অরুণকুমার সেন

অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞান

[বাণিজ্য-ধারার জন্য]

দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী

পশ্চিমবংগ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ কর্তৃক প্রদত্ত নূতন্ সিলেবাস অনুসারে লিখিত (*S. E. Board's Press Notification No. Syll. PN/2/68, Dated 9. 5. 68*) ও উক্ত পর্ষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত (recommended) [*No. TB—5. Dated 20. 12. '68*]

অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞান

[বাণিজ্য-ধারার জন্য]

অধ্যক্ষ **অরুণকুমার সেন**, এম্ এ. (সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত),
এম্. এস্-সি. ইকন. (লণ্ডন), ব্যারিষ্টার-এ্যাট্-ল
প্রণীত

দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট · কলিকাতা-১২

Revised in collaboration with
Prof. SUSHIL KUMAR SEN, M. A.
Head of Political Science Department,
City College, Calcutta
and
Dr. SANTILAL MUKHERJI, M. A., D. Phil.
Head of Economics Department, City College of
Commerce and Business Administration, Calcutta

প্রকাশক :
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন, বি. এস্-সি
দি সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সীর পক্ষে
১৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—ডিসেম্বর, ১৯৬৮
দ্বিতীয় সংস্করন—মার্চ, ১৯৬৯

দাম ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা

মুদ্রাকর :
শ্রীপার্বতী চরণ রায়
দি গৌতম প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯-এ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

বর্তমান শিক্ষা-বৎসরের (১৯৬৯ সালের) মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতে হইবে, এ-আশা ঠিক করি নাই। অবশ্য গ্রন্থখানি শিক্ষক মহলে আদৃত হওয়ায় আমি স্বভাবতই আনন্দিত। বর্তমান সংস্করণকে দ্বিতীয় 'সংস্করণ' বলিয়া অভিহিত করা বোধ হয় ভুল, কারণ এই সংস্করণে আলোচ্য বিষয়ের কোন পরিবর্তনই করা হয় নাই—ভাষার অসংগতি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটি দূর করিয়া পরিমার্জন করা হইয়াছে মাত্র। এই পরিমার্জনকার্যে আমাকে সহায়তা করিয়াছেন সিটি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক সুশীলকুমার সেন এবং সিটি কলেজ অফ্ কমার্স অ্যাণ্ড বিজ্‌নেস্ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়। ইতি—

সিটি কলেজ অফ্ কমার্স অ্যাণ্ড
বিজ্‌নেস্ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন,
কলিকাতা
১৫ই মার্চ, ১৯৬৯

অরুণকুমার সেন

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

পশ্চিমবংগ মধ্য-শিক্ষা পর্ষদ্ প্রদত্ত নূতন সিলেবাস অনুসারে গ্রন্থখানি রচনা করা হইল।

নূতন সিলেবাসে পুরাতন সিলেবাসের কয়েকটি বিষয় বাদ দেওয়া হইয়াছে ইহার ফলে অবশিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে নূতন সিলেবাস অনুসারে রচনার প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার প্রতি যথাসম্ভব দৃষ্টি রাখিয়াই গ্রন্থখানি বা বর্তমান সংস্করণটি প্রণয়ন করিয়াছি। অন্যান্য ব্যাপারেও পর্ষদ্ প্রদত্ত সিলেবাসের মর্যাদা রাখার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করিয়াছি। প্রচেষ্টায় কতদূর সফল হইয়াছি, সে-বিষয়ের ভার অবশ্য আমার উপর নহে। ইতি—

সিটি কলেজ অফ্ কমার্স অ্যাণ্ড
বিজ্‌নেস্ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন,
কলিকাতা
৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬৮

অরুণকুমার সেন

II. ECONOMICS AND CIVICS

(*Including Economic Geography*)

A. ECONOMICS

(*Including Indian Economic Problems*)

Chapter 1

Some Fundamental Concepts : Wealth, Goods, Utility, Production and Consumption. Supply and Demand. Value and Price.

Chapter 2

Wants and their characteristics—Law of Diminishing Utility—Total and Marginal Utility.

Chapter 3

Law of Demand—Elasticity and Demand.

Chapter 4

Factors of Production—Land, Labour, Capital and Organisation. Land and other factors of production—Laws of Returns. Supply and efficiency of Labour—Division of Labour. Capital—Wealth and Capital. The Functions of the Organisation.

Chapter 5

Large-scale Production—Internal and External Economies of large-scale production. Small-scale production. Localisation of industries. Organisation of large and small industries in India.

Chapter 6

Exchange : What is a market ? Conditions determining size of market—Value and Price. Value and Competition—Theory of Value. Market Value and Normal Value—Equilibrium of Demand and Supply in the case of market value and in the case of normal value. Value and the Laws of Returns.

Chapter 7

Money : Barter, What is money ? Functions of money. Different kinds of money in India. Paper money—Value of money. Quantity Theory of Money—Inflation—Prices in India.

Chapter 8

Credit and Banking : Nature and characteristics of Credit. Credit instruments. Banking : Central and Commercial Banks and their functions.

Chapter 9

Distribution : Rent, Wages, Interest and Profit. National Dividend and National Income—India's National Income and its principal sources.

B. CIVICS

(Including Indian Administration)

Chapter 1

Meaning and Scope of the study of Civics.

Chapter 2

The Individual, Society, the State and the other Associations.

Chapter 3

Ends and Functions of the Modern State.

Chapter 4

Citizenship—Citizens and Aliens—Acquisition and termination of Citizenship—Indian Citizenship. Rights and Duties of a Citizen.

Chapter 5

Law—Meaning of Law. Law and Liberty.

Chapter 6

Forms of Government—Democracy and Dictatorship. Merits and Demerits of Democracy—Conditions of Democracy.

Chapter 7

The Executive, the Legislature and the Judiciary. Theory of Separation of Powers.

Chapter 8

The Electorate—Adult Suffrage—Extent of Electorate—Minority representation. Voters and Constituencies in India.

Chapter 9

Government of India—Union Executive and Union Legislature. State Executive and State Legislature. Judicial System.

সূচীপত্র

অর্থবিদ্যা (Economics)

পৌরবিজ্ঞান (Civics)

ভারতের শাসন-ব্যবস্থা (Government of India)

অর্থবিদ্যা

- মৌলিক ধারণা
- ভোগ
- উৎপাদন

১ | কতকগুলি মৌলিক ধারণা
(Some Fundamental Concepts)

বর্ণপরিচয় না করিয়া যেমন কোন ভাষা শিক্ষা করা চলে না, তেমনি মৌলিক ধারণাগুলির অর্থ সুস্পষ্টভাবে না বুঝিয়া কোন বিজ্ঞান বা শাস্ত্র চর্চাও করা যায় না অর্থবিদ্যা অন্যতম বিজ্ঞান বলিয়া আলোচনার সুরুতেই কতকগুলি মৌলিক ধারণার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

অর্থবিদ্যার মৌলিক ধারণার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দ্রব্য (Goods)

মানুষ তাহার অভাবমোচনের দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় এবং অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হইল মানুষের এই কর্মপ্রচেষ্টা। এখন প্রশ্ন, 'দ্রব্য' (goods) বলিতে কি বুঝায় ?

বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য ঃ সংক্ষেপে বলা যায়, যাহা কিছু মানুষের অভাববোধকে পরিতৃপ্ত করে তাহাই দ্রব্য। ইহা 'বস্তুগত' (material) এবং 'অ-বস্তুগত' (non-material) উভয়ই হইতে পারে। চালডাল তরিতরকারি ঘরবাড়ী বইপত্র আলোবাতাস প্রভৃতি বস্তুগত দ্রব্যের উদাহরণ। ইহাদিগকে সাধারণত সামগ্রী (commodities) বলিয়া অভিহিত করা হয়। অপরপক্ষে ব্যবসায়ীর দক্ষতা, ডাক্তার গায়ক মিস্ত্রী প্রভৃতির পেশাগত কর্মকুশলতা, ব্যবসায়ের সুনাম (goodwill), ইত্যাদি হইল অ-বস্তুগত দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। ডাক্তার যখন চিকিৎসা করেন, শিক্ষক যখন শিক্ষাদান করেন, গায়ক যখন তাঁহার সংগীত দ্বারা লোককে আনন্দ দান করেন তখন ঐরূপ কার্যকে অর্থবিদ্যার ভাষায় 'সেবা' (service) বলা হয়।

দ্রব্যাদিকে অন্যভাবে 'বাহ্যিক' (external) এবং 'আভ্যন্তরীণ' (internal) —এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র, আলোবাতাস, ব্যবসায়ের সুনাম, প্রভৃতি হইল মানুষের বাহিরের জিনিস; কিন্তু ব্যবসায়ীর দক্ষতা, গায়কের গান গাহিবার কুশলতা, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারের দক্ষতা, প্রভৃতি মানুষের অভ্যন্তরে অবস্থিত। সুতরাং ইহাদিগকে আভ্যন্তরীণ দ্রব্য বলা হয়।

আবার দ্রব্যাদি 'হস্তান্তরযোগ্য' (transferable) অথবা 'হস্তান্তরযোগ্যতাহীন' (non-transferable) হইতে পারে। ঘরবাড়ী, ক্ষেতখামার, ধানচাল, ব্যবসায়ের সুনাম, প্রভৃতি একজনের নিকট হইতে অপরের নিকট হস্তান্তর বা বিক্রয় করা যায়। ইহাদের বলা হয় হস্তান্তরযোগ্য দ্রব্য। কিন্তু কোন লোকের ব্যক্তিগত গুণাবলী—যেমন, গায়কের সুকণ্ঠ, খেলোয়াড়ের নৈপুণ্য, চিকিৎসকের দক্ষতা, ইত্যাদি—

একজন অপরকে দিতে অথবা বিক্রয় করিতে পারে না। অনুরূপভাবে কোন স্থানের আলোবাতাস স্বাস্থ্যকে অন্য এক স্থানে লইয়া আসা যায় না।

'অবাধলভ্য' (free) ও 'অর্থনৈতিক' (economic)—এইভাবেও দ্রব্যসমূহের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। অবাধলভ্য দ্রব্য হইল সেইগুলি যেগুলি প্রকৃতি এত প্রচুর পরিমাণে দিয়াছে যে তাহাদের ইচ্ছামত ব্যবহারে কোন বাধা নাই। প্রকৃতিদত্ত আলোবাতাস, অরণ্যে কাষ্ঠ, মরুভূমিতে বালুকা, নদীতে জল প্রভৃতি অবাধলভ্য দ্রব্যের দৃষ্টান্ত। ইহাদের সম্পর্কে হিসাব করিয়া ব্যবহার করিবার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ দ্রব্যই অবাধলভ্য নয়। অধিকাংশ দ্রব্যেরই যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর এবং মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা উহাদিগকে সংগ্রহ করিতে হয়। এই সকল অপ্রচুর (scarce) দ্রব্যকেই অর্থনৈতিক দ্রব্য (economic goods) বলা হয়। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কোন দ্রব্য অবাধলভ্য বা অর্থনৈতিক দ্রব্য কি না, তাহা অবস্থার উপর নির্ভর করে। নদীতীরে জল অবাধলভ্য দ্রব্য, কারণ চাহিদার তুলনায় প্রচুর বলিয়া উহার জন্য কাহাকেও দাম দিতে হয় না ; কিন্তু যখন কলিকাতার মত সহরাঞ্চলে নদী হইতে গৃহে গৃহে ঐ জল সরবরাহ করা হয় তখন উহা অর্থনৈতিক দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত। দ্রব্য হিসাবে জলের এই পরিবর্তনের মূলে আছে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা (human effort) বা পরিশ্রম। অর্থাৎ, পরিশ্রমই অবাধলভ্য দ্রব্যকে অর্থনৈতিক দ্রব্যে পরিণত করে।

সম্পদ ঃ অর্থবিদ্যায় অর্থনৈতিক দ্রব্যকে সংক্ষেপে 'সম্পদ' (wealth) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে আবার দ্রব্যসমূহকে 'ভোগ্যদ্রব্য' (consumer's or consumption goods) এবং 'মূলধন বা বিনিয়োগ দ্রব্য' (producer's or investment or capital goods)—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যে-সকল দ্রব্য সরাসরি আমাদের অভাব বা আকাংক্ষা মিটায় তাহাদের বলা হয় ভোগ্যদ্রব্য। যেমন, চালডাল জামাকাপড় ঘরবাড়ী ইত্যাদি। মূলধন বা বিনিয়োগ দ্রব্য হইল সেগুলি যাহা অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করিয়া পরোক্ষভাবে আমাদের চাহিদা মিটায়। যেমন, কলকারখানা যন্ত্রপাতি কাঁচামাল প্রভৃতি। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রত্যক্ষ ভোগের দ্রব্য হইল ভোগ্যদ্রব্য আর উৎপাদনের জন্য যে-দ্রব্য ব্যবহৃত হয় তাহা হইল মূলধন-দ্রব্য। তবে একই দ্রব্য এক অবস্থায় ভোগ্যদ্রব্য এবং অন্য অবস্থায় মূলধন-দ্রব্য হইতে পারে। যখন আমরা বাড়ীর রান্নাবান্নার জন্য কয়লা ব্যবহার করি তখন কয়লা ভোগ্যদ্রব্য, কিন্তু কারখানায় যে-কয়লা ব্যবহার করা হয় তাহা মূলধন-দ্রব্য, কারণ উহাকে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইতেছে।

সুতরাং কোন দ্রব্য মূলধন বা বিনিয়োগ-দ্রব্য, না ভোগ্যদ্রব্য তাহা ব্যবহারের উপর নির্ভর করে।

স্থায়িত্ব অনুসারেও দ্রব্যাদিকে 'একবার ব্যবহার্য দ্রব্য' (single-use goods) এবং 'স্থায়ী দ্রব্য' (durable goods)—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যে-সকল দ্রব্য একবার মাত্র ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হইয়া যায় তাহাদিগকে একবার ব্যবহার্য দ্রব্য বলা হয়। যেমন, যে-কয়লা একবার পোড়ান হইল তাহাকে দ্বিতীয়বার আর পোড়ান চলে না, যে-লেবুটি একবার খাওয়া হইল তাহা আর দ্বিতীয়বার খাওয়া যায় না। অপরদিকে এরূপ দ্রব্য আছে যাহাদের একাধিকবার ব্যবহার করা চলে—যেমন, যে-কলমটি দিয়া আমি লিখিতেছি তাহা দিয়া একবার লিখিলেই তাহার ব্যবহার শেষ হয় না—একই কলম দ্বারা বেশ কিছুদিন লেখা চলে। কারখানায় যে-সকল যন্ত্রপাতি দ্বারা উৎপাদন করা হয় তাহা একাধিক বার ব্যবহারযোগ্য। এই ধরনের একাধিক বার ব্যবহার্য দ্রব্যকে স্থায়ী দ্রব্য বলা হয়।

উপযোগ (Utility)

অর্থবিদ্যায় 'উপযোগ' বলিতে অভাব মিটাইবার ক্ষমতাকে বুঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, উপযোগ হইল মানুষের অভাববোধ পরিতৃপ্ত করিবার জন্য দ্রব্যের গুণ বা ক্ষমতা। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে কোন দ্রব্যের তৃপ্তিদান করিবার ক্ষমতাই উপযোগ, দ্রব্যটি উপযোগ নহে। যে-কলম দিয়া আমি লিখি সেই কলমটি উপযোগ নহে, আমার লেখায় সহায়তা করার জন্য ইহার যে-ক্ষমতা তাহাই উপযোগ। লেখায় সহায়তা করে বলিয়াই আমি কলমের আকাংক্ষা করি। এইজন্য উপযোগকে আকাংক্ষা বা কাম্যতা (desiredness) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

অর্থবিদ্যায় 'উপযোগ' শব্দটি ব্যবহার করিবার সময় দুইটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। প্রথমত, উপযোগ শব্দটির সহিত কোন নৈতিক প্রশ্ন জড়িত নাই। নীতির দিক দিয়া ভাল হউক বা মন্দ হউক, কোন দ্রব্যের জন্য মানুষের আকাংক্ষা থাকিলেই ঐ দ্রব্যের উপযোগ আছে বলিয়া ধরিতে হইবে। আকাংক্ষা উঁচুদরের না নীচুদরের, অথবা দ্রব্যটি উপকারী না ক্ষতিকারক তাহা আমাদের দেখিবার কথা নয়। দুগ্ধ উপকারী এবং মদ্য ক্ষতিকারক। কিন্তু দুগ্ধের যেমন আমাদের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে, মদ্যপায়ীর নিকট মদেরও সে-ক্ষমতা আছে। সুতরাং উভয়েরই উপযোগ বা অভাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে।

দ্বিতীয়ত, উপযোগ একটি আপেক্ষিক (relative) ও মানসিক (subjective) ধারণা। কোন দ্রব্য হয়ত একজনের আকাংক্ষা তৃপ্তি করিতে পারে, অপর একজনের পারে না। যেমন, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একজনের জল হইলেই চলিতে পারে, অপর

একজনের কিন্তু লেমনেডের প্রয়োজন হয়; অথবা আহারের জন্য কেহ কেহ ভাত, আবার কেহ কেহ রুটি পছন্দ করে। এইভাবে একই দ্রব্য দুই ব্যক্তির আকাংক্ষা সমানভাবে পূরণ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া সময়ের ব্যবধানে কোন জিনিসের জন্য একই ব্যক্তির আকাংক্ষার তারতম্য দেখা যায়। যেমন, তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়িলে পানীয় জলের জন্য আকাংক্ষা খুব তীব্র থাকে, কিন্তু জলপানের পর তৃষ্ণা মিটিলে সাময়িকভাবে পানীয় জলের জন্য আকাংক্ষা আর থাকে না। সুতরাং দ্রব্যের উপযোগ বা পরিতৃপ্তি-দানের ক্ষমতা সকল সময় সকল অবস্থায় সকলের নিকট সমান নহে।

উপযোগের প্রকারভেদ (Different Kinds of Utility) : উপযোগ মোটামুটি পাঁচ প্রকারের হইতে পারে :

ক। স্বাভাবিক উপযোগ (Elementary or Natural Utility) : প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যের যে-উপযোগ থাকে তাহাকে 'স্বাভাবিক' উপযোগ বলা হয়। যেমন, আমাদের কাছে প্রকৃতিদত্ত আলোবাতাস-জলের যে-উপযোগ আছে তাহা স্বাভাবিক উপযোগ।

খ। রূপগত উপযোগ (Form Utility) : কোন দ্রব্যের রূপান্তর ঘটাইয়া উহার উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়। এই প্রকারের উপযোগকে 'রূপগত' উপযোগ বলা হয়। কাঠ হইতে ছুতার-মিস্ত্রী যখন চেয়ার টেবিল আলমারি প্রভৃতি আসবাবপত্র তৈয়ারি করে তখন সে কাঠকে রূপান্তরিত করিয়া কাঠের উপযোগ বৃদ্ধি করে। আবার যখন তুলা হইতে বস্ত্র তৈয়ারি করা হয় তখন তুলাকে নূতন রূপ দিয়া উহার উপযোগ বৃদ্ধি করা হয়। এইভাবে নূতন রূপ দেওয়ার ফলে যে-উপযোগের সৃষ্টি হয় তাহাই রূপগত উপযোগ।

গ। স্থানগত উপযোগ (Place Utility) : একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণ করিয়া কোন দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি বা সৃষ্টি করা যায়। যেমন, খনি হইতে কয়লা নগরাঞ্চলে ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করিয়া কয়লার উপযোগ বৃদ্ধি করা হয়, অথবা দার্জিলিং হইতে কমলালেবু কলিকাতায় চালান দিয়া উহার উপযোগ বৃদ্ধি করা হয়।

ঘ। সময়গত উপযোগ (Time Utility) : এক সময় হয়ত কোন জিনিসের জন্য মানুষের আকাংক্ষা কম, অন্য সময় উহার জন্য আকাংক্ষা অধিক। সময়ের ব্যবধানে দ্রব্যের উপযোগ বাড়িয়া যাইতে পারে। পূজার সময় ছেলেমেয়েদের নূতন জামাকাপড়ের যে-আকাংক্ষা থাকে, অন্য সময় তাহা থাকে না। অর্থাৎ, পূজার সময় জামাকাপড়ের উপযোগ বাড়িয়া যায়। সুতরাং যে-সময় যে-দ্রব্য আকাংক্ষিত হয় সেই সময় সেই দ্রব্যের যোগান দিয়া সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়।

৬। সেবাগত উপযোগ (Service Utility): কতকগুলি দ্রব্য বস্তুর আকার ধারণ না করিয়া সরাসরি আমাদের আকাংক্ষা পরিতৃপ্ত করে। ইহাদের তৃপ্তিদানের ক্ষমতা বা উপযোগকে সেবাগত উপযোগ বলা হয়। যেমন, চিকিৎসকের চিকিৎসা, শিক্ষকের শিক্ষাদান, ভৃত্যের পরিচর্যা, ইত্যাদি।

সম্পদ (Wealth)

অর্থবিদ্যায় 'সম্পদ' শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। সম্পদ বলিতে সেই সকল বস্তুগত দ্রব্যকে বুঝায় যাহাদের বিনিময়-মূল্য আছে—অর্থাৎ, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসমষ্টিকেই সম্পদ বলা হয়। এখন কোন বস্তুগত দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য থাকিতে হইলে উহাকে তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইতে হইবে—যথা, (১) উহার উপযোগ বা অভাবমোচনের ক্ষমতা থাকিবে, (২) উহার যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর (scarce) হইবে, এবং (৩) উহা বিক্রয়যোগ্য (marketable) হইবে। এখন এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

সম্পদের বৈশিষ্ট্য: প্রথমত, ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, উপযোগ না থাকিলে কোন জিনিসের বিনিময়-মূল্য থাকিতে পারে না। যাহার অভাবমোচন বা আকাংক্ষাপূরণের ক্ষমতা নাই তাহা কেহই চাহিবে না, টাকা দিয়া ক্রয় করা ত দূরের কথা। সুতরাং সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে প্রথমেই বস্তুটির পক্ষে উপযোগ থাকা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, মাত্র উপযোগ থাকিলেই কোন জিনিস সম্পদ বলিয়া গণ্য হয় না। যে-সকল দ্রব্য অবাধলভ্য, যাহা চাহিলেই পাওয়া যায় তাহাদের বিনিময়ে কেহ কোন মূল্য দেয় না। আমরা নিত্য যে প্রকৃতিদত্ত আলোবাতাস ভোগ করি তাহা আমাদের জীবনধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় ইহাদের যোগান এতই প্রচুর যে ইহাদের ক্রয়বিক্রয়ের কোন প্রশ্নই উঠে না। বিনামূল্যেই ইহাদের আমরা ভোগ করিয়া থাকি। অনুরূপভাবে নদীতীরে চাহিদার তুলনায় জলের যোগান এতই প্রচুর যে জল বেচাকেনার কথা কেহ চিন্তাই করে না। সুতরাং অবাধলভ্য দ্রব্যাদি সম্পদের পর্যায়ে পড়ে না।

তবে মনে রাখিতে হইবে যে যাহা এক অবস্থায় অবাধলভ্য তাহা অন্য অবস্থায় চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর হইতে পারে; ফলে উহার জন্য দাম দিতে হইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, নদীর তীরে জল অবাধলভ্য দ্রব্য, কিন্তু সহরে বাড়ীতে বাড়ীতে করপোরেশন কিংবা মিউনিসিপ্যালিটি যে-জল সরবরাহ করে তাহা অবাধলভ্য নয়; ইহার জন্য নগরবাসীদের নিকট হইতে কর আদায় করা হয়। সুতরাং এই অবস্থায় জল সম্পদের পর্যায়ে পড়ে। বায়ুর ক্ষেত্রে অনুরূপ উক্তি খাটে। প্রকৃতিদত্ত বায়ু

আমরা অবাধে ও বিনামূল্যে শ্বাসপ্রশ্বাসে লই ; কিন্তু সিনেমাগৃহে যখন কৃত্রিম উপায়ে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা করা হয় তখন উহার জন্য সিনেমা-মালিককে অর্থব্যয় করিতে হয় এবং ঐ খরচ দর্শকদের নিকট হইতে সিনেমা-টিকিটের দামের মধ্য দিয়া তুলিয়া লওয়া হয়। এক্ষেত্রে বায়ুও অপ্রচুর সামগ্রী এবং সম্পদের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং কোন দ্রব্য সম্পদ কি না, তাহা বিচারের সময় দেখিতে হইবে যে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর বা সীমাবদ্ধ কি না। সীমাবদ্ধ না হইলে উহা সম্পদের পর্যায়ে পড়িবে না।

তৃতীয়ত, আবার উপযোগ থাকিলে এবং সীমাবদ্ধ হইলেই কোন দ্রব্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হয় না। উপযোগ ও সীমাবদ্ধতা ছাড়াও দ্রব্যটির আর একটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। দ্রব্যটিকে বিক্রয়যোগ্য হইতে হইবে। অর্থাৎ, দ্রব্যটি ক্রয়বিক্রয়ের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন।

বিক্রয়যোগ্য হইতে হইলে দ্রব্যের পক্ষে আবার হস্তান্তরযোগ্য হওয়া আবশ্যক। যেমন, ঘরবাড়ী চালডাল পোশাকপরিচ্ছদ বইপত্র ইত্যাদি একজন আর একজনের নিকট বিক্রয় করিতে পারে। সুতরাং ইহারা বিক্রয়যোগ্য বা হস্তান্তরযোগ্য। 'হস্তান্তর' শব্দটির দ্বারা মালিকানার হস্তান্তরই বুঝায়, স্থানান্তর বুঝায় না। যেমন, যখন জমি বা বাড়ী বিক্রয় করা হয় তখন উহা একস্থান হইতে অন্য কোন স্থানে স্থানান্তরিত হয় না। জমি বা বাড়ীর মালিকানা একজনের নিকট হইতে অপর একজনের নিকট হস্তান্তরিত হয় মাত্র। হস্তান্তর করা যায় না বলিয়াই হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার পাসের সার্টিফিকেট বা চিকিৎসকের পারদর্শিতা সম্পদ বলিয়া গণ্য হয় না।

অতএব, যে-সকল দ্রব্য হস্তান্তর করা যায় না এবং বিক্রয়যোগ্য নয় সেই সকল দ্রব্যকে সম্পদ আখ্যা দেওয়া হয় না। যেমন, মানুষের স্বাস্থ্য, গায়কগায়িকার সংগীতনৈপুণ্য, চিকিৎসকের পারদর্শিতা, শিল্পীর শিল্পকৌশল প্রভৃতি ব্যক্তিগত গুণাবলীর উপযোগ আছে এবং উহাদের যোগানও অপ্রচুর, কিন্তু এই জিনিসগুলি একজন অপরের নিকট হস্তান্তরিত করিতে পারে না বলিয়া উহারা সম্পদ বলিয়া গণ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, চলতি কথায় আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'। কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহার স্বাস্থ্যকে অপরের নিকট হস্তান্তরিত করিতে পারে না ; সুতরাং অর্থবিদ্যায় স্বাস্থ্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হয় না।

দেখা গেল, কোন দ্রব্য সম্পদ হইতে হইলে উহাকে বিক্রয়যোগ্য হইতে হইবে। কিন্তু বিক্রয়যোগ্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে উহাকে বাস্তবিকপক্ষে বিক্রয় করিতে হইবে। সমাজের এমন সকল সাধারণ সম্পদ আছে—যথা, রাস্তাঘাট পুল রেলপথ উদ্যান স্কুলকলেজ চিড়িয়াখানা ইত্যাদি যাহা ক্রয়বিক্রয় করা হয় না। তবুও এগুলি সম্পদের পর্যায়ভুক্ত।

পরিশেষে, 'সম্পদ' শব্দটি বস্তুগত দ্রব্যকে (material goods) বুঝাইতেই ব্যবহার করা হয়। অনেকে অবশ্য অ-বস্তুগত দ্রব্যকেও সম্পদ বলিয়া অভিহিত করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু এইরূপ করায় অসুবিধা আছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সম্পদ হইতে গেলে দ্রব্যকে হস্তান্তরযোগ্য হইতে হইবে। অ-বস্তুগত দ্রব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হস্তান্তরযোগ্য নয় বলিয়া উহারা সম্পদের পর্যায়ে পড়ে না। উপরন্তু, অ-বস্তুগত দ্রব্যকে সম্পদ বলিয়া গণ্য করিলে সম্পদ পরিমাপ করিবার ব্যাপারেও অসুবিধা দেখা যায়। সম্পদ হইল কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে (at a certain point in time) অবস্থিত বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসমষ্টি (a stock of marketable goods)। ডাক্তারের সেবা, উকিলের পরামর্শ, শিক্ষকের শিক্ষাদান, বাস-কণ্ডাক্টরের কার্য, অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় আমাদের অভাবপূরণ করে সত্য। ইহারা চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর এবং বাজারে ইহাদের বিনিময়-মূল্যও আছে। কিন্তু ইহাদের উৎপাদন ও ভোগ একই সময় সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে এবং ইহারা বস্তুগত দ্রব্যের আকার ধারণ করিতেছে না। অতএব, কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে ইহাদের পরিমাণ কত তাহা নির্ধারণ করা যায় না। এই কারণে আমরা অ বস্তুগত সেবাকে সম্পদের পর্যায়ে ফেলিব না ; সম্পদ বলিতে মাত্র নির্দিষ্ট মুহূর্তে অবস্থিত দ্রব্যসমষ্টিকেই বুঝিব।

সম্পদের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Wealth): মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে 'ব্যক্তিগত সম্পদ' (individually owned wealth) এবং 'সমষ্টিগত সম্পদ' (collectively owned wealth)—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

ক। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পদ: যে-সকল সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা-স্বত্ব থাকে তাহাদিগকে ব্যক্তিগত সম্পদ বলা হয়—যেমন, ব্যক্তিবিশেষের ঘরবাড়ী, ধনসম্পত্তি, আসবাবপত্র, কাপড়চোপড়, ইত্যাদি। অপরদিকে সাধারণে যে-সকল সম্পদের মালিক তাহাদিগকে সমষ্টিগত সম্পদ বলা হয়—যেমন, রাস্তাঘাট, পার্ক, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, জাতীয় লাইব্রেরী, সরকারী ঘরবাড়ী, ইত্যাদি। ইহা ছাড়া বর্তমান সময়ে সরকার অনেক ব্যবসায় ও শিল্প নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে—যেমন, রেলপথ, নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা, অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা, সরকারী পরিবহণ, ইত্যাদি। এগুলিও সমষ্টিগত সম্পদের উদাহরণ।

খ। সামাজিক ও জাতীয় সম্পদ: আবার 'জাতীয়' (national) বা 'সামাজিক' সম্পদ কথাটিও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ইহার দ্বারা কোন সমাজ বা দেশের সমগ্র সম্পদকে বুঝায়। সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পদ ও সমষ্টিগত সম্পদ লইয়াই এই জাতীয় বা সামাজিক সম্পদ। উদাহরণস্বরূপ, সকল ভারতবাসীর

ব্যক্তিগত সম্পদ ও ভারত-রাষ্ট্রের সমষ্টিগত সম্পদ—উভয়ে মিলিয়াই হইল ভারতের জাতীয় সম্পদ।

জাতীয় সম্পদের হিসাবঃ জাতীয় সম্পদের হিসাব করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি যখন তাহার নিজস্ব সম্পদের হিসাব করে তখন সে তাহার ঘরবাড়ী আসবাবপত্র গহনা বই ইত্যাদি ছাড়াও কোম্পানীর শেয়ার-বণ্ড-ডিবেঞ্চার, সরকারী ঋণপত্র (যেমন, সেভিংস্ সার্টিফিকেট), টাকাকড়ি (নোট ও মুদ্রা), অপরকে প্রদত্ত ঋণ ইত্যাদিও তাহার সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করে। ব্যক্তি যে শেয়ার বণ্ড ঋণপত্রকে তাহার সম্পদ বলিয়া মনে করিবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, এই সকল কাগজপত্র বিক্রয় করিয়া সে যে-কোন সময় অভাবমোচনের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারে। সম্পদের যে-বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি তাহা এই কাগজপত্রের আছে। অর্থাৎ, ইহাদের উপযোগ আছে, ইহারা চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর, ইহারা হস্তান্তরযোগ্য ও বিক্রয়যোগ্য এবং ইহারা বস্তুগত দ্রব্য। কিন্তু এই সকল কাগজপত্রের নিজস্ব কোন মূল্য নাই—ইহারা 'প্রকৃত সম্পদে'র মালিকানার নির্দেশক বলিয়াই মানুষ ইহাদের আকাংক্ষা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন কোন ব্যক্তি যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের (joint stock company) শেয়ার ক্রয় করে তখন তাহার ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির আংশিক মালিকানা জন্মায়। তাহার শেয়ারপত্র ঐ কোম্পানীর উপর তাহার আংশিক মালিকানা নির্দেশ করে বলিয়াই ব্যক্তির নিকট উহা মূল্যবান। কিন্তু সমাজের নিকট উহার কোন মূল্য নাই; এই শেয়ারপত্রের পিছনে কোম্পানীর যে-সম্পত্তি থাকে তাহাই আসলে সম্পদ। এই কারণে সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে শেয়ার বণ্ড প্রভৃতি সম্পদ বলিয়া গণ্য নহে; সম্পদ হইল ঐ প্রতিষ্ঠানের ঘরবাড়ী যন্ত্রপাতি মালমসলা ইত্যাদি দ্রব্য।

অনুরূপভাবে ব্যক্তির দিক হইতে সরকারী ঋণপত্র সম্পদ বিবেচিত হইলেও সমাজের দিক হইতে উহা সম্পদ নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার কর সংগ্রহের দ্বারা ঋণ পরিশোধ বা ঋণের উপর সুদ প্রদান করে। ইহার অর্থ হইল দেশের একজনের নিকট হইতে অপরের নিকট অর্থ হস্তান্তরিত করা। আবার এক ব্যক্তি যখন অপর আর এক ব্যক্তিকে ঋণদান করে তখন ঐ ঋণপত্র সামাজিক দিক হইতে সম্পদ নয়—তবে ঐ ঋণের সাহায্যে প্রকৃত সম্পত্তি সৃষ্ট হইলে ঐ সম্পত্তি সম্পদের পর্যায়ভুক্ত হয়।

টাকাকড়ির ক্ষেত্রেও একই রকম যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত টাকাকড়ির মধ্যে নোট ও ধাতব মুদ্রা আছে। এইগুলি যে উপযোগসম্পন্ন, অপ্রচুর, হস্তান্তরযোগ্য এবং বস্তুগত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু নিজস্ব মূল্যের

জন্য ইহাদের কেহ চাহে না ; চাহে উহাদের দ্বারা অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করা যায় বলিয়া। অতএব টাকাকড়ি সম্পদের প্রতীক মাত্র, সম্পদ নহে। ধাতব মুদ্রার ক্ষেত্রে মুদ্রার ধাতুটুকু মাত্র সম্পদ, তাহার বেশী নহে। টাকাকড়ি যদি দেশের বা সমাজের সম্পদ হইত তাহা হইলে যে-কোন দেশ মাত্র নোট ছাপাইয়াই সম্পদশালী হইতে পারিত ; খাদ্যের উৎপাদন, শিল্পের প্রসার, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতির কোন প্রয়োজনই হইত না।

জাতীয় সম্পদের হিসাবের সময় আমাদের আর এক বিষয়ও মনে রাখিতে হইবে। কোন দেশই আজ অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। নানাভাবে দেনাপাওনার সূত্রে এক দেশ অন্যান্য দেশের সহিত সম্পর্কিত। জাতীয় সম্পদ হিসাবের সময় দেশের নিকট বিদেশের পাওনাকে সমগ্র সম্পদ হইতে বাদ দিতে হইবে, আবার বিদেশের নিকট দেশের কোন পাওনা থাকিলে উহাকে দেশের সম্পদের সংগে যোগ করিতে হইবে।

উৎপাদন (Production)

মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে তাহার অভাবমোচন বা ভোগের তাগিদ। প্রকৃতি আমাদের অনেক জিনিস দিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল দ্রব্য সরাসরি আমাদের অভাবপূরণ করে। যেমন, প্রকৃতিদত্ত আলোবাতাস আমরা সরাসরি ভোগ করিয়া থাকি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃতির দান সরাসরি আমাদের অভাবমোচন করিতে পারে না। আমাদের অন্নবস্ত্র আসবাবপত্র বাড়ীঘর যানবাহন বইপত্র প্রভৃতি অসংখ্য দ্রব্যের অভাব আছে। প্রকৃতি এইগুলি সরাসরি মানুষের হস্তে তুলিয়া দেয় না। এইজন্যই প্রয়োজন হয় উৎপাদনের। মানুষ প্রকৃতির দানকে রূপান্তরিত করিয়া তাহার অভাব-আকাংক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিবার উপযোগী করিয়া তুলে। যেমন, প্রকৃতি বনেজংগলে গাছপালা দিয়াছে। মানুষ নিজে পরিশ্রম করিয়া গাছপালা কাটিয়া কাঠ হইতে আসবাবপত্র তৈয়ারি করে। আবার প্রকৃতি অসংখ্য নদনদী দিয়াছে। মানুষ তাহার পরিশ্রম ও কলাকৌশলের সাহায্যে নদনদীতে বাঁধ বাঁধিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করে। প্রকৃতি জমি দিয়াছে। মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় ঐ জমি হইতে খাদ্য ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং উৎপাদনের অর্থ হইল তৃপ্তিদান-ক্ষমতা সৃষ্টি করা। অর্থাৎ, উপযোগ-সৃষ্টিকেই (the creation of utility) অর্থবিদ্যায় বলা হয় উৎপাদন।

অনেক সময় উৎপাদনকে পদার্থসৃষ্টির অর্থে ব্যবহার করা হয়। এ-ধারণা কিন্তু ভুল। মানুষ কোন নূতন পদার্থ সৃজন করিতে পারে না। সে প্রকৃতিদত্ত পদার্থের কাম্যতা সৃষ্টি করিয়া আকাংক্ষা নিবৃত্তির ব্যবস্থা করে। যেমন, গাছ কাটিয়া তাহার

কাঠ হইতে মানুষ যখন চেয়ার টেবিল আলমারি প্রভৃতি দ্রব্য তৈয়ারি করে তখন সে গাছের ও কাঠের কাম্যতা বা তৃপ্তিদান-ক্ষমতাই বৃদ্ধি করে।

অনেকের মতে অবশ্য উপযোগ-সৃষ্টি বস্তুগত দ্রব্যের আকার ধারণ না করিলে তাহাকে উৎপাদন বলা যায় না। এই মতানুসারে যাহারা খাদ্যবস্ত্র ঘরবাড়ী প্রভৃতি বস্তুগত দ্রব্য উৎপাদন করে তাহাদের শ্রম উৎপাদনশীল, কিন্তু শিক্ষক গায়ক বাদক ডাক্তার উকিল বিচারক অভিনেতা প্রভৃতির কার্য অনুৎপাদনশীল। কারণ, ইঁহাদের শ্রমের ফল কোন বস্তুগত দ্রব্যের আকার ধারণ করে না এবং উহা উৎপাদনের সংগে সংগেই ধ্বংস বা নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু যে-ব্যক্তি হারমোনিয়াম তৈয়ারি করে সে যেমন মানুষের আকাংক্ষা মিটায়, তেমনি যে-গায়ক ঐ হারমোনিয়ামের সাহায্যে গান করিয়া অর্থোপার্জন করে সেও মানুষকে পরিতৃপ্তি দান করে। সুতরাং হারমোনিয়াম-বাদকের শ্রমও উৎপাদনশীল।

মোটকথা উপযোগ-সৃজন মাত্রই উৎপাদন, তাহা এই উপযোগ সেবা বা বস্তুগত দ্রব্য যে-কোন আকারেই সৃষ্ট হউক না কেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে মানুষ বিভিন্ন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করিতে পারে—যেমন, রূপগত উপযোগ, স্থানগত উপযোগ, সময়গত উপযোগ ও সেবাগত উপযোগ। ইহার যে-কোনটির সৃজনকেই আমরা উৎপাদন বলিব।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্প (Firm and Industry): উৎপাদনের ধারণার প্রসংগে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (Firm) এবং শিল্পের (Industry) মধ্যে পার্থক্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন। একই প্রকার দ্রব্যাদি উৎপাদনকারী প্রত্যেকটি কারবারকে বলা হয় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা (power of independent decision-making)।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান একজনের কারবার হইতে পারে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির অংশীদারী কারবার হইতে পারে, আবার বৃহৎ যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানও (joint stock company) হইতে পারে। সুতরাং একটি ছোট পানবিড়ির দোকান যেমন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য, তেমনি টাটা-বাটা কোম্পানীর ন্যায় বৃহৎ কারবারও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে একই কারবারে সমজাতীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনকারী অনেক কলকারখানা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারা একই পরিচালনাধীনে থাকিলে—অর্থাৎ, উৎপাদন সম্বন্ধে একই সংগে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে—সকলে মিলিয়া হয় একটিমাত্র উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান। উদাহরণস্বরূপ, কলিকাতায় ভীম নাগের অনেকগুলি খাবারের দোকান আছে, কিন্তু ভীম নাগ একটিমাত্র উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান।

শিল্প গঠিত হয় একই শ্রেণীভুক্ত ছোটবড় সকল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে লইয়া। যেমন, ভারতের সকল পাটকল-প্রতিষ্ঠান মিলিয়া হইল ভারতের পাটকল শিল্প (Jute Mill Industry of India)। কলিকাতার সকল ছোটবড় মিষ্টান্ন-প্রতিষ্ঠান মিলিয়া হইল কলিকাতার মিষ্টান্ন-শিল্প, ইত্যাদি।

ভোগ (Consumption)

উৎপাদন বলিতে যেমন উপযোগের সৃষ্টি বুঝায়, তেমনি আকাংক্ষার প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্তির জন্য ব্যবহার করিয়া উপযোগকে নিঃশেষ করাই হইল ভোগ। আমরা যেমন কোন পদার্থ নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারি না তেমনি পদার্থকে ধ্বংসও করিতে পারি না। যাহা পারি তাহা হইল কোন দ্রব্যকে ব্যবহার করিয়া তাহার অভাবমোচনের ক্ষমতাকে শেষ করিয়া ফেলিতে। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হইবে। যখন আমরা চেয়ার ক্রয় করি বা তৈয়ারি করাই তখন উহা বসিবার সুবিধার জন্যই করি। তারপর উহাকে ব্যবহার করিতে থাকি। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে একসময়ে ঐ চেয়ার ভাঙিয়া গিয়া কতকগুলি পুরাতন কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত হয়। তখন আর উহা আমাদের বসিবার প্রয়োজন মিটাইতে পারে না—অর্থাৎ, উহার উপযোগ ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তেমনি আবার জামাকাপড় ব্যবহার করিতে করিতে একসময় উহা অব্যবহার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু সকল জিনিসের উপযোগই ধীরে ধীরে শেষ হয় না। অনেক দ্রব্য আছে যাহার উপযোগ একবার ব্যবহারের ফলেই শেষ হইয়া যায়; উহা আর দ্বিতীয়বার ব্যবহার-যোগ্য থাকে না। যেমন, কেহ যখন একটি কমলালেবু খায় তখন কমলালেবুটির উপযোগ একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হইয়া যায়। অনুরূপভাবে সেবামূলক কার্যের উপযোগ উৎপাদনের সংগে সংগেই শেষ হইয়া যায়।

মূল্য ও দাম (Value and Price)

'মূল্য' (value) শব্দটি সাধারণত দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, কোন কোন সময় জিনিসের 'ব্যবহার-মূল্য' (value-in-use) বুঝাইবার জন্য মূল্য শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। যেমন, আমরা বলিয়া থাকি যে জল মানুষের জীবনের পক্ষে অতি মূল্যবান। ইহার অর্থ হইল, জলের ব্যবহার-মূল্য বা অভাবপূরণের ক্ষমতা অপরিসীম।

দ্বিতীয়ত, মূল্য শব্দটি 'বিনিময়-মূল্য' (value-in-exchange) বুঝাইবার জন্যও ব্যবহার করা হয়। বিনিময়-মূল্য বলিতে এক দ্রব্যের পরিবর্তে যে-পরিমাণ অপর একটি দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা বুঝায়। যেমন, এক কুইণ্টাল চাউলের বদলে যদি দুই

কুইণ্টাল গম বিনিময় করা যায়, তাহা হইলে এক কুইণ্টাল চাউলের মূল্য হইল দুই কুইণ্টাল গম, আর এক কুইণ্টাল গমের মূল্য হইল আধ-কুইণ্টাল চাউল। আবার চার কিলোগ্রাম আটার বদলে যদি এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈল পাওয়া যায় তাহা হইলে এক কিলোগ্রাম আটার মূল্য হইল ২৫০ গ্রাম সরিষার তৈল, আর এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের মূল্য হইল চার কিলোগ্রাম আটা। দ্রব্যের সংগে দ্রব্যের বিনিময় হারকেই বিনিময়-মূল্য বলা হয়। অর্থবিদ্যায় 'মূল্য' শব্দটি বিনিময়-মূল্যের অর্থেই ব্যবহার করা হয় এবং 'ব্যবহার-মূল্য' বা পরিতৃপ্তিদানের ক্ষমতা 'উপযোগ' শব্দটি দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

কোন দ্রব্যের ব্যবহার-মূল্য অধিক হইলেই যে উহার বিনিময়-মূল্য অধিক হইবে এমন কোন কথা নাই। জলের ব্যবহার-মূল্য অত্যধিক হইলেও উহার বিনিময়-মূল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাই। বিনিময়-মূল্যের জন্য ব্যবহার-মূল্যের সহিত থাকা চাই অপ্রাচুর্য এবং হস্তান্তরযোগ্যতা।

বিনিময়-মূল্যকে টাকাকড়ির অংকে প্রকাশ করা হইলে উহাকে দাম (price) বলা হয়—যেমন, এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম ২ টাকা। দামের সহিত মূল্যের একটি বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। সকল দামই একসংগে বাড়িতে পারে কিন্তু সকল মূল্য একসংগে বাড়িতে পারে না। মূল্য হইল বিনিময় হার—যথা, আটা ও সরিষার তৈলের মধ্যে বিনিময় হার। পূর্বে চার কিলোগ্রাম আটার বিনিময়ে এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈল পাওয়া যাইত; এখন যদি তিন কিলোগ্রাম আটার বিনিময়ে এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈল পাওয়া যায় তবে আটার মূল্য বাড়িল এবং সরিষার তৈলের মূল্য কমিল। কিন্তু আটা ও সরিষার তৈল উভয়েরই দাম একসংগে বৃদ্ধি পাইতে পারে।

চাহিদা ও যোগান (Demand and Supply)

চাহিদা ও যোগান অর্থবিদ্যার আর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ধারণা। অভাববোধ বা ভোগের আকাংক্ষা হইতেই চাহিদার উদ্ভব হয়। কিন্তু অর্থবিদ্যায় আকাংক্ষা বা পাইবার ইচ্ছাকেই চাহিদা বলিয়া গণ্য করা হয় না। আমি একখানি মোটরগাড়ীর আকাংক্ষা করিতে পারি; কিন্তু আমার মোটরগাড়ী ক্রয়ের ক্ষমতা বা ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বলা যায় না যে আমার মোটরগাড়ীর চাহিদা রহিয়াছে। অতএব, চাহিদা আকাংক্ষা ছাড়াও অন্য দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(১) ক্রয়ের ক্ষমতা, এবং (২) ক্রয়ের ইচ্ছা।

ক্রয়ের ক্ষমতা ও ইচ্ছা আবার দামের উপর নির্ভরশীল। কোন দ্রব্যের দাম বেশী হইলে উহা লোকের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে যাইতে পারে অথবা ক্রয়ের ইচ্ছা অন্তর্হিত

হইতে পারে। এইজন্য চাহিদা বলিতে বিশেষ দামে চাহিদার পরিমাণ বুঝায়। বস্তুত, দামের সহিত সম্পর্কহীন চাহিদা বলিয়া কিছু নাই। 'বাজারে মাছের চাহিদা কত?'— এইরূপ প্রশ্ন অর্থহীন। মাছের চাহিদা বিভিন্ন দামে বিভিন্ন পরিমাণ হইতে পারে। ২ টাকা কিলোগ্রাম হইলে লোকে হয়ত ১০ কুইন্টাল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইবে, ৩ টাকা কিলোগ্রাম হইলে ৫ কুইন্টাল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইবে এবং ১ টাকা কিলোগ্রাম হইলে ৪০ কুইন্টাল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইবে, ইত্যাদি। সুতরাং বিশেষ বিশেষ দামে যে পরিমাণ দ্রব্য লোকে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকে অর্থবিদ্যার ধারণা অনুসারে তাহাই ঐ জিনিসের চাহিদা।

অনুরূপভাবে অর্থবিদ্যায় যোগান বলিতে নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতারা যে-পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহাকে বুঝায়। সাধারণ ভাষায় অবশ্য যোগান বলিতে মোট উৎপন্ন দ্রব্য বা মোট মজুত মালের পরিমাণ যে-কোনটিকে বুঝাইতে পারে। যেমন, অনেক সময় বলা যায় যে এই বৎসর সমগ্র পৃথিবীতে গমের যোগান এত, বা দেশে এই সময় চাউলের যোগান এত। মোট উৎপন্ন দ্রব্য বা মোট মজুত মালের মধ্যে কতটা বিক্রেতারা বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইবে তাহা দামের উপর নির্ভরশীল। দাম বেশী হইলে বেশী পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বাজারে আনীত হইবে, আর দাম কম হইলে যোগানের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। অতএব, চাহিদার মত যোগানও দামের সহিত সম্পর্কিত এবং দামের সহিত সম্পর্কবিহীন যোগান বলিয়া কিছু নাই।

২ | অভাব ও উপযোগ
(Wants and Utility)

অভাব (Wants)

বলা যায়, অভাব হইতেই অর্থবিষ্ঠার আলোচনা শুরু। অভাব আছে বলিয়াই মানুষকে অভাবমোচনের প্রচেষ্টা করিতে হয়, এবং অভাবমোচনের জন্য মানুষের বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টাই অর্থবিষ্ঠার আলোচ্য বিষয়। মানুষের এই অভাবের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

বৈশিষ্ট্য ঃ প্রথমত, সাধারণভাবে অভাবের কোন সীমা নাই (wants in general are unlimited)। একটি অভাব পরিতৃপ্ত হইলে আর একটি নূতন অভাব আসিয়া দেখা দেয়। যে-ব্যক্তির দুই বেলা দুই মুঠা ভাত জুটে না সে মনে করে অন্নকষ্ট দূর হইলেই তাহার সকল অভাব মিটিবে। যখন অন্নকষ্ট দূর হয়, তখন সে অভাব বোধ করে পোশাকপরিচ্ছদের। সাধারণ পোশাকপরিচ্ছদের অভাব মিটিবার পর সে দামী পোশাকপরিচ্ছদের আকাংক্ষা করে। এইভাবে মানুষ সীমাহীন অভাবের পশ্চাতে প্রতিনিয়ত ছুটিয়াই চলে।

দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে অভাব অসীম হইলেও প্রতিটি অভাব কিন্তু সসীম (each want is limited)। একটি বিশেষ দ্রব্য যতই পাওয়া যায় উহার জন্য আকাংক্ষা ততই কমিয়া যায়। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যদি শরবত পান করিয়া চলে তবে প্রতিটি অতিরিক্ত গ্লাস শরবতের জন্য তাহার আকাংক্ষা ক্রমশ কমিয়া যাইবে এবং শেষে এমন একসময় আসিবে যখন তাহার শরবত পানের আর কোন ইচ্ছাই থাকিবে না। যে-ব্যক্তির এক জোড়াও জুতা নাই সে প্রথম জোড়া জুতার জন্য যতটা আকাংক্ষা বোধ করিবে, দ্বিতীয় জোড়া জুতার জন্য ততটা আকাংক্ষা বোধ করিবে না। তাহার জুতা জোড়ার সংখ্যা যদি ক্রমশ বাড়িয়া চলে তবে এমন একসময় আসিবে যখন তাহার নূতন এক জোড়া জুতার জন্য কোন আগ্রহই থাকিবে না অর্থাৎ, তাহার জুতার জন্য যে-অভাববোধ তাহা সম্পূর্ণভাবে মিটিয়া যাইবে।

তৃতীয়ত, কতকগুলি অভাব পরস্পরের প্রতিযোগী (some wants are competitive)। গরম পানীয়ের অভাব চা বা কফি যে-কোন একটি হইতে, জামার অভাব পাঞ্জাবী বা সার্ট যে-কোন একটি হইতে, পরিবহণের অভাব বাস বা ট্রাম যে-কোন একটি হইতে মিটিতে পারে। সুতরাং চা কফির, পাঞ্জাবী সার্টের এবং বাস ট্রামের প্রতিযোগী।

চতুর্থত, কতকগুলি অভাব পরস্পরের পরিপূরক (some wants are complementary)। চা-এর অভাব দুধ ও চিনির অভাব সৃষ্টি করে, মোটরগাড়ী

চড়ার অভাব মিটানর জন্য মোটরগাড়ী ও পেট্রল দুই-ই চাই, আলু বা পটলের তরকারি আলাদাভাবে রাঁধা গেলেও আলু-পটলের তরকারি রাঁধিতে হইলে আলু ও পটল উভয়ই প্রয়োজন।

অভাবের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Wants): এইভাবে বৈশিষ্ট্য আলোচনা ছাড়াও মানুষের অভাবকে আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—যথা, প্রয়োজনীয় অভাব (necessaries), আরামপ্রদ দ্রব্যাদি (comforts) এবং বিলাস-দ্রব্যাদি (luxuries)।

প্রয়োজনীয় অভাব বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে—যথা, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অভাব, দক্ষতার জন্য অভাব, রীতিগত প্রয়োজনীয় অভাব, ইত্যাদি। যে-অভাবগুলি না মিটিলে জীবনধারণই সম্ভব নহে তাহাদিগকে জীবনধারণের জন্য অভাব (necessaries for life) বলে। উদাহরণস্বরূপ, ন্যূনতম খাদ্য বস্ত্র ও বাসস্থানের উল্লেখ করা যায়। দক্ষতার জন্য অভাব (necessaries for efficiency) হইল সেইগুলি যেগুলি না মিটিলে দক্ষতা বজায় রাখা যায় না। সহরে যে-ডাক্তারের পসার আছে তাঁহার পক্ষে একখানি মোটরগাড়ী রাখা প্রয়োজন; সাইকেলে চাপিয়া রোগী দেখিতে গেলে তাঁহার দক্ষতা বজায় থাকে না। রীতিগত প্রয়োজনীয় অভাব (conventional necessaries) বলিতে সেগুলিকে বুঝায় যেগুলি ব্যক্তির পক্ষে মর্যাদা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয়। পাড়ায় যদি সকলেরই একটি করিয়া রেডিও-সেট থাকে তবে আমাকেও একটি রেডিও-সেট রাখিতে হয়, অফিসে সমপদস্থ লোকে সকলেই যদি স্যুট পরিয়া আসে তবে আমাকেও স্যুট পরিতে হয়, ইত্যাদি।

বিলাস-দ্রব্য সেগুলিকেই বলে যেগুলির অভাব মানুষ আড়ম্বর প্রদর্শনের জন্য বোধ করে। দামী দামী জামাকাপড় অলংকার গাড়ীবাড়ী আসবাবপত্র প্রভৃতি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নহে, দক্ষতা বজায় রাখার জন্যও প্রয়োজনীয় নহে। তবুও মানুষ এগুলির আকাংক্ষা করে শুধু আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য।

প্রয়োজনীয় অভাব ও বিলাস-দ্রব্যের অভাবের মধ্যস্থল অধিকার করিয়া থাকে আরামপ্রদ দ্রব্যগুলি। এগুলি হইতে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না, আড়ম্বর প্রদর্শনও সম্ভব হয় না। এগুলি হইতে কিছুটা আরাম, কিছুটা সুখ ভোগ করা যায়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে একই জিনিস ব্যক্তিভেদে প্রয়োজনীয়, আরামপ্রদ ও বিলাস-দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যে-ডাক্তারের পসার ভাল তাঁহার পক্ষে একখানি মোটরগাড়ী বিশেষ প্রয়োজনীয়, একজন উচ্চ মাহিনার চাকুরিয়ার পক্ষে একখানি মোটরগাড়ী হইলে বেশ ভাল হয়, কিন্তু সাধারণ চাকুরিয়ার নিকট মোটরগাড়ীই বিলাস-দ্রব্য বলিয়া গণ্য।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি (The Law of Diminishing Utility)

মানুষের প্রতিটি অভাব যে সসীম ইহা হইতে অর্থবিদ্যার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহা ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি (The Law of Diminishing Utility) নামে অভিহিত। সূত্রটিকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে: কোন জিনিস যত বেশী পাইতে থাকি উহার জন্য আমাদের আকাংক্ষা বা কাম্যতা (desiredness) ততই কমিয়া যায়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, প্রতিটি অভাব সসীম বলিয়া যে-কোন দ্রব্যের অভাবপূরণের ক্ষমতা বা উপযোগ উহার পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। সূত্রটির সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে আমাদের অভ্যাস ও রুচি অপরিবর্তিত থাকিলে কোন জিনিসের ভোগের পরিমাণ যদি বাড়াইয়া চলি তাহা হইলে ঐ দ্রব্যের অতিরিক্ত একক হইতে যে-অতিরিক্ত তৃপ্তি বা উপযোগ পাইতে থাকি তাহা ক্রমশ কমিয়া যাইতে থাকে। অর্থাৎ, কোন জিনিসের ভোগ বাড়াইয়া চলিলে আমাদের নিকট ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হইতে থাকে। সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতেই ইহা প্রমাণ করা যায়। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির নিকট প্রথম এক গ্লাস শরবতের জন্য যেরূপ আকাংক্ষা থাকে, দ্বিতীয় গ্লাস শরবতের জন্য সেরূপ আকাংক্ষা বা ইচ্ছা থাকে না। তৃতীয় গ্লাস শরবতের জন্য আকাংক্ষা আরও কম হয়। অর্থাৎ, শরবতের তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পায় বলিয়া উহার জন্য আকাংক্ষাও কমিয়া আসে। আকাংক্ষা কি পরিমাণ কমিতেছে তাহা বুঝা যায় লোকে কি দাম দিতে প্রস্তুত তাহা হইতে।

কোন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যদি প্রথম গ্লাস শরবতের জন্য ৪০ পয়সা, দ্বিতীয় গ্লাস শরবতের জন্য ৩০ পয়সা, তৃতীয় গ্লাস শরবতের জন্য ২০ পয়সা এবং চতুর্থ গ্লাস শরবতের জন্য ১০ পয়সা দিতে প্রস্তুত থাকে তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি প্রথম গ্লাস হইতে ৪০ পয়সার, দ্বিতীয় গ্লাস হইতে ৩০ পয়সার, তৃতীয় গ্লাস হইতে ২০ পয়সার এবং চতুর্থ গ্লাস হইতে ১০ পয়সার তৃপ্তি বা উপযোগ লাভ করে বলিয়া ধরা হয়। চতুর্থ গ্লাসের পর আর এক গ্লাস শরবত দেওয়া হইলে হয়ত ঐ ব্যক্তি কোন পয়সা দিতেই রাজী হইবে না। অর্থাৎ, তাহার নিকট পঞ্চম গ্লাস শরবতের উপযোগ হইল শূন্য। এখানে দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক অতিরিক্ত গ্লাস শরবত পানের ফলে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যে-অতিরিক্ত তৃপ্তি বা উপযোগ লাভ করিতেছে তাহা ক্রমশ হ্রাস পাইয়া চলিয়াছে।

মোট ও প্রান্তিক উপযোগ (Total and Marginal Utility) ঃ কোন দ্রব্যের সকল এককের ভোগ হইতে ভোক্তা (Consumer) সর্বসাকল্যে যে-উপযোগ লাভ করে তাহাই হইল ঐ দ্রব্যের মোট উপযোগ (Total Utility), আর ঐ দ্রব্যের

শেষ একক হইতে যে-অতিরিক্ত উপযোগ (additional utility) লাভ করে তাহা হইল ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility)। আমাদের উদাহরণে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি দুই গ্লাস শরবত পান করিলে তাহার মোট উপযোগ হইবে (৪০+৩০=) ৭০ পয়সা, কিন্তু শেষ বা দ্বিতীয় একক হইতে প্রাপ্ত উপযোগ হইবে মাত্র ৩০ পয়সা। এই শেষ বা অতিরিক্ত একককে প্রান্তিক একক বলা হয় বলিয়াই উহা হইতে প্রাপ্ত উপযোগ 'প্রান্তিক উপযোগ' বলিয়া অভিহিত হয়।

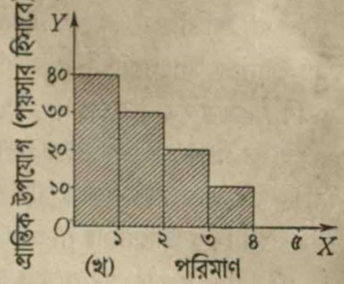
প্রান্তিক একক বলা হয় কেন? ইহার কারণ হইল ঐ একক ভোগ বা প্রাপ্তির প্রান্তে অবস্থিত থাকে। উপরি-উক্ত উদাহরণে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি দুই গ্লাস শরবত পানের পর যদি আর এক গ্লাস শরবত পান করে তবে তৃতীয় গ্লাস শরবত 'প্রান্তিক' হইয়া দাঁড়ায় এবং প্রান্তিক উপযোগের পরিমাণ হয় ২০ পয়সা। আবার যখন ঐ ব্যক্তি মোট চারি গ্লাস শরবত পান করে তখন চতুর্থ গ্লাস হয় প্রান্তিক একক এবং প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া দাঁড়ায় ১০ পয়সা।

মোট ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্বন্ধের ব্যাখ্যা : মোট ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্বন্ধের আরও একটু ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ক্রয় বা ভোগের পরিমাণ যতই বাড়িতে থাকে মোট উপযোগ ততই বৃদ্ধি এবং প্রান্তিক উপযোগ ততই হ্রাস পাইতে থাকে। প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হয় বলিয়া মোট উপযোগ বৃদ্ধির হার ক্রমে কমিয়া আসিতে থাকে। আমাদের কল্পিত তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যদি মাত্র দুই গ্লাস শরবত পান করিত তবে তাহার মোট উপযোগ হইত (৪০+৩০=) ৭০ পয়সা, কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ হইত ৩০ পয়সা মাত্র। দুই গ্লাসের পরিবর্তে তিন গ্লাস শরবত পান করিলে মোট উপযোগ বাড়িয়া (৪০+৩০+২০=) ৯০ পয়সায় দাঁড়ায়, কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাইয়া ২০ পয়সায় পরিণত হয়। এইভাবে যেখানে প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া কমিয়া যখন শূন্যে পরিণত হয় সেখানেই মোট উপযোগ সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়।

পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটির সাহায্যেও মোট ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

পরবর্তী পৃষ্ঠার (ক)-রেখাচিত্রে মোট উপযোগ এবং (খ)-রেখাচিত্রে প্রান্তিক উপযোগ দেখান হইয়াছে। রেখাচিত্র দুইটির উল্লম্ব (vertical) OY অক্ষে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির উপযোগ এবং অনুভূমিক (horizontal) OX অক্ষে দ্রব্যটির পরিমাণ পরিমাপ করা হইয়াছে। (ক)-রেখাচিত্রের প্রতিটি স্তম্ভ দ্রব্যটির বিভিন্ন পরিমাণের মোট উপযোগ বা তৃপ্তি নির্দেশ করিতেছে। রেখাচিত্রটি হইতে দেখা যাইতেছে যে মোট উপযোগ কিভাবে প্রথমে বাড়িয়া চলিয়াছে এবং দ্রব্যের পরিমাণ যখন ৫ একক তখন এই বৃদ্ধি





কিভাবে থামিয়া গিয়াছে। এই রেখাচিত্রটির প্রতিটি স্তম্ভের কালো অংশের দিকে তাকাইলে বুঝা যাইবে যে, মোট উপযোগ বৃদ্ধি পাইলেও উহা ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায় এবং 'প্রান্তিক' উপযোগ শূন্য হইয়া দাঁড়াইলে ঐ বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায় (স্তম্ভের কালো অংশের দ্বারা প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করা হইয়াছে)। (খ)-রেখাচিত্রটি হইতে বুঝা যায় যে দ্রব্যের পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে প্রান্তিক উপযোগ কিভাবে ক্রমহ্রাসমান হয়। রেখাচিত্রটি হইতে দেখা যাইতেছে যে পয়সার মাপকাঠিতে প্রথম এককের প্রান্তিক উপযোগ ৪০ হইতে ক্রমশ হ্রাস পাইয়া পঞ্চম এককের ক্ষেত্রে শূন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মোট ও প্রান্তিক উপযোগ এবং দাম : উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, ভোগ বা ক্রয়ের পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে একটা সীমা পর্যন্ত—অর্থাৎ, প্রান্তিক উপযোগ শূন্যে পরিণত না-হওয়া পর্যন্ত—মোট উপযোগ বৃদ্ধিই পায়, মাত্র প্রান্তিক উপযোগই হ্রাস পাইতে থাকে। সুতরাং বিধিটিকে ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Utility) না বলিয়া ক্রমহ্রাসমান 'প্রান্তিক' উপযোগ বিধিই (Law of Diminishing Marginal Utility) আখ্যা দেওয়া উচিত। বর্তমানে বিধিটিকে এইভাবেই অভিহিত করা হয়। মোট ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে আরও একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মোট উপযোগ ক্রমশ বাড়িয়া চলে বলিয়া উহার গতি দামের বিপরীতমুখী, কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ সকল সময়ই ব্যক্তি যে-দাম দিতে ইচ্ছুক থাকে তাহার সমান হয়। উপরের উদাহরণে শরবতের দাম প্রতি গ্লাস ৩০ পয়সা করিয়া হইলে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি দুই গ্লাস পান করিত। ঐ দ্বিতীয় গ্লাস শরবতের যে-উপযোগ—অর্থাৎ, ৩০ পয়সা তাহাই তাহার প্রান্তিক উপযোগ। ইহাই দামের সমান। এক্ষেত্রে তাহার মোট উপযোগ হইতেছে (৪০+৩০=) ৭০ পয়সা।

ইহা বাজার-দাম হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে। শরবতের দাম প্রতি গ্লাস ২০ পয়সা করিয়া হইলে সে তিন গ্লাস পান করিত ; ফলে তখনও দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হইত। এইভাবে প্রান্তিক উপযোগ দামের সমান না-হওয়া পর্যন্ত লোকে জিনিস ক্রয় করিয়া চলে বলিয়াই দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হয় এবং মোট উপযোগ হইতে ক্রমাগত দূরে সরিয়া যায়। এ-সম্পর্কে দাম-নির্ধারণ প্রসংগে আবার আলোচনা করা হইবে।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধির সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Law of Diminishing Utility) : ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি একটি সাধারণ নিয়ম, ইহা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য অনেকে কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সংগ্রহের উল্লেখ করা হয়। দেখিতে পাওয়া যায় যে পুরাতন ডাকটিকিট, মুদ্রা প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সংগ্রাহকের নিকট আরও ডাকটিকিট, আরও মুদ্রা প্রভৃতি প্রাপ্তির আকাংক্ষা বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। অনেকে অবশ্য ইহাকে ব্যতিক্রম বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে, বিভিন্ন প্রকারের ডাকটিকিট বা বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা একই দ্রব্যের বিভিন্ন একক নহে। তাহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন দ্রব্য। বিভিন্ন প্রকার ডাকটিকিটের জন্য সংগ্রাহকের আকাংক্ষা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইলেও, একই ডাকটিকিটের দ্বিতীয়খানির জন্য আকাংক্ষা প্রথমখানি অপেক্ষা কম হয়। মহম্মদ তুঘলকের একটি তামার টাকা পাইবার পর অনুরূপ আর একটি টাকা সংগ্রাহক পূর্বের দামে ক্রয় করিতে রাজী হইবে না, যদিও বা সে অন্য কোন রাজার তামার টাকা বেশী দামে ক্রয় করিতে রাজী হইতে পারে। যাহা হউক, সাধারণত দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিধিটি প্রযোজ্য নয় বলিয়াই মনে করা হয়।

দ্বিতীয়ত, কৃপণের অর্থসঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও বিধিটি কার্যকর হয় না বলিয়া ধরা হয়। কৃপণের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহার অর্থপ্রাপ্তির আকাংক্ষাও তত বাড়িয়া যায়। এই দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধে অনেকে বলেন যে কৃপণের আচরণ বিকৃত মনের পরিচায়ক। সুতরাং অর্থবিদ্যায় উহা লইয়া আলোচনা করিয়া লাভ নাই। সুস্থ মন ও মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট টাকাকড়ির উপযোগও ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। এরূপ ব্যক্তির নিকট প্রথম একশত টাকা যতটা কাম্য, দ্বিতীয় একশত টাকা ততটা কাম্য নহে। তবুও ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধির আলোচনা প্রসংগে কৃপণের অর্থসঞ্চয়ের উল্লেখ করা হয় এবং উহাকে বিধিটির ব্যতিক্রম হিসাবে দেখান হয়।

উপসংহার : উপসংহারে বলা যাইতে পারে, ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধির কোন ব্যতিক্রম আছে কি না সে-বিষয়ে মতবিরোধ থাকিলেও বিধিটি যে কয়েকটি সর্তাধীন

সে-বিষয়ে কোন মতবিরোধ নাই। তিনটি প্রধান সর্ত হইল : (ক) ভোগের একক পর্যাপ্ত হওয়া চাই, (খ) ভোগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হওয়া চাই, এবং (গ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোক্তার রুচি-পছন্দ ও আয় পরিবর্তিত হইবে না।

ভোগের একক পর্যাপ্ত না হইলে দ্বিতীয় একক প্রাপ্তির জন্য আকাংক্ষা হ্রাসের পরিবর্তে বৃদ্ধি পাইতে পারে। যেমন, অতি ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সামান্য এক মুঠা ভাতের পর দ্বিতীয় মুঠা ভাতের জন্য আকাংক্ষা তীব্রতর হইতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ভোগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত না হইলেও আকাংক্ষা হ্রাসের পরিবর্তে বৃদ্ধি পাইতে পারে। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি এক গ্লাস শরবত পানের পরই আর এক গ্লাস শরবত পানে বিশেষ ইচ্ছুক না হইলেও কয়েক ঘণ্টা পরে হইতে পারে।

তৃতীয়ত, ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধিতে ধরিয়া লওয়া হয় ভোক্তার আয় ও রুচি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত হইতেছে না। কিন্তু কোন ভোক্তার রুচি যদি ঐ সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত হয় তাহা হইলে সে হয়ত সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটিকে অধিক মাত্রায় আকাংক্ষা করিবে। যেমন, কেহ উচ্চাংগ সংগীত পছন্দ না করিতে পারে, কিন্তু হঠাৎ দুই-চার দিন শোনার পর সে হয়ত উচ্চাংগ সংগীত উপভোগ করিতে শিখিল। এক্ষেত্রে উচ্চাংগ সংগীতের জন্য তাহার আকাংক্ষা পূর্বের তুলনায় বাড়িয়া যাইতে পারে। আবার আয় বাড়িলে পূর্বের দামেই, এমনকি বেশী দাম দিয়াও, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটি অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে পারে।

৩

চাহিদার সূত্র ও স্থিতিস্থাপকতা

(Law of Demand and Elasticity of Demand)

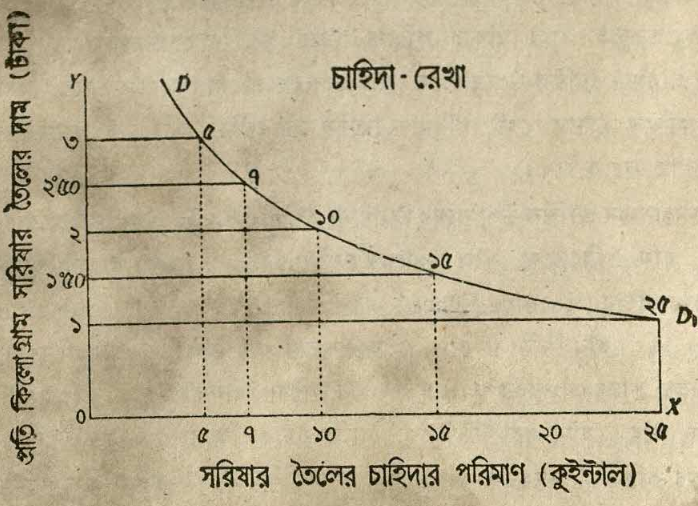
চাহিদার সূত্র (Law of Demand)

আমরা দেখিয়াছি যে, অর্থবিদ্যায় চাহিদা বলিতে বিশেষ বিশেষ দামে চাহিদার পরিমাণ বুঝায় (১৫ পৃষ্ঠা)। চাহিদার এই প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে চাহিদা-সূচীর মধ্যে। চাহিদা-সূচী (Demand Schedule) বলিতে বিভিন্ন দামে বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদার তালিকাকে বুঝায়। নিম্নে একটি কাল্পনিক চাহিদা-সূচী দেওয়া হইল :

প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম	সরিষার তৈলের চাহিদার পরিমাণ
৩ টাকা	৫ কুইণ্টাল
২.৫০ "	৭ "
২ "	১০ "
১.৫০ "	১৫ "
১ "	২৫ "

উপরের সূচীটি হইতে দেখা যাইতেছে যে ৩ টাকা, ২.৫০ টাকা, ২ টাকা ইত্যাদি বিভিন্ন দামে যথাক্রমে ৫ কুইণ্টাল, ৭ কুইণ্টাল, ১০ কুইণ্টাল ইত্যাদি বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা হইতেছে। এই সকল দামের প্রত্যেকটিকে চাহিদা-দাম (Demand Price) বলা হয়

নিম্নের রেখাচিত্রটির সাহায্যে চাহিদা-সূচীটির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে :



পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে OY (উল্লম্ব) অক্ষে সরিষার তৈলের দাম এবং OX (অনুভূমিক) অক্ষে চাহিদার পরিমাণ ধরা হইয়াছে। দাম যখন ৩ টাকা তখন ৫ কুইণ্টাল চাহিদা হয়। দাম কমিয়া ২·৫০ টাকা, ২·৫০ টাকা হইতে ২ টাকা, ২ টাকা হইতে ১·৫০ টাকা এবং ১·৫০ টাকা হইতে ১ টাকায় আসিলে চাহিদাও যথাক্রমে বাড়িয়া ৭, ১০, ১৫ এবং ২৫ কুইণ্টালে দাঁড়াইবে। বিভিন্ন দামে সরিষার তৈলের চাহিদার পরিমাণ নির্দেশক উপরের ৫, ৭, ১০, ১৫ এবং ২৫ যোগ করিলে যে-রেখাটি (DD_1) পাওয়া যায় তাহাকে চাহিদা-রেখা (Demand Curve) বলে। ইহার গতি নিম্নমুখী। ইহার দ্বারা বুঝান হয় দাম কমিলেই চাহিদা বাড়ে।

দাম কমিলেই যে চাহিদা বাড়ে এবং পক্ষান্তরে দাম বাড়িলেই যে চাহিদা কমে এই সাধারণ নিয়মকেই চাহিদার সূত্র (Law of Demand) বলা হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে দাম ও চাহিদার মধ্যে যে সম্পর্ক তাহাই চাহিদার সূত্র নামে অভিহিত।

চাহিদার সূত্রের ব্যাখ্যা : এখন প্রশ্ন, চাহিদার এই সূত্রের মূলে কি কি কারণ আছে—অর্থাৎ, দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়িলে চাহিদা কমে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির (Law of Diminishing Marginal Utility) মধ্যে।

প্রত্যেক ব্যক্তি যত অধিক পরিমাণে কোন দ্রব্য পাইতে থাকে উহার জন্য তাহার আকাংক্ষা ততই কমিয়া যায়। অর্থাৎ, তাহার নিকট ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাইতে থাকে। অপরদিকে দাম দিতে হইলে ত্যাগস্বীকার করিতে হয়—অর্থাৎ, টাকাকড়ির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় লোকে অসুবিধা বোধ করে। সুতরাং লোকে ততটাই ত্যাগ স্বীকার করিতে, ততটা অসুবিধা ভোগ করিতে রাজী থাকে যতটা পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ সে কোন দ্রব্য হইতে ভোগ করিতে পারে। অতএব, দাম কমিলে লোকে বেশী পরিমাণ জিনিস ক্রয় করিবে, আর দাম বেশী হইলে কম জিনিসপত্র ক্রয় করিবে।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের উল্লেখ না করিয়াও প্রশ্নটির উত্তর অন্যভাবে দেওয়া যায়। দাম পরিবর্তনের ফলে লোকের চাহিদা দুইটি বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়—(১) আয়-প্রভাব (Income Effect) এবং (২) পরিবর্তন-প্রভাব (Substitution Effect)। কোন জিনিসের দাম কমিলে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, কারণ সে পূর্বের তুলনায় কম ব্যয় করিয়া জিনিসটির সেই পরিমাণই ক্রয় করিতে পারে। যেমন, ধরা যাউক কোন ব্যক্তি ২ টাকা কিলোগ্রাম দামে ১ কিলোগ্রাম মাছ ক্রয় করিত। মাছের দাম কমিয়া ১ টাকা কিলোগ্রাম হইলে সে পূর্বের মত

১ কিলোগ্রাম মাছ ক্রয় করিলেও তাহার হাতে ১টি টাকা থাকিয়া যাইবে। এই অতিরিক্ত টাকার একাংশ সে আরও মাছ কিনিতে ব্যয় করিতে পারে বলিয়া মাছের ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে কোন জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাইলে ক্রেতার আয় হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া ধরা হয় এবং ঐ জিনিসের ক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া যায়। ইহাকে আয়-প্রভাব (Income Effect) বলা হয়।

আয়-প্রভাবের আর একটি দিক আছে। দামহ্রাস আয়বৃদ্ধির সামিল বলিয়া নূতন নূতন ক্রেতা বাজারে আসিয়া জুটে। ফলে মোট চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে দাম বৃদ্ধি পাইলে ক্রেতার সংখ্যা হ্রাস পায় বলিয়া চাহিদার পরিমাণও কমিয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, কোন জিনিসের দাম হ্রাস পাইলে লোকে অপেক্ষাকৃত অধিক দামের অন্যান্য দ্রব্যের পরিবর্তে ঐ জিনিস অধিক মাত্রায় ক্রয় করিতে থাকে ; আবার কোন জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাইলে ঐ দ্রব্যের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম দামের অন্য জিনিস অধিক মাত্রায় ক্রয় করে। যেমন, মাছের তুলনায় মাংসের দাম কমিলে অনেকে অধিক পরিমাণে মাংস ক্রয় করিবে, আবার মাংসের দাম বৃদ্ধি পাইলে অনেকে মাছের দিকে ঝুঁকিবে। সুতরাং কোন দ্রব্যের দাম কমিলে ও বাড়িলে উহার ক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে বাড়িবে ও কমিবে। ইহাকে পরিবর্তন-প্রভাব (Substitution Effect) বলা হয়।

আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাবকে মিলাইয়া দাম-প্রভাব (Price Effect) বলা হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দামের পরিবর্তন ছাড়াও চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। যেমন, লোকের আয়ের পরিবর্তন, রুচি-ফ্যাসানের পরিবর্তন, জনসংখ্যার পরিবর্তন প্রভৃতির ফলে চাহিদা পূর্বের তুলনায় কমবেশী হইতে পারে। কিন্তু আমরা যখন চাহিদার সূত্রের উল্লেখ করি তখন এইগুলি অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরিয়া লইয়া শুধু দামের সংগে চাহিদার সম্পর্ক নির্ধারণ করি এবং দেখিতে পাই যে দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে আর দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand)

দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়িলে চাহিদা কমে—ইহাই চাহিদার নিয়ম। কিন্তু দাম বাড়াকমার ফলে সকল দ্রব্যের চাহিদার সমান হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। দেখিতে পাওয়া যায়, দাম সামান্য কমিলে বিলাস-দ্রব্যের চাহিদা বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায় কিন্তু চাউল, লবণ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বিশেষ কমিলেও উহাদের চাহিদা তেমনি বৃদ্ধি পায় না। দাম-পরিবর্তন ও চাহিদা-পরিবর্তনের মধ্যে এই যে সম্বন্ধ ইহাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand) বলে। অন্যভাবে

বলিতে গেলে, দামের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন যে-পরিমাণ সাড়া দেয় তাহাই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা।

দামের বেশ কিছুটা পরিবর্তন হইলে যে-সকল দ্রব্যের চাহিদার সামান্য মাত্র পরিবর্তন হয় তাহাদিগকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (Inelastic Demand) বলে। চাউল লবণ সাধারণ পোশাকপরিচ্ছদ ইত্যাদি ইহার উদাহরণ। অপরদিকে দামের সামান্য পরিবর্তন ঘটিলেই যে-সকল দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ পরিবর্তিত হয় তাহাদিগকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা (Elastic Demand) বলে। মোটরগাড়ী রেডিও-সেট ফাউণ্টেন পেন প্রভৃতি বিলাস-দ্রব্যের চাহিদা এই শ্রেণীভুক্ত।

কোন চাহিদা স্থিতিস্থাপক কি অস্থিতিস্থাপক তাহা বুঝা যায় বিভিন্ন দামে ঐ দ্রব্যের উপর ব্যয়িত অর্থ হইতে। চা ও কফির উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক বিভিন্ন বাজার-দামে উহাদের উপর কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয় :

চা

প্রতি পাউণ্ডের দাম	চাহিদার পরিমাণ	মোট ব্যয়
৩ টাকা	১০০০ পাউণ্ড	৩০০০ টাকা
২ „	১২০০ „	২৪০০ „
১ „	১৫০০ „	১৫০০ „

কফি

প্রতি পাউণ্ডের দাম	চাহিদার পরিমাণ	মোট ব্যয়
৪ টাকা	১০০ পাউণ্ড	৪০০ টাকা
৩·৫০ „	২০০ „	৭০০ „
৩ „	৫০০ „	১৫০০ „

দেখা যাইতেছে, চা-এর দাম পাউণ্ড প্রতি ১ টাকা কমিলেও চাহিদা তেমন বৃদ্ধি পাইতেছে না এবং চা-এর উপর ব্যয়িত মোট টাকার পরিমাণ কমিতেছে। অস্থিতি-স্থাপক চাহিদার ইহাই লক্ষণ। কিন্তু কফির দাম পাউণ্ড প্রতি ৫০ পয়সা কমিয়া যাওয়ার ফলেই চাহিদা প্রায় দ্বিগুণ ও ততোধিক হইতেছে এবং কফির উপর ব্যয়িত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। স্থিতিস্থাপক চাহিদার ইহাই বিশেষত্ব।

আর একভাবেও চাহিদা স্থিতিস্থাপক না অস্থিতিস্থাপক তাহা নির্ধারণ করা যায়। এই পদ্ধতিতে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনকে দামের পরিমাণের পরিবর্তন দিয়া ভাগ করিলেই স্থিতিস্থাপকতার অবস্থা বুঝা যায়। যেমন, দাম শতকরা ২ ভাগ হ্রাস পাইলে চাহিদা যদি শতকরা ৪ ভাগ বৃদ্ধি পায় তবে স্থিতিস্থাপকতা হইল (৪ ÷ ২ =) ২ বা একের অধিক। সুতরাং ঐ চাহিদা স্থিতিস্থাপক। অপরদিকে দাম শতকরা ২ ভাগ হ্রাস পাইলে চাহিদার পরিমাণ যদি শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধি পায় তবে স্থিতিস্থাপকতা হইল (১ ÷ ২ =) $\frac{১}{২}$। অতএব, চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

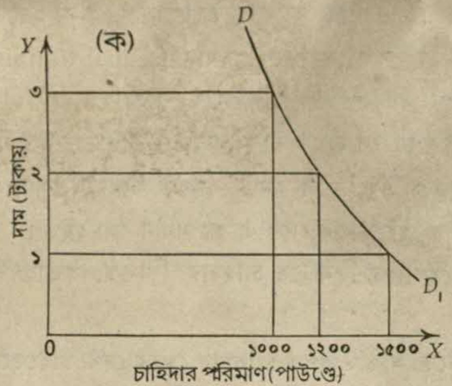
চাহিদা আবার স্থিতিস্থাপক বা অস্থিতিস্থাপক কিছুই না হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে 'একের সমান' (equal to unity or one) বলা হয়। ইহাতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ পূর্বের মত থাকিয়া যায়। আমাদের উদাহরণে প্রতি পাউণ্ড চা-এর দাম ৩ টাকা হইতে ২ টাকায় কমার ফলে যদি চাহিদা বাড়িয়া ১৫০০ পাউণ্ড এবং ফলে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩০০০ টাকা হইত, তখন চা-এর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে একের সমান বলা হইত।

পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্র তিনটিতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার তিনপ্রকার অবস্থা দেখান হইল :

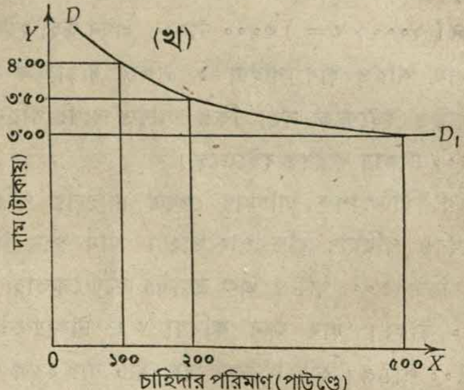
(ক)-রেখাচিত্রটিতে অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে দাম ৩ টাকা হইতে ২ টাকায় কমিয়া আসায় চাহিদার পরিমাণ ১০০০ পাউণ্ড হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১২০০ পাউণ্ড হইলেও ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কিন্তু পূর্বাপেক্ষা কম। পূর্বে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ছিল (১০০০ × ৩ =) ৩০০০ টাকা ; এখন উহা হইল (১২০০ × ২ =) ২৪০০ টাকা। দাম আরও হ্রাস পাইয়া ১ টাকায় দাঁড়াইলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া ১৫০০ পাউণ্ড হইতেছে সত্য কিন্তু ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ আরও কমিয়া (১৫০০ × ১ =) ১৫০০ টাকায় পরিণত হইতেছে।

(খ)-রেখাচিত্রটির স্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে ব্যয়িত অর্থেরও পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। দাম যখন ছিল ৪ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ছিল ১০০ পাউণ্ড এবং দ্রব্যটির ক্রয়ে ক্রেতারা মোট ব্যয় করিত (১০০ × ৪ =) ৪০০ টাকা। দাম যখন কমিয়া ৩·৫০ টাকায় হইল তখন চাহিদার পরিমাণ দাঁড়াইল ২০০ পাউণ্ড। সুতরাং ক্রেতাদের মোট ব্যয় হইল (২০০ × ৩·৫০ =) ৭০০ টাকা—পূর্বাপেক্ষা ৩০০ টাকা বেশী। দাম আরও কমিয়া ৩ টাকা হইলে চাহিদার পরিমাণ হইতেছে ৫০০ পাউণ্ড এবং ক্রেতাদের মোট ব্যয় দাঁড়াইতেছে (৫০০ × ৩ =) ১৫০০ টাকায়—পূর্বাপেক্ষা ৮০০ টাকা বেশী।

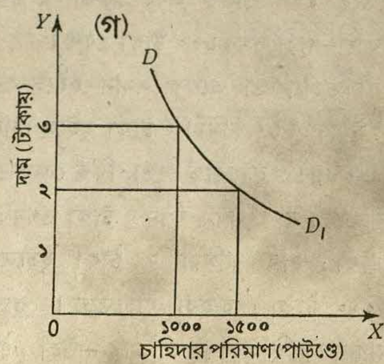
(গ)-রেখাচিত্রটিতে স্থিতিস্থাপকতা একের সমান হইলে অবস্থা কিরূপ হয় তাহা দেখান হইয়াছে। দাম ৩ টাকা হইতে কমিয়া ২ টাকা হইলে চাহিদার পরিমাণ ১০০০ পাউণ্ড হইতে বাড়িয়া ১৫০০ পাউণ্ড হইতেছে সত্য, কিন্তু ক্রেতাদের দ্রব্যটির জন্য মোট ব্যয়ের কোন তারতম্য ঘটিতেছে না। দাম যখন ৩ টাকা তখন মোট ব্যয়ের পরিমাণ (১০০০ × ৩ =) ৩০০০ টাকা ; দাম কমিয়া ২ টাকা হইলেও মোট ব্যয় ঐ একই (১৫০০ × ২ = ৩০০০ টাকা) রহিয়া যাইতেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে চাহিদা স্থিতিস্থাপক নহে, আবার অস্থিতিস্থাপকও নহে—উহা একের সমান (equal to unity)।



অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (Inelastic Demand)



স্থিতিস্থাপক চাহিদা (Elastic Demand)



স্থিতিস্থাপকতা একের সমান (Elasticity, equal to unity)

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে: চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, যে দ্রব্য যত প্রয়োজনীয় অভাব দূর করে তাহার চাহিদা তত অস্থিতিস্থাপক। চাউল তৈল লবণ প্রভৃতি আমাদের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য। এই কারণে ইহাদের চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক। চা-ও আমাদের দেশে বর্তমানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে পড়ে; সুতরাং ইহার চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক। অপরপক্ষে বিলাস-দ্রব্য আমাদের অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় অভাব মিটায়। ফলে ইহাদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

দ্বিতীয়ত, যে-সকল দ্রব্য নানাভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহাদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। কয়লা রন্ধনকার্য, কলকারখানা, রেল-ইঞ্জিন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কয়লার দাম বৃদ্ধি পাইলে লোকে রন্ধনকার্যে জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করিতে পারে, আবার দাম কমিলে যাহারা কাঠ ব্যবহার করিত তাহারা কয়লার চাহিদা বাড়াইতে পারে।

তৃতীয়ত, ভোগ স্থগিত রাখিতে সমর্থ হইলে ঐ ভোগ্যদ্রব্য বা উহার উৎপাদনের উপকরণগুলির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইবে। বাড়ীঘর নির্মাণের দ্রব্যাদির দাম যদি বাড়িয়া যায় তবে লোকে বাড়ীঘর নির্মাণ স্থগিত রাখে; পরে আবার মালমসলার দাম কমিলে নির্মাণকার্য সুরু করে।

পরিশেষে, যে-সকল দ্রব্যের পরিবর্ত (substitute) আছে তাহাদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। যেমন, চা-এর দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে লোকে কফি পান সুরু করিতে পারে, বিদ্যুৎ সরবরাহের দাম বৃদ্ধি করিলে লোকে গ্যাসের বাতি জ্বালাইতে পারে, ইত্যাদি।

চাহিদার মূল্যানুগ ও আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা (Price-Elasticity and Income-Elasticity of Demand): দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে-পরিমাণ পরিবর্তন ঘটে তাহাকে 'চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা' (Price-Elasticity of Demand) বলা হয়। দাম ছাড়া আরও অনেক কারণে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল আয়ের পরিবর্তন। আয় বাড়িলে লোকে বেশী করিয়া জিনিসপত্র ক্রয় করিবে এবং আয় কমিলে ক্রয় করার পরিমাণও কমাইয়া দিবে। আয় কম থাকার জন্য যে-ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামে চাপিত, সপ্তাহে মাত্র দুই-তিন দিন মাছ খাইত, জামাকাপড় নিজেই সাবান দিয়া কাচিয়া লইত—আয় বাড়িলে সে প্রথম শ্রেণীর ট্রামে চাপিবে, রোজই মাছ খাইবে এবং জামাকাপড় ধোপার বাড়ী দিবে। ফলে এই সমস্ত জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িবে। আয়ের পরিবর্তনের

ফলে চাহিদার যে-পরিমাণ পরিবর্তন হয় তাহাকে 'চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা' (Income-Elasticity of Demand) বলা হয়।

মূল্যানুগ ও আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা ছাড়াও অন্যান্য প্রকার স্থিতিস্থাপকতার কথা বলা যায়। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল চাহিদার ক্রম-স্থিতিস্থাপকতা (Cross-Elasticity of Demand)। ক্রম-স্থিতিস্থাপকতা বলিতে বুঝায় সম্পর্কিত দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন। যেমন, চা-এর দামের পরিবর্তনের ফলে কফির চাহিদার পরিবর্তন, মোটরগাড়ীর দামের পরিবর্তনের ফলে পেট্রলের চাহিদার পরিবর্তন, ইত্যাদি।

ভোগ্যপণ্যক্রেতার চাহিদার পরিমাণ (Consumer's Demand for a Commodity)

চাহিদার প্রকৃতি সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত যে-আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে ভোগ্যপণ্যক্রেতার (consumer) চাহিদা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সে-সম্বন্ধে ধারণা করা যাইবে। আমরা দেখিয়াছি যে অর্থবিদ্যায় 'চাহিদা' বলিতে বিশেষ দামে লোকে যে-পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকে তাহাকে বুঝায় (১৫ ও ২৩ পৃষ্ঠা)। সুতরাং কোন ভোগ্যপণ্যক্রেতার চাহিদা প্রথমত নির্ভর করে ঐ দ্রব্যটির দামের উপর। দ্বিতীয়ত, দাম ছাড়াও দ্রব্যটির প্রকৃতি, ভোগ্যপণ্যক্রেতার রুচি পছন্দ ইত্যাদি ভোগ্যপণ্যক্রেতার চাহিদা নির্ধারণ করিয়া থাকে। দ্রব্যটি প্রয়োজনীয় অভাব মিটাইলে দামের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলেও চাহিদার বিশেষ তারতম্য দেখা যাইবে না; অপরপক্ষে দ্রব্যটি যদি বিশেষ প্রয়োজনীয় না হয় তাহা হইলে চাহিদার পরিমাণ রুচি পছন্দ ইত্যাদি দ্বারা অনেকাংশে নির্ধারিত হইবে। তৃতীয়ত, ভোগ্যপণ্যক্রেতার চাহিদা তাহার আয়ের উপরও নির্ভর করে। সাধারণ ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি পাইলে চাহিদার পরিমাণও বাড়িবে এবং আয় হ্রাস পাইলে চাহিদার পরিমাণও কমিবে। অবশ্য আয় যদি খুব বেশী বৃদ্ধি পায় তবে ভোগ্যপণ্যক্রেতা ঐ দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট দ্রব্যের দিকে ঝুঁকিতে পারে। পরিশেষে আছে অন্যান্য সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম। যেমন, চা-এর দাম বৃদ্ধি পাইলে ভোগ্যপণ্যক্রেতা চা-এর পরিবর্তে কফির দিকে ঝুঁকিবে কি না, তাহা নির্ভর করিবে কফির দামের উপর; অথবা সরিষার তৈলের দাম কমিলে উহার চাহিদা কতটা বৃদ্ধি পাইবে তাহা নির্ভর করে মাছমাংস শাকসবজির দামের উপর।

চাহিদার পরিবর্তন (Changes in Demand)

দামের পরিবর্তন না ঘটিয়াও চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলে উহাকে চাহিদার পরিবর্তন (Change in Demand) বলা হয়। চাহিদার এই ধরনের হ্রাসবৃদ্ধি হইলে পূর্বের

দামেই জিনিসপত্র কমবেশী বিক্রয় হয়। পূর্বোক্ত আয়ের পরিবর্তন ছাড়া নিম্নলিখিত কারণে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়।

(১) লোকের রুচি, স্বভাব ও ফ্যাসানের পরিবর্তন: চা-পানের অভ্যাস বৃদ্ধি পাইলে চিনি ও দুগ্ধের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে, মোটরগাড়ীর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইলে ঘোড়ার গাড়ীর চাহিদা কমিবে, মেয়েদের মধ্যে জরির জুতা পরার ফ্যাসান চালু হইলে জরির চাহিদা বাড়িবে, ইত্যাদি।

(২) জনসংখ্যার পরিবর্তন: জনসংখ্যার পরিবর্তনের ফলেও চাহিদা পরিবর্তিত হয়। পূর্ব-পাকিস্তান হইতে বহু লোকের আগমনের ফলে পশ্চিমবংগের বাড়ীঘর জমিজমার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে; আবার ঐ কারণেই পূর্ব-পাকিস্তানে ঐ সকল দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে।

(৩) আয়ের বণ্টনে পরিবর্তন: জাতীয় আয়ের বণ্টন-পদ্ধতি পরিবর্তিত হইলেও চাহিদা পরিবর্তিত হইবে। ধনীর তুলনায় দরিদ্রের আয় বৃদ্ধি পাইলে দরিদ্রের ভোগ্য-দ্রব্যের চাহিদা বাড়িবে।

(৪) ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা: বাজারের তেজীমন্দা অবস্থার দ্বারাও চাহিদা প্রভাবান্বিত হয়। তেজী বাজারের (boom market) সময় সকল জিনিসের চাহিদা বাড়ে আবার মন্দাবাজারের সময় সকল জিনিসের চাহিদা কমে।

(৫) পরস্পর-সম্পর্কিত দামের পরিবর্তন: কতকগুলি এরূপ দ্রব্য আছে যাহাদের দাম পরস্পর-সম্পর্কিত—যেমন, চা ও চিনি, মোটরগাড়ী ও পেট্রল, ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে একটির দাম বাড়িলে অপরটির চাহিদাও হ্রাস পাইতে পারে—যেমন, পেট্রলের দাম বৃদ্ধি পাইলে লোকে মোটরগাড়ী চড়া কমাইয়া দিতে পারে।

নিম্নে চাহিদার পরিবর্তনের একটি তালিকা দেওয়া হইল:

দাম	চাহিদার পরিমাণ
৫ টাকা	১০০ একক
" "	১৫০ "
" "	১২০ "

দেখা যাইতেছে ৫ টাকা দামের কোন পরিবর্তন হয় নাই, তবে চাহিদার পরিমাণ ১০০ একক হইতে বাড়িয়া ১৫০ একক হইল এবং পরে আবার কমিয়া ১২০ এককে দাঁড়াইল। অর্থাৎ, একই দামে বিভিন্ন সময়ে কমবেশী চাহিদা হইতেছে।

৪ | উৎপাদনের উপাদান
(Factors of Production)

উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান (Different Factors of Production)

উৎপাদন বলিতে যে প্রকৃতির দানকে রূপান্তরিত করিয়া মানুষের অভাব মিটানর উপযোগী করিয়া তোলা বুঝায়, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি (১১-১২ পৃষ্ঠা)। উৎপাদনকার্য সম্পাদন করিতে হইলে কতকগুলি উপকরণের প্রয়োজন হয়। এই উপকরণগুলিকেই অর্থবিদ্যায় 'উৎপাদনের উপাদান' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ক। জমি (Land): কোন উৎপাদনই প্রকৃতির দান ব্যতীত হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতির দানই হইল উৎপাদনের প্রথম উপাদান। অর্থবিদ্যাবিদগণ প্রকৃতির দানকে জমি (Land) বলিয়া অভিহিত করেন। জমি বলিতে কেবলমাত্র ভূখণ্ডকেই বুঝায় না; কৃষি ও ঘরবাড়ীর জন্য জমি ছাড়াও খনি, বন, মৎস্যধৃতকরণের উপযোগী নদী, সমুদ্র, জলবিদ্যুতের উৎস ইত্যাদি সকল প্রাকৃতিক সম্পদকেই বুঝায়।

খ। শ্রম (Labour): উৎপাদনের জন্য প্রকৃতির দানই যথেষ্ট নহে। মানুষের শ্রম ব্যতীত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারোপযোগী হয় না। এমনকি সুদূর অতীতে মানুষ যখন বনেজংগলে বসবাস করিত তখনও তাহাকে পরিশ্রম করিয়া ফলমূল আহরণ করিয়া জীবনধারণ করিতে হইত। বর্তমান যুগে মানুষ তাহার শ্রমের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে আকাংক্ষা মিটাইবার নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া থাকে। এই শ্রম (Labour) হইল উৎপাদনের দ্বিতীয় উপাদান। শ্রম বলিতে শুধু দৈহিক শ্রমই বুঝায় না, মানসিক শ্রমও বুঝায়।

গ। মূলধন (Capital): কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য কোন উপাদানের সাহায্য না লইয়া মাত্র জমি ও শ্রমের সহযোগে উৎপাদন করা সম্ভব হইলেও সেই উৎপাদন অতি সাধারণ ও সামান্য হইতে বাধ্য। তাই মানুষ উৎপাদনের জন্য নানাবিধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। প্রাচীন যুগে মানুষ যখন বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত, তখনও সে তীরধনুক বর্শা প্রভৃতির সাহায্যে শিকার সংগ্রহ করিত। এই সকল অস্ত্রশস্ত্রই ছিল তখনকার দিনে মূলধন। বর্তমান যুগে কৃষি শিল্প প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই অসংখ্য রকমের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের দ্বারা উৎপাদনকার্য চলিতেছে। এই সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের ব্যবহারের ফলে উৎপাদন আশাতীতভাবে বাড়িয়া গিয়াছে এবং মানুষের শ্রমেরও লাঘব হইয়াছে। বাটা কোম্পানীর ন্যায় জুতার কারখানায় গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে যন্ত্রের সাহায্যে দৈনিক শত শত জুতা তৈয়ারি হইতেছে; কোন

কাপড়ের কলে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে প্রত্যহ শত শত মিটার কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং দেখা যায় যে উৎপাদনের জন্য প্রকৃতির দান বা জমি ও শ্রম ব্যতীত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামেরও প্রয়োজন। অর্থবিদ্যায় এই যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামকেই মূলধন (Capital) বলা হয়। ইহা উৎপাদনের তৃতীয় উপাদান। মূলধনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা মানুষের অতীত শ্রমের ফল এবং অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। যেমন, কৃষক যে-লাঙল ব্যবহার করে তাহা অতীতে মানুষ তাহার শ্রমের দ্বারা তৈয়ারি করিয়া বর্তমানে শস্যাদি উৎপাদন করিবার জন্য উহাকে ব্যবহার করিতেছে। মূলধনের সহিত জমির পার্থক্য এইখানেই। জমি প্রকৃতির দান আর মূলধন মানুষ নিজের পরিশ্রমের দ্বারা গড়িয়া তুলে।

ঘ। **সংগঠন (Organisation)**: আবার জমি শ্রম ও মূলধন থাকিলেই চলে না; ভালভাবে উৎপাদনের জন্য এই তিনটি উপাদানকে একত্রিত ও সংগঠিত করা প্রয়োজন। এই কার্য সম্পাদন করে উদ্যোক্তা (Entrepreneur) বা সংগঠক (Organiser)। সংগঠক বা উদ্যোক্তার সংগঠন-নৈপুণ্যের উপরই উৎপাদনকার্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে। বর্তমান যুগে এই কর্মকর্তা বা সংগঠকের গুরুত্ব বিশেষভাবে বাড়িয়া গিয়াছে, কারণ উৎপাদন-পদ্ধতি ক্রমশই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। অনেক অর্থবিদ্যাবিদ উদ্যোগ বা সংগঠনকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে স্বীকার করিতে চাহেন না। ইঁহাদের মতে, সংগঠনকার্য একপ্রকার শ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং প্রত্যেক শ্রমিককেই কিছু-না-কিছু সংগঠনমূলক কার্য করিতে হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলা হয় যে, সংগঠক বা উদ্যোক্তার কার্য বিশেষ ধরনের এবং বর্তমানের জটিল উৎপাদন-পদ্ধতিতে তাহার বিশেষ স্থান রহিয়াছে। এইজন্যই সংগঠনকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা যায়।

সংগঠকের কার্যাবলী (Functions of the Entrepreneur or Business Organiser)

উদ্যোক্তা বা সংগঠকের কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অধিক গুরুত্বপূর্ণ:

(১) তাহাকে প্রথমেই স্থির করিতে হয় যে কোন্ শিল্প বা ব্যবসায়ে সে প্রবেশ করিবে এবং কত পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে। এই উৎপাদনের জন্য তাহাকে স্থান নির্বাচন করিতে এবং মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়।

(২) সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব করিবার জন্য কি হারে জমি শ্রম ও মূলধন উৎপাদনকার্যে ব্যবহার করা হইবে, সে-সম্পর্কেও উদ্যোক্তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। উৎপাদন-পদ্ধতি ও শ্রমবিভাগ নির্ধারণ করাও তাহার দায়িত্ব।

(৩) যাহাতে পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাযথভাবে কাজকর্ম চলে তাহাও তাহাকে দেখিতে হয়। অবশ্য এই কার্য মাহিনা-করা ম্যানেজারের হাতে কতকটা ছাড়িয়া দেওয়া যায়।

(৪) উদ্যোক্তার প্রধান দায়িত্ব ঝুঁকি (risk) বহন করা। বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সে দ্রব্যাদি উৎপাদন করে। কিন্তু বাজার বড় অনিশ্চিত এবং চাহিদাও অনবরত পরিবর্তিত হয়। কোন দ্রব্যের উৎপাদনের আরম্ভ হইতে উৎপাদন সমাপ্ত হইয়া উহা বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত করিবার মধ্যে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে চাহিদার পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব, লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা সকল সময়েই রহিয়াছে। উদ্যোক্তাকে এই অনিশ্চয়তার দায়িত্ব বা ঝুঁকি বহন করিয়াই উৎপাদন করিতে হয়।

উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানকে এই ঝুঁকি লইতে হয় না, কারণ চুক্তি অনুসারে শ্রমিক নির্দিষ্ট হারে মজুরি, জমির মালিক খাজনা এবং বিনিয়োগকারী সুদ পাইয়াই থাকে। এই সকল প্রাপ্য মিটাইয়া উদ্বৃত্ত কিছু থাকিলে তবে তাহাই উদ্যোক্তা মুনাফা হিসাবে ভোগ করে। যে-সকল অর্থবিদ্যাবিদ উদ্যোক্তাকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করিতে রাজী নহেন তাঁহারা অবশ্য বলেন যে, উদ্যোক্তার যেমন ঝুঁকি রহিয়াছে, অন্যান্য উপাদানেরও তেমন ঝুঁকি রহিয়াছে। যেমন, শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িতে পারে, কলকারখানার মধ্যে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। আবার জমির মালিক অনিশ্চয়তার ঝুঁকি লইয়া এক কাজ (use) হইতে জমিকে ছাড়াইয়া লইয়া অন্য কাজে ব্যবহার করিতে পারে। সুতরাং ঝুঁকি বহনের জন্য যদি মুনাফা পাওয়া যায় তাহা হইলে সুদ খাজনা ও মজুরির একাংশকেও মুনাফা বলিয়াই ধরিতে হয়। ইহার উত্তরে বলা হয় যে, অন্যান্য উপাদানের পক্ষে কিছুটা ঝুঁকি বহন করিতে হইলেও উদ্যোক্তার ঝুঁকির পরিমাণ অধিক এবং প্রকৃতিও ভিন্ন। যাহা হউক, উদ্যোক্তার কার্য বিশেষীকৃত (specialised) হওয়ায় আমরা সংগঠনকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে ধরিয়াই আলোচনা করিব।

৫

জমি
(Land)

জমির সংজ্ঞা (Definition of Land)

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে জমি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হইয়াছে। এখন এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। দেখা গিয়াছে, জমি উৎপাদনের অন্যতম মৌলিক উপাদান (original factor)। সাধারণ ভাষায় জমি বলিতে ভূ-ত্বক বা মৃত্তিকাকে বুঝায়—যেমন, চাষবাস ও কলকারখানার জমি। অর্থবিদ্যায় কিন্তু 'জমি' শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা শুধু ভূখণ্ডের উপরিভাগটুকুই বুঝায় না—খনি, বন, জীবজন্তু, আলোবাতাস, নদনদী, সমুদ্র প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকেই বুঝায়। বিখ্যাত ইংরাজ লেখক মার্শালের (Alfred Marshall) ভাষায় বলা যায়, "জমি হইল সেই সকল শক্তি ও সম্পদ যাহা প্রকৃতি মানুষের সাহায্যার্থে জল স্থল বায়ু আলোক ও উত্তাপের মাধ্যমে মুক্তভাবেই দান করে।" অবশ্য অনেক অর্থবিদ্যাবিদ মানুষের নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানায় নাই এরূপ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকে 'জমি'র সংজ্ঞার মধ্যে ধরিতে চাহেন না। উদাহরণস্বরূপ, সূর্যালোক বৃষ্টিপাত বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

জমির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Land)

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে জমির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হয়:

১। **জমির যোগান অপরিবর্তনশীল (Supply of Land is Fixed):** প্রকৃতিদত্ত বলিয়া জমির যোগান বা পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। পৃথিবীতে যে-পরিমাণ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য রহিয়াছে তাহা আমরা ইচ্ছা করিলেই বাড়াইয়া লইতে পারি না। তবে একথা বলা ঠিক নয় যে জমির পরিমাণ সম্পূর্ণভাবে অপরিবর্তনশীল। উপকূল ভগ্ন অথবা জমি জলমগ্ন হওয়ার ফলে পৃথিবীর স্থলভাগ হ্রাস পাইতে পারে; আবার বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির ফলে মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে। অপরপক্ষে মানুষ আবার বাঁধ দিয়া, পতিত জমি পুনরুদ্ধার করিয়া, সেচ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া জমির যোগান কতক পরিমাণে বাড়াইতে পারে। কিন্তু এইভাবে কৃষি-জমির কতকটা হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব হইলেও আমরা জলবায়ু আলোবাতাস বৃষ্টিপাত অবস্থান প্রভৃতির পরিবর্তন করিতে পারি না। সুতরাং সাধারণভাবে বলিতে পারা যায় যে, অন্যান্য উপাদানের তুলনায় জমির সরবরাহ অপেক্ষাকৃত নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনশীল।

২। জমির উৎপাদন-ব্যয় নাই (**Land has no Cost of Production**): জমি প্রকৃতির দান। কেহ ব্যয় করিয়া প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে নাই। বলিতে পারা যায় যে উহা মানুষের কাজে নিয়োজিত হইবার জন্যই পড়িয়া আছে। শ্রম কিংবা মূলধনের বেলায় একথা খাটে না। লালনপালন, শিক্ষাদীক্ষার মধ্য দিয়া শ্রমিক কর্মক্ষম হইয়া উঠে; বিনা আয়াসে শ্রমিক তৈয়ারি হয় না। মূলধনও সম্পদের সঞ্চয় হইতে আসে; উহার জন্যও মানুষকে পরিশ্রম করিতে ও বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিতে হয়; কিন্তু জমির প্রকৃতিদত্ত উর্বরতা জলবায়ু অবস্থান প্রভৃতির পিছনে মানুষের কোন ব্যয় বা শ্রম নাই।

৩। জমি বিভিন্ন জাতীয় (**Land is Heterogeneous**): উর্বরতার দিক হইতে বিভিন্ন জমির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কোন জমি হয়ত অতি উর্বর আবার কোন জমির উর্বরাশক্তি অতি সামান্যই। আমাদের দেশে একদিকে যেমন অতি উর্বর সিন্ধু-গাংগেয় সমতলভূমি রহিয়াছে, অপরদিকে তেমনি রহিয়াছে রাজস্থানের অনুর্বর মরুভূমি অঞ্চল। কোন কোন জমির অবস্থান ব্যবসাবাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক, আবার কোন জমি হয়ত ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত। ইহা ব্যতীত, কতকগুলি জমি আছে যাহাতে উৎপাদনকার্য সকল সময়েই লাভজনক হয়, কারণ উহাতে উৎপাদন খুব বেশী হয়; অপরদিকে কতকগুলি জমি আছে যাহাতে উৎপাদন কোন সময়েই লাভজনক হয় না। সুতরাং উৎপাদনক্ষমতা অনুসারে আমরা জমিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। অবশ্য মূলধন ও শ্রমিকের বেলায়ও জমির এই তৃতীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। জমির মত শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির উৎপাদন-ক্ষমতাতেও তারতম্য দেখা যায়।

৪। জমিকে স্থানান্তরিত করা যায় না (**Land is Immovable**): যতই উপযোগী হউক না কেন অথবা যতই উর্বর হউক না কেন, জমিকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে চালান করা যায় না। এইজন্যই কলিকাতার ন্যায় সহরে জমির দাম এত বেশী এবং পল্লীগ্রামে জমির দাম এত কম।

৫। জমি হইতে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের নিয়মাধীন (**Production from Land is subject to the Law of Diminishing Returns**): পরিশেষে, বলা হয় যে জমির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করে। ইহার অর্থ হইল, একই জমিতে অধিক মাত্রায় শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা করিলে উৎপাদনের হার ক্রমশ কমিতে থাকে। প্রাচীন লেখকগণ মনে করিতেন যে এই নিয়ম কৃষির ক্ষেত্রেই অধিক প্রযোজ্য। কিন্তু দেখা যায়, এই নিয়ম অর্থবিদ্যার অন্যতম সাধারণ নিয়ম এবং অবস্থা বিশেষে ইহা

শিল্পের ক্ষেত্রেও কার্যকর। সুতরাং এই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (The Law of Diminishing Productivity or Returns)

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি উদ্ভূত হয় কৃষকের অভিজ্ঞতার ফলে। অভিজ্ঞতা হইতে কৃষক দেখিয়াছে যে একই জমিতে অধিক মাত্রায় শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া চলিলে ফসলের উৎপাদন সমপরিমাণ হারে বৃদ্ধি না পাইয়া ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াই সমহারে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদের দেশে খাদ্যাভাবের সমস্যাই থাকিত না—এক বিঘা জমিতে শত শত কৃষক নিযুক্ত করিয়াই দেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যাইত। ওয়েস্ট ও রিকার্ডোর ন্যায় প্রাচীন লেখকগণ কৃষকের এই অভিজ্ঞতাকেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি নাম দিয়া অর্থবিদ্যার সূত্রে পরিণত করেন। আধুনিক অর্থবিদ্যায় ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিটি পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি (The Law of Variable Proportions) নামেও পরিচিত।

সংজ্ঞা : কৃষির ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত সূত্রকে এইভাবে বর্ণনা করা যায় : কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে কৃষিকার্যের জন্য শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া চলা হইলে শেষ পর্যন্ত উৎপাদনবৃদ্ধির পরিমাণ সমানুপাত অপেক্ষা কম হইতে থাকিবে, অবশ্য ইতিমধ্যে যদি-না কৃষির পদ্ধতিতে কোন উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা : সংজ্ঞাটি সম্পর্কে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইহাতে জমির মোট উৎপন্নের কথা বলা হইতেছে না, অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধনের নিয়োগের ফলে যতটুকু অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হইতেছে, তাহার কথাই বলা হইতেছে। সুতরাং ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির অর্থ হইল—শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমাণ কম হইবে। যেমন, যদি ২ একর জমিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধনসহ ৪ জন শ্রমিক নিয়োগ করা হইলে ৬০ কুইন্টাল ধান, ৫ জন শ্রমিক নিয়োগ করা হইলে ৭৫ কুইন্টাল ধান এবং ৬ জন শ্রমিক নিয়োগ করা হইলে ৮৪ কুইন্টাল ধান পাওয়া যায় তাহা হইলে ৪ জনের স্থলে ৫ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে পূর্বের তুলনায় ১৫ কুইন্টাল এবং ৫ জনের স্থলে ৬ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে পূর্বের তুলনায় ৯ কুইন্টাল অতিরিক্ত ধান পাওয়া যাইতেছে। অতএব, অতিরিক্ত উৎপন্নের পরিমাণ পূর্বের অনুপাতে হ্রাস পাইয়া চলিয়াছে।

অনেক সময় অবশ্য প্রথম প্রথম শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির তুলনায় উৎপন্ন ফসলবৃদ্ধির হার সমানুপাতের অধিকও হইতে পারে—অর্থাৎ, ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন (Increasing Returns) দেখা দিতে পারে। ইহার কারণ, কৃষক হয়ত প্রথমদিকে জমিতে কম মূলধন ও শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছে এবং উপযুক্তভাবে কৃষিকার্য পরিচালনা করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রথম প্রথম ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন দেখা দিলেও একসময়-না-একসময় ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর হইবেই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রথমদিকে সাময়িকভাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য নাও করিতে পারে—অর্থাৎ, প্রান্তিক বা অতিরিক্ত উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হইতে পারে।

আর একটি কারণেও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্য সাময়িকভাবে স্থগিত থাকিতে পারে। উপরি-উক্ত সংজ্ঞায় পরিষ্কারভাবেই বলা হইয়াছে যে, কৃষিকার্যের পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটিলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর নাও হইতে পারে। উন্নত ধরনের কৃষি-যন্ত্রপাতি সার বীজ সেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রবর্তনের ফলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির পরিবর্তে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে পারে। কিন্তু নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত হইবার পর ক্রমাগত অধিক পরিমাণে শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করা হইতে থাকিলে আবার ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে সুরু করিবে। সুতরাং সাময়িকভাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি স্থগিত রাখা সম্ভব হইলেও স্থায়ীভাবে উহাকে বন্ধ করিয়া রাখা যায় না।

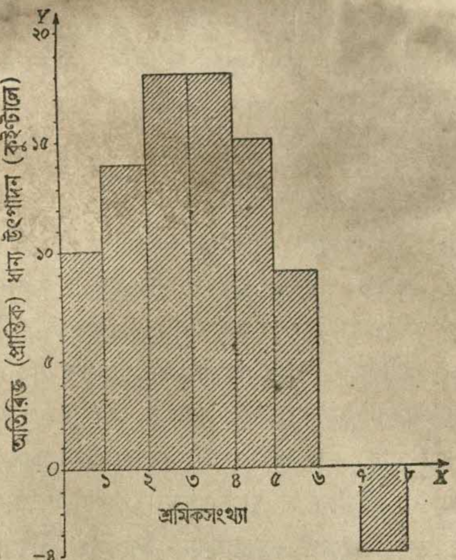
ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ব্যাখ্যা নিম্নের ছকটির সাহায্যে করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, নির্দিষ্ট জমির পরিমাণ হইল ২ একর এবং নিযুক্ত প্রত্যেক শ্রমিক নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন (বীজ সার লাঙল প্রভৃতি) লইয়া কাজ করে। তাহা হইলে এই জমিতে ক্রমাগত মূলধনসহ শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি করা হইলে অতিরিক্ত উৎপন্ন ধানের পরিমাণ নিম্নে বর্ণিত হারে হ্রাস পাইতে পারে।

শ্রমিকের সংখ্যা	মোট উৎপন্ন ধানের পরিমাণ (কুইণ্টালে)	শ্রমিকপিছু গড় উৎপাদন (কুইণ্টালে)	অতিরিক্ত উৎপাদন বা শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন (কুইণ্টালে)
১	১০	১০	১০
২	২৪	১২	১৪
৩	৪২	১৪	১৮
৪	৬০	১৫	১৮
৫	৭৫	১৫	১৫
৬	৮৪	১৪	৯
৭	৮৪	১২	০
৮	৮০	১০	−৪

ছকটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ১ জন শ্রমিকের স্থলে ২ জন এবং ২ জনের স্থলে ৩ জন নিয়োগ করা পর্যন্ত প্রান্তিক (marginal) বা অতিরিক্ত উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১ জন শ্রমিক বাড়াইলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ যতটা বৃদ্ধি পায় তাহাকে প্রান্তিক উৎপাদন বা অতিরিক্ত উৎপাদন বলা হয়। প্রদত্ত হিসাবে ১ জনের স্থলে ২ জন শ্রমিক নিযুক্ত করার ফলে মোট উৎপাদন ১০ কুইন্টাল হইতে বাড়িয়া ২৪ কুইন্টাল হয়। সুতরাং অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপাদন হইল ১৪ কুইন্টাল ধান। আবার শ্রমিকসংখ্যা ২ জন হইতে ৩ জন করা হইলে মোট উৎপাদন ২৪ কুইন্টাল হইতে বাড়িয়া ৪২ কুইন্টাল হয়। অতএব অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপাদন হইল ১৮ কুইন্টাল। ইহার পর শ্রমিকসংখ্যা যত বাড়ান হইয়াছে প্রান্তিক উৎপাদন তত হ্রাস পাইয়া চলিয়াছে এবং যখন শ্রমিকসংখ্যা ৭ জন তখন অতিরিক্ত উৎপাদন মোটেই হয় নাই এবং শ্রমিকসংখ্যা যখন ৮ জন তখন মোট উৎপাদনের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় ৪ কুইন্টাল কমিয়া গিয়াছে। যখন হইতে প্রান্তিক উৎপাদন কমিতে শুরু করে তখন হইতেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া ধরা হয়। আমাদের উদাহরণে ৫ জন শ্রমিকের নিয়োগের স্তর হইতেই জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে শুরু করিয়াছে এবং ৪ জন শ্রমিকের নিয়োগের স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। মোট উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে ৭ জন শ্রমিক নিয়োগের স্তরে উহা সর্বাধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ক্রমাগত কার্য করিতে থাকায় অষ্টম শ্রমিকের নিয়োগের ফলে মোট উৎপাদনও কমিয়া গিয়াছে। পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটি হইতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা সহজেই ধরা পড়িবে।

রেখাচিত্রটির প্রত্যেক স্তম্ভের দ্বারা বুঝান হইয়াছে—১ জন করিয়া শ্রমিক বাড়াইলে কত পরিমাণ অতিরিক্ত ধান পাওয়া যায়—অর্থাৎ, প্রত্যেকটি স্তম্ভ প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাপ করিতেছে। সকল স্তম্ভ একসংগে যোগ করিলে মোট উৎপাদনের হিসাব পাওয়া যায়। সর্বশেষ স্তম্ভটি নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে অষ্টম শ্রমিক নিয়োগের ফলে উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বাড়ে নাই, বরং কমিয়া গিয়াছে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিটিকে গড় উৎপন্নের হিসাবের ভিত্তিতেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে শ্রমের (নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধনসহ) নিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া চলিলে একটা সময়ের পর শ্রমিক-পিছু গড় উৎপাদন (average product) ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। মোট উৎপন্নকে



শ্রমিকসংখ্যা দিয়া ভাগ দিলেই এই গড় উৎপন্নের হিসাব পাওয়া যায়। যেমন, ২ জন শ্রমিক নিয়োগ করিলে যদি মোট উৎপাদন হয় ২৪ কুইণ্টাল ধান তাহা হইলে শ্রমিকপিছু গড় উৎপন্ন হইবে (২৪ ÷ ২ =) ১২ কুইণ্টাল ধান। ৩৮ পৃষ্ঠার ছকটি হইতে দেখা যায় গড় উৎপাদনের পরিমাণ সর্বাধিক হইয়াছে যখন নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৪ কিংবা ৫। ইহার পর শ্রমিকসংখ্যা বাড়াইয়া চলা হইলে শ্রমিক-পিছু গড় উৎপন্নের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকিবে। অর্থাৎ, ষষ্ঠ শ্রমিক হইতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ক্রিয়া করিতে সুরু করিবে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় (Diminishing Returns and Increasing Cost) ঃ ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির জন্য সাধারণত ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় (increasing cost of production) দেখা দেয়। যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে ক্রমাগত শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে ক্রমশ কম হারে উৎপাদন হইতে থাকে তাহা হইলে উৎপাদনের ব্যয় ক্রমশই বাড়িয়া চলে। ধরা যাউক, চাষের জন্য মজুরি ও মূলধন বাবদ শ্রমিকপিছু খরচ হইল ১৮০ টাকা। আমাদের পূর্বের (৩৮ পৃষ্ঠার) ছকটিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে পঞ্চম শ্রমিক নিয়োগের ফলে অতিরিক্ত ১৫ কুইণ্টাল ধান উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ১৫ কুইণ্টাল ধানের উৎপাদন-ব্যয় হইল ১৮০ টাকা। অর্থাৎ, প্রতি কুইণ্টাল অতিরিক্ত ধান উৎপাদন করিতে ১২ টাকা করিয়া খরচ পড়িয়াছে। ষষ্ঠ শ্রমিক নিয়োগের ফলে ৯ কুইণ্টাল অতিরিক্ত ধান উৎপন্ন হইয়াছে দেখা যায়। এই ৯ কুইণ্টাল ধানের জন্য ব্যয়

হইয়াছে ১৮০ টাকা। অর্থাৎ, কুইণ্টাল প্রতি উৎপাদন-ব্যয় হইল ২০ টাকা। এইভাবে অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ বাড়িয়াই চলে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? (Where does the Law of Diminishing Returns apply?): প্রাচীন লেখকগণ মনে করিতেন যে, যেখানে উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রকৃতির দান বা জমির প্রাধান্য রহিয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ তাঁহারা খনির কার্য, মৎস্যচাষ, গৃহনির্মাণ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই ধারণার কারণ বুঝা মোটেই কঠিন নয়। জমির স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতার জন্য যখন ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ক্রিয়া করে তখন যে যে ক্ষেত্রে জমির প্রাধান্য রহিয়াছে, সেখানেই বিধিটি কার্যকর হইবে। যেমন, গৃহনির্মাণের বেলায় জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ হইলে বাড়ীর তলার পর তলা নির্মাণ করিয়া যাওয়া হয়। ইহাতে একসময়ের পর উচ্চতর তলা নির্মাণের ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং বসবাসেরও অসুবিধা হয়। আবার খনির ক্ষেত্রে যতই কয়লা ইত্যাদি তোলা হয় ততই খনি গভীর হয় এবং কয়লা ইত্যাদি তোলার ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। মৎস্যচাষের বেলায় বলা হয় যে, ঐ ক্ষেত্রে যত বেশী শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয় অতিরিক্ত মৎস্যের পরিমাণ ততই কমিতে থাকে।

প্রাচীন লেখকগণের আরও ধারণা ছিল যে এইভাবে প্রকৃতির দান বা জমির প্রাধান্যের দরুন কৃষি, খনির কার্য প্রভৃতির বেলায় ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিলেও শিল্পক্ষেত্রে মূলধনের প্রাধান্য অধিক বলিয়া ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়াই লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক মতানুসারে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কৃষি ও শিল্পে ক্রমহ্রাসমান বা ক্রমবর্ধমান—উভয় নিয়মই কার্যকর হইতে পারে। আধুনিক লেখকগণ বলেন যে, ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি উৎপন্নের হ্রাসবৃদ্ধির সাধারণ নিয়মের একটি বিশেষ দিক। কৃষি হউক আর শিল্পই হউক, প্রত্যেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের জন্য জমি শ্রম মূলধন ও সংগঠন—উৎপাদনের এই চারিটি উপাদানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে-কোনরূপে এই উপাদানগুলির প্রয়োগ করিলে কাম্যভাবে উৎপাদনকার্য সম্পাদিত হয় না। উপযুক্ত অনুপাতে শ্রম মূলধন জমি ও সংগঠন সংযুক্ত করা হইলে তবেই উৎপাদন সন্তোষজনক হয়।

বিভিন্ন উপাদানের সংযোগের উপযুক্ত অনুপাত কি হইবে তাহা পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে ঠিক করিয়া লইতে হয়। কখনও বা শ্রম বাড়াইয়া, কখনও বা মূলধন বাড়াইয়া আবার কখনও বা জমি বাড়াইয়া সংগঠক 'কাম্য অনুপাত' (optimum proportion) ঠিক করিয়া লয়। যখন কোন একটি উপাদানের পরিমাণ কাম্য

অনুপাতের তুলনায় কম থাকে তখন উক্ত উপাদান বৃদ্ধি করিয়া চলিলে যতক্ষণ-পর্যন্ত না কাম্য অনুপাতে পৌছান যাইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন হইতে থাকিবে। কিন্তু এই কাম্য অনুপাতে পৌছিবার পরও যদি ঐ উপাদানটি অন্যান্য উপাদানের তুলনায় অধিক মাত্রায় নিয়োগ করা হইতে থাকে তখন উৎপাদনবৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকিবে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝান যাইতে পারে।

ধরা যাউক, কোন কারখানায় কাম্য উৎপাদনের জন্য ৪ একর জমি, ৫০০ টাকার মূলধন, ২০ জন শ্রমিক ও ১ জন দক্ষ সংগঠকের প্রয়োজন হয়। এখন অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। এই অবস্থায় উৎপাদনবৃদ্ধির হার হ্রাস পাইবে। কারণ, অন্যান্য উপাদানের তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িবে।

শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে দেখা যায় যে উৎপাদনের সকল উপাদানকে সমান-ভাবে বর্ধিত করা সম্ভব হয় না। যেমন, কোন দ্রব্যের চাহিদা হঠাৎ বাড়িয়া গেলে অধিক উৎপাদনের জন্য সংগে সংগেই কারখানা যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি মূলধন এবং সংগঠন বাড়ান সম্ভব হয় না। তখন সীমাবদ্ধ যন্ত্রপাতি ও একই সংগঠনের সহিত অধিক মাত্রায় শ্রম জুড়িয়া দিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হয়। ফলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে সুরু করে এবং উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

কৃষির ক্ষেত্রেও শ্রম মূলধন জমি ও সংগঠনের যে-কোনটিকে অন্যান্যগুলির অনুপাতে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হইলে উৎপাদনবৃদ্ধির হার ক্রমশ কম হইবে। যেমন, শ্রম মূলধন ও সংগঠনের তুলনায় জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইলে উৎপাদনবৃদ্ধির হার ক্রমশ কমিতে থাকিবে। তবে অধিকাংশ দেশেই জমির যোগান অন্যান্য উপাদানের তুলনায় অপ্রচুর। সুতরাং খাদ্য ও অন্যান্য শস্যের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য যখন সীমাবদ্ধ জমিতে অধিক মাত্রায় শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হইতে থাকে তখন উৎপন্ন ফসলের বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে।

উপসংহার ঃ তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কৃষি শিল্প ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে পারে এবং ইহা অর্থবিদ্যার একটি সাধারণ সূত্র। সাধারণ সূত্র হিসাবে আমরা ইহার সংজ্ঞা এইরূপে দিতে পারি ঃ উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া কোন একটি উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া চলিলে একটা সময়ের পর হইতে প্রথমে অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপন্নের (marginal product) পরিমাণ এবং পরে গড় উৎপন্নের (average product) পরিমাণ হ্রাস পাইয়া চলিবে। সকল উপাদানের মধ্যে কাম্য অনুপাতের অভাবের দরুনই বিধিটি

কার্যকর হয় বলিয়া বিধিটিকে পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি (Law of Variable Proportions) বলা হয়।*

বিধিটির সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Law) ঃ ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বা পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইলেও কোন কোন সময় উহার কার্যকারিতা স্থগিত থাকিতে পারে। কৃষির ক্ষেত্রে যেমন পূর্বে কম শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হইয়া থাকিলে প্রথম প্রথম উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান না হইয়া ক্রমবর্ধমান হইতে পারে। আবার কৃষির পদ্ধতিগত উন্নয়ন ঘটিলেও উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হইতে পারে। শিল্পক্ষেত্রে অধিকতর শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতির পূর্ণতর ব্যবহারের ফলে প্রথমদিকে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের পরিবর্তে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন দেখা দিতে পারে। তবুও কিন্তু বলা যায়, মাত্র সাময়িকভাবে বিধিটি অকার্যকর থাকিতে পারে। উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে অনুপাত রক্ষা না করিয়া ক্রমাগত আয়তন বৃদ্ধি করিয়া চলিলে একসময়-না-একসময় বিধিটি কার্যকর হইবেই।

উৎপন্নের বিভিন্ন বিধি (Laws of Returns)

এ-পর্যন্ত ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি লইয়াই আলোচনা করা হইয়াছে। অবশ্য ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধিও যে অনেক সময় কার্যকর হইতে পারে তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও সময় সময় সমহারে উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা দেখা যাইতে পারে। অতএব, উৎপন্নের বিধি সংখ্যায় তিনটি—(ক) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি, (খ) ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি এবং (গ) সমহারে উৎপন্নের বিধি। নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

ক। ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (Law of Diminishing Returns) ঃ ইহার সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে অনুপাত কাম্য অবস্থা ছাড়াইয়া গেলে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে ঘটিতে থাকে এবং ফলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় দেখা দেয়। এই কারণে ইহাকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধিও (Law of Increasing Cost) বলা হয়। নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধি সম্বন্ধে আরও সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইবে।

ধানের উৎপাদন	কুইণ্টাল প্রতি উৎপাদন-ব্যয়
১০০ কুইণ্টাল	১০ টাকা
২০০ "	১২ "
৩০০ "	১৫ "
৪০০ "	২০ "

* ৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিধিটি মাত্র কৃষি ও অনুরূপ কার্যের বেলাতেই ক্রিয়া করে না, উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই ইহার কার্যকারিতা দেখা যায়। উৎপাদনের উপাদান-সমূহের মধ্যে অনুপাত কাম্য অবস্থায় পৌছানর পর যদি যে-কোন উপাদানকে অপরিবর্তিত রাখিয়া অপরগুলির পরিমাণ ক্রমশ বাড়াইয়া যাওয়া হয় তবে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ে উৎপাদন ঘটিতে থাকিবে। বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে জমি শ্রম ও মূলধন বাড়ান সম্ভব হইলেও সংগঠক একই থাকে বলিয়া ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধিকে ক্রিয়া করিতে দেখা যায়।

খ। ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি (Law of Increasing Returns): উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে অনুপাত যতক্ষণ কাম্য অবস্থায় না পৌছায় ততক্ষণ উহাদের নিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া চলিলে ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন ঘটে। ফলে এককপিছু উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। এইজন্য এই সূত্রকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধিও (Law of Decreasing Cost) বলা হয়। প্রধানত উৎপাদনের যে-সকল ক্ষেত্রে প্রকৃতির দানের প্রাধান্য নাই, সেখানেই এরূপ ঘটিতে দেখা যায়। তবে কৃষির বেলাতেও প্রথম প্রথম এই বিধি কার্য করিতে পারে। বিধিটিকে বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত উদাহরণ দেওয়া হইল।

সিমেন্টের উৎপাদন	টন প্রতি উৎপাদন-ব্যয়
১০০ টন	১০০ টাকা
২০০ ,,	৯০ ,,
৩০০ ,,	৮০ ,,
৪০০ ,,	৭০ ,,

বৃহদায়তন উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের আয়তন যতই বাড়িতে থাকে শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ততই সুবিধা পাওয়া যায়। অন্যান্যভাবেও ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিতে থাকে। ফলে একক প্রতি উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ কমিয়া আসে। অবশ্য অনির্দিষ্ট কাল ধরিয়া এরূপ চলিতে পারে না। উপাদানসমূহের মধ্যে কাম্য অনুপাতের অবস্থা অতিক্রম করিলেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় ক্রিয়া সুরু করিবে।

গ। সমহারে উৎপন্নের বিধি (Law of Constant Returns): অনেক সময় সমহারে উৎপাদন হইতে দেখা যায়। সুতরাং এককপিছু উৎপাদন-ব্যয়ও অপরিবর্তিত থাকে। ইহারও একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে।

কাপড়ের উৎপাদন	মিটার প্রতি উৎপাদন-ব্যয়
১০০ মিটার	৫০ পয়সা
২০০ ,,	৫০ ,,
৩০০ ,,	৫০ ,,
৪০০ ,,	৫০ ,,

সমহারে উৎপন্নের বিধি ক্রমহ্রাসমান ও ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধির সমপ্রভাবের ফল। প্রকৃতির দানের অপ্রতুলতার জন্য ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের দিকে যতটা ঝোঁক দেখা যায় – শ্রমবিভাগ, যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বৃহদায়তনে উৎপাদনের জন্য ঠিক ততটাই ব্যয়সংক্ষেপ ঘটে। ফলে উৎপাদন ও উৎপাদন-ব্যয়ের হার একই থাকে।

সাধারণত কৃষির ক্ষেত্রে অতি শীঘ্র ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ক্রিয়া সুরু করিতে দেখা যায়। শিল্পক্ষেত্রে অধিকতর শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতির পূর্ণতর ব্যবহারের সুবিধা বহু সময় পর্যন্ত ভোগ করা যায় বলিয়া এবং বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কাম্য অনুপাতে পৌছিতে দেরী হয় বলিয়া বেশ কিছু সময় ধরিয়া ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি কার্য করে; ইহার পর কার্য করে সমহারে উৎপন্নের বিধি। কৃষির সহিত অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রের ইহা একটি মৌলিক পার্থক্য।

আর এক শ্রেণীর উৎপন্নের বিধি (Another Set of Laws of Returns)

উপরে যে উৎপন্নের বিধিসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল উহারা পরিবর্তনীয় অনুপাতেরই বিভিন্ন দিক। উহাদিগকে 'উপাদানের ক্ষেত্রে উৎপন্নের বিভিন্ন বিধি'ও (Laws of Returns to Factors) বলা যাইতে পারে। এই বিধিগুলির বা মূল পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধির তাৎপর্য হইল এইরূপ: প্রত্যেকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপাদানগুলির মধ্যে একটি কাম্য অনুপাত আছে। এই অনুপাত বজায় রাখিয়া যদি উৎপাদন করা যায় তবেই গড় উৎপাদন সর্বাধিক হইবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কাম্য অনুপাতে পৌছান যায় না, আবার অনেক ক্ষেত্রে পৌছান গেলেও উহা বজায় রাখা যায় না। ইহার কারণ হইল উপাদানগুলি প্রয়োজনীয় পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া- নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। যেমন, হঠাৎ যদি কোন দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যায় তবে যন্ত্রপাতি শ্রমিক কারখানার জমিজায়গা সবকিছুই প্রয়োজনমত বর্ধিত করা সম্ভব হয় না। তখন কারখানার আয়তন একই রাখিয়া অধিক পরিমাণ শ্রমিক ও কাঁচামালের সাহায্যে উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। কৃষির ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাড়ান সম্ভব হয় না বলিয়া বেশী বেশী শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হয়। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় সত্য, কিন্তু কখনও পায় ক্রমহ্রাসমান হারে, কখনও বা ক্রমবর্ধমান হারে এবং কখনও বা সমহারে।

কিন্তু সকল উপাদানেরই প্রয়োজনমত বৃদ্ধি যদি সম্ভব হইত তবে কি হইত? এক্ষেত্রেও আর এক শ্রেণীর উৎপন্নের বিধি কার্য করিত। ইহাদিগকে বলা হয় 'আয়তনের ক্ষেত্রে উৎপন্নের বিভিন্ন বিধি' (Laws of Returns to Scale),

কারণ এরূপ ক্ষেত্রে উৎপাদনের আয়তনই (scale of production) বৃদ্ধি করা হয়।

আয়তনের ক্ষেত্রেও উৎপন্নের বিধি তিন প্রকার—ক্রমবর্ধমান, ক্রমহ্রাসমান এবং সমহারে। উৎপাদনের আয়তন যতটা বৃদ্ধি করা হইল উৎপাদনের পরিমাণ যদি উহা অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পায় তবে উহাকে বলে ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন। যেমন, আয়তন দ্বিগুণ করিলে যদি উৎপন্ন দ্বিগুণের অধিক হয় তবে উৎপন্নের হার হইল ক্রমবর্ধমান। কিন্তু আয়তন দ্বিগুণ করা হইলেও উৎপন্ন যদি দ্বিগুণ অপেক্ষা কম হয় তবে উৎপন্নের হার হইল ক্রমহ্রাসমান। আবার আয়তন যতটা বাড়ান হইল উৎপন্ন যদি ঠিক সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তবে সমহারে উৎপাদন হইতেছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন, আয়তন যতটা বাড়ান হয় উৎপাদনের পরিমাণ ঠিক সেই হারে বৃদ্ধি পায় না কেন? ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে বৃহদায়তনে উৎপাদনের স্থবিধা-অস্থবিধার (advantages and disadvantages) মধ্যে। আয়তন বৃদ্ধি করিলে বৃহদায়তনে উৎপাদনের স্থবিধা (advantages of large-scale production) পাওয়া যায়। ফলে উৎপন্নের পরিমাণ সমানুপাতিক অপেক্ষা অধিক হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। কিন্তু স্থবিধার সংগেই জড়িত থাকে অস্থবিধা। এই অস্থবিধার দরুন উৎপন্নের পরিমাণ যতটা অধিক হইত ততটা হইতে পারে না।

আয়তন আরও বৃদ্ধি করা হইলে অস্থবিধার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত স্থবিধার পরিমাণ অস্থবিধা অপেক্ষা অধিক থাকে ততক্ষণ উৎপন্নের হার হয় ক্রমবর্ধমান। কিন্তু স্থবিধা ও অস্থবিধা সমান সমান হইলেই সমহারে উৎপন্নের বিধি ক্রিয়া করিতে থাকে।

ইহার পর যদি উৎপাদনের আয়তন আরও সম্প্রসারিত করা হয় তবে অস্থবিধার পরিমাণ হইবে স্থবিধা অপেক্ষা অধিক। ফলে উৎপন্ন ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

বৃহদায়তনে উৎপাদনের যে-সকল স্থবিধা-অস্থবিধার জন্য আয়তনের ক্ষেত্রে উৎপন্নের বিধিসমূহ কার্য করে তাহাদের সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে (৬৮-৭০ পৃষ্ঠা)।

৬

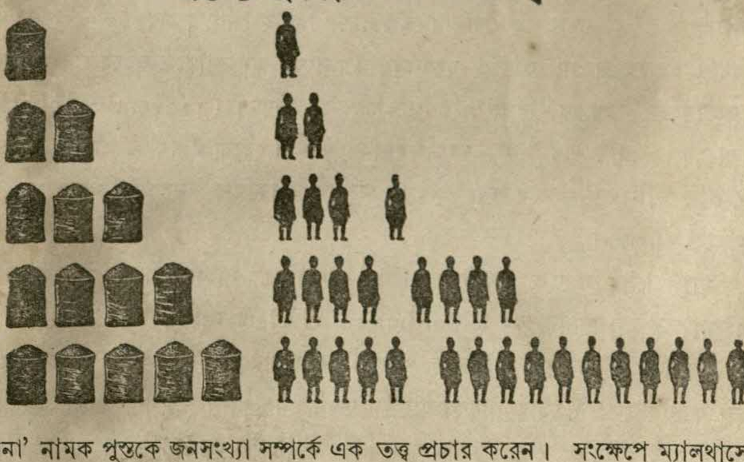
শ্রম
(Labour)

মাত্র প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য থাকিলেই চলে না, প্রকৃতির দানকে সম্পদে রূপান্তরিত করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য প্রয়োজন হয় মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা বা শ্রমের। এই শ্রমের পরিমাণ ও দক্ষতাই হইল দেশের অগ্রগতির অন্যতম সর্ত। দেশের শ্রমিকসংখ্যা প্রধানত নির্ভর করে মোট জনসংখ্যার উপর। মোট জনসংখ্যা অধিক হইলে শ্রমিকসংখ্যাও সাধারণত অধিক হইবে; জনসংখ্যা বাড়িতে কিংবা কমিতে থাকিলে শ্রমিকসংখ্যাও বাড়িবার কিংবা কমিবার দিকে ঝোঁক দেখা দিবে।

জনসংখ্যাতত্ত্ব—ক। ম্যালথাসের তত্ত্ব (Theories of Population—A. The Malthusian Theory)

দেশের পক্ষে জনসংখ্যার গুরুত্ব অনুভব করিয়া বহুদিন হইতেই পণ্ডিতদের মধ্যে ইহা লইয়া আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। দেড়শত বৎসরের উপর হইল টমাস্ রবার্ট ম্যালথাস (Malthus) নামক একজন ইংরাজ ধর্মযাজক 'জনসংখ্যা নীতির উপর

খাদ্য ও জনসংখ্যা - ম্যালথাসের তত্ত্ব



রচনা' নামক পুস্তকে জনসংখ্যা সম্পর্কে এক তত্ত্ব প্রচার করেন। সংক্ষেপে ম্যালথাসের বক্তব্য হইল এইরূপঃ প্রত্যেক দেশেই জনসংখ্যা এরূপ দ্রুতগতিতে বাড়ে যে ৩০-৩৫ বৎসরের মধ্যেই উহা দ্বিগুণ হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিতে (geometric progression)—অর্থাৎ, ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ··· এই হারে বাড়িতে থাকে। অপরদিকে দেশের খাদ্যের উৎপাদন এতটা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় না। উহা বৃদ্ধি পায় পাটীগাণিতিক প্রগতিতে

(arithmetical progression)—যথা, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি হারে। মন্থরগতিতে খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি পাইবার হেতু হইল কৃষিকার্যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা। সুতরাং দেখা যায় যে খাদ্যের উৎপাদনবৃদ্ধি জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত তাল রাখিতে পারে না। ফলে জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য-সরবরাহ কম হইয়া পড়ে।

জনসংখ্যার পক্ষে খাদ্য কম হইয়া পড়িলে তাহাকে জনাধিক্যের অবস্থা (over-population) বলা হয়। খাদ্যাভাবের জন্য তখন দুর্ভিক্ষ মহামারী শিশুমৃত্যু যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি দেখা দেয় এবং জনসংখ্যার একাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; মৃত্যুর ফলে অতিরিক্ত জনসংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় এখন আবার খাদ্যের যোগান জনসংখ্যার কাছে পর্যাপ্ত হয়। কিন্তু এখানেই সমস্যার সমাধান হয় না। জনসংখ্যা আবার খাদ্যোৎপাদনের তুলনায় অধিক মাত্রায় বাড়িয়া চলিতে থাকে এবং আবার রোগ অনাহার মহামারী প্রভৃতি আসিয়া জনসংখ্যা কমাইয়া উহাকে খাদ্য-সরবরাহের সমান করিয়া দেয়। মহামারী অনাহার যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায় (positive checks) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণের হাত হইতে রেহাই পাইতে হইলে—অর্থাৎ, মহামারী অনাহার দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দুঃখদুর্দশা এড়াইতে হইলে— মানুষকে স্বেচ্ছায় বেশী বয়সে বিবাহ করিয়া, অবস্থা ভাল না হইলে বিবাহ একেবারে না করিয়া সন্তানসন্ততির সংখ্যা কম রাখিতে হইবে। এই সকল স্বেচ্ছামূলক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকে প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণ (preventive checks) বলা হয়। প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে মহামারী অনাহার প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণকে রোধ করা সম্ভব। অন্যথায় প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ নির্মমভাবে কার্য করিতে থাকিবে।

ম্যালথাসের তত্ত্বকে একটি চক্রাকার রেখাচিত্রের সাহায্যে বুঝান যাইতে পারে। এইরূপ চক্র ম্যালথুসীয় চক্র (Malthusian Cycle) নামে অভিহিত। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার চক্রটি হইতে দেখা যাইতেছে, খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা হইতে সুরু করা হইলেও শীঘ্রই জনাধিক্য ঘটে। তখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপায় কার্য করিতে থাকে। উহার দ্বারা বর্ধিত জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া আবার খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য আসে। কিছুদিন পরেই কিন্তু আবার জনাধিক্য দেখা যায়।

নানাভাবে ম্যালথাসের এই মতবাদের সমালোচনা করা হইয়াছে। ম্যালথাস তাঁহার মতবাদ প্রচার করিবার পর দেখা যায় যে ব্রিটেন ও অন্যান্য উন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জীবনযাত্রার মান উন্নতিলাভ করিয়াছে। শিল্প-বিপ্লব,

উন্নত ধরনের যান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতি, যানবাহনের উন্নতি ও নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের ফলেই এই উন্নতি সাধিত হয়। অতএব বলা হয়, ম্যালথাস জনসংখ্যা সম্পর্কে যে হতাশাব্যঞ্জক অভিমত করিয়াছেন তাহা ভিত্তিহীন ও অতিরঞ্জিত।



ম্যালথাসের মতবাদের ত্রুটি : ম্যালথাসের মতবাদের নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের ফলে কৃষিকার্যের কলাকৌশলে সুদূরপ্রসারী উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই সকল কলাকৌশল প্রয়োগের সাহায্যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিকে স্থগিত রাখিয়া খাদ্যোৎপাদন বহুগুণে বর্ধিত করা সম্ভব। অতএব, খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতির সম্ভাবনা কম।

(২) ম্যালথাস মাত্র খাদ্য-সরবরাহের সহিত তুলনা করিয়া জনসংখ্যার সমস্যাকে বিচার করিয়াছেন। কিন্তু লোকের জীবনযাত্রার মান শুধু খাদ্যদ্রব্যের যোগানের উপরই নির্ভর করে না। ভোগের অন্যান্য দ্রব্য—যথা, শিল্পজাত দ্রব্য, সেবা প্রভৃতির সরবরাহের উপরও নির্ভর করে। ইহা ব্যতীত, সামগ্রিকভাবে দেশের জাতীয় আয় বা উৎপাদন অধিক হইলে অন্যান্য দেশে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্যাদি আমদানি করিয়া দেশের খাদ্যাভাব দূর করা সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইংলণ্ডের কথা উল্লেখ করা যায়। ইংলণ্ড প্রধানত তাহার শিল্পজাত দ্রব্য অন্যান্য দেশে রপ্তানি করিয়াই দেশের লোকের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে। সুতরাং মোট জাতীয় উৎপাদন ও উহার বণ্টনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জনসংখ্যার সমস্যার বিচার করিতে হইবে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় জাতীয় উৎপাদন অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি করিয়া উহাকে উপযুক্তভাবে সকলের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে লোকের অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটিবে।

(৩) মানুষের শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের ফলে জন্মের হার কমিতে থাকে। মানুষ তখন জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার জন্য বেশী বয়সে বিবাহ

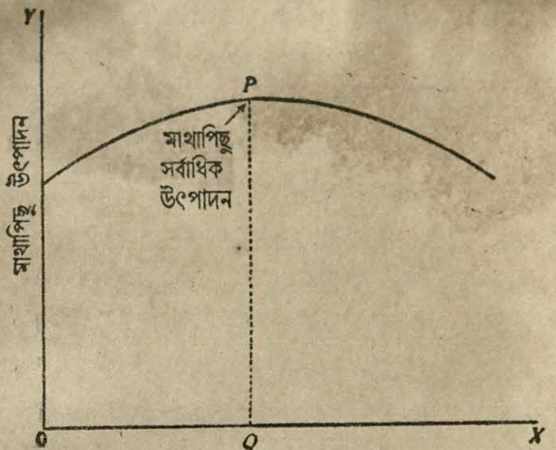
করিয়া সংসারকে ছোট রাখিতে চায়। আমাদের দেশে পূর্বে লোকে বাল্যাবস্থাতেই বিবাহ করিত। এখন শিক্ষিত যুবকগণ সংসার প্রতিপালনে সমর্থ না-হওয়া পর্যন্ত বিবাহ করিতে চাহে না। এই কারণে ইংলণ্ড ও অন্যান্য উন্নত পাশ্চাত্য দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধি অপেক্ষা জনসংখ্যাহ্রাসের আশংকা দেখা দিয়াছে। অতএব, জনসংখ্যা সকল সময়েই জ্যামিতিক প্রগতিতে দ্রুত বাড়িয়া চলিবে—ম্যালথাসের এই মতবাদকে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না।

ম্যালথাসের মতবাদের উপরি-উক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও এমন অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন যাঁহারা মনে করেন যে পৃথিবীর জনসংখ্যা যেভাবে বাড়িতেছে তাহাতে খাদ্যাভাব দেখা দিতে বাধ্য। এমনকি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ঘোষণা করিয়াছে যে সমগ্র পৃথিবীতে মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় বর্তমানে কমিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, তর্কবিতর্কের ভিতর না যাইয়াও আমরা বলিতে পারি যে ভারতের ন্যায় অনেক স্বল্পোন্নত দেশেই জনাধিক্য রহিয়াছে এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য যোগানের ব্যবস্থা অন্যতম প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

খ। আধুনিক তত্ত্ব—জনসংখ্যা ও জাতীয় আয় (B. The Modern Theory—Population and National Income)

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ জনসংখ্যার সমস্যাকে জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয়ের পটভূমিকায় বিচার করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে, কোন দেশের যে-পরিমাণ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও মূলধনের সংগতি থাকে তাহা সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাইতে হইলে নির্দিষ্ট জনসংখ্যার প্রয়োজন হয়। এই জনসংখ্যাকে ঐ দেশের পক্ষে 'কাম্য জনসংখ্যা' (optimum population) বলিয়া অভিহিত করা যায়। কারণ, ইহার ফলে দেশের উৎপাদনের হার ও মাথাপিছু জাতীয় আয় (*per capita* national income) সর্বাধিক হয়। জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কম হইলে দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও মূলধন যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না বলিয়া মাথাপিছু জাতীয় আয় সর্বাধিক হয় না। অপরদিকে আবার জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার অধিক হইলে মাথাপিছু জাতীয় আয় কমিয়া যায়, কারণ উৎপাদন যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহা অপেক্ষা অধিক হারে। একমাত্র জনসংখ্যা কাম্য অবস্থায় থাকিলেই দেশের উৎপাদন সর্বাধিক দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতে পারে এবং মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন বা আয় সর্বাধিক হয়।

বিষয়টিকে নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।



রেখাচিত্রটিতে দেখা যাইতেছে, জনসংখ্যা যে-পর্যন্ত না OQ পরিমাণ হয় সে-পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে মাথাপিছু উৎপাদন বাড়িয়াই চলে। অপরপক্ষে জনসংখ্যা OQ পরিমাণের অধিক হইলে মাথাপিছু উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে। যখন জনসংখ্যা OQ পরিমাণ হয় তখন মাথাপিছু উৎপাদন বা আয় QP সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়। অতএব, OQ পরিমাণ জনসংখ্যাই হইল কাম্য জনসংখ্যা।

এই মতবাদ অনুসারে যখন কোন দেশের জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কম থাকে তখন ঐ দেশটিকে জনবিরল (underpopulated) বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহার লক্ষণ হইল মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত না জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া যাইতেছে ততক্ষণ মাথাপিছু আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে। জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া গেলেই মাথাপিছু আয় কমিতে থাকিবে। তখন দেশে জনাধিক্য (overpopulated) ঘটিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে কাম্য জনসংখ্যার এই ধারণাকে বুঝান যাইতে পারে। ধরা যাউক, একটি নবাবিষ্কৃত দ্বীপে মাত্র ৫ জন লোক আছে এবং ঐ দ্বীপের মোট উৎপাদন হইল ১০০ কুইণ্টাল ধান। এখানে ধরা যাউক যে, ঐ ৫ জনই শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। সুতরাং দ্বীপটিতে মাথাপিছু উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় হইল ২০ কুইণ্টাল ধান। এখন লোকসংখ্যা বাড়িয়া যদি ৬ জন হয় এবং মোট উৎপাদন যদি ১১৪ কুইণ্টাল ধান হয় তবে মাথাপিছু উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় (১১৪ ÷ ৬ = ১৯ কুইণ্টাল) হ্রাস পাইতেছে। সুতরাং জনসংখ্যা কাম্য স্তরকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। অপরদিকে

জনসংখ্যা ৫ হইতে কমিয়া যদি ৪-এ দাঁড়ায়, তবে মোট উৎপাদন কমিয়া ৭৬ কুইণ্টালে পরিণত হইতে পারে। এক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক (২০ কুইণ্টাল) অপেক্ষা কম (৭৬ ÷ ৪ = ১৯ কুইণ্টাল) হইতেছে। মোট উৎপাদন ১০০ কুইণ্টাল হইতে ৭৬ কুইণ্টালে কমিবার কারণ হইল যে ৪ জন লোক ঐ দ্বীপের সমস্ত জমি ভালভাবে চাষ করিতে পারে না। ইহার জন্য ঠিক ৫ জন লোকই দরকার। সুতরাং ৫ জনই ঐ দ্বীপের কাম্য জনসংখ্যা। ইহাতেই মাথাপিছু আয় সর্বাধিক (আমাদের উদাহরণে ২০ কুইণ্টাল) হয়।

সমালোচনা : কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বেরও বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে ইহা একটি তত্ত্বগত ধারণা মাত্র, বাস্তবে ইহাকে প্রয়োগ করা কঠিন। কোন দেশের কাম্য জনসংখ্যা কি, তাহা হিসাব করিয়া বলা যায় না। ইহা ছাড়া উৎপাদন-পদ্ধতি, মূলধন প্রভৃতিও পরিবর্তনশীল। এই সকল বিষয়ের পরিবর্তনের ফলে কাম্য জনসংখ্যাও পরিবর্তিত হয়। যেমন, দেশের মধ্যে যদি নূতন নূতন খনির সন্ধান পাওয়া যায় তবে পূর্বের কাম্য জনসংখ্যা আর কাম্য থাকিবে না। কারণ, এখন জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অল্প হইয়া পড়িবে।

তবে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব শিখাইয়াছে যে দেশের জনসংখ্যাকে সামগ্রিক উৎপাদনের সহিত তুলনা করিয়াই জনসংখ্যার সমস্যা বিচার করিতে হইবে। দেশের উৎপাদনের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ করিতে পারিলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও আশংকার কারণ থাকে না। উপরন্তু, দেশের উন্নতি হইতেছে কি না, তাহা আমরা মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ হইতে কতকটা বুঝিতে পারি।

শ্রমের যোগান (Supply of Labour)

কোন দেশের শ্রমের যোগান তিনটি জিনিসের উপর নির্ভর করে—(১) জনসংখ্যা, (২) শ্রমিকের কার্যের সময় এবং (৩) শ্রমিকের দক্ষতা।

১। জনসংখ্যা : জনসংখ্যা যত অধিক হইবে শ্রমের যোগানের সম্ভাবনাও তত অধিক হইবে। জনসংখ্যা কম বলিয়া অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় নূতন দেশে শ্রমিকসংখ্যাও অল্প। অপরদিকে ভারতের জনসংখ্যা অধিক বলিয়া শ্রমের যোগানও অধিক। জনসংখ্যার আয়তন দুইটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়—(ক) জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার এবং (খ) স্থানান্তরগমন (migration)। স্থানান্তরগমন বলিতে বুঝায় এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমন। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই বিদেশীদের প্রবেশ ও বসবাস সম্পর্কে নানা প্রকার বাধানিষেধ আরোপ করে; সুতরাং স্থানান্তরগমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে। অতএব বলা যায়, জনসংখ্যার আয়তন প্রধানত জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

শ্রমের যোগান পরিমাপ করিবার সময় মোট জনসংখ্যাকে হিসাবের মধ্যে ধরিলে ভুল হইবে। জনসংখ্যার সমগ্রটাই উৎপাদনশীল কার্যে ব্যাপৃত থাকে না। একেবারে

শিশু এবং অত্যধিক বৃদ্ধদের শ্রমিকশ্রেণীর বহির্ভূত বলিয়া ধরা হয়। আমাদের দেশে ১৫ বৎসর হইতে ৫৫ বৎসর বয়স্কদের শ্রমকারী জনসংখ্যা বলিয়া ধরা হয়। বিগত দুই জনগণনার হিসাব অনুসারে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগের কিছু বেশী লোক এই পর্যায়ে পড়িত। অবশ্য শ্রমের যোগান হিসাবের সময় যে-সকল স্ত্রীলোক গৃহে পরিবারের সেবাযত্ন প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বাদ দেওয়া হয়।

২। **কার্যের সময়ঃ** শ্রমশীল লোক সপ্তাহে বা দৈনিক কত ঘণ্টা খাটে তাহার উপরও শ্রমের যোগান নির্ভর করে। যেমন, দুইটি দেশের শ্রমিকসংখ্যা যদি এক হয় কিন্তু যদি প্রথম দেশে সাপ্তাহিক ৪০ ঘণ্টা এবং দ্বিতীয় দেশে সাপ্তাহিক ৪৮ ঘণ্টা শ্রমের নিয়ম প্রবর্তিত থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় দেশের শ্রমের মোট যোগান প্রথম দেশ অপেক্ষা অধিক হইবে। বর্তমানে প্রায় সকল সভ্য দেশেই শ্রমের সময় ও ছুটির দিন আইন করিয়া স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রমের সময় অত্যধিক হইলে পরিশ্রান্ত শ্রমিকের কার্যের পরিমাণ কমিয়া যায়। আমাদের দেশে কারখানায় প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের সপ্তাহে কার্য করিবার সময় ৪৮ ঘণ্টা স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৪ বৎসর হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক শ্রমিকদের কারখানায় দৈনিক ৪½ ঘণ্টার বেশী খাটান যায় না।

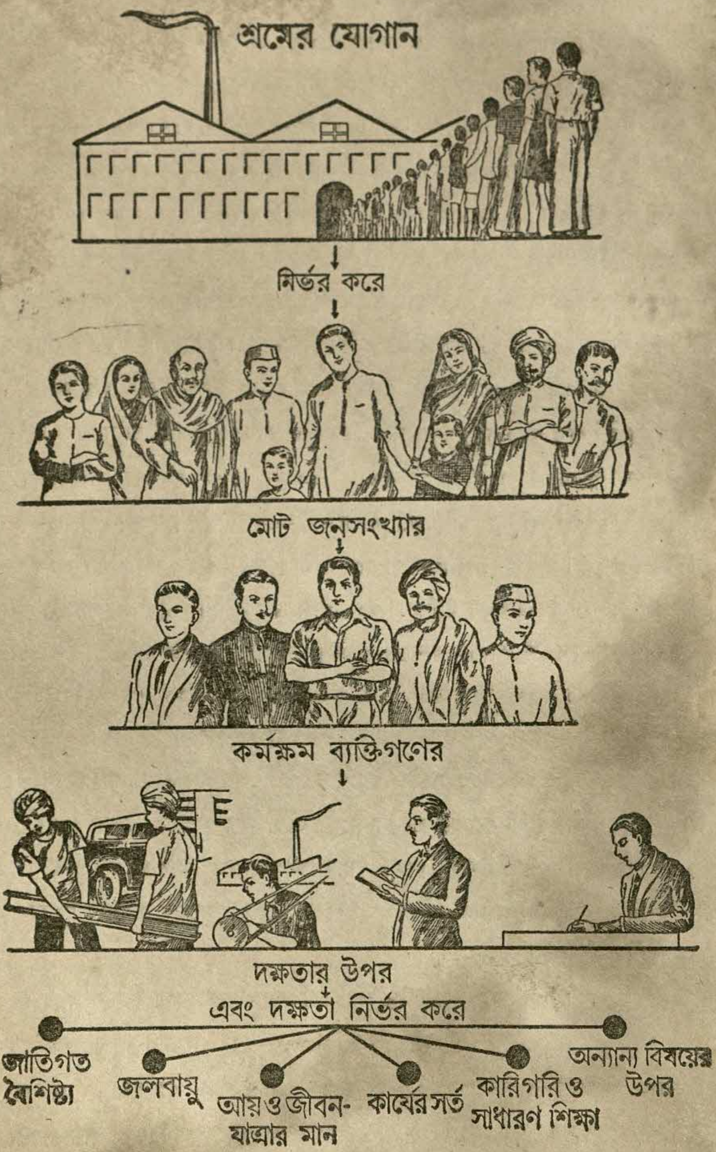
৩। **শ্রমিকের দক্ষতাঃ** শ্রমিকের দক্ষতা বলিতে বুঝায় শ্রমিকের উৎপাদন-শীলতা বা কার্য সম্পাদন করিবার ক্ষমতা। যেমন, বলা হয় যে ল্যাংকাশায়ারের কাপড়ের কলে একজন শ্রমিক ভারতের কাপড়ের কলে নিযুক্ত ছয় জন শ্রমিকের সমান কাজ করিতে পারে। অর্থাৎ, ল্যাংকাশায়ারের শ্রমিকের দক্ষতা ভারতীয় শ্রমিকের ছয় গুণ। আবার বলা হয়, একজন মার্কিন কয়লাখনি-শ্রমিক ভারতীয় কয়লাখনি-শ্রমিকের পাঁচ গুণ অধিক কয়লা উত্তোলন করিতে সমর্থ। অর্থাৎ, ঐ শ্রেণীর মার্কিন শ্রমিকের দক্ষতা ভারতীয় শ্রমিকের পাঁচ গুণ। তবে এইভাবে শ্রমিকের দক্ষতা বিচারের সময় দেখিতে হইবে যে যন্ত্রপাতি, পরিচালনা ইত্যাদি একই প্রকারের কি না। যাহা হউক, ইহা সত্য যে কোন বিশেষ দেশে শ্রমের যোগান শ্রমিকের দক্ষতার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। যেমন, দুইটি দেশের শ্রমিকসংখ্যা এক হইতে পারে, কিন্তু প্রথম দেশটির তুলনায় দ্বিতীয় দেশটির শ্রমিকদের দক্ষতা যদি অপেক্ষাকৃত অধিক হয় তবে দ্বিতীয় দেশটির শ্রমের যোগান অধিক হইবে। কারণ, দক্ষতা অধিক হওয়ায় দ্বিতীয় দেশে উৎপাদন অধিক হইবে।

শ্রমিকের দক্ষতা মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।

ক। জাতিগত বৈশিষ্ট্য (Racial Qualities)ঃ অনেক সময় বলা হয় যে দৈহিক শক্তি ও মানসিক উৎকর্ষ হইল সম্পূর্ণভাবে জাতিগত বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এক জাতির লোক অপর এক জাতির লোক হইতে স্বাভাবিক কারণেই অধিক দক্ষ হয়।

কিন্তু এ-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইলে সকল জাতির লোকই দক্ষ হইয়া উঠিতে পারে।

খ। জলবায়ু (Climate): শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতার উপর দেশের জলবায়ুরও বিশেষ প্রভাব থাকে। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া শ্রম করিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা



অনুকূল। অতিশয় গ্রীষ্মতাপ ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া সহজেই শ্রমিকদের মধ্যে ক্লান্তি ও অবসাদের ভাব আনিয়া দেয়। এদিক হইতে ভারতের জলবায়ু শ্রমদক্ষতাকে অনেকটা ব্যাহত করে। তবে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এই অসুবিধা আর একেবারে দূরপনেয় নয়। যেমন, তাপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সাহায্যে কলকারখানাগুলিতে গ্রীষ্মতাপের অসহনীয় অবস্থার অবসান করা যাইতে পারে।

গ। আয় ও জীবনযাত্রার মান (Income and Standard of Living): শ্রমিকের দক্ষতার উপর তাহার আয়ের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। আয়ের পরিমাণ দ্বারা জীবনযাত্রার মান নির্ধারিত হয়। অন্নবস্ত্র আশ্রয় এবং কিছুটা আমোদপ্রমোদের জন্য আয় পর্যাপ্ত না হইলে মানুষের কর্মশক্তি ও উৎপাদনক্ষমতা পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় না। ভারতের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকের আয় সুস্থ ও সবল জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তবে সম্প্রতি এ-বিষয়ের প্রতি কিছু দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে এবং সমাজসেবামূলক কার্যাদি (social services) প্রসারের জন্য সরকার অধিক ব্যয় করিতেছে।

ঘ। কার্যের সর্তাবলী (Working Conditions): যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ও সর্তাধীনে শ্রমিক কার্য করে তাহার দ্বারাও শ্রমিকের দক্ষতা প্রভাবান্বিত হয়। কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশ ভাল হইলে, কার্যের সময় অতিরিক্ত না হইলে, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক মধুর হইলে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়া যায়। এইজন্যই কলকারখানায় প্রচুর আলোবাতাস, পানীয় জল, স্নানাগার, স্বল্প দামে পুষ্টিকর খাদ্য-সরবরাহ, চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সংগে সংগে শ্রমের সময় যাহাতে অত্যধিক না হয়, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যাহাতে বিরোধ লাগিয়াই না থাকে তাহার দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। ভারতে এই সকল দিক হইতে অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা হইলেও অনেক কলকারখানাতেই এখনও আভ্যন্তরীণ পরিবেশ শ্রমদক্ষতার পক্ষে অনুকূল নহে।

ঙ। সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা (General and Technical Education): শিক্ষার উপর শ্রমিকের দক্ষতা অনেকখানি নির্ভর করে। সাধারণ শিক্ষার ফলে শ্রমিকদের বুদ্ধিমত্তা ও দৃষ্টিভংগি প্রসারিত হয়। এই সাধারণ শিক্ষার উপর ভিত্তি করিয়াই অন্যান্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। কারিগরি দক্ষতা অর্জন করিতে হইলে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন। বস্তুত, ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পপ্রসারের অপরিহার্য সর্ত হইল কারিগরি শিক্ষার প্রসার।

চ। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের উৎকর্ষ (Efficiency of Other Factors): উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান উৎকৃষ্ট ধরনের হইলেও শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা

বৃদ্ধি পায়। কৃষির ক্ষেত্রে জমি যদি উর্বর হয় তবে মাথাপিছু উৎপাদন অধিক হইবে। অনুরূপভাবে, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল উৎকৃষ্ট ধরনের হইলে শ্রমিকের উৎপাদনও অধিক এবং উৎকৃষ্ট হইবে। এদিক হইতে ভারতীয় শ্রমিককে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পরিচালক বা কর্মকর্তার দক্ষতার উপরও শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভরশীল। পরিচালকের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও উদার দৃষ্টিভংগি থাকিলে শ্রমিকের উৎপাদন অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। উন্নত দেশগুলিতে যে-স্বল্প ব্যয়ে অধিক উৎপাদন হয় তাহার মূলে রহিয়াছে এই সুদক্ষ পরিচালনা। আমাদের দেশে শিল্প-পরিচালনার মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত শ্রমবিভাগের ফলেও শ্রমিকের দক্ষতা বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়।

ছ। শ্রমবিভাগ যত সম্প্রসারিত হইবে শ্রমিকের দক্ষতাও তত বৃদ্ধি পাইবে। সকলেই সকল কার্যের উপযুক্ত নয়। যে যে-কাজের উপযুক্ত তাহাতে নিযুক্ত থাকিলেই সে দক্ষতা অর্জন করিতে পারে। এ-সম্বন্ধে শ্রমবিভাগের প্রসংগে আবার আলোচনা করা হইতেছে।

জ। পরিশেষে, শ্রমিকের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রেরণা যোগাইতে হইবে। ইহা করিতে হইলে কর্মক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৭

মূলধন
(Capital)

আমরা দেখিয়াছি যে অর্থবিদ্যায় উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামকেই মূলধন বলা হয়। ইহাও বলা হইয়াছে, মূলধন অতীত শ্রমের ফল এবং অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয় (৩৩ পৃষ্ঠা)। এইজন্য মূলধনকে 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান' ('produced means of production') বলিয়াই বর্ণনা করা হয়। আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যায়, যে-সম্পদ সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত না হইয়া পুনরায় উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত হয় তাহাকেই মূলধন বলে—যেমন, যন্ত্রপাতি গরু-লাঙল বীজ-সার ইত্যাদি।

এখানে পুনরায় উল্লেখ করা যাইতে পারে যে একই দ্রব্য ব্যবহারের পার্থক্য অনুসারে মূলধন কিংবা ভোগ্যদ্রব্য হইতে পারে। যেমন, ডাক্তার যখন তাঁহার মোটরগাড়ী চড়িয়া রোগী দেখিবার জন্য বাহির হন তখন উহা মূলধন ; কিন্তু তিনি যখন ঐ গাড়ীতে করিয়া বেড়াইতে বাহির হন তখন উহা ভোগ্যদ্রব্য। কয়লা যখন কারখানায় ব্যবহৃত হয় তখন উহা মূলধন ; কিন্তু বাড়ীতে রান্নার জন্য যখন কয়লা ব্যবহার করা হয় তখন উহা ভোগ্যদ্রব্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উপরের সংজ্ঞা অনুসারে মূলধন বলিতে বাস্তব মূলধন বা মূলধন দ্রব্যকেই (capital goods) বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে, অর্থবিদ্যায় উৎপাদনের উপাদান হিসাবে মূলধনকে প্রকৃত মূলধনের অর্থেই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই বাস্তব মূলধন ছাড়া অনেক সময় আবার টাকাকড়ি এবং শেয়ার বণ্ড প্রভৃতি ঋণপত্রকেও মূলধন বলিয়া অভিহিত করা হয়। বলা হয় যে মূলধন তিন প্রকারের হইতে পারে—(১) বাস্তব মূলধন, (২) আর্থিক মূলধন এবং (৩) ঋণ মূলধন। এখন দেখা যাউক, কি অর্থে টাকাকড়ি বা ঋণপত্রকে মূলধন বলা হয় এবং বাস্তব মূলধনের সহিত উহাদের পার্থক্য কি।

বাস্তব মূলধন (Concrete or Real Capital) : কারখানার বাড়ীঘর, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, ব্যবসায়ীর মজুত মাল প্রভৃতি হইল বাস্তব মূলধন। ইহারা উৎপাদন বা ব্যবসায়ে নিবদ্ধ থাকে বলিয়া ইহাদিগকে ব্যবসায়ীর মূলধনও (Trade Capital) বলা হয়।

সমাজের দিক হইতে উপরি-উক্ত দ্রব্যাদি ছাড়া রাস্তাঘাট দোকানপাট যানবাহন বন্দর পোতাশ্রয় প্রভৃতিকেও বাস্তব মূলধন বলিয়া গণ্য করা হয়, কারণ ইহারাও সমাজের উৎপাদনকার্যে সহায়তা করে।

আর্থিক মূলধন (Money Capital) : অনেককেই টাকাকড়িকে মূলধন বলিয়া অভিহিত করিতে শুনা যায়। এইভাবে টাকাকড়িকে মূলধন বলিয়া গণ্য করিবার কারণ যে ব্যক্তিবিশেষ ইচ্ছামত টাকাকড়িকে বাস্তব মূলধনে রূপান্তরিত করিতে পারে। এই কারণেই ব্যবসায়ী বা হিসাবপরীক্ষক (accountant) টাকাকড়িকে মূলধন বলিয়া গণ্য করে। যেমন, কোন ব্যবসায়ীর হাতে ৫০ হাজার টাকা থাকিলে সে ঐ টাকা দিয়া যে-কোন সময় যন্ত্রপাতি কাঁচামাল প্রভৃতি ক্রয় করিতে পারে। হিসাবপরীক্ষক যখন ব্যবসায়ের মূলধনের হিসাব করে তখন টাকাকড়িতেই করে। আবার লোকে যখন সঞ্চয় করিয়া বিনিয়োগকার্যে লগ্নী করে তখন টাকাকড়ির অংকেই করে। এইভাবে টাকাকড়ির মাধ্যমে মূলধনের ক্রয় ও হিসাব করা হইলে এবং টাকাকড়ির সঞ্চয় বাস্তব মূলধন-গঠনে সহায়তা করিলেও টাকাকড়ি উৎপাদনের কোন উপাদান নহে এবং উহাকে প্রকৃতপক্ষে মূলধন বলিয়া গণ্য করা যায় না। সমাজের দিক হইতে বিচার করিলে টাকাকড়িকে কোন প্রকারেই মূলধন আখ্যা দেওয়া যায় না। টাকাকড়ি যদি সমাজের দিক হইতে মূলধন হইত তবে মাত্র নোট ছাপাইয়াই যে-কোন দেশ ধনী হইতে পারিত, উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য বাস্তব মূলধন বাড়াইবার কোন প্রয়োজনই হইত না। বাস্তব মূলধন গঠন করিয়া জিনিসপত্রের উৎপাদন না বাড়াইয়া শুধু টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়াইয়া গেলে মাত্র দামই বৃদ্ধি পায়।

ঋণ মূলধন (Loan Capital) : শেয়ার বণ্ড সরকারী ঋণপত্র (যেমন, সেভিংস্ সার্টিফিকেট) ইত্যাদিকে ব্যক্তির দিক হইতে মূলধন বলিয়া গণ্য করা যায়, কারণ এগুলি হইতে তাহার আয় হয়। এগুলি বিক্রয় করিয়া সে প্রকৃত মূলধন-দ্রব্যাদিও ক্রয় করিতে পারে। সমাজের দিক হইতে এই সকল শেয়ার বণ্ড প্রভৃতি কিন্তু মূলধন নহে, কারণ এগুলি দ্বারা সমাজের কোন উৎপাদনকার্য চলে না।

অতএব, ব্যক্তির দিক হইতে বাস্তব মূলধন, টাকাকড়ি এবং ঋণপত্র সকলই মূলধন বলিয়া গণ্য হইলেও, সমাজের দিক হইতে বাস্তব মূলধনই একমাত্র মূলধন।

সম্পদ ও মূলধন (Wealth and Capital)

এখন আমরা সামাজিক ও ব্যক্তিগত এই দুইটি দিক হইতে মূলধন ও সম্পদের মধ্যে পার্থক্য বিচার করিতে পারি। সমাজের দিক হইতে সকল মূলধনই সম্পদ, কিন্তু সকল সম্পদই মূলধন নয়। যখন কোন সম্পদ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন ঐ সম্পদ মূলধন নয়। যেমন, পূর্বের উদাহরণ অনুসারে বাড়ীতে রান্নার জন্য যখন কয়লা ব্যবহৃত হয় তখন ঐ 'সম্পদ' ভোগ্যদ্রব্য, মূলধন নয় ; কিন্তু কারখানায় যখন উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কয়লা ব্যবহার করা হয় তখন উহা মূলধন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন সম্পদ মূলধন পর্যায়ে পড়িবে কি না তাহা নির্ভর করে কোন্ উদ্দেশ্যে ঐ সম্পদ ব্যবহৃত হইতেছে তাহার উপর। সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত হইলে ঐ সম্পদকে মূলধন বলিয়া ধরা হয় না; পুনরায় অন্য দ্রব্যাদি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলে তবেই ঐ সম্পদ মূলধন বলিয়া গণ্য হয়।

এখানে আরও বলা যাইতে পারে, ব্যক্তির দিক হইতে এরূপ সকল জিনিসই মূলধন যাহা দ্বারা কোন-না-কোন ভাবে তাহার আয় হয়। যেমন, টাকাকড়ি ধার দিয়া কোন ব্যক্তি আয় করিতে পারে। সুতরাং টাকাকড়ি তাহার নিকট সম্পদ এবং মূলধন উভয়ই; কিন্তু সমাজের দিক হইতে টাকাকড়ি সম্পদ কিংবা মূলধন কোনটাই নয়।

মূলধন ও জমি (Capital and Land)

মূলধন ও জমির মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না তাহার আলোচনাও করা যাইতে পারে। মূলধনের সহিত জমির অনেক সাদৃশ্য আছে। মূলধন যেমন সম্পদ জমিও তেমনি সম্পদ; মূলধন যেমন অন্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় জমিও তেমনি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু জমি ও মূলধনের মধ্যে পার্থক্যও রহিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, মানুষ নিজের পরিশ্রমের দ্বারা মূলধন সৃষ্টি করে। জমির বেলায় কিন্তু একথা খাটে না। জমি প্রকৃতির দান, মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা সৃষ্ট নহে। ইহা ছাড়া জমির যোগানও অপরিবর্তনশীল—অর্থাৎ, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি করা যায় না। অপরপক্ষে, মূলধনের পরিমাণ মানুষ নিজের চেষ্টায় বাড়াইয়া লইতে পারে। এই সকল পার্থক্যের জন্যই জমিকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু জমির মোট পরিমাণ বৃদ্ধি করা না গেলেও উহার উৎপাদিকাশক্তিকে সেচ-ব্যবস্থা, সার প্রয়োগ প্রভৃতির দ্বারা বাড়ান যাইতে পারে। জমির এই বর্ধিত উৎপাদিকাশক্তিকে মূলধন এবং উহার আয়কে সুদ বা মূলধনের আয় হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে।

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ (Classifications of Capital)

উল্লেখ করা হইয়াছে যে—(ক) বাস্তব মূলধন, (খ) আর্থিক মূলধন এবং (গ) ঋণ মূলধন—এই তিন প্রকারের মূলধনের কথা বলা হয়। নিম্নলিখিত কয়েকভাবেও মূলধনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়:

ক। **ব্যক্তিগত, সামগ্রিক এবং জাতীয় মূলধন (Private, Collective and National Capital) ঃ** ব্যক্তিগত মালিকানায় যে-মূলধন থাকে এবং যাহা হইতে ব্যক্তি আয় ভোগ করে তাহাকে ব্যক্তিগত মূলধন বলে; অপরদিকে সমাজের বা জনসাধারণের যে-মূলধন থাকে তাহাকে সামগ্রিক মূলধন বলা হয়। সমগ্র ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক মূলধন মিলিয়া হইল জাতীয় মূলধন।

খ। স্থায়ী ও চলতি মূলধন (Fixed and Circulating Capital) : যে-মূলধন উৎপাদনকার্যে একবার ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হইয়া যায় না তাহাকে স্থায়ী মূলধন বলে—যেমন, কল কারখানার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। অপরদিকে কাঁচামাল জ্বালানি বীজ সার প্রভৃতির ন্যায় যে-মূলধনের কার্য একবার ব্যবহারেই শেষ হইয়া যায় তাহাকে চলতি মূলধন বলে। চলতি মূলধন পৌনঃপুনিক মূলধন (recurring capital) নামেও অভিহিত হয়, কারণ ইহা বারবার আবর্তন করিতে থাকে। যেমন, বীজ হইতে ধান উৎপাদন করা হইল ; এখন এই উৎপন্ন ধান হইতে কিছু অংশ আবার বীজ বা মূলধন হিসাবে রাখিয়া দিতে হইবে। উৎপাদনকার্যে একবার মাত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়া চলতি মূলধন একেবারেই ফেরত পাওয়া যায়, কিন্তু স্থায়ী মূলধন ফেরত পাওয়া যায় দীর্ঘকাল ধরিয়া। তাঁতী কাপড় বুনিবার জন্য যখন সূতা ক্রয় করে তখন সে আশা করে যে একবার কাপড় বিক্রীত হইলেই উহার দাম ফেরত পাইবে। কিন্তু যে-অর্থ ব্যয় করিয়া সে তাঁত বসায় তাহা ফেরত পাইবার আশা করে কাপড় কয়েকবার ধরিয়া উৎপন্ন ও বিক্রীত হইলে।

গ। নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ মূলধন (Sunk or Specific and Floating or Non-Specific Capital) : নিবদ্ধ মূলধন হইল তাহাই যাহা বিশেষ একপ্রকার উৎপাদনকার্যেই নিবদ্ধ থাকে—যাহাকে অন্য কোনপ্রকার উৎপাদনকার্যে সহজে লাগান যায় না। উদাহরণস্বরূপ, রেল-ইঞ্জিনের উল্লেখ করা যাইতে পারে ; ইহা মাত্র একপ্রকার উৎপাদনকার্যেই ব্যবহার্য। আবার ক্যামেরা দিয়া শুধু ছবি তোলাই যায়। কিন্তু কয়লা বা আর্থিক মূলধন বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনকার্যে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং ইহারা হইল অনিবদ্ধ মূলধনের উদাহরণ।

মূলধনের কার্যাবলী (Functions of Capital)

মূলধনের প্রাথমিক কার্য হইল শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করা। যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূলধন-দ্রব্যের সাহায্যে উৎপাদন করিলে শ্রমিক পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং উৎকৃষ্টতর দ্রব্যাদির উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। দুই-একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি বুঝা যাইবে। ধরা যাউক, ২০ মাইল দূরে ১০০ কুইন্টাল দ্রব্য লইয়া যাইতে হইবে। একজন মোটরলরী-চালক লরী চালাইয়া এক ঘণ্টার মধ্যে ঐ দ্রব্য লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। কিন্তু মোটরলরী ব্যবহার না করিয়া শুধু শ্রমিকের সাহায্যে এই কার্য করিতে গেলে বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে এবং সময়ও অধিক লাগিবে। সুতরাং শ্রমের সহিত মূলধন—অর্থাৎ, মোটরলরী জুড়িয়া দেওয়ায় কাজ অতি দ্রুত ও অল্প পরিশ্রমে সম্পাদিত হইতেছে। আবার একজন লোক সেলাই এর কলের দ্বারা যত সেলাই করিতে পারে খালি হাতে তাহা পারে না। সুতরাং দেশে মূলধন যত বৃদ্ধি পাইবে জাতীয়

উৎপাদন বা জাতীয় আয়ও তত বাড়িয়া যাইবে। বর্তমানে ভারতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও যে উৎপাদন কম তাহার অন্যতম কারণ হইল মূলধনের অপ্রাচুর্য।

মোট উৎপাদন আর একটি কারণেও বৃদ্ধি পায়। ইহা হইল সূক্ষ্মতর শ্রমবিভাগ। শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদন-পদ্ধতি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়। বিভিন্ন অংশের কাজের জন্য যতই যন্ত্রপাতি নিয়োগ করা হয় ততই উৎপাদন বৃদ্ধি হয় এবং উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। উদাহরণস্বরূপ, বাটার কারখানায় জুতা তৈয়ারির কাজ অনেকগুলি বিভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক বিভাগের কাজের জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলে স্বল্প ব্যয়ে জুতার উৎপাদনও অধিক হয়। মূলধনের ব্যবহার যতই বাড়িতে থাকে, শ্রমবিভাগ বা বিশেষীকরণ (specialisation) ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হয়।

মূলধন উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখিতে সাহায্য করে। কোন দ্রব্য উৎপাদিত হইয়া বাজারে বিক্রয় হইতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। ইতিমধ্যে শ্রমিকদের জীবনধারণের জন্য মজুরি না দেওয়া হইলে উৎপাদনকার্য অব্যাহতভাবে চলিতে পারে না। উৎপাদক উৎপাদনের সময় মূলধনের সাহায্যে শ্রমিকদের অন্নবস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে এবং পরে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে উহা পূরণ করিয়া লয়।

পরিশেষে, উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহকেও মূলধনের অন্যতম কার্য বলিয়া নির্দেশ করা যায়। উৎপাদনের জন্য কাঁচমাল এই মূলধনের সাহায্যেই ক্রয় করা হইয়া থাকে।

মূলধন-গঠন (Capital Formation)

আমরা দেখিয়াছি যে উৎপাদনের উপাদান হিসাবে যাহা মূলধন বলিয়া গণ্য তাহা হইল কলকারখানা বাড়ীঘর রাস্তাঘাট যানবাহন ইত্যাদির ন্যায় বাস্তব মূলধন। এই বাস্তব মূলধন গড়িয়া তোলাকেই বলা হয় মূলধন-গঠন (Capital Formation)। দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকিলেও বাস্তব মূলধনের অভাবে উৎপাদনের পরিমাণ স্বল্প হইতে বাধ্য। যেমন, আমাদের দেশে যথেষ্ট প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য আছে ; জনসংখ্যা বিপুল বলিয়া শ্রমিকের যোগানও পর্যাপ্ত। কিন্তু বাস্তব মূলধনের অভাবের দরুন আমাদের উৎপাদনের পরিমাণ উন্নত দেশসমূহের তুলনায় অনেক কম এবং ফলে আমরা দরিদ্রই রহিয়া গিয়াছি।

মূলধন-গঠনের প্রথম স্তর সঞ্চয় (saving)। সুতরাং বর্তমান আয়ের সবটা ভোগ না করিয়া কিছুটা ভবিষ্যৎ উৎপাদনের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ইহার পর ঐ সঞ্চয়কে যন্ত্রপাতি কলকারখানা বাড়ীঘর রাস্তাঘাট ইত্যাদি বাস্তব মূলধন-গঠনে নিয়োগ করিতে হইবে। ঐ সঞ্চয় এবং বাস্তব মূলধন-গঠনে উহার নিয়োগ যতই করা যাইবে ততই দেশে উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিয়া জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে।

বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প
(Large- and Small-scale Industries)

বর্তমান যুগ একদিকে যেমন যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনার যুগ, অন্যদিকে আবার তেমনি বৃহদায়তন শিল্পের যুগ। বস্তুত, সকল ক্ষেত্রে শিল্পবাণিজ্য যদি ক্ষুদ্রায়তনেই পরিচালনা করা হইত তবে ব্যবসায় সংগঠনের রূপ হিসাবে একমালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার এবং সমবায়ের অস্তিত্বই লক্ষ্য করা যাইত—যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনার উদ্ভব ঘটিত না।

বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভবের মূলে আছে তিনটি কারণ—(ক) শ্রমবিভাগ, (খ) যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং (গ) বিক্রয়-বাজারের প্রসার।

শ্রমবিভাগ (Division of Labour)

শ্রমবিভাগ প্রথমে শুরু হয় পেশা বা কর্মবিভাগ হিসাবে। আদিমতম যুগে কর্মবিভাগ বলিয়া কিছু ছিল না। ভ্রাম্যমাণ মানবগোষ্ঠীর সকলে মিলিয়া পশুপক্ষী শিকার ও ফলমূল আহরণ করিয়া জীবনধারণ করিত। তাহার পর কৃষিকার্য স্থুরু ও গ্রামীণ ব্যবস্থার উদ্ভব হইলে ধীরে ধীরে শ্রমবিভাগ দেখা দিল। কতক লোক মাত্র কৃষিকার্যেই নিযুক্ত রহিল, আবার কতক লোক সংগে সংগে অন্যান্য পণ্যও উৎপাদন করিতে লাগিল। এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ ক্রমে কৃষিকার্য ছাড়িয়া তাহাদের বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনেই সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করিল। যেমন, যে-ব্যক্তি লাঙল তৈয়ারি করিত সে শুধু লাঙল তৈয়ারিতেই নিযুক্ত রহিল। এইভাবে যে পেশাগত বিভিন্নতা বা কর্মবিভাগ শুরু হইল সমাজের ক্রমবিকাশের সংগে সংগে তাহা অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতে লাগিল। ফলে একদিন গড়িয়া উঠিল অসংখ্য পেশার ভিত্তিতে বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থা। বর্তমান দিনে কেহই তাহার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য স্বয়ং উৎপাদন করে না। ইহার পরিবর্তে সাধারণত একটিমাত্র পেশা অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জনে নিযুক্ত থাকে এবং অর্জিত অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক মাত্র শিক্ষকতার কার্যেই নিযুক্ত থাকেন এবং ইহার বিনিময়ে যে-অর্থ পান তাহা দিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করেন।

কিন্তু বিভিন্ন পেশায় উৎপাদনকার্যের বিভাগই শ্রমবিভাগের শেষ কথা নয়। শ্রমবিভাগ আরও অগ্রসর হইয়াছে। বর্তমানে প্রত্যেকটি পেশাও আবার বিভিন্ন অংশ বা প্রক্রিয়ায় (processes) বিভক্ত। পূর্বে চিকিৎসককে—যেমন, কবিরাজ বা হকিমকে—রোগনির্ণয়, ঔষধপত্র তৈয়ারি, ঔষধপত্র প্রদান সকল কার্যই স্বয়ং সম্পাদন করিতে হইত। বর্তমানে চিকিৎসক রোগনির্ণয় করিয়া ব্যবস্থাপত্র (prescription)

লিখিয়া দিয়াই ক্ষান্ত। ঔষধ তৈয়ারি ও ঔষধ প্রদানের ভার হইল অন্যান্য শ্রেণীর লোকের উপর।* জুতা তৈয়ারির উদাহরণও লওয়া যাইতে পারে। পূর্বে জুতা তৈয়ারির জন্য চর্মকারকে চর্ম সংগ্রহ করিতে হইত। এখন চর্ম সংগ্রহ করে একদল লোক, চর্ম পরিষ্কার ও শোধন করে দ্বিতীয় একদল লোক এবং প্রকৃত জুতা তৈয়ারি করে আর একদল লোক। আবার বাটা কোম্পানীর মত জুতার কারখানায়



আধুনিক সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগ
জুতা তৈয়ারি

* অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য চিকিৎসক এখনও নিজে ঔষধ দিয়া থাকেন, কবিরাজ বা হকিম নিজে ঔষধপত্র তৈয়ারিও করিয়া থাকেন। তবে গতি হইল চিকিৎসার কার্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভক্ত করার দিকে।

মাত্র তৈয়ারির কার্যই শতাধিক ক্ষুদ্রতর প্রক্রিয়ায় বিভক্ত। কেহ শুধু গোড়ালি লাগায়, কেহ বা শুধু ফিতা পরায়, কেহ বা মাত্র চারিটি করিয়া পেরেক বসায়, ইত্যাদি। অর্থবিদ্যার জনক অ্যাডাম স্মিথ দেখিয়াছিলেন যে আলপিন তৈয়ারির কার্য ১৮টি প্রক্রিয়ায় বিভক্ত। এই বিংশ শতাব্দীর এই সময় বর্তমান থাকিলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, শুধু শতাধিক নহে সহস্রাধিক প্রক্রিয়ায় বিভক্ত উৎপাদনকার্যও আছে।

শ্রমবিভাগের সুবিধা ঃ শ্রমবিভাগের কতকগুলি সুবিধা সহজেই অনুধাবন করা যায়। প্রথমত, শ্রমবিভাগের ফলেই শিল্পবাণিজ্যের এবং জীবনযাত্রার মানের বর্তমান উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। অবশ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমবিভাগ ছাড়া যন্ত্রপাতির আবিষ্কারও বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে। তবুও বলা যায়, শ্রমবিভাগ ব্যতিরেকে ইহা কোন উপকারেই আসিত না। উদাহরণ দিয়া একজন অর্থবিদ্যাবিদ বলিয়াছেন যে ইঞ্জিন-নির্মাতা, ইঞ্জিন-চালক, গার্ড, সিগন্যালার প্রভৃতির মধ্যে যদি শ্রম-বিভাগ না থাকিত তবে বাষ্পীয় ইঞ্জিন দ্বারা কখনও রেলগাড়ী চালান সম্ভব হইত না। আবার ইঞ্জিন-নির্মাণের কার্যও যদি মাত্র একজনকে করিতে হইত তবে কখনই ইঞ্জিন নির্মিত হইত না।

দ্বিতীয়ত, শ্রমবিভাগ যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সহায়তা করিয়াছে। বিজ্ঞানীর পক্ষে গবেষণায় নিযুক্ত থাকা সম্ভব হইয়াছে বলিয়াই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিতে পারিয়াছে।

তৃতীয়ত, শ্রমবিভাগ শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। অ্যাডাম স্মিথই প্রথম দেখাইয়াছিলেন যে কোন লোকই সকল কার্যের জন্য সমান উপযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং যে যে-কাজের উপযুক্ত তাহাতে নিযুক্ত থাকিলেই সে দক্ষতা দেখাইতে পারে।

চতুর্থত, একই কার্যে মনোনিবেশ করার জন্য সে পারদর্শিতাও লাভ করে।

পঞ্চমত, শ্রমিককে একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন করিতে হয় না বলিয়া সময়ও বাঁচে।

ষষ্ঠত, শ্রমবিভাগ যত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও তত বাড়িতে থাকে। পরিশেষে, এই সকল সুবিধার সমন্বয়ের ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায় এবং শ্রমিককে অধিক মজুরি প্রদান করা সম্ভব হয়।

শ্রমবিভাগের অসুবিধা ঃ অবশ্য শ্রমবিভাগের অসুবিধাও আছে। প্রথমত, অতি সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিক যন্ত্রবৎ হইয়া পড়ে; তাহার অন্য কার্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। দৈনিক সহস্র সহস্র জুতার গোড়ালি লাগান যাহার কাজ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ জুতা নির্মাণ করা আর সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়ত, বৈচিত্র্যবিহীন একই ধরনের কাজ শ্রমিকের মনের উপর আঘাত করে বলিয়া তাহাকে নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইতে দেখা যায়।

তৃতীয়ত, শ্রমিক যে-দ্রব্য উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে তাহার চাহিদা কমিয়া গেলে শ্রমিকের পক্ষে বেকার হইয়া পড়িবার আশংকা থাকে। কারণ, অন্য কাজে তাহার দক্ষতা থাকে না বলিয়া বিকল্প কাজে তাহার নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা কম থাকে।

পরিশেষে, শ্রমবিভাগের জন্য অসংখ্য শ্রমিক অসংখ্য রকমের কাজ করে বলিয়া পরিচালকগণের পক্ষে তাহাদের সংগে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এই সকল অসুবিধার জন্য শ্রমবিভাগ সীমাহীনভাবে সম্প্রসারিত হইতে পারে না।

যন্ত্রপাতির ব্যবহার (Use of Machinery)

শ্রমবিভাগের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত আছে যন্ত্রপাতির ব্যবহার। শ্রমবিভাগ যতই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও তত বাড়িতেছে। অপরদিকে আবার নূতন নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কারও শ্রমবিভাগকে সূক্ষ্মতর করিয়া তুলিতেছে।

সুবিধা : উৎপাদনকার্যে যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে যে-সকল সুবিধা হয় তাহাদিগকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : (ক) শক্তি (power) এবং (খ) সূক্ষ্মতা (precision)। যন্ত্রপাতির জন্য উৎপাদনকার্যে মানুষের শক্তি নানাভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। জলস্রোত ও কয়লা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরমাণু হইতে পারমাণবিক শক্তির সৃষ্টি প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে। যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ নদী সমুদ্র পর্বত প্রভৃতি সকল প্রাকৃতিক বাধাকে জয় করিয়াছে। যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে মানুষের পেশীর উপর চাপও কম পড়িতেছে। তাজমহল নির্মাণে মানুষকে পেশীর দ্বারা যত বড় পাথর তুলিতে হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বড় বড় পাথর আজ যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই তোলা যায়।

দ্বিতীয়ত, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দ্বারা সূক্ষ্ম, নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ একই প্রকার জিনিসপত্রও তৈয়ারি করা সম্ভব হইতেছে। পরিশেষে, যন্ত্রপাতি দ্বারা অনেক অবাঞ্ছনীয় কাজও করা যায়।

অসুবিধা : যন্ত্রপাতির ব্যবহারের অবশ্য অসুবিধাও আছে। যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে করিতে শ্রমিকও যান্ত্রিক হইয়া উঠে। তাহার পেশীর উপর চাপ কমিলেও মনের উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় শ্রমিক ইহা সহ্য করিতে পারে না। যন্ত্রপাতি আবার প্রথম প্রথম শ্রমিককে কর্মচ্যুত করিয়া বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি করে। অবশ্য পরে ঐ নূতন যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামতের কারখানা গড়িয়া উঠিলে

কর্মচ্যুত শ্রমিকের অধিকাংশ পুনর্নিযুক্ত হয়। আরও বলা যায় যে কদর্য কারখানা-জীবন, বৈচিত্র্যবিহীন পরিশ্রম ইত্যাদি যেমন শ্রমবিভাগের ফল তেমনি যন্ত্রপাতি ব্যবহারেরও ফল। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজি প্রভৃতি যন্ত্র-সভ্যতার বিরোধিতা করিয়াছেন।

শিল্পের একদেশতা (Localisation of Industries)

শ্রমবিভাগ দুই প্রকারের হয়—(ক) ব্যক্তিগত শ্রমবিভাগ বা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শ্রমবিভাগ (individual division of labour) এবং (খ) আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ বা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শ্রমবিভাগ (territorial division of labour)। আঞ্চলিক শ্রমবিভাগকে 'শিল্পের একদেশতা' বলিয়া অভিহিত করা হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, একটি শিল্প যদি দেশের একস্থানে কেন্দ্রীভূত হয় তাহাকে শিল্পের একদেশতা বলে। পশ্চিমবংগের পাটকল শিল্প, বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কল শিল্প প্রভৃতি এই একদেশতার উদাহরণ। ভারতের পাটকলের অধিকাংশ পশ্চিমবংগেই অবস্থিত; কাপড়ের কলের বেশীর ভাগ বোম্বাই ও আমেদাবাদে অবস্থিত।

একদেশতার কারণ: একদেশতার প্রধান কারণ হইল ব্যয়সংক্ষেপের (economies) জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ। এই ব্যয়সংক্ষেপের জন্য তাহারা সুবিধাজনক স্থানে গিয়া ভিড় করে; ফলে শিল্পটি ঐ স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। নানা কারণে কলিকাতার আশেপাশে হুগলী নদীর ধারে পাটকল স্থাপন করা সুবিধাজনক বিবেচিত হইয়াছিল বলিয়াই পশ্চিমবংগের এই অঞ্চলে পাটকল শিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

যে-যে কারণে শিল্পের একদেশতা ঘটে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :

(১) কাঁচামালের সান্নিধ্য (Nearness to Raw Materials): যে-অঞ্চলে কাঁচামাল পাওয়া যায় তাহার নিকটবর্তী স্থানেই শিল্পটি গড়িয়া উঠিবার প্রবণতা দেখা যায়। বাংলাদেশে পাট পাওয়া যায় বলিয়াই কলিকাতার নিকট পাটকল শিল্পের একদেশতা ঘটিয়াছে; ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ভাল তুলা উৎপন্ন হয় বলিয়াই বোম্বাই ও আমেদাবাদে কাপড়ের কলগুলি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

(২) জলবায়ু (Climate): জলবায়ুও আর একটি কারণ। ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের মূলে আছে ঐ অঞ্চলের আর্দ্র জলবায়ু।

(৩) শক্তির সান্নিধ্য (Nearness to Power): শক্তিসম্পদের সুযোগ লাভ করিবার জন্যও শিল্পের একদেশতা ঘটে। লৌহ শিল্প কয়লাখনির নিকটেই গড়িয়া উঠে।

(৪) বিক্রয়বাজারের সান্নিধ্য (Nearness to Market): প্রাচীন কালে রাজদরবারের নিকটবর্তী স্থানেই বিভিন্ন শিল্পকে কেন্দ্রীভূত হইতে দেখা যাইত। অন্যান্য

সুবিধা না থাকিলেও একমাত্র বিক্রয়বাজারের সান্নিধ্যই শিল্পের একদেশতার কারণ হইত। ঢাকাই মসলিন, মুর্শিদাবাদের সিল্ক ও বাসনপত্র শিল্পের একদেশতার কারণ ছিল ইহাই। বর্তমানেও দেখা যায় যে বিক্রয়বাজারের সুবিধা লাভ করিবার জন্য অনেক শিল্প মহানগরীর নিকট কেন্দ্রীভূত হইতেছে।

(৫) অন্যান্য কারণ (Other Reasons): অনেক সময় বন্দর, রেলপথ ও বাজারের সুবিধা লাভ করিবার জন্যও শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়। মোটকথা, শিল্পের একদেশতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হইল বহন-ব্যয় (transport cost) জনিত সুবিধা। যে-স্থানে শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে কাঁচামাল ইত্যাদি লইয়া আসা ও নির্মিত দ্রব্য বিক্রয়বাজারে প্রেরণ করা ব্যাপারে সর্বাধিক সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে, শিল্পপতিগণ অধিকাংশ সময় সেই স্থানেই শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহান্বিত হয়। ফলে উদ্ভব হয় একদেশতার।

সুবিধা ও অসুবিধা : একদেশতার ফলে শিল্পের নানা সুবিধা হয়। প্রথমত, অনেক দক্ষ শ্রমিক ঐ স্থানে আসিয়া কর্মপ্রার্থী হয় বলিয়া শ্রমিকসংগ্রহ করা সহজ হয়। দ্বিতীয়ত, অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান একসংগে গড়িয়া উঠে বলিয়া যানবাহন ইত্যাদির সুবিধা পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, নানা সহায়ক শিল্প গড়িয়া উঠে। ইহাতে উপজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারের সুবিধা হয়। চতুর্থত, শিল্পের একদেশতা ঘটিলে ঐ স্থানে যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানাও গড়িয়া উঠে। পরিশেষে, ঐ স্থানের শিল্পের সুনাম ছড়াইয়া পড়ে। যেমন, মুর্শিদাবাদের সিল্কের শাড়ী ক্রয় করিবার সময় লোকে কোন্ কারখানায় বা কোন্ তাঁতীর তৈয়ারি তাহা খোঁজ করে না।

একদেশতার কিন্তু একটি বিশেষ বিপদ আছে। কেন্দ্রীভূত শিল্প যে-দ্রব্য উৎপাদন করে তাহার চাহিদা যদি বিশেষ কমিয়া যায় তবে ঐ অঞ্চলে ব্যাপক বেকার-সমস্যা দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দেশবিদেশে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ হ্রাস পাইলে পশ্চিমবংগের পাটকলগুলির অধিকাংশ বন্ধ হইয়া পাটকল-শ্রমিকদের মধ্যে অনেক বেকারের সৃষ্টি করিবে।

বৃহদায়তন শিল্প (Large-scale Industry)

শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অন্যতম অবশ্যম্ভাবী ফল হইল বৃহদায়তন শিল্প যাহাকে বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থার অংগ বলিয়া বর্ণনা করা যায়। যন্ত্রপাতি ও শ্রমিককে যদি পূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে হয় তবে বৃহদায়তনে উৎপাদন করিতেই হইবে। বৃহদায়তনে উৎপাদন করিতে করিতে আরও শ্রমবিভাগ এবং যন্ত্রপাতি নিয়োগের সুবিধা উপস্থিত হয়। ফলে শিল্প বৃহত্তর আকার ধারণ করে।

বৃহদায়তনে উৎপাদন বা বৃহদায়তন শিল্পের দিকে বর্তমানে যে-গতি লক্ষ্য করা যায় তাহার তৃতীয় কারণটিরও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইল বিক্রয়বাজারের প্রসার। বিক্রয়বাজার যতদিন গ্রামের বাজারের মত বিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভব হয় নাই। কারণ, সংকীর্ণ বাজারে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং শ্রমবিভাগ, যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং বিক্রয়বাজারের প্রসার—এই তিনটি বিষয়ই শিল্পকে বৃহদায়তনের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধা : শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে-সকল সুবিধা হয় তাহা সকলই বৃহদায়তন শিল্প ভোগ করিতে পারে। ইহা ছাড়া বিক্রয় ব্যাপারে এবং অর্থসংগ্রহেও কতকগুলি সুবিধা হয়।

(ক) উৎপাদন ব্যাপারে সুবিধা : উৎপাদন ব্যাপারে বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগের জন্য যে-ব্যক্তি যে-কার্যের উপযুক্ত তাহাকে তাহাতেই নিযুক্ত রাখিয়া তাহাদের দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার করা যাইতে পারে। অতিমাত্রায় বিশেষজ্ঞ কর্মীদেরও (specialised experts) নিয়োগ করা যাইতে পারে।

(২) শিল্পের মোট উৎপাদন-ব্যয়কে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়—যথা, ধার্য ব্যয় (fixed cost) এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় (variable cost)। কারখানার জন্য যে-জমি লওয়া হইয়াছে তাহার খাজনা, কারখানাগৃহ, অপরিহার্য যন্ত্রপাতি, ম্যানেজার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মাহিনা ইত্যাদি এই ধার্য ব্যয়ের মধ্যে পড়ে। অপরদিকে কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি প্রভৃতি হইল পরিবর্তনশীল ব্যয়। ব্যবসায়ের আয়তনবৃদ্ধির সমানুপাতে ধার্য ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটে না বলিয়া দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় পূর্বাপেক্ষা কম হয়।

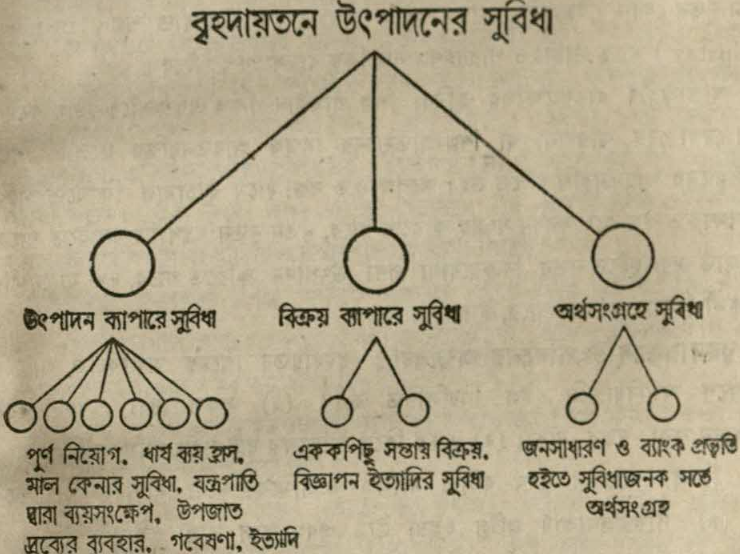
(৩) একসংগে বহু পরিমাণে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি কেনা হয় বলিয়া দামের দিক দিয়া সুবিধা পাওয়া যায় এবং একসংগে অনেক মাল লইয়া আসিলে পরিবহণ-ব্যয়ও কম পড়ে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান মালপত্র কেনা ও পরিবহণ ব্যাপারে পাইকারী দরের যে-সুবিধা পায় তাহা ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয় না।

(৪) নূতন নূতন আধুনিক যন্ত্রপাতি বসাইয়া ক্রমাগত ব্যয়সংক্ষেপের ব্যবস্থা করা যায়।

(৫) উপজাত দ্রব্য (by-products) হইতে বিক্রয়যোগ্য পণ্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ইক্ষু হইতে চিনি উৎপাদনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ছোট ছোট কারখানায় চিনি উৎপাদনের সময় অনেকটা রস নষ্ট হয়। বড় বড় কারখানায় এই রস হইতে জ্বালানির জন্য একরকম স্পিরিট তৈয়ারি করা হয়।

(ঙ) বৃহদায়তন শিল্প উৎপাদনের উন্নতিকল্পে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বহু অর্থব্যয়ও করিতে পারে।

(খ) বিক্রয় ব্যাপারে সুবিধা : বিক্রয় ব্যাপারেও বৃহদায়তন শিল্পের অনুরূপ কয়েকটি সুবিধা দেখা যায়। ইহা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে মাল বহন করিয়া বাজারে দিতে পারে ; অনেক দ্রব্য একসংগে বিক্রয় হয় বলিয়া এককপিছু কিছু সুবিধা দিলেও মোট লাভ অধিক থাকে। ইহা ছাড়াও বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন, ক্যানভাসার নিয়োগ প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারকার্য চালাইতে পারে। ইহার উৎপন্ন দ্রব্যসমূহও পরস্পরের পক্ষে প্রচার করিতে থাকে—যেমন, বাটার জুতা বাটার মোজার বিজ্ঞাপনের কাজ করে।



(গ) অর্থসংগ্রহে সুবিধা : বৃহদায়তন শিল্পের পক্ষে সুবিধাজনক সর্তে অর্থসংগ্রহ করা সম্ভব। ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, মহাজন প্রভৃতি যত অল্প সুদে এবং সহজ জামিনে বড় ব্যবসায়ীদের ঋণ দেয় ছোট ছোট ব্যবসায়ীকে তাহা দেয় না।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ (External and Internal Economies) : বৃহদায়তনে উৎপাদনের উপরি-বর্ণিত সুবিধাসমূহকে সংক্ষেপে 'আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ' (economies of scale) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মার্শাল ইহাদিগকে বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ (external economies) এবং আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ (internal economies)—এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন।

বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপের উদ্ভব হয় প্রধানত একদেশতার জন্য। কোন শিল্প (industry) বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের (firm) আয়তন সম্প্রসারণের ফলে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে-সকল সুবিধা ভোগ করিতে সমর্থ হয় তাহাই বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া অভিহিত। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে, শিল্পের আয়তন সম্প্রসারণের ফলে এই ব্যয়সংক্ষেপ কোন বিশেষ শিল্প-প্রতিষ্ঠান এককভাবে ভোগ করে না, সংগে সংগে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও উহা ভোগ করিতে সমর্থ হয়। যেমন, পশ্চিমবংগে হুগলী নদীর দুই তীরে যে অসংখ্য পাটকল-শ্রমিক আসিয়া হাজির হয় তাহার সুবিধা কোন পাটকল এককভাবে ভোগ করে না, সকল পাটকলই ঐ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। আবার কোন বিশেষ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তনবৃদ্ধি ব্যতিরেকেও উহা অপরের আয়তনবৃদ্ধির দরুন ব্যয়-সংক্ষেপের সুবিধা ভোগ করিতে পারে। জামসেদপুরে টাটার কারখানা সম্প্রসারণের দরুন নূতন কোন রেললাইন পাতা হইলে ঐখানে যে টিন-পাত শিল্প (tin-plate industry) আছে তাহারও পরিবহণজনিত কিছু ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিবে।

আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা শিল্প-প্রতিষ্ঠান কিন্তু এককভাবে ভোগ করে। ইহা দেখা দেয় কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়তনবৃদ্ধির ফলে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তনবৃদ্ধি ঘটিলে উহা অপেক্ষাকৃত সস্তা দামে কাঁচামাল কিনিতে পারে, অপেক্ষাকৃত কম সুদে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে, নূতন নূতন যন্ত্রপাতি বসাইতে পারে, উপজাত দ্রব্য হইতে নূতন বিক্রয়যোগ্য পণ্য উৎপাদন করিতে পারে, দক্ষ ম্যানেজার ও কর্মী নিয়োগ করিতে পারে, ইত্যাদি।

বৃহদায়তনে উৎপাদনের অসুবিধা : বৃহদায়তন শিল্পের অসুবিধাও আছে। সংক্ষেপে অসুবিধাগুলি হইল নিম্নলিখিত রূপ : (১) সকল দ্রব্য বৃহদায়তনে উৎপাদন করা সম্ভব নহে ; (২) এরূপ শিল্পে মালিকের দৃষ্টি সর্বত্র থাকিতে পারে না ; (৩) শিল্পের আয়তন বৃহৎ বলিয়া মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্য গড়িয়া উঠে না ; (৪) পরিচালনাকার্য জটিল হইয়া উঠে এবং ফলে নানা প্রকার অপচয় দেখা দেয় ; (৫) আয়তন একটা মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ক্রিয়া সুরু করিয়া উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি করে ; (৬) বাজারে মন্দা দেখা দিলে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়-সমস্যা উদ্ভূত হয়।

বৃহদায়তন শিল্পের এই সকল অসুবিধাই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সুবিধা হইয়া দেখা দেয়। নিম্নে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসংগে এ-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Small-scale Industry)

বৃহদায়তন উৎপাদনের নানা সুবিধা সত্ত্বেও দেখা যায় যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-ব্যবস্থা এখনও টিকিয়া আছে। শুধু টিকিয়া আছে বলিলে অবশ্য ভুল হইবে, অনেক

ক্ষেত্রে নিজ প্রাধান্যও বজায় রাখিয়াছে। ইহার কারণ হইল বৃহদায়তনে উৎপাদনের যেরূপ সুবিধা আছে সেইরূপ কতকগুলি অসুবিধা বা সীমাও আছে। এই অসুবিধাগুলিই ক্ষুদ্র শিল্পের সুবিধা হিসাবে দেখা দেয়।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সুবিধা ঃ প্রথমত, কতক প্রকারের জিনিসপত্র বহুল অপেক্ষা স্বল্প পরিমাণে উৎপাদন করিলেই অধিক সফলতা লাভ করা যায়। যে-সকল দ্রব্যের চাহিদা ব্যক্তিগত রুচি-পছন্দ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল তাহাদিগকে বৃহদায়তন শিল্পে বহুল পরিমাণে উৎপাদন করা যায় না। এইজন্য দেখা যায় যে বাজারে 'রেডিমেড' পোশাকের প্রাচুর্য সত্ত্বেও দর্জির দোকানের সংখ্যা কমে নাই। অনেক দ্রব্য নির্মাণে আবার ব্যক্তিগত নিপুণতার প্রয়োজন হয়। ইহাদিগকেও বহুল পরিমাণে উৎপাদন করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, কাশ্মীরী শালের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং বৃহদায়তনে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার ব্যক্তিগত চাহিদার দ্বারা সীমাবদ্ধ। বাজার আবার ভৌগোলিক কারণেও সীমাবদ্ধ হয়। কাঁচা দুধ, মাছ, তরিতরকারি প্রভৃতি অধিকাংশ মাত্র স্থানীয় বাজারেই বিক্রয় করা চলে। এইজন্য এই সকল দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অতি বৃহদায়তন হইতে পারে না। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান টিকিয়া থাকে। এই দিকে লক্ষ্য করিয়া অ্যাডাম স্মিথ বলিয়াছিলেন যে বাজারের আয়তনই শ্রমবিভাগ বা বৃহদায়তনে উৎপাদনের সীমা নির্দেশ করে।

দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে মালিক সকলের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারে। ইহার ফলে কাঁচামাল সরবরাহকারী ঠকাইতে পারে না, শ্রমিক ঠিকমত কাজ করে, খরিদ্দারের যত্ন লওয়া সম্ভব হয়, ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, পরস্পরের নিকট থাকিয়া কাজ করার ফলে ক্ষুদ্র শিল্পে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কও গড়িয়া উঠে।

চতুর্থত, পরিচালনার দিক দিয়াও ক্ষুদ্র শিল্পের কয়েকটি সুবিধা রহিয়াছে। বৃহদায়তন শিল্পের পরিচালনা-ব্যবস্থা অতি জটিল। ইহা রুটিন-পদ্ধতিতেই চলে। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সময় অযথা বিলম্ব হয়, নানারূপ অপচয় ঘটে এবং ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের এই অসুবিধা নাই। ইহাতে মালিক বা পরিচালক দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহা কার্যকর করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে।

পঞ্চমত, ব্যবসায়ের আয়তন একটা সীমা ছাড়াইয়া গেলে তাহা পরিচালনা করা দুষ্কর হইয়া পড়িতে পারে, কারণ লোকের পরিচালনক্ষমতার একটা সীমা আছে। এইরূপ ঘটিলে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কাম্য অনুপাতের অভাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া সুরু হইতে পারে। (৪১-৪৩ পৃষ্ঠা দেখ। সেখানে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে জমি শ্রম মূলধন ও সংগঠন—উৎপাদনের এই চারিটি

উপাদানের মধ্যে অনুপাত অকাম্য হইলেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া সুরু হয়।) পরিচালক প্রয়োজনমত মূলধন সংগ্রহ করিতে না পারিলে অথবা প্রয়োজনমত শ্রমিক নিয়োগ করিতে না পারিলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে পারে। অনেক সময় এই মূলধন সংগ্রহ করার অসুবিধার জন্যই ব্যবসায়ের আয়তনকে সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়।

ক্ষুদ্র শিল্পে কিন্তু এই অসুবিধা নাই। অল্প লইয়া কারবার করে বলিয়া ইহার পক্ষে উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে কাম্য অনুপাত নির্ধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সুতরাং ইহা ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়াকে এড়াইয়া চলিতে পারে।

পরিশেষে, বৃহদায়তনে উৎপাদন সর্বদা বাজারে চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হয়। নচেৎ, উৎপন্ন দ্রব্য অবিক্রীত থাকার ফলে শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। ক্ষুদ্র শিল্পের পক্ষে এ-সমস্যা কিন্তু অতটা গুরুত্বপূর্ণ নহে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সামান্য পরিমাণে উৎপাদন করে; সুতরাং চাহিদার সামান্য হ্রাসবৃদ্ধিতে তাহার বিশেষ কিছু যায় আসে না। কোন বৎসরে পূজার সময়ে জুতার চাহিদা পূর্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ কমিয়া গেলে বাটা কোম্পানীর যতটা ক্ষতি হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জুতা নির্মাতাদের ততটা ক্ষতি হয় না।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের এই সকল সুবিধা বা বৃহদায়তন শিল্পের এই সকল অসুবিধার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপান ইংলণ্ড প্রভৃতি অতি-শিল্পোন্নত দেশেও ক্ষুদ্র শিল্প বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিয়া আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষুদ্রায়তন। জাপানে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান হইল শতকরা ৮০ ভাগ। ভারতের ক্ষেত্রে ইহা শতকরা ৯৫-৯৮ ভাগের মত হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে বৃহদায়তন শিল্পোন্নয়নের সবিশেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৬০-৬১ সালে ঐ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি ১৩০০ কোটি টাকার মত দ্রব্য উৎপাদন এবং ৩৬ লক্ষ লোক নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, অপরদিকে ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য ২০০ কোটি টাকার মত কম হইলেও উহাদের নিয়োগের পরিমাণ ছিল প্রায় ২ কোটি লোক। মাত্র তুলাতাঁত শিল্পেই (handloom industry) নিযুক্ত লোকের সংখ্যাই ছিল সকল বৃহদায়তন কলকারখানা খনি এবং চা কফি ইত্যাদির ন্যায় রোপণ শিল্পে (plantation industries) নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যার সমান। অতএব, উৎপাদন ও নিয়োগ—উভয় দিক দিয়াই আমাদের দেশে ক্ষুদ্র শিল্প-ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটির শিল্প ঃ ক্ষুদ্র শিল্প-ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটির শিল্প। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে মালিক ভাড়াটিয়া শ্রমিকের সাহায্যে উৎপাদন করে, কিন্তু কুটির শিল্পে পরিবারের লোকেরাই প্রধানত শ্রমের যোগান দেয়।

ভারতের বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Large and Small-scale Industries of India)

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও শিল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারত সমগ্র পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যে অষ্টম স্থানাধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এই বিচার করা হইয়াছিল মোট উৎপাদন ও মোট শ্রমিক নিয়োগের দিক হইতে। অর্থাৎ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে যে-পরিমাণ শিল্পদ্রব্য উৎপাদন হইত এবং ভারতের কলকারখানাগুলিতে যত সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত ছিল, মাত্র আর সাতটি দেশে তাহা অপেক্ষা অধিক উৎপাদন ও অধিক শ্রমিক নিয়োগ দেখা গিয়াছিল। তবুও ভারতের শিল্পোন্নয়ন যথেষ্ট বিবেচিত হয় নাই।

ভারতের শিল্প-ব্যবস্থায় ত্রুটি ঃ প্রথমত, ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনবলের তুলনায় শিল্পোৎপাদন ছিল সামান্যই। দ্বিতীয়ত, মাথাপিছু শ্রমিকের উৎপাদন-হারও ছিল অতি অল্প। তৃতীয়ত, উৎপাদন-ব্যয় ছিল অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বহু পরিমাণে অধিক। চতুর্থত, শিল্প-ব্যবস্থা মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে ভোগ্যপণ্য সরবরাহকারী শিল্পগুলিই সম্প্রসারিত হইয়াছিল ; লৌহ ও ইস্পাত, ভারী রসায়ন প্রভৃতি মূল শিল্পগুলি (basic industries) তেমন গড়িয়া উঠে নাই। ইহার উপর আবার শিল্পের স্থান-নির্বাচনও কাম্য হয় নাই। দেশের কোন কোন অঞ্চলে ঘটিয়াছিল অত্যধিক শিল্পপ্রসার ; আবার কোন কোন অঞ্চল ছিল সম্পূর্ণ শিল্পবিহীন। পরিশেষে, বৃহদায়তন শিল্পগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি মাথা তুলিতে পারিতেছিল না এবং কুটির শিল্পগুলি ধ্বংস হইতেছিল।

এই অবস্থার মূলে ছিল দুইটি প্রধান কারণ ঃ (ক) বিদেশী শাসকের নীতি এবং (খ) স্বল্পোন্নত ভারতের (underdeveloped India) জনগণের দারিদ্র্য। ভারতে বিদেশী শাসক শিল্পপ্রসারের দিকে মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করে নাই ; বরং ভারতকে শিল্পে অনুন্নত রাখিতে সকল প্রচেষ্টাই করিয়াছিল। ভারত হইতে কাঁচামাল লইয়া গিয়া ইংলণ্ডে শিল্পদ্রব্য নির্মাণ করিয়া ঐ শিল্পদ্রব্য আবার ভারতে বিক্রয় করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। দরিদ্র জনসাধারণের নিকট শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বিশেষ মুনাফা করা যায় না বলিয়া ভারতীয় শিল্পপতিগণও শিল্পবিস্তারের প্রতি বিশেষ উৎসাহী হন নাই। ইহার উপর অবশ্য বলা যায় যে ভারতে শিল্প-শ্রমিক দলও ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই এবং বিভিন্ন কারণে তাহাদের দক্ষতা (efficiency) ছিল অতি নিম্ন স্তরের।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারতে যে কিছুটা শিল্পোন্নয়ন ঘটিয়াছিল তাহার মূলে ছিল পাট ও তুলার ন্যায় কাঁচামালের প্রাচুর্য, স্বদেশী আন্দোলন, দুইটি বিশ্বযুদ্ধ এবং শিল্প-সংরক্ষণ নীতি (Policy of Protection)।

কাঁচা পাটের একচেটিয়া উৎপাদনের জন্য এবং কাঁচা তুলার প্রাচুর্যের জন্য এদেশে পাটকল শিল্প ও বস্ত্র শিল্প বিদেশী শাসকের উপেক্ষা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐ একই কারণে কয়লাখনি শিল্প ও চা-বাগান শিল্পও সম্প্রসারিত হইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলন বিলাতী দ্রব্য বর্জনের নীতি গ্রহণ করিয়া দেশীয় শিল্প-প্রসারে সহায়তা করিয়াছিল। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের সময় আমদানীহ্রাস এবং সামরিক প্রয়োজনে শিল্পদ্রব্যের অভাবনীয় চাহিদাবৃদ্ধি ভারতকে শিল্পপ্রসারের পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। পরিশেষে, শিল্প-সংরক্ষণ নীতির ফলেও চিনি কাগজ দিয়াশলাই প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ভারতের শিল্পোন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা (Role of the State in Industrial Development of India)

বিভিন্ন দেশের শিল্পোন্নয়নের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আধুনিক যুগে উহা কোন ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা ব্যতিরেকে সম্ভবপর হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপান সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি সকল আধুনিক শিল্পোন্নত দেশেই সরকার সক্রিয়ভাবে শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করিয়াছে। জাপানে রাষ্ট্রকে শিল্পোন্নয়নের ধর্মপিতা (godfather) বলিয়া গণ্য করা হয়। ভারতে কিন্তু বৈদেশিক সরকার সক্রিয় সহযোগিতার পরিবর্তে করিয়াছে হয় বিরোধিতা, না-হয় উপেক্ষা। ফলে শিল্পোন্নত হইয়াও ভারত ছিল শিল্পে অনগ্রসর। অসামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্প-ব্যবস্থা, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির অভাব, উৎপাদন-ব্যয়ের আধিক্য ছিল ভারতের শিল্প-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

স্বাভাবিকভাবেই সরকারের এই দৃষ্টিভংগি পরিবর্তিত হয় স্বাধীন ভারতে। দেশের শিল্পোন্নয়নে স্বাধীন ভারতের সরকার ঠিক কি ভূমিকা গ্রহণ করিবে তাহার প্রথম ব্যাখ্যা করা হয় ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ঘোষণায়।

শিল্পনীতি (Industrial Policy) ঃ তখন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা না হইলেও বলা হইয়াছিল যে ভবিষ্যতে (১) অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন, (২) পারমাণবিক শক্তির গবেষণা ও নিয়ন্ত্রণ এবং (৩) রেলপথ—এই তিনটি বিষয় সম্পূর্ণ সরকারী এলাকায় থাকিবে। ইহা ছাড়া কয়লাখনি, লৌহ ও ইস্পাত, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বেতারের যন্ত্রপাতি, বিমানপোত ও জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন একমাত্র সরকারই করিবে। বাকী সমস্ত শিল্পবাণিজ্য বেসরকারী উদ্যোগে থাকিবে। এই শিল্পনীতি অনুসারেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির পরিবর্তে এক নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়।

এই নূতন শিল্পনীতি অনুসারে সমস্ত শিল্পকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে আছে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, পারমাণবিক শক্তি, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা ও খনিজ তৈল, রেলপথ ও বিমানপথ, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন প্রভৃতি ১৭টি মূল শিল্প বা সেবামূলক কার্য। এইগুলির উন্নয়নের ভার সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের হস্তেই থাকিবে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে ১২টি শিল্প—যথা, যন্ত্রপাতি, রসায়ন, কয়লা ও তৈল ছাড়া অন্যান্য খনিজ পদার্থ, মোটর চলাচল ইত্যাদি। এইগুলি বর্তমানে বেসরকারী মালিকানায় থাকিলেও ক্রমশ ইহাদের রাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করা হইবে। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত বা অবশিষ্ট শিল্পগুলিকে বেসরকারী মালিকানাতেই রাখা হইবে। তবে এইগুলি সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে নূতন শিল্পনীতিতে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী ভূমিকাকে ব্যাপকতর করিয়া তোলা হইয়াছে। সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের নীতি অনুসারেই এরূপ করা হইয়াছে।

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা ঃ পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল শিল্পবাণিজ্যই সরকারী মালিকানা ও পরিচালনায় থাকে। শিল্পবাণিজ্যের কিছু সরকারী ও কিছু বেসরকারী পরিচালনায় থাকিলে উহাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (Mixed Economy) বলা হয়। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থাই ছিল আদর্শ। এখনও ভারতের অর্থ-ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বলিয়াই অভিহিত করিতে হইবে ; কিন্তু উহা আর এখন আদর্শ নহে। আদর্শ বা লক্ষ্য হইল সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন। এইজন্য ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি ঘোষণার দ্বারা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করা হইয়াছে। এইভাবে ভবিষ্যতে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে ধীরে ধীরে আরও সম্প্রসারিত করিয়া শিল্পবাণিজ্যের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সরকারী মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। তখন পুরাপুরি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু বেসরকারী শিল্পক্ষেত্র যতদিন বর্তমান থাকিবে ততদিনই সরকার সর্বতোভাবে উহাকে সাহায্য করিয়া যাইবে এবং আশা করিবে যে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র সরকারী উদ্যোগের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবে।

ঘোষিত শিল্পনীতি অনুসারে সরকার নিজস্ব ক্ষেত্রে শিল্প গঠনে উদ্যোগী হয় এবং নানাভাবে বেসরকারী ক্ষেত্রকে সাহায্য করিতে থাকে। এখন প্রথমে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্প গঠনের বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

ক। সরকারী উদ্যোগে শিল্পোন্নয়ন (Industrial Development under Government Enterprise)

প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্প ও খনিজ খাতে বরাদ্দ ছিল (কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকা ধরিয়া) ১৭৯ কোটি টাকা বা মোট ব্যয়ের শতকরা ৭.৬ ভাগ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঐ খাতে ব্যয় করা হয় মোট ৭৪ কোটি টাকা বা মোট পরিকল্পনার ব্যয়ের মাত্র শতকরা ৪ ভাগ।

মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্প ও খনিজ খাতে ৮৯০ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে ২০০ কোটি টাকা ছিল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য। বাকী ৬৯০ কোটি টাকার প্রায় সমস্তটাই লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, সার, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূল শিল্প ও বিভিন্ন মধ্যায়তন শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, শিল্প ও খনিজ খাতে ব্যয় হইয়াছিল ৯০০ কোটি টাকা এবং উহার মধ্যে ক্ষুদ্রায়তন ও গ্রামীণ শিল্পের অংশ ছিল ১৭৫ কোটি টাকার মত। শুধু বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্রের বিনিয়োগের (investment) কথা ধরিলে (খনিজ ক্ষেত্রের ব্যয় এবং চলতি ব্যয় বাদ দিয়া) দেখা যায় যে উহার পরিমাণ ছিল ৭৭০ কোটি টাকা, যদিও মূল পরিকল্পনায় ৫৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

সরকারী উদ্যোগে যে-সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান এ-পর্যন্ত স্থাপন করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে উড়িষ্যার রুরকেলা, মধ্যপ্রদেশের ভিলাই এবং পশ্চিমবংগের দুর্গাপুরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানা তিনটিই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য।* শেষ পর্যন্ত এই তিনটি কারখানার মোট উৎপাদনক্ষমতা হইবে বাৎসরিক প্রায় ৬০ লক্ষ টন। ইহা ছাড়া মহীশূরের সরকারী ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণ করা হইয়াছে। তারপর আছে সিন্ধ্রি, নাংগল, রুরকেলা ও নিভেলির সার তৈয়ারির কারখানা। বিশাখাপত্তনমে জাহাজ তৈয়ারির কারখানাও সরকারী ক্ষেত্রভুক্ত। চিত্তরঞ্জনের রেল-ইঞ্জিন তৈয়ারির কারখানা সরকারী ক্ষেত্রভুক্ত আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান। ইহার উৎপাদন এরূপ বাড়িয়া গিয়াছে যে বর্তমানে ভারত রেল-ইঞ্জিন নির্মাণে একপ্রকার স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে, এমনকি ভারত রেল-ইঞ্জিন রপ্তানী করার অবস্থাতেও পৌছিয়াছে। বর্তমানে এই কারখানায় বৈদ্যুতিক রেল-ইঞ্জিনও নির্মিত হইতেছে।

অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে পেরাম্বুরের রেলকোচ নির্মাণের কারখানা, টেলিফোনের যন্ত্রপাতির কারখানা, টেলিফোনের তারের কারখানা, বিমান নির্মাণের

---

* ইহা ছাড়া বোকারোতে একটি কারখানা নির্মাণ করা হইতেছে।

কারখানা, সাধারণ যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, গৃহনির্মাণের উপকরণের কারখানা, কয়েকটি পেনিসিলিন এবং ডি. ডি. টি. কারখানা, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, সংবাদপত্র মুদ্রণ কাগজের কারখানা, বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কারখানা, চশমার কাঁচের কারখানা, সিমেন্টের কারখানা, তৈল শোধনাগার ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিকল্পনায় অনেক যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ভারী বৈদ্যুতিক দ্রব্য নির্মাণ শিল্প, মূল রসায়ন শিল্প, ঔষধপত্রাদি উৎপাদন শিল্প প্রভৃতি স্থাপন করা এবং পেট্রল পরিশোধনের (oil refining) ব্যাপকতর ব্যবস্থা করা হয়। এই পরিকল্পনায় বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ উন্নয়নের যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় প্রথমে তাহার ব্যয় ১৯০০ কোটি টাকার মত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত ব্যয় ঐ পরিমাণ হইয়াছে বলিয়াই প্রাথমিকভাবে হিসাব করা হইয়াছে। তবে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির দরুন কার্যক্রমকে পুরাপুরি অনুসরণ করা সম্ভবপর হয় নাই।

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের কার্যক্রম প্রস্তুত করা হয় আগামী ১৫ বৎসরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত কার্যক্রম ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে শেষ না করিলেও বিশেষ অসুবিধা হইবার কথা নয়। কিন্তু চূড়ান্ত চতুর্থ পরিকল্পনা এখনও (ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সাল) প্রণীত না হওয়ায় এবং উহার আকার কি হইবে সে-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকায় ঐ অসমাপ্ত কার্য চতুর্থ পরিকল্পনায় কতদূর সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে, সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে।

চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় ঘোষণা করা হয় যে ঐ পরিকল্পনায় বৃহদায়তন শিল্পখাতে ৪০০০ কোটি টাকার মত বরাদ্দ করা হইবে। এই পরিমাণ বরাদ্দ করা সম্ভব হইলে তৃতীয় পরিকল্পনার আরব্ধ কার্য শেষ হইবে এবং শিল্পোন্নয়ন বহদূর অগ্রসর হইবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কতটা বরাদ্দ করা সম্ভব হইবে, তাহা সন্দেহের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, চতুর্থ পরিকল্পনায় বৃহদায়তন শিল্প-সম্প্রসারণকে এক নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে কৃষি ও রপ্তানীর সহায়ক শিল্পোন্নয়নের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইবে।

থ। বেসরকারী উদ্যোগে শিল্পোন্নয়নে সরকারের ভূমিকা (Role of the Government in Industrial Development under Private Enterprise)

ঘোষিত শিল্পনীতি অনুসারে সরকার নিজস্ব উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্প গঠন করা ছাড়াও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নে সর্বপ্রকারে সহায়তা করিবে। সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সহায়তা করিতেছে। ব্যবস্থাগুলি হইল : (১) নূতন শিল্প-সংরক্ষণ নীতি, (২) বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের

ব্যবস্থা, (৩) শিল্প-পরিচালনা ব্যবস্থার সংস্কার এবং (৪) শিল্প-শ্রমিক সম্বন্ধে নীতির নূতন রূপায়ণ। ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

১। **নূতন শিল্প সংরক্ষণ নীতি (New Fiscal Policy) :** শিল্প-সংরক্ষণ বলিতে বুঝায় বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে দেশের শিল্পকে রক্ষা করা। যে-সকল দেশ শিল্পোন্নয়নের পথে নূতন পা বাড়াইয়াছে সেই সকল দেশের শিশুশিল্পগুলি (infant industries) বিদেশের সংগঠিত শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে সরকারের কর্তব্য হইল শিশুশিল্পগুলিকে সংরক্ষণের (protection) ব্যবস্থা করা। ইহা করা হয় আমদানী দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করিয়া। আমদানী দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করিলে উহার দাম অধিক হয় এবং তখন দেশী শিল্পজাত দ্রব্য উহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে।

এইভাবে ব্রিটিশ আমলে কিছু কিছু ভারতীয় শিশুশিল্পের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং ইহার ফলেই গড়িয়া উঠিয়াছিল আমাদের চিনি শিল্প, তুলাবস্ত্র শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ইত্যাদি। তবে বিদেশী শাসকগণ যে নিজেদের স্বার্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংরক্ষণ প্রদান করে নাই তাহা সহজেই অনুমেয়।

স্বাধীনতার পর ঠিক হয় যে ব্যাপকভাবে সংরক্ষণ-নীতি প্রয়োগ করা হইবে—অর্থাৎ, দেশের শিল্পোন্নয়নে যেখানেই প্রয়োজন সেখানেই সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে। ইহাকে বলা হয় উন্নয়নমূলক সংরক্ষণ (developmental type of protection)। এই নীতি নির্ধারিত হয় ১৯৪৯ সালে এবং এই নীতি অনুসারেই স্বাধীন ভারতে সরকার সংরক্ষণ প্রদান করিয়া শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করিয়া আসিতেছে।

২। **বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা (Measures for the Supply of Industrial Finance in the Private Sector) :** ভারতের শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সংগ্রহ করার সমস্যা ছিল অন্যতম প্রধান সমস্যা। মূলধন সরবরাহের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না, শিল্পগুলিকে বাজার হইতে শেয়ার-ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের মাধ্যমেই মূলধন সংগ্রহ করিতে হইত। কিন্তু দেশের লোকের সঞ্চয় সামান্য হওয়ায় এবং বিনিয়োগের অভ্যাস গড়িয়া না উঠায় শেয়ার-ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা ছিল অতি কঠিন কার্য। অন্যান্যের মধ্যে মূলধন সংগ্রহের অসুবিধার জন্য ভারতে শিল্পোন্নয়ন পর্যাপ্ত হইতে পারে নাই।

স্বাধীনতার পর হইতেই সরকার এই সমস্যার সমাধানে যত্নবান হয় এবং বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের জন্য একের পর এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে থাকে। এ-পর্যন্ত স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলি হইল—(ক) ভারতের শিল্প অর্থ করপোরেশন (Industrial Finance Corporation of India), (খ) রাজ্য অর্থসরবরাহকারী

করপোরেশনসমূহ (State Financial Corporations), (গ) জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন (National Industrial Development Corporation), (ঘ) শিল্প-ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন (Industrial Credit and Investment Corporation), (ঙ) জাতীয় ক্ষুদ্র-শিল্প করপোরেশন (National Small Industries Corporation), (চ) ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক (Industrial Development Bank), (ছ) ভারতের ইউনিট ট্রাষ্ট (Unit Trust of India) এবং (জ) রাজ্য শিল্পোন্নয়ন করপোরেশনসমূহ (State Industrial Development Corporations)।

ইহাদের মধ্যে রাজ্য অর্থসরবরাহকারী করপোরেশনগুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে মূলধন সরবরাহ করিয়া থাকে এবং রাজ্য শিল্পোন্নয়ন করপোরেশনগুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্যে শিল্পোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করে। যেমন, পশ্চিমবংগ রাজ্য অর্থসরবরাহ করপোরেশন পশ্চিমবংগে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে মূলধন যোগান দেয় এবং পশ্চিমবংগ রাজ্য শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন এই রাজ্যে শিল্প গঠন, প্রসার ও উন্নয়ন সাধনের ব্যবস্থা করে। বাকী প্রতিষ্ঠানগুলি হইল সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। উহারা সকল রাজ্যেই বৃহদায়তন শিল্পগুলিকে মূলধন সরবরাহ করে।

ক্ষুদ্র শিল্পগুলি যাহাতে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank of India), বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রভৃতি হইতেও মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে তাহার জন্য সরকার কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

৩। **শিল্প-পরিচালনা ব্যবস্থার সংস্কার (Reforms in the System of Industrial Management)**ঃ ব্রিটিশ আমলে শিল্প-পরিচালনার ভার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ন্যস্ত ছিল ম্যানেজিং এজেন্টদের (Managing Agents) উপর। এই ব্যবস্থাকে বলা হইত ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা (Managing Agency System)। ইহার অনেকগুলি কুফল দেখা গিয়াছিল—যথা, কুপরিচালনা, সুযোগসুবিধার অপব্যবহার, বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস নষ্ট, ইত্যাদি। এই কুফলগুলি দূর করিবার জন্য ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হইয়াছে। এখন সরকার যে-কোন শিল্পে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার অবসান করিতে সমর্থ। কোন এজেন্সীই ১০টির বেশী শিল্প বা ব্যবসায়ের পরিচালনা করিতে পারে না। ম্যানেজিং এজেন্টদের পারিশ্রমিকও সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ক্ষমতাকেও নানাভাবে খর্ব করা হইয়াছে। আশা করা হইয়াছে যে এই সকল সংস্কারের ফলে শিল্প-পরিচালনা ব্যবস্থা সুষ্ঠু হইয়া দেশের শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করিবে।

৪। **শিল্প-শ্রমিক সম্বন্ধে নীতির নূতন রূপায়ণ (New Orientation of the Policy regarding Industrial Labour) :** শিল্প-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যে নূতন নীতির প্রবর্তন করা হইয়াছে তাহার মূল ব্যবস্থাগুলি হইল এইরূপ : (ক) শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়ন, (খ) আপোষের মাধ্যমে শিল্প-বিবাদ মিটানর উপর গুরুত্ব আরোপ, (গ) শ্রমিকরা যাহাতে পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা, (ঘ) বোনাস সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ, (ঙ) ন্যূনতম মজুরি প্রদানের প্রচেষ্টা, (চ) শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও পীড়া দুর্ঘটনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বীমার মাধ্যমে অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা, এবং (ছ) নানাভাবে শ্রমিকদের কল্যাণের প্রসার।

উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহের মাধ্যমে সরকার একদিকে যেমন শ্রমিকদের অবস্থা উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতেছে, তেমনি আবার যাহাতে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়া শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করে—সেদিকেও দৃষ্টি দিতেছে।

ভারতের কয়েকটি বৃহদায়তন শিল্প (Some Large-scale Industries of India)

ক। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (Iron and Steel Industry) : লৌহ ও ইস্পাত শিল্প অন্যতম মূল শিল্প (basic industry)। ইহার উপরই দেশের শিল্পোন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে। আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এ-পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে রুরকেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুরে তিনটি বৃহদায়তন কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে এবং বোকারোতে চতুর্থ ইস্পাত কারখানার নির্মাণকার্য সুরু হইয়াছে।* ইহা ছাড়া মহীশূরের ছোট কারখানাটিও সরকার দ্বারা পরিচালিত।

বেসরকারী ক্ষেত্রে আছে টাটা লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠান এবং বার্ণপুরের ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠান।

পৃথিবীর মধ্যে ভারতে খনিজ লৌহের পরিমাণ সর্বাধিক। কিন্তু সেই তুলনায় উৎপাদন অতি সামান্য। নূতন নূতন কারখানা স্থাপন সত্ত্বেও ভারতে বর্তমানে বৎসরে মাত্র ৫০ লক্ষ টনের মত ইস্পাত নির্মিত হয়।

খ। তুলাবস্ত্র শিল্প (Cotton Textile Industry) : ভারতের তুলাবস্ত্র শিল্প অন্যতম প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প। ভারতের তুলাবস্ত্রজাত দ্রব্য বহু পরিমাণে বিদেশে

---

* ৭৬ পৃষ্ঠা দেখ।

রপ্তানী হয়। কিন্তু এই তুলাবস্ত্র শিল্প বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। অন্যতম সমস্যা হইল আধুনিকীকরণের (modernisation) সমস্যা। আমাদের তুলাবস্ত্র শিল্পকে আধুনিক পদ্ধতিতে গড়িয়া না তুলিতে পারিলে তুলাবস্ত্রজাত দ্রব্যাদির রপ্তানীর ব্যাপারে আমরা অনেক দেশের সংগেই পারিয়া উঠিব না। অবশ্য আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইতেছে।

আর একটি সমস্যা হইল কাঁচামালের সমস্যা। যে-পরিমাণ কাঁচাতুলা এদেশে উৎপন্ন হয় তাহা মোটেই পর্যাপ্ত নহে। সুতরাং কাঁচাতুলার উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

গ। পাটকল শিল্প (Jute Mill Industry): পাটজাত দ্রব্যাদি আমাদের অন্যতম প্রধানতম রপ্তানী পণ্য এবং আমাদের পাটকল শিল্প অন্যতম প্রধান সুসংগঠিত শিল্প। কিন্তু এই শিল্পও বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন। ইহাদের মধ্যে আছে কাঁচামাল সংগ্রহের সমস্যা, বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সমস্যা, কাগজ তুলা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন পরিবর্ত-দ্রব্য (substitutes) হইতে প্রতিযোগিতার সমস্যা এবং পুরাতন যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা। এই সকল সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা অবশ্য করা হইতেছে। কিন্তু সমস্যাগুলি গুরুতর প্রকৃতির বলিয়া সমাধান সহজ হইতেছে না।

ঘ। চিনি শিল্প (Sugar Industry): চিনি শিল্পে ভারত পৃথিবীতে অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করে। দেশের প্রয়োজন মিটাইয়াও ভারত বেশ কিছু পরিমাণ চিনি বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকে। তবে যতটা চিনি দেশের লোকের পক্ষে ভোগ করা উচিত ততটা ভোগ করা অবশ্য সম্ভব হয় না। এইজন্য বিভিন্নভাবে চিনির উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলিতেছে।

ঙ। কয়লাখনি শিল্প (Coal Mining Industry): কয়লাখনিতে ভারত বিশেষ সমৃদ্ধ এবং কয়লাখনি শিল্পও সুগঠিত। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রসারের জন্য কয়লার প্রয়োজন বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এইজন্য কয়লাখনি শিল্পে নূতন নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইতেছে এবং ধাতু নিষ্কাশনের জন্য যে-কোক কয়লার প্রয়োজন হয় তাহার উৎপাদনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

চ। চা শিল্প (Tea Industry): চা শিল্প আমাদের প্রধানতম রোপণ শিল্প (plantation industry)। আমরা বিদেশে চা রপ্তানী করিয়া বৎসরে ১০০ কোটি টাকার অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি। বর্তমানে কিন্তু এই বৈদেশিক বাজারে আমাদিগকে অন্যান্য দেশের চা শিল্পের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে। বিদেশের বাজার বজায় রাখিতে হইলে আমাদিগকে চা-এর

রপ্তানী মূল্য কমাইতে হইবে এবং চা-এর গুণগত উন্নয়নসাধনও করিতে হইবে। ইহা করিতে না পারিলে কিছুদিনের মধ্যে আমরা চা-বিক্রয় ব্যাপারে বিদেশের বাজার হইতে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইব।

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন (Development of Cottage and Small-scale Industries)

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সহিত বৃহৎ ও মধ্যায়তন শিল্পের সমন্বয় আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় শিল্পোন্নয়নের অন্যতম ঘোষিত নীতি। অর্থাৎ, বৃহদায়তন শিল্পের উন্নয়নই আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নহে, যাহাতে বৃহৎ ও মধ্যায়তন শিল্পের সংগে সংগে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিও কাম্যভাবে সম্প্রসারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করাও আমাদের উদ্দেশ্য।

ভারতের কুটির শিল্প ঃ ভারতের কুটির শিল্পসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) গ্রামীণ এবং (খ) পৌর। গ্রামীণ কুটির শিল্পের মধ্যে সুতাকাটা ও বয়ন, মক্ষিকা পালন, ঝুড়ি তৈয়ারি, দড়ি তৈয়ারি, বেতের কার্য প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ইহাদের মধ্যে অবশ্য সুতাকাটা ও বয়ন শিল্পই অধিক প্রসিদ্ধ।

পৌর কুটির শিল্পের উদাহরণ হিসাবে হাতীর দাঁত ও কাঠ খোদাই-এর কাজ, সূচী শিল্প, খেলনা নির্মাণ, জরির কাজ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের স্থান ঃ সকল দেশের শিল্প-ব্যবস্থাতেই কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের এক নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ড জাপান প্রভৃতি শিল্পপ্রধান দেশেও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার কারণ হইল, অনেক ক্ষেত্রে বৃহদায়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তনে উৎপাদনই সুবিধাজনক। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে অন্যান্য দিক দিয়াও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, নিয়োগের সংস্থা হিসাবে এই সকল শিল্পের গুরুত্ব অতুলনীয় বলিলেও চলে। ভারতে শুধু কুটির শিল্পসমূহে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ২ কোটির মত এবং মাত্র হস্তচালিত তাঁতশিল্পে নিযুক্ত আছে ৫০ লক্ষ লোক, যাহা বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যার সমান। ইহার সহিত ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ধরিলে নিয়োগের পরিমাণ যে বহুগুণ অধিক হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীনে বেকারের সংখ্যা যখন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তখন কর্মসংস্থানের জন্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। চতুর্থ পরিকল্পনায় মোট কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ৩·৩ কোটির মত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১ কোটির উপর লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা মাত্র

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতেই হইতে পারে। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের মত সামান্য মূলধন নিয়োগ করিয়া কর্মসংস্থানের ব্যাপক ব্যবস্থা করা বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্রে কখনই সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ছদ্ম বেকারের পরিমাণও কমান যাইতে পারে। ইহাতে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমিবে এবং কৃষকের জীবনযাত্রার মান আরও বৃদ্ধি পাইবে। উপরন্তু, কোন বৎসর ফসল না হইলে কৃষককে অনাহারে মরিতে হইবে না।

তৃতীয়ত, মূলধনের অপ্রাচুর্যের জন্যও আমাদিগকে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। সকল প্রকার বৃহদায়তন শিল্প-গঠনের জন্য যে-পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন তাহা বর্তমানে আমাদের নাই। সুতরাং সামান্য মূলধন নিয়োগ করিয়া ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে সংগঠিত করিতে হইবে এবং বেশীর ভাগ মূলধন মূল শিল্প (basic industries) গঠনে নিয়োজিত করিতে হইবে। চতুর্থত, এইভাবে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিলে মুদ্রাস্ফীতিও বিশেষ প্রবল হইতে পারিবে না। আমাদের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার বর্তমান পর্যায়ে ইহাও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পঞ্চমত, অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র শিল্প বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক। বৃহদায়তন কারখানায় উৎপন্ন হইতেছে এইরূপ দ্রব্যের অংশবিশেষ ক্ষুদ্র শিল্পে প্রস্তুত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বাই-সাইকেলের অংশ ক্ষুদ্র শিল্পে নির্মিত হইতে পারে। এ-বিষয়ে জাপান বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

পরিশেষে, শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, দেশের বাহিরেও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের বিরাট বাজার রহিয়াছে। সুতরাং এই সকল শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বহু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণের পথে প্রতিবন্ধক : ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের স্থান এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও ইহাদের সম্প্রসারণের পথে কয়েকটি বিশেষ প্রতিবন্ধক বা অসুবিধা রহিয়াছে, (১) কাঁচামাল সংগ্রহে অসুবিধা, (২) মূলধনের অভাব, (৩) অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি ও কলাকৌশল, (৪) বিক্রয়করণের অসুবিধা এবং (৫) বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা।

(১) কাঁচামাল সংগ্রহে অসুবিধা : কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে কাঁচামাল সংগ্রহে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় ফড়িয়া, ব্যাপারী প্রভৃতি মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর (middlemen) জন্য। ইহারা বেশ কিছু করিয়া মুনাফা করে বলিয়া কাঁচামালের দামও বাড়িয়া যায়। ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের দামও বৃদ্ধি পায়। ইহা ছাড়া কাঁচামাল

সংগ্রহ সম্বন্ধে অনেক সময় কোন নিশ্চয়তা থাকে না। ফলে অনেক সময় উৎপাদনও বন্ধ করিতে হয়।

(২) মূলধনের অভাব : ভারতীয় কৃষকদের মত কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগরগণও দরিদ্র। সম্বলহীন বলিয়া তাহাদিগকে যখন তখন মহাজনের নিকট হইতে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। অনেক সময় আবার তাহাদিগকে মহাজনের নিকট হইতে স্বল্প দামে মাল বিক্রয় করিবার সর্তেও ঋণ করিতে দেখা যায়। ইহার মধ্যে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগর ও মালিকরা তাহাদের প্রাপ্য লাভ হইতে বঞ্চিত হয়।

(৪) অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি ও কলাকৌশল : এখনও অনেক ক্ষেত্রে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগরগণ অনুন্নত প্রাচীন পন্থাকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। আধুনিক পদ্ধতি বা যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রসারলাভ করে নাই। চাহিদা সম্প্রসারণের জন্য আধুনিক রুচি ও ফ্যাসান অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা বিশেষ দেখা যায় না। ফলে উন্নয়নের সম্ভাবনা সত্ত্বেও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলি মৃতপ্রায় অবস্থায় রহিয়াছে।

(৪) বিক্রয়করণের অসুবিধা : বিক্রয়ের অব্যবস্থা কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের আর একটি প্রধান অসুবিধা। কাঁচামাল সংগ্রহের ন্যায় এ-ব্যবসায়েও ফড়িয়া ব্যাপারী মহাজন প্রভৃতি মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পীকে শোষণ করিতে থাকে। ইহা ছাড়া পণ্য সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে মালও অনেক সময় নষ্ট হয়।

(৫) বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা : অনেক ক্ষেত্রে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। যেমন, অনেক প্রকার তাঁতবস্ত্রই মিলবস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় হটিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ইহা যে কুটির শিল্পের স্বাভাবিক দুর্বলতা তাহা নহে; অনেকাংশে ইহা বহুদিনের অবহেলার ফল।

প্রতিবন্ধকগুলিকে কিভাবে দূর করা যায় : এই অসুবিধাগুলি দূর করিয়াই যে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের সম্প্রসারণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এখন কিভাবে অসুবিধাগুলিকে দূর করা সম্ভব তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমত, কাঁচামাল সংগ্রহের অসুবিধা ও মূলধনের অভাব সমবায় সমিতির সাহায্যে অনেকাংশে দূর করা যাইতে পারে। বিক্রয়করণও সমবায় সমিতির মাধ্যমে কাম্যভাবে সম্পাদিত হইতে পারে। একই সমবায় সমিতি যদি কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পীকে কাঁচামাল ও মূলধন যোগাইয়া সাহায্য করে এবং তাহার পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে,

তবে শিল্পীর পক্ষে মহাজনের শরণাপন্ন হইবার বা ফড়িয়া ব্যাপারী ইত্যাদির হাতে পড়িবার কোন দরকার হয় না।

আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি ব্যবহারের জন্যও মূলধনের প্রয়োজন। ইহা সমবায় সমিতির সামর্থ্যে না কুলাইলে সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করিতে হইবে। ইহা ছাড়া প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থার দায়িত্বও সরকারকে লইতে হইবে।

যাহাতে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ দাঁড়াইতে সমর্থ হয় তাহার জন্য প্রয়োজন হইলে কিছুদিনের জন্য বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণকে বাঁধিয়া দিতে হইবে, বৃহদায়তন শিল্পের উপর কর বা সেস্ (cess) বসাইয়া সেই অর্থ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে ব্যয় করিতে হইবে।

পরিশেষে, সকল প্রকার কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যা একপ্রকার নহে। যেমন, তাঁতশিল্পের সমস্যা রেশম শিল্পের সমস্যা হইতে পৃথক। সুতরাং বিভিন্ন বোর্ড গঠন করিয়া বিশেষ বিশেষ শিল্পের উন্নয়ন দায়িত্ব তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। সরকার এই সকল বোর্ডকে প্রয়োজনীয় সকল সাহায্যই করিয়া যাইবে।

অবলম্বিত বিভিন্ন উন্নয়ন-ব্যবস্থা ঃ আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় এইভাবে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

১। কাঁচামাল যোগানের ব্যবস্থা, ২। সুলভ ঋণদানের ব্যবস্থা, ৩। উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতিসাধন এবং তজ্জন্য কারিগরি শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থা, ৪। বিক্রয়বাজারের সংগঠন, ৫। বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে উহাদিগকে রক্ষা করা এবং ৬। বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য বিশেষ বিশেষ বোর্ড গঠন।

কাঁচামাল যোগান এবং সুলভে ঋণপ্রদানের জন্য প্রধানত সমবায় সমিতিগুলির উপরই নির্ভর করা হইতেছে। ইহা ছাড়া ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank of India), রিজার্ভ ব্যাংক প্রভৃতির মাধ্যমেও ঋণপ্রদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতিসাধনের জন্য কারিগরি শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। বিক্রয়বাজারের সংগঠনের জন্য সমবায়িক বিক্রয়-সংগঠন (co-operative sales organisation) ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। সরকারও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয়ের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং উহাদের উপর সেস্ বসাইয়া ঐ অর্থ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নকল্পে ব্যয় করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বস্ত্রশিল্পের উপর সেস্ বসাইয়া ঐ অর্থ তাঁতশিল্পের উন্নয়নে ব্যয় করা হইয়াছিল।

বিশেষ বিশেষ শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে-সকল বোর্ড গঠন করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে তাঁতশিল্প বোর্ড, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প বোর্ড, হস্তশিল্প বোর্ড, সিল্ক বোর্ড এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ডই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া কতকগুলি স্থানে শিল্প-উপনিবেশ (industrial estates) স্থাপন করিয়াও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হইতেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতে ব্যয় হয় ২১৮ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২৬৪ কোটি টাকা এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় বরাদ্দ ৩৭০ কোটি টাকার মত হইবে বলিয়া প্রাথমিকভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। এই বরাদ্দবৃদ্ধির অন্যতম উদ্দেশ্য হইল কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা। অর্থাৎ, যাহাতে তাহারা আপনা হইতেই বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা।

● বিনিময় ও দাম

৯ | বাজার
(Market)

মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্ম (economic activities) বাজারকে কেন্দ্র করিয়াই চলে। আমরা বাজার হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করি আবার বাজারেই আমাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি এবং শ্রম জমি মূলধন প্রভৃতি বিক্রয় করি। এইজন্য সৃষ্টি হইয়াছে দ্রব্যের বাজার (commodity market), শ্রমের বাজার (labour market), মূলধনের বাজার (capital market), ইত্যাদি। এখন আলোচনা করা যাইতে পারে যে বাজার বলিতে কি বুঝায় ?

বাজার বলিতে কি বুঝায় ? (What is a Market ?)

যে-কোন নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় চলিলে তাহাকেই সাধারণ ভাষায় বাজার বলা হয়। এই অর্থে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে যে-সকল ক্রয়বিক্রয়ের জায়গা আছে তাহারা বাজার বলিয়া অভিহিত—যেমন, নূতন বাজার, কলেজ ষ্ট্রীট বাজার, বড়বাজার প্রভৃতি। আবার গ্রামাঞ্চলে যে-সকল নির্দিষ্ট জায়গায় হাট বসে বা বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় চলে তাহাদেরও বাজার বলা হয়। কিন্তু অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে কোন নির্দিষ্ট জায়গাকে বুঝায় না ; কোন দ্রব্য বা উৎপাদনের উপাদানের ক্রেতা-বিক্রেতাগণের মধ্যে লেনদেনের যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহাকেই অর্থবিদ্যায় বাজার বলিয়া অভিহিত করা হয়। নির্দিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতাবিক্রেতারা নানা স্থানে ছড়াইয়া থাকিতে পারে—এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবস্থান করিতে পারে এবং তাহাদের মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বা কোন নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত নাও হইতে পারে। টেলিফোন টেলিগ্রাম চিঠিপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে ক্রেতাবিক্রেতাদের লেনদেন সম্পাদিত হইতে পারে।

সুতরাং যদি কোন অঞ্চলে বিশেষ দ্রব্যের ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে আদানপ্রদানের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ফলে উহাদের প্রদত্ত বিভিন্ন দাম একে অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তবে ঐ অঞ্চল সংকীর্ণ হউক বা বিস্তৃত হউক উহাকে বাজার বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

বাজারের উপাদান : উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বাজারের উপাদানের ইংগিত পাওয়া যায়। প্রথমত, বাজারের জন্য বিশেষ দ্রব্য থাকা চাই। বস্তুত, অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে পৃথক পৃথক জিনিসের জন্য পৃথক পৃথক বাজার বুঝায়—যেমন, গমের বাজার, পাটের বাজার, তুলার বাজার প্রভৃতি। এই সকল পণ্য (commodities) ব্যতীত অন্যান্য ধরনের বাজারও আছে—যেমন, বৈদেশিক মুদ্রার

বাজার, শেয়ার-বাজার, শ্রমের বাজার। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতাবিক্রেতা থাকা চাই। যে-কোন দ্রব্যের দাম (price) থাকিলেই উহার বাজার থাকিবে। তৃতীয়ত, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

বাজারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Markets)

বিভিন্নভাবে বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে।

ক। স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার ঃ পরিধি অনুযায়ী বাজার স্থানীয় (Local), জাতীয় (National) ও আন্তর্জাতিক (International) হইতে পারে। দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকিলে তাহাকে স্থানীয় বাজার বলে—যেমন, তরিতরকারি, ইট প্রভৃতির ক্রয়বিক্রয় সাধারণত দেশের নির্দিষ্ট অঞ্চলে বা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে; সুতরাং উহাদের বাজারকে স্থানীয় বাজার বলা হয়। অনেক জিনিস আছে যাহাদের ক্রয়বিক্রয় সমগ্র দেশ জুড়িয়া চলে অথচ ইহাদের চালান বিদেশে যায় না—দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই সকল দ্রব্যের বাজার জাতীয় বাজার। বর্তমান জগতে পরিবহণ ও সংসরণ, ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রসারের ফলে আবার অনেক দ্রব্যের বাজার দেশের সীমাকেও অতিক্রম করিয়াছে। ফলে উহাদের বাজার এখন জগদ্ব্যাপী—যেমন, পাট তুলা স্বর্ণ প্রভৃতির বাজার আন্তর্জাতিক।

খ। অত্যল্পকালীন, স্বল্পকালীন, দীর্ঘকালীন এবং অতি-দীর্ঘকালীন বাজার ঃ সময়ের তারতম্য অনুসারে বাজারের প্রকারভেদ করা যায়। মার্শাল (Marshall) সময়ের দিক হইতে চারি প্রকারের বাজারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, অত্যল্পকালীন বাজার (very short-period market), স্বল্পকালীন বাজার (short-period market), দীর্ঘকালীন বাজার (long-period market) এবং অতি-দীর্ঘকালীন বাজার (secular-period or very long-period market)। এই চারি প্রকারের বাজারের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে হইল এইরূপ ঃ

(১) অত্যল্পকালীন বাজারঃ এক দিনের বা কয়েক দিনের বাজারকে মার্শাল অত্যল্প-কালীন বাজারের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। এইরূপ বাজারের মেয়াদ বা সময় এতই অল্প যে যোগানের (supply) হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয় না—অর্থাৎ, যোগান মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে। এই অবস্থায় দামের উপর চাহিদার প্রভাব অধিক পড়িবে। চাহিদা অধিক হইলে দাম বৃদ্ধি পাইবার প্রবণতা দেখা দিবে, আর চাহিদা হ্রাস পাইলে দাম-হ্রাসের ঝোঁক দেখা দিবে। উদাহরণস্বরূপ, এক বিশেষ দিনে বাজারে মৎস্য যোগানের কথা ধরা যাউক। ঐ দিনের দামের তারতম্য অনুসারে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। মৎস্য যোগানের পরিমাণ এইভাবে নির্দিষ্ট থাকায় চাহিদা অধিক হইলে

মৎস্যের দাম বৃদ্ধি পাইবে, চাহিদা কম থাকিলে মৎস্যের দাম হ্রাস পাইবে। দাম অত্যল্প হইলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত মৎস্যই বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে, কারণ মৎস্য অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী পচনশীল দ্রব্য। তবে সকল দ্রব্যই মৎস্যের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নয়। আবার বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনেক ক্ষণস্থায়ী দ্রব্যই কিছু সময়ের জন্য ধরিয়া রাখা সম্ভব হয়। এই অবস্থায় অত্যন্ত স্বল্পকালীন বাজারেও কোন দ্রব্যের চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সংগে সংগে যোগানেরও কতকটা পরিবর্তন করা সম্ভব হয়।

(২) স্বল্পকালীন বাজার : স্বল্পকালীন বাজারে দ্রব্যের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করিবার মত সময় হাতে থাকে। তবে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের দ্বারা যতটা পরিমাণ পরিবর্তন সম্ভব যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি ততটা পরিমাণই হইবে। অর্থাৎ, স্বল্পকালীন বাজারের সময় এত যথেষ্ট নয় যে উহার মধ্যে উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পের পক্ষে বিশেষীকৃত বা স্থায়ী সাজসরঞ্জামের বা মূলধনের (specialised or fixed equipment or capital) পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। সুতরাং স্বল্পকালীন বাজারে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সহিত যোগান মাত্র আংশিকভাবে তাল রাখিয়া চলিতে পারে।

(৩) দীর্ঘকালীন বাজার : দীর্ঘকালীন বাজারে চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী সমধিক পরিমাণে যোগানের পরিবর্তন সাধনের যথেষ্ট সময় থাকে। চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলি স্থায়ী মূলধন, কুশলী শ্রমিক বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে পারে। ইহা ব্যতীত নূতন নূতন কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়া সংশ্লিষ্ট 'শিল্পে'র কলেবর বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। অপরপক্ষে চাহিদা হ্রাস পাইলে দীর্ঘকালীন বাজারে শিল্পে অবস্থিত কারখানাগুলির উৎপাদন কমান যায়। দীর্ঘকালীন বাজারে সময় অধিক হওয়ায় এইভাবে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সহিত সম্পূর্ণভাবে তাল রাখিয়া চলিতে পারে।

(৪) অতি-দীর্ঘকালীন বাজার : মার্শাল দীর্ঘকালীন বাজার ব্যতীত অতি-দীর্ঘকালীন বাজারের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ বাজারের সময় এতই দীর্ঘ যে সাধারণ দীর্ঘকালীন বাজারে যে-সকল পরিবর্তন সম্ভব হয় তাহা ছাড়াও আরও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে। যেমন, এক যুগ হইতে অন্য যুগের মধ্যে মানুষের জ্ঞান, জনসংখ্যার আয়তন, মূলধন সরবরাহের অবস্থা, মানুষের রুচি অভ্যাস প্রভৃতি সকলই পরিবর্তিত হইতে পারে। এই সমস্তের প্রভাবের ফলে দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে।

বাজারের আয়তন (Size of a Market)

সকল দ্রব্যের বাজারের আয়তন একপ্রকারের নয়। ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোন কোন দ্রব্যের বাজার জগদ্ব্যাপী, আবার কোন কোন দ্রব্যের বাজার

অত্যন্ত সংকীর্ণ ও স্থানীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। যদিও বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের প্রসার এবং পরিবহণ ও আদানপ্রদানের সুযোগসুবিধার উন্নতির ফলে বহু দ্রব্যের বাজারই সম্প্রসারিত হইতেছে, তবুও কোন দ্রব্যের বাজারের আয়তন বিস্তৃত হইতে হইলে কতকগুলি সর্ত পূরিত হওয়া প্রয়োজন। সর্তগুলির মোটামুটি বর্ণনা এইভাবে করা যায়।

(১) স্থায়িত্ব (Durability): ক্ষণস্থায়ী বা পচনশীল দ্রব্যের বাজার স্বাভাবিকভাবেই সংকীর্ণ হয়। ক্ষণস্থায়ী হইলে স্থানান্তরে প্রেরণে অসুবিধা হয় এবং প্রেরণের সময়ের মধ্যে দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং দ্রব্যাদি যত দীর্ঘস্থায়ী হইবে অন্য কোন বাধা না থাকিলে উহাদের বাজার তত সম্প্রসারিত হইবে।

(২) সহজে স্থানান্তরে প্রেরণের সুবিধা (Portability): সুপরিসর বাজারের জন্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটি সহজেই স্থানান্তরে প্রেরণযোগ্য হওয়া চাই। আয়তনের তুলনায় দাম যত অধিক হইবে দ্রব্যের প্রেরণযোগ্যতা তত বেশী সহজ হইবে। ইটের কথা যদি ধরা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ইটের আয়তন বা ওজনের তুলনায় উহার দাম অতি সামান্য। ফলে উহাকে স্বল্প খরচে অল্প সময়ের মধ্যে স্থানান্তরে প্রেরণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং ইহার বাজার সংকীর্ণ হইতে বাধ্য। অপরপক্ষে সোনার মত মূল্যবান ধাতুর বাজার বিস্তৃত হয়, কারণ আয়তনের তুলনায় উহার দাম অধিক।

(৩) সহজে চেনার যোগ্যতা (Cognizability): যে-সকল দ্রব্যের গুণাগুণ সহজেই বুঝিয়া লওয়া যায় তাহাদের বাজারও বিস্তৃত হয়। এইজন্য মূল্যবান ধাতু, সরকারী ঋণপত্র বা কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতির বাজার ব্যাপক হয়।

(৪) ব্যাপক চাহিদা (Wide Demand): অন্যান্য সুযোগসুবিধা যতই থাকুক না কেন, কোন দ্রব্যের বাজার সুপরিসর হইতে হইলে ঐ দ্রব্যটির স্থায়ী ও ব্যাপক চাহিদা থাকা চাই। উদাহরণস্বরূপ, সোনারূপা প্রভৃতির চাহিদা জগদ্ব্যাপী বলিয়া উহাদের বাজারও সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত।

বাজার ও প্রতিযোগিতা (Market and Competition)

বাজারের দুইটি পক্ষ আছে—ক্রেতা ও বিক্রেতা। ক্রেতাবিক্রেতাদের চাহিদা ও যোগানের প্রভাবের ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সংখ্যা ও প্রতিযোগিতার তারতম্য থাকিতে পারে। এই তারতম্যের জন্যই বাজারে বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাজারের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা লইয়া চলা প্রয়োজন, কারণ উৎপাদন (production) বণ্টন (distribution) বিনিময় (exchange) প্রভৃতি অর্থনৈতিক সমস্যার রূপ বাজারের অবস্থার (conditions of market) দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, দ্রব্যের দাম-নির্ধারণের

কথা উল্লেখ করা যায়। বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে দাম-নির্ধারণে এক ধরনের শক্তি কার্য করিবে; আবার বাজারে যদি একচেটিয়া ব্যবসায় চালু থাকে তাহা হইলে দাম-নির্ধারণের সূত্র ভিন্ন আকার ধারণ করিবে।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা (Perfect Competition)

অর্থবিদ্যাবিদগণ যখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করেন তখন তাঁহারা নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি বর্তমান থাকে বলিয়া ধরিয়া লন: (১) বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা (a large number of buyers and sellers), (২) সমজাতীয় দ্রব্য (homogeneous commodity), (৩) ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, (৪) ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের অনস্তিত্ব, (৫) উৎপাদন ব্যাপারে প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, (৬) নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ সুযোগ (free entry) এবং (৭) শ্রম জমি মূলধন প্রভৃতি উপাদানের পূর্ণ গতিশীলতা (perfect mobility of the factors of production)।

বহুসংখ্যক ক্রেতাবিক্রেতা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার প্রথম সর্ত। এখন প্রশ্ন হইল, 'বহুসংখ্যক' বলিতে কি বুঝায় এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উহার তাৎপর্যই বা কি? কত সংখ্যা হইলে বহুসংখ্যক হইবে সে-সম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। তবে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের জন্য ক্রেতাবিক্রেতাদের সংখ্যা এত বেশী হওয়া প্রয়োজন যে, যেন কোন ক্রেতা ও বিক্রেতা এককভাবে লেনদেন বা দ্রব্যমূল্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে। প্রত্যেক বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানের যোগান মোট যোগানের তুলনায় এত সামান্য যে একজন বিক্রেতা বা একটি প্রতিষ্ঠানের যোগানের পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্যের কোন পরিবর্তন ঘটে না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। ধরা যাউক, বাজারে ধানের মোট যোগানের পরিমাণ ২০০ লক্ষ কুইণ্টাল এবং কোন একজন কৃষকের সর্বাধিক উৎপাদনক্ষমতা হইল ২০০ কুইণ্টাল। এই অবস্থায় ঐ কৃষক বাজারে ২০০ কুইণ্টাল বিক্রয় করিল বা না-করিল তাহার দ্বারা বাজারে ধানের দাম পরিবর্তিত হইবে না। উৎপাদক হিসাবে সংশ্লিষ্ট কৃষক এতই ক্ষুদ্র যে তাহার পক্ষে বাজার-দামের উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয় না। সুতরাং তাহাকে প্রচলিত বাজার-দামেই বিক্রয় করিতে হয় এবং ঐ দামে সে কমবেশী যেমন খুশি বিক্রয় করিতে পারে।

সমজাতীয় দ্রব্য বলিতে বুঝায় গুণগত দিক দিয়া দ্রব্যটির কোন একক অপর যে-কোন এককের সমান। ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অর্থ হইল বাজারের বিভিন্ন অংশে কি দামে ক্রয়বিক্রয় চলিতেছে, সে-সম্পর্কে সকল ক্রেতা-বিক্রেতাই পুরাপুরি অবহিত থাকিবে। ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে পক্ষপাতিত্বের অনস্তিত্ব

বলিতে বুঝায় নির্দিষ্ট দামে ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে অবাধ লেনদেন চলিবে—কোন ক্রেতা বিক্রেতা বাছাই করিয়া দ্রব্যটি ক্রয় করিবে না এবং কোন বিক্রেতাও কোন ক্রেতাকে কোনরূপ স্থবিধা দিবে না বা খাতির করিবে না। তারপর অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন্‌টি কত পরিমাণ উৎপাদন করিবে এবং বাজারে যোগান দিবে, সে-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেরাই। অর্থাৎ, এই ব্যাপারে তাহারা কোন সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশে চলিবে না।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার পরবর্তী সর্ত হইল সংশ্লিষ্ট শিল্পে প্রতিষ্ঠানের অবাধে প্রবেশের স্থযোগ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে জমি শ্রম মূলধন প্রভৃতি উপাদানের পূর্ণ গতিশীলতা। নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশের স্থযোগ থাকে বলিয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বহু হয়। উপাদানসমূহের পূর্ণ গতিশীলতার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিল্পে একই উপাদানের দাম—যেমন শ্রমের—একই হয়।

একচেটিয়া কারবার (Monopoly)

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হইল একচেটিয়া কারবার। একচেটিয়া বাজারে মাত্র একজন বিক্রেতা বা একটি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের যোগান দিয়া থাকে। কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ করপোরেশন একচেটিয়া কারবারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

একচেটিয়া কারবার যদি নিখুঁত (pure or absolute) হয় তাহা হইলে একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের কোনপ্রকার পরিবর্ত-দ্রব্য (substitute) থাকিবে না, এবং ফলে তাহাকে কোন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে না। এইরূপ নিখুঁত একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের দাম চড়া রাখিলেও ক্রেতাগণ তাহার নিকট হইতে কম ক্রয় করিবে না বা অন্য দ্রব্যবিক্রেতার দিকে ঝুঁকিতে পারিবে না।

কিন্তু একেবারে পরিবর্ত-দ্রব্য (substitute) ও মোটেই প্রতিযোগিতা থাকিবে না এবং যতই দাম বৃদ্ধি করা হউক না কেন ক্রেতারা সমপরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে থাকিবে, এরূপ কল্পনা করা অতিমাত্রায় অবাস্তব বলিয়া মনে হয়। এইজন্য সাধারণত একচেটিয়া কারবার বলিতে বুঝায় এমন একটি অবস্থা যেখানে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের সরবরাহকারী হইল একজন এবং বাজারে ঐ দ্রব্যের 'ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্যের অভাব' (absence of close substitutes) দেখা যায়। ঘনিষ্ঠ পরিবর্তের অভাব বলিতে বুঝায় যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত-দ্রব্য এতই দূরবর্তী (remote) বা এতই অপ্রচুর যে একচেটিয়া কারবারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিযোগিতার কথা বিশেষ চিন্তা না করিয়াই আপন দ্রব্যের দাম ধার্য করিতে পারে। স্থতরাং একচেটিয়া কারবারে প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা (Imperfect Competition)

বাস্তব জগতে নিখুঁত একচেটিয়া কারবার যেমন দেখা যায় না তেমনি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সন্ধানও কদাচিৎ পাওয়া যায়। এই দুই-এর মধ্যবর্তী অবস্থাই বাজারে সচরাচর দেখা যায়। অর্থাৎ, বেশীর ভাগ শিল্পের বেলায় প্রতিযোগিতা হইল অপূর্ণাংগ (imperfect competition)। প্রতিযোগিতা অপূর্ণাংগ হয় প্রধানত তিনটি কারণে। প্রথমত, বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অল্প হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিক্রয় দ্রব্য সমজাতীয় না হইতে পারে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে যখন দ্রব্য সমজাতীয় হয় এবং ক্রেতা বহুসংখ্যক হয় তখন প্রতিযোগিতা হয় নিখুঁত বা পূর্ণাংগ। এই দুইটির যে-কোনটির অভাবে প্রতিযোগিতা অপূর্ণাংগ হইতে পারে।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন রূপ ঃ অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার একটি রূপ হইল 'একচেটিয়া প্রতিযোগিতা' (Monopolistic Competition)। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা পৃথকীকৃত (differentiated) কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (close substitute products) লইয়া প্রতিযোগিতা করে। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতার সংখ্যা বহু হইলেও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার মত বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্যাদি সমজাতীয় হয় না। কিন্তু একেবারে সমজাতীয় না হইলেও বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্যাদি সদৃশ ও ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য হয়, একচেটিয়া কারবারের মত দূরবর্তী পরিবর্ত-দ্রব্য (remote substitute products) নয়। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা ট্রেডমার্ক, সুন্দর প্যাকেট প্রভৃতির দ্বারা পৃথকীকরণের চেষ্টা করে এবং অনুরূপ দ্রব্য হইতে যে তাহার দ্রব্য উৎকৃষ্টতর তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করে।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার আর একটি রূপ হইল অলিগোপলি (Oligopoly) বা কতিপয় প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতাবিশিষ্ট কারবার। যখন বাজারে একজন বিক্রেতা বা বহুসংখ্যক বিক্রেতার স্থলে মাত্র কতিপয় বিক্রেতা প্রতিযোগিতা করে তখন তাহাকে অলিগোপলি বা কতিপয় প্রতিষ্ঠানবিশিষ্ট কারবার বলা হয়। অলিগোপলির একটি বিশেষ সংস্করণ হইল দ্বি-বিক্রেতাবিশিষ্ট কারবার বা ডুয়োপলি (Duopoly)। ডুয়োপলিতে দুইজন বিক্রেতা বা দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। পরিশেষে, দ্বিপক্ষীয় একচেটিয়া কারবারের (bilateral monopoly) কথাও বলা হইয়া থাকে। এইরূপ বাজারে মাত্র একজন ক্রেতা ও মাত্র একজন বিক্রেতা থাকে বলিয়া ধরা হয়।

১০ | দাম-নির্ধারণের গোড়ার কথা
(Introduction to Price Determination)

অভাবমোচনের সমস্যাই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। অভাবের পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে। উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবা বিনিময়ের মাধ্যমে ভোগীর নিকট গিয়া পৌছায়। বিনিময়কার্য সম্পাদিত হয় বাজারে। সুতরাং বাজারে বিনিময় হইল উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সেতু।

সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় (Barter) : বাজারে বিনিময়কার্য বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রথম প্রথম সরাসরি দ্রব্য-বিনিময়ই করা হইত। সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় কয়েকটি সর্তের উপর নির্ভরশীল। অন্যতম সর্ত হইল যে বিনিময়কারী ব্যক্তিগণের প্রত্যেককেই মনে করিতে হইবে যে বিনিময় দ্বারা তাহার লাভ হইবে। ধরা যাউক, এক ব্যক্তি চাউলের পরিবর্তে সরিষার তৈল চায় এবং অপর এক ব্যক্তি সরিষার তৈলের পরিবর্তে চাউল চায়। অতএব, উভয়েরই অপরের দ্রব্য পাইবার জন্য আকাংক্ষা রহিয়াছে। কিন্তু কতটা চাউলের পরিবর্তে কতটা সরিষার তৈল বিনিময় করা যাইতে পারে সে-সম্বন্ধে উভয়ে একমত না হইলে বিনিময় সংঘটিত হইবে না। যাহার চাউল আছে সে যদি মনে করে চাউল বিনিময় করিয়া তাহার যে 'ক্ষতি' হইবে সরিষার তৈল হইতে তাহা অপেক্ষা বেশী 'লাভ' পাওয়া যাইবে এবং অনুরূপভাবে সরিষার তৈলের মালিক যদি মনে করে যে সরিষার তৈলের বিনিময়ে চাউল পাওয়ায় তাহার লাভ বাড়িবে—তবেই চাউল ও সরিষার তৈলের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হইবে। এই যে 'লাভক্ষতি'র উল্লেখ করা হইল অর্থবিদ্যায় উহাকেই 'উপযোগ' বলে। সুতরাং বিনিময় দ্বারা উভয় পক্ষেরই উপযোগ বর্ধিত হয়। উভয় পক্ষের উপযোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকিলে বিনিময় সম্পাদিত হইবে না।

বর্তমানে পরোক্ষ বা টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময়ের ব্যাপারেও ঐ একই সর্ত কার্য করে। টাকাকড়ির বিনিময়ে দ্রব্য সংগ্রহ করিলে একদিক দিয়া উপযোগ বাড়ে, অন্য দিক দিয়া টাকাকড়ি কমিয়া যাওয়ার জন্য উপযোগ বা অভাবমোচনের ক্ষমতা কমে। বিক্রেতার পক্ষে দ্রব্যের বিনিময়ে টাকাকড়ি পাওয়ার জন্য উপযোগ বাড়ে, কিন্তু দ্রব্য হস্তান্তরিত হওয়ায় উপযোগ কমে।

সুতরাং ক্রেতাবিক্রেতা উভয়েই যদি মনে করে তাহাদের উপযোগ বাড়িবে তবেই টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময় সম্পাদিত হইতে পারে। এইজন্য দেখা যায় যে, 'দামে না পোষানর দরুন' অনেকে বাজারে জিনিস ক্রয় করিতে গিয়াও ফিরিয়া আসিয়াছে, অথবা খরিদ্দার থাকা সত্ত্বেও বিক্রেতা বিক্রয় করে নাই।

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষের যখনই 'দামে পোষায়' তখন টাকা ও জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হয়। এই দামকে অর্থবিদ্যায় 'বাজার-দাম' (Market Price) বলা হয়। এই দামেই বাজারে জিনিসপত্র ক্রয়বিক্রয় হয়। এ-সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

মূল্য ও দাম (Value and Price)

মূল্য ও দামের পার্থক্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে (১৩-১৪ পৃষ্ঠা)। মূল্যকে টাকাকড়ির অংকে প্রকাশ করিলে উহাকে দাম বলা হয়। বিভিন্ন দ্রব্যের দাম জানিতে পারিলে আমরা উহাদের পারস্পরিক মূল্য নির্ধারণ করিয়া লইতে পারি। ধরা যাউক, এক কিলোগ্রাম চাউলের দাম ৫০ পয়সা এবং এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম ২ টাকা। এক্ষেত্রে উভয়ের বিনিময়-মূল্য হইবে ১ কিলোগ্রাম চাউল = ২৫০ গ্রাম সরিষার তৈল। চাউলের দাম বাড়িয়া যদি প্রতি কিলোগ্রাম ২ টাকা এবং সরিষার তৈলের দাম বাড়িয়া যদি প্রতি কিলোগ্রাম ৮ টাকা হয় তবে এখনও ১ কিলোগ্রাম চাউলের পরিবর্তে ২৫০ গ্রাম সরিষার তৈল পাওয়া যাইবে। কিন্তু সাধারণত এরূপ ঘটে না—সকল জিনিসের দাম সমপরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মূল্য পরিবর্তিত হইতে পারে। এই পারস্পরিক মূল্য কতটা পরিবর্তিত হইয়াছে, বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মূল্য কি?—এই সকল বিষয় অনুধাবনের সহজ উপায় হইল দাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। দাম সম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রথমেই আছে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা দেখা।

দাম-নির্ধারণ (Price Determination)

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, বাজারে দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। সুতরাং দাম বা মূল্যের দুইটি দিক আছে—(ক) চাহিদার দিক এবং (খ) যোগানের দিক। চাহিদার সৃষ্টি করে ক্রেতারা এবং যোগান দেয় উৎপাদকগণ। চাহিদা ও যোগান যেখানে পরস্পরের সমান হয় সেখানেই দাম নির্ধারিত হয়।

প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণের অনেকে মনে করিতেন যে দাম শুধু যোগান দ্বারাই নির্ধারিত হয়—অর্থাৎ, দাম-নির্ধারণে চাহিদার কোন ভূমিকা নাই। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। চাহিদা না থাকিলে যোগান বেশী হউক আর কম হউক, দামের কোন প্রশ্নই উঠে না। জনমানবহীন জংগলে কাঠের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, দামের সমস্যা দেখা দিবে না। সুতরাং মাত্র যোগান দ্বারা কোন দামই নির্ধারিত হয় না।

মার্শালকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, কাঁচির দ্বারা কোন কিছু কাটা হইলে যেমন উপরের এবং নীচের দুইটি ফলাই ব্যবহৃত হয়, তেমনি দাম-নির্ধারণের ক্ষেত্রে

চাহিদা ও যোগান উভয়ই ক্রিয়া করে। অথবা, ক্রিকেট খেলায় 'ন্যাটা' ব্যাটস্‌ম্যান যেমন শুধু বাম হাতেই ব্যাট করে না, তাহার ডান হাতটিও যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি দাম চাহিদা ও যোগান উভয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়, শুধু চাহিদা বা শুধু যোগান দ্বারা নহে।

চাহিদা ও যোগান (Demand and Supply)

চাহিদা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, চাহিদা দামের সহিত সংশ্লিষ্ট। দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমে (২৪ পৃষ্ঠা)। ইহাকেই চাহিদার সূত্র বলা হয়।

চাহিদার মত যোগানের পরিমাণও দাম-পরিবর্তনের সংগে সংগে পরিবর্তিত হয়। দাম কমিলে মুনাফা কমে ; ফলে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। আর দাম বাড়িলে মুনাফার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় বলিয়া যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং চাহিদার সূত্রের (Law of Demand) মত যোগানেরও একটি সূত্র আছে। ইহাকে যোগানের সূত্র (Law of Supply) বলা হয়। যোগানের সূত্র হইতে যোগান-সূচী (Supply Schedule) প্রস্তুত করা যাইতে পারে। নিম্নে একটি যোগান-সূচী দেওয়া হইল।

প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম	সরিষার তৈলের যোগানের পরিমাণ
৩ টাকা	১৫ কুইণ্টাল
২.৫০ "	১৩ "
২ "	১০ "
১.৫০ "	৭ "
১ "	৪ "

সূত্রটি হইতে দেখা যাইবে যে দাম যত বাড়িতেছে যোগানের পরিমাণও তত বাড়িতেছে। এই দামকে যোগান-দাম (Supply Price) বলা হয়। যোগানের উপর দামের প্রভাব চাহিদার উপর দামের প্রভাবের ঠিক বিপরীত। এই কারণে যোগান-রেখা (Supply Curve) অংকন করা হইলে তাহার গতিও চাহিদা-রেখার বিপরীতমুখী—অর্থাৎ, উর্ধ্বমুখী হইবে।

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রটির সাহায্যে যোগানের সূত্র ব্যাখ্যা করা হইল।

দাম যখন ১ টাকা তখন যোগান ৪ কুইণ্টাল ; দাম বাড়িয়া ১ টাকা হইতে ১.৫০ টাকা, ১.৫০ টাকা হইতে ২ টাকা, ২ টাকা হইতে ২.৫০ টাকা এবং ২.৫০ টাকা হইতে ৩ টাকা হইলে যোগানের পরিমাণও বাড়িয়া যথাক্রমে ৭, ১০, ১৩ এবং ১৫ কুইণ্টাল হইবে। বিভিন্ন দামে সরিষার তৈলের যোগানের পরিমাণ নির্দেশক উপরের দিকে ৪, ৭, ১০, ১৩ এবং ১৫ যোগ করিলে যে-রেখাটি (SS_1) পাওয়া যায় তাহাই যোগান-রেখা। প্রতিবার দামবৃদ্ধির ফলে ইহা উপরের দিকে উঠিতেছে।



যোগানের পশ্চাতে কোন্ কোন্ শক্তি কার্য করে : এখন প্রশ্ন হইল, বিভিন্ন দামে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য যোগান হয় কেন ? অর্থাৎ, যোগানের পশ্চাতে কোন্ কোন্ শক্তি কার্য করে ? এই প্রশ্নের বিচারে বিভিন্ন সময়ে যোগানের বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন বাজারে (short-period and long-period markets) যোগান নির্ধারিত হয় উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা। যে-দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিলে উৎপাদন-ব্যয় (cost of production) পোষায় উৎপাদকগণ সেই পরিমাণ দ্রব্যই যোগান দিয়া থাকে। আমাদের উদাহরণে ১ টাকা কিলোগ্রাম দামে ৪ কুইণ্টাল, ১'৫০ টাকা কিলোগ্রাম দামে ৭ কুইণ্টাল, ২ টাকা কিলোগ্রাম দামে ১০ কুইণ্টাল, ইত্যাদি পরিমাণ সরিষার তৈল যোগান দিলে উৎপাদকদের পোষায়—ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। দাম উহা অপেক্ষা কম হইলে উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান হইবে না বলিয়া উৎপাদনও কমিবে ; ফলে যোগানও হ্রাস পাইবে।

অত্যল্পকালীন বাজারে (very short-period market) কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ কমাইবার বিশেষ সুযোগ থাকে না। ফলে ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় যে মজুত মালের মধ্যে তাহারা কতটুকু পরিমাণ বাজারে ছাড়িবে। ইহা নির্ধারিত হয় সংরক্ষণ-দাম (Reservation Price) দ্বারা। সংরক্ষণ-দাম বলিতে সেই দামকেই বুঝায় যাহা না পাইলে বিক্রেতারা বাজারে মাল ছাড়িবে না। এই সংরক্ষণ-দাম নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যথা, মজুত মালের পরিমাণ ও প্রকৃতি, ভবিষ্যতে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সম্ভাবনা, বিক্রেতাদের নগদ টাকার প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি। মজুত মালের পরিমাণ যদি অধিক হয় এবং দ্রব্যটি যদি

মাছ-তরিতরকারির মত পচনশীল হয় তবে বিক্রেতাদের যথাশীঘ্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিতে হইবে। ফলে উহার সংরক্ষণ-দামও কম হইবে। অপরপক্ষে দ্রব্যটি যদি পচনশীল না হয় এবং মজুত মালের পরিমাণ যদি অধিক না হয় তবে দাম কম হইলে বিক্রেতারা দ্রব্যটি ধরিয়া রাখিবার প্রচেষ্টাই করিবে। এক্ষেত্রে দ্রব্যটি ধরিয়া রাখিবার সময় তাহারা ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুমান করিবে। ভবিষ্যতে যদি চাহিদাবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে তবেই তাহারা মাল ধরিয়া রাখিবে, নচেৎ নয়। আবার বিক্রেতাদের নিকট নগদ টাকার প্রয়োজনীয়তা যদি খুব বেশী হয় তবে ভবিষ্যতে চাহিদাবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও তাহাদের পক্ষে স্বল্প দামে বিক্রয় করিবার চাপ অধিক হইবে। এইভাবে বিভিন্ন বিষয়ের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা সংরক্ষণ-দাম নির্ধারিত হয়।

সংরক্ষণ-দাম বিভিন্ন বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হইলেও উহার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। কারণ, ব্যবসায়ীরা নগদ টাকার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির প্রভাব যথাসম্ভব কাটাইয়া উঠিয়া যতক্ষণ-পর্যন্ত না দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয় ততক্ষণ মাল ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। অবশ্য অত্যল্পকালীন চাহিদা যদি বিশেষ হ্রাস পায় এবং অদূর ভবিষ্যতে উহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকে তবে আর মাল ধরিয়া রাখে না—উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অল্প বাজার-দামেই উহা বিক্রয় করিয়া দেয়। অতএব, দেখা যায় যে অত্যল্পকালীন যোগান উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা বেশ কতকটা প্রভাবান্বিত হয়।

স্বল্পকালীন অবস্থায় যোগানের উপর উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাব আরও অধিক। বলা যায়, স্বল্পকালীন ভিত্তিতে যোগান মোটামুটি উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয়।

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে কিন্তু যোগান উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা পুরাপুরিই প্রভাবান্বিত হয়—উৎপাদন-ব্যয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়। কারণ, বহুদিন ধরিয়া লোকসান দিয়া কেহই উৎপাদন করিতে চাহে না।

উৎপাদন-ব্যয় এবং উৎপন্নের বিধিসমূহ (Cost of Production and Laws of Returns)

দেখা গেল, অত্যল্পকালীন, স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন—সকল বাজারেই যোগানের উপর উৎপাদন-ব্যয়ের কিছু-না-কিছু প্রভাব রহিয়াছে। কিন্তু উৎপাদন-ব্যয় সকল ক্ষেত্রে এক থাকে না। উৎপাদন-ব্যয় কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে উৎপন্নের বিভিন্ন বিধির (Laws of Returns) উপর।

উৎপন্নের বিধি যে দুই শ্রেণীর তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে—যথা, উপাদানের ক্ষেত্রে উৎপন্নের বিভিন্ন বিধি (Laws of Returns to Factors) বা পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি (Law of Variable Proportions) এবং আয়তনের

ক্ষেত্রে উৎপন্নের বিভিন্ন বিধি (Laws of Returns to Scale)। স্বল্পকালীন অবস্থায় যখন উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য সকল উপাদান সমভাবে বাড়ান সম্ভব হয় না তখনই কাম্য অনুপাতের অভাবে প্রথম শ্রেণীর উৎপন্নের বিধিগুলি কার্য করে। দীর্ঘকালে অবশ্য সকল উপাদানেরই প্রয়োজনীয় হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনের আয়তন পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। তখন কার্য করে আয়তনের ক্ষেত্রে উৎপন্নের বিধিগুলি। উভয় শ্রেণীভুক্ত উৎপন্নের বিধি সংখ্যায় তিনটি করিয়া—(ক) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধি, (খ) ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধি এবং (গ) সমহারে উৎপন্নের বিধি (৪৩-৪৬ পৃষ্ঠা)। স্বল্পকালেই হউক আর দীর্ঘকালেই হউক, কোন দ্রব্যের উৎপাদন ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের নিয়মাধীন হইলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধির সংগে সংগে যোগান-দামও বাড়িতে থাকিবে, উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের সূত্রাধীন হইলে যোগান যত বাড়িবে যোগান-দাম তত কমিবে এবং সমহারে উৎপন্নের বিধি কার্য করিলে যোগান-দাম কমিবেও না, বাড়িবেও না—একই থাকিবে।

চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য (Equilibrium of Demand and Supply)

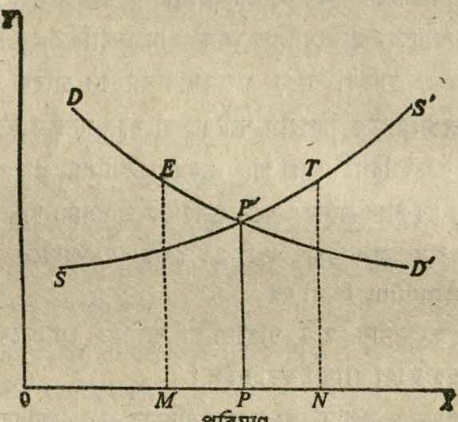
চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিবার পূর্বে দেখা যাউক যে ইহাদের প্রভাবে কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক দাম নির্ধারিত হয়। চাহিদার নিয়ম অনুসারে দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়িলে চাহিদা কমে ; অপরদিকে যোগানের নিয়ম অনুসারে ঠিক বিপরীত ঘটে। দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণের এই বিপরীতমুখী গতি একস্থানে আসিয়া পরস্পরের সহিত সমান হইতে দেখা যায়। যে-দামে এইরূপ ঘটে তাহাকে ভারসাম্য-দাম (Equilibrium Price) এবং ঐ দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হয় তাহাকে ভারসাম্য পরিমাণ (Equilibrium Amount) বলা হয়।

নিম্নে চাহিদা ও যোগান সূচী পাশাপাশি সাজাইয়া প্রতিযোগিতামূলক দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা ব্যাখ্যা করা হইল :

সরিষার তৈলের চাহিদার পরিমাণ	প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম	সরিষার তৈলের যোগানের পরিমাণ
৫ কুইণ্টাল	৩ টাকা	১৫ কুইণ্টাল
৭ „	২·৫০ „	১৩ „
১০ „	২ „	১০ „
১৫ „	১·৫০ „	৭ „
২৫ „	১ „	৪ „

আমাদের চাহিদার তালিকা হইতে দেখা যায় যে দামবৃদ্ধির সংগে সংগে চাহিদার পরিমাণ কমিতেছে, কিন্তু যোগানের তালিকা অনুসারে দামবৃদ্ধির সংগে সংগে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। দাম যখন প্রতি কিলোগ্রাম ২ টাকা করিয়া তখন চাহিদা ও যোগান উভয়ই ১০ কুইন্টাল। দাম আরও বৃদ্ধি পাইয়া ২ টাকা হইতে ২·৫০ টাকা হইলে যোগান ১৩ কুইন্টাল হইবে কিন্তু চাহিদা ৭ কুইন্টালে নামিয়া আসিবে। ফলে বাধ্য হইয়া বিক্রেতাদের দাম কমাইতে হইবে। অপরদিকে দাম কমিয়া ১·৫০ টাকা হইলে চাহিদা বাড়িয়া ১৫ কুইন্টাল হইবে, কিন্তু যোগান কমিয়া ৭ কুইন্টালে দাঁড়াইবে। ফলে চাহিদার প্রভাবে দাম আবার উর্ধ্বমুখী হইবে। এইভাবে ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে চাহিদা ও যোগান ২ টাকা দামে পরস্পরের সহিত সমান হইবে। এই ২ টাকায় ক্রয়বিক্রয়ের অবস্থাই হইল ভারসাম্যের অবস্থা (Equilibrium Position) এবং এই ২ টাকা দামই ভারসাম্য-দাম (Equilibrium Price)। ভারসাম্য-দাম বলা হয় এই কারণে যে ঐ দামে চাহিদা ও যোগানের প্রভাবের মধ্যে সমতার সৃষ্টি হয়।

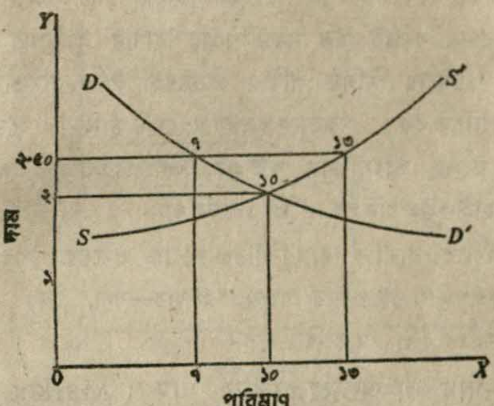
বিষয়টিকে চাহিদা ও যোগান রেখার সাহায্যে বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটি রেখাচিত্র অংকন করা হইল।



DD' পূর্বোক্ত চাহিদা-রেখা ; উহার গতি নিম্নমুখী। SS' যোগান-রেখা ; উহা উর্ধ্বগামী (২৩ এবং ৯৯ পৃষ্ঠা)। উহারা পরস্পরকে P' বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। PP' (অস্থায়ী) ভারসাম্য-দাম পরিমাপ করে। অর্থাৎ, PP' দামে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান (OP পরিমাণ) হইবে। দাম যদি বাড়িয়া ME হয় তবে চাহিদা কমিয়া OM-এ আসিয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু যোগান হইবে ON পরিমাণ। যোগানের

পরিমাণ চাহিদা অপেক্ষা অধিক হওয়ায় বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আবার দামকে PP'-তে লইয়া আসিবে।

পাটীগাণিতিক হিসাব ধরিলে আমাদের উদাহরণে PP' (দাম) হইল ২ টাকা এবং OP (চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ) হইল ১০ কুইণ্টাল। দাম PP' (২ টাকা) হইতে বাড়িয়া ME (২'৫০ টাকা) হইলে চাহিদা OP (১০ কুইণ্টাল) হইতে OM-এ (৭ কুইণ্টাল) কমিয়া আসিবে। কিন্তু যোগান OP (১০ কুইণ্টাল) হইতে ON-এ (১৩ কুইণ্টাল) বৃদ্ধি পাইবে।



দাম-নির্ধারণের ব্যাপারে চাহিদা ও যোগানের তিনটি নীতি: দাম-নির্ধারণ ব্যাপারে চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়াকে এইভাবে বিবৃত করা যায়।

(১) কোন বিশেষ দামে চাহিদা যোগান অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ দাম বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু যোগান চাহিদা অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ দাম কমার দিকে ঝোঁক দেখা দিবে।

(২) দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে কিন্তু যোগান কমে; দাম বাড়িলে চাহিদা কমে কিন্তু যোগান বাড়ে।

(৩) এইভাবে দাম এমন একটা স্তরে আসিয়া দাঁড়ায় যেখানে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পরের সমান হয়।

১১ | বাজার-দাম ও স্বাভাবিক দাম
(Market Price and Normal Price)

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম-নির্ধারণ (Price Determination in Perfectly Competitive Market) : এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম-নির্ধারণ। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় শিল্প বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান লইয়া গঠিত হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের যোগানের সমষ্টিই হইল সমগ্র শিল্পের যোগান। শিল্পের এই যোগান ও ক্রেতাদের মোট চাহিদার মিলিত শক্তির প্রভাবেই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারসাম্য-দাম নির্ধারিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেই ভারসাম্যের সৃষ্টি হয়, এবং ভারসাম্যের অবস্থায় যে-দাম নির্ধারিত হয় তাহাই হইল বাজারে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির দাম।

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম-নির্ধারণ আবার সময়ের উপর নির্ভর করে। এই দিক দিয়া প্রথমে দাম দুই পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়—যথা, (ক) বাজার-দাম বা অত্যল্পকালীন দাম এবং (খ) স্বাভাবিক দাম।

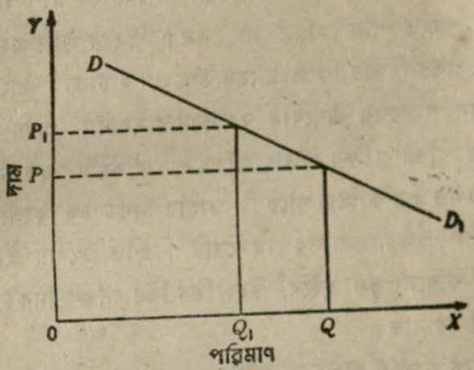
ক। বাজার-দাম বা অত্যল্পকালীন দাম (Market Price or Very Short-period Price)

অত্যল্পকাল বলিতে এমন স্বল্প সময় বুঝায় যাহার ভিতর উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ পরিবর্তিত করা সম্ভব হয় না। বিক্রেতাদের হাতে যে-পরিমাণ দ্রব্য আছে তাহার দ্বারাই যোগান সীমাবদ্ধ থাকে। এই অত্যল্পকালীন বাজারে প্রচলিত দামই বাজার-দাম বা অত্যল্পকালীন দাম বলিয়া অভিহিত হয়। এই অত্যল্পকালীন দাম বা বাজার-দাম প্রধানত নির্ভর করে ক্রেতাদের চাহিদার উপর। চাহিদা অধিক হইলে দাম অধিক হইবে, চাহিদা কম হইলে দাম কম হইবে। মাছ শাক-বজি দুধ প্রভৃতি পচনশীল দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় যাহাই হউক না কেন, ক্রেতারা যে-দাম দিতে চাহিবে বিক্রেতাগণকে তাহাতেই বিক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু বেশির ভাগ দ্রব্যই এত ক্ষণস্থায়ী নয়। বিক্রেতারা অদূর ভবিষ্যতে উচ্চতর দামে বিক্রয়ের আশায় সংশ্লিষ্ট দ্রব্য ধরিয়া রাখিতে পারে। ভবিষ্যতে এই প্রত্যাশিত দামকে সংরক্ষণ-দাম (Reservation Price) বলা হয়।* অতএব বলা যাইতে পারে যে, সংরক্ষণ-দাম হইল বিক্রেতাদের বিক্রয় করিবার ন্যূনতম দাম। এই সংরক্ষণ-দাম দ্রব্যটির ভবিষ্যৎ

* ৯৯ পৃষ্ঠা দেখ।

দাম, ভবিষ্যৎ উৎপাদন-ব্যয়, ভবিষ্যৎ চাহিদা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বিক্রেতাদের ধারণার উপর নির্ভর করে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, অদূর ভবিষ্যতে দাম কি হইবে না-হইবে তাহার দিকে তাকাইয়াই বিক্রেতারা দ্রব্য ধরিয়া রাখিবে কি না তাহা ঠিক করে। সুতরাং অত্যল্পকালীন দাম বা বাজার-দাম (Market Price) স্বল্পকালীন দাম ও উৎপাদন-ব্যয়ের (Short-run Price and Cost) সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

বাজার-দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়ঃ বাজার-দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে বুঝান যাইতে পারে।



DD_1 রেখাটি দ্বারা অত্যল্পকালীন চাহিদার অবস্থা দেখান হইয়াছে। OQ হইল বিক্রেতাদের হাতে যে-পরিমাণ দ্রব্য আছে তাহার নির্দেশক। এখন OQ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম হইবে OP। কিন্তু বিক্রেতারা যদি QQ_1 পরিমাণ দ্রব্য ধরিয়া রাখিতে চায় এবং মাত্র OQ_1 পরিমাণ দ্রব্য বাজারে ছাড়ে তাহা হইলে দাম হইবে OP_1।

বাজার-দামের উপর প্রান্তিক উপযোগ ও উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাব (Influence of Marginal Utility and Cost of Production on Market Price) ঃ বাজার-দাম হইল অত্যল্পকালীন ভারসাম্য-দাম। অর্থাৎ, অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে-দামে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয় তাহাকেই বাজার-দাম বলে। অল্প সময়ের মধ্যে যোগান মোটামুটি স্থির থাকে, কারণ উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব হয় না। সুতরাং উৎপাদন-ব্যয় বাজার-দামের উপর প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রভাব বিস্তার করে না। মাছ তরিতরকারি প্রভৃতি পচনশীল দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় যাহাই হউক না কেন, ক্রেতারা যে-দাম দিতে চাহিবে বিক্রেতাগণকে তাহাতেই উহা বিক্রয় করিতে হইবে। অন্যান্য দ্রব্যের বেলায় বিক্রেতাদের প্রত্যাশিত বা সংরক্ষণ দাম

(Reservation Price) থাকে। এই সংরক্ষণ-দামের জন্য বাজার-দামের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়।

কিন্তু ক্রেতার নিকট বাজার-দাম সর্বদাই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। কোন দ্রব্য লোকে যত বেশী পরিমাণ ক্রয় করিতে থাকে ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি অনুসারে উহার প্রতি ক্রীত এককের উপযোগ ততই কমিতে থাকে। এইভাবে একসময় বাজার-দাম ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হয়। যে-ব্যক্তি ২ টাকা কিলোগ্রাম দামে ২ কিলোগ্রাম সরিষার তৈল ক্রয় করিল, সে ২ কিলোগ্রামের কম বা বেশী ক্রয় করিল না কেন? অথবা, যে-ব্যক্তি ২৫ পয়সা দামের দুই গ্লাস শরবত পান করিল, সে ১ বা ৩ গ্লাস শরবত পান করিল না কেন? ইহার উত্তর হইল, প্রথম ব্যক্তির নিকট সরিষার তৈলের দ্বিতীয় কিলোগ্রামের উপযোগ ২ টাকার এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট দ্বিতীয় গ্লাস শরবতের উপযোগ ২৫ পয়সার সমান। স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রান্তিক উপযোগ বিভিন্ন ব্যক্তির বেলায় বিভিন্ন প্রকার হয়। একজন ২ টাকা দামে ৪ কিলোগ্রাম তৈলও ক্রয় করিতে পারে। তাহার নিকট ৪র্থ কিলোগ্রামের উপযোগ ২ টাকার সমান। সুতরাং বাজার-দাম মোট বিক্রীত দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের সমান হয় মনে করিলে ভুল হইবে, উহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগের সমান হয় মাত্র।

খ। স্বাভাবিক দাম (Normal Price)

মোটামুটিভাবে যে-সময়ের মধ্যে চাহিদার অবস্থার সহিত যোগানের অবস্থার সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয় সেই সময়ের দামকেই স্বাভাবিক দাম (Normal Price) বলা যায়। অর্থাৎ, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি চাহিদার অবস্থার সহিত সংগতিসাধনের জন্য যোগানের পরিমাণ পরিবর্তিত করিবার পর্যাপ্ত সময় পাইলে যে-দাম কার্যকর হয় তাহাকেই স্বাভাবিক দাম বলিয়া অভিহিত করা হয়। অতএব, স্বাভাবিক দামের সহিত সময়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। বাজার-দামের ক্ষেত্রে সময় এতই স্বল্প যে চাহিদার সহিত যোগান মোটেই তাল রাখিয়া চলিতে পারে না; সুতরাং অত্যল্পকালীন বাজারে চাহিদার পরিবর্তনের ফলে বাজার-দাম (Market Price) দ্রুত উঠানামা করে। সময় যত দীর্ঘ হইতে থাকে যোগান ততই চাহিদার সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিয়া চলিবার সুযোগ পায় এবং দামও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হইতে থাকে।

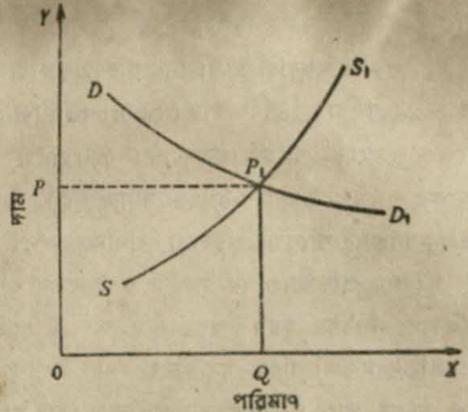
স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম : স্বাভাবিক দাম স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন (Short-run and Long-run Normal Price) উভয়ই হইতে পারে। স্বল্পকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা এবং উহাদের যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি উৎপাদনের স্থায়ী উপকরণ অপরিবর্তিত থাকে; সুতরাং উৎপাদনের পরিবর্তন মাত্র

পরিবর্তনশীল উপকরণের হ্রাসবৃদ্ধির সাহায্যে করিতে পারা যায়। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানসমূহ চাহিদার প্রকৃতি অনুযায়ী উৎপাদনের পরিবর্তন করিলে যে-দাম বাজারে নির্ধারিত হয় তাহাই স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম (Short-run Normal Price)। এই দাম একদিকে ক্রেতাদের প্রান্তিক উপযোগ (marginal utility) এবং অপরদিকে উৎপাদকের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদক বা প্রতিষ্ঠান চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী যোগানকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, কারণ এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা ও আয়তন পরিবর্তন এবং ফলে উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয়। স্বল্পকালীন অবস্থায় চাহিদায় মন্দা দেখা দিলে উৎপাদক বা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক মুনাফাসহ মোট উৎপাদন-ব্যয় দ্রব্যবিক্রয় হইতে উসুল নাও হইতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় স্বাভাবিক মুনাফাসহ মোট উৎপাদন-ব্যয় দ্রব্যবিক্রয় হইতে উসুল না হইলে প্রতিষ্ঠান শিল্প ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, কারণ কোন প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন লোকসান দিয়া উৎপাদন চালাইবে না। সুতরাং দীর্ঘকালীন অবস্থায় স্বাভাবিক দাম (Long-run Normal Price) শুধু প্রান্তিক ব্যয়ের সমানই হয় না, উহা ন্যূনতম গড় ব্যয় (Minimum Average Cost) অপেক্ষা কমও হইতে পারে না।* এই ন্যূনতম গড় ব্যয়ের মধ্যেই থাকে স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit)।

স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় (How Short-run Normal Price is Determined): পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শিল্প বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান লইয়া গঠিত বলিয়া এই সকল প্রতিষ্ঠানের যোগান যোগ দিলেই শিল্পের মোট যোগান এবং যোগান-রেখা পাওয়া যায়। শিল্পের যোগান-রেখা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের যোগান-রেখার মতই উর্ধ্বগামী হয়। এই উর্ধ্বগামী যোগান-রেখা (Supply Curve) যে-বিন্দুতে নিম্নগামী চাহিদা-রেখাকে (Demand Curve) ছেদ করে সেখানেই স্বল্পকালীন বাজারে দাম নির্ধারিত এবং শিল্পের স্বল্পকালীন ভারসাম্য স্থাপিত হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের দ্বারা ভারসাম্য অবস্থা দেখান হইল।

---

* প্রান্তিক ব্যয় (marginal cost) বলিতে এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে-অতিরিক্ত ব্যয় (extra cost) হয় তাহাকে বুঝায়। যখন ১০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে মোট ব্যয় হয় ১০০ টাকা এবং ১১ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে ১১২ টাকা তখন প্রান্তিক ব্যয় হইল (১১২ − ১০০ =) ১২ টাকা। এক্ষেত্রে গড় ব্যয় প্রথমে হইল (১০০ ÷ ১০ =) ১০ টাকা এবং পরে (১১২ ÷ ১১ =) ১০·১৮ টাকার মত।



রেখাচিত্রে চাহিদা-রেখা DD_1 এবং যোগান-রেখা SS_1 পরস্পরকে P_1 বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং ভারসাম্য-দাম হইল OP (বা QP_1) এবং উৎপাদনের ভারসাম্য-পরিমাণ হইল OQ।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই ভারসাম্য অস্থায়ী ভারসাম্য মাত্র, কারণ এই ভারসাম্য-দামে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের লোকসান অথবা অতিরিক্ত লাভ হইতে পারে। লোকসান হইতে থাকিলে দীর্ঘকালে কিছু প্রতিষ্ঠান শিল্প ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং ফলে যোগান হ্রাস ও দাম বৃদ্ধি পাইবে। অপরপক্ষে অতিরিক্ত লাভ হইলে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান আসিয়া যোগান বৃদ্ধি করিবে। ফলে দাম হ্রাস পাইবে। এইভাবে দীর্ঘকালীন অবস্থায় দাম ন্যূনতম গড় ব্যয়েরই সমান হয়।

দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম (Long-run Normal Price)

দীর্ঘকালে শিল্প-প্রতিষ্ঠান উহার উপকরণ ও আয়তনের প্রয়োজনমত পরিবর্তনসাধন করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই সময়ের মধ্যে নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে যোগদান করিতে পারে এবং পুরাতন প্রতিষ্ঠান শিল্প ত্যাগ করিতে পারে। তৃতীয়ত, কোন প্রতিষ্ঠানই দীর্ঘকালীন অবস্থায় লোকসান দিয়া উৎপাদন করে না। ফলে এই অবস্থায় দাম শুধু শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইলেই চলিবে না, গড় ব্যয়েরও সমান হইতে হইবে। নচেৎ প্রতিষ্ঠানের লোকসান হইবে এবং কোন প্রতিষ্ঠানই দীর্ঘদিন লোকসান দিয়া উৎপাদন করিবে না।

অপরদিকে আবার এই গড় ব্যয় যাহা দামের সমান তাহা ন্যূনতম অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। কারণ, অধিক হইলে প্রতিষ্ঠানগুলি অতিরিক্ত লাভ করিবে এবং ফলে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান আসিয়া শিল্পে প্রবেশ করিবে। ফলে যোগান বৃদ্ধি পাইবে এবং দাম হ্রাস পাইয়া ন্যূনতম গড় ব্যয়ের সমান হইবে।

অতএব, দীর্ঘকালীন অবস্থায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের সূত্র হইল: দাম (price)=প্রান্তিক ব্যয় (marginal cost)=গড় ব্যয় (average cost)।

প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয় (Marginal and Average Cost of Production)

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় স্বাভাবিক দামের আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় যেখানে পরস্পরের সমান গড় ব্যয় সেখানে ন্যূনতম। সুতরাং প্রান্তিক ও গড় ব্যয় সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। নিম্নের উদাহরণটি হইতে প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক মোটামুটি বুঝা যাইবে।

কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির অধীন হইলে উৎপাদন-বৃদ্ধির সংগে সংগে উহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে থাকে এবং ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধির অধীন হইলে উহার বিপরীত ঘটে। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় পরিবর্তনের সংগে সংগে গড় উৎপাদন-ব্যয় কিভাবে পরিবর্তিত হয় তাহা নিম্নে দেখান হইল।

মোট উৎপাদন (কুইন্টাল)	মোট উৎপাদন-ব্যয় (টাকা)	প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (টাকা)	গড় উৎপাদন-ব্যয় (টাকা)
১	১০	১০	১০
২	১৮	৮	৯
৩	২৭	৯	৯
৪	৩৮	১১	৯.৫

দেখা যাইতেছে, উৎপাদন যখন ৩ কুইন্টাল তখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও গড় উৎপাদন-ব্যয় উভয়ই ৯ টাকা হইতেছে এবং এই ৯ টাকাই হইল ন্যূনতম গড় ব্যয়। ইহার পর গড় ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে। যে-পরিমাণ উৎপাদন হইলে প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় পরস্পরের সমান এবং গড় ব্যয় ন্যূনতম হয় তাহাকে কাম্য উৎপাদন (Optimum Production) বলে। সুতরাং আমাদের উদাহরণে ৩ একক হইল কাম্য উৎপাদন।

দাম-নির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব (Time Element in Price Determination)

চাহিদা ও যোগানের প্রভাব দ্বারা দাম নির্ধারিত হয়। কিন্তু এই দুই প্রভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব সময়ের সংগে সংগে যে পরিবর্তিত হয়, বাজার-দাম ও স্বাভাবিক দামের পার্থক্য হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। সংক্ষেপে বলা যায়, সময় যতই স্বল্প

হইবে চাহিদার প্রভাব হইবে তত অধিক এবং সময় যতই দীর্ঘ হইবে যোগানের প্রভাব হইবে তত বেশী।

সময়ের দৈর্ঘ্য অনুসারে বাজার চারি প্রকারের হয় বলিয়া মার্শাল চারি প্রকার দামের উল্লেখ করিয়াছেন: (ক) অত্যল্পকালীন দাম বা বাজার-দাম (Very Short-period or Market Price), (খ) স্বল্পকালীন দাম (Short-period Price), (গ) দীর্ঘকালীন বা স্বাভাবিক দাম (Long-period or Normal Price) এবং (ঘ) অতি-দীর্ঘকালীন দাম (Very Long-period or Secular Price)।

অত্যল্পকালীন বাজারে দাম অনিয়মিত ও ক্ষণস্থায়ী কারণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই সময়ে চাহিদার প্রভাব হয় সর্বাধিক। বিক্রেতারা অবশ্য মাল বিক্রয় না করিয়া কিছুদিন বসিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু বেশীদিন তাহাদের পক্ষে এই অবস্থায় থাকা সম্ভব হয় না। সুতরাং মোটামুটি চাহিদার প্রভাব দ্বারাই দাম নির্ধারিত হয়। বলা হইয়াছে যে, এই দামকে বাজার-দাম বলা হয়। ইহাতে বিক্রেতার লাভও হইতে পারে আবার ক্ষতিও হইতে পারে।

বাজার-দাম অধিক হইলে যোগান বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু যোগান নির্ভর করে সাজসরঞ্জামের অবস্থা ও উৎপাদনের আয়তনের উপর। অল্প সময়ের মধ্যে ইহাদের পরিবর্তনসাধন করা সম্ভব নয়। বর্তমান সাজসরঞ্জাম ও উৎপাদনের আয়তনে অধিক উৎপাদন করিতে গেলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের (increasing cost) সূত্র ক্রিয়া করিতে পারে। সুতরাং উৎপাদকগণ সেই পর্যন্তই উৎপাদন করিবে যে-পর্যন্ত না প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দামের সমান হয়। এই দামকেই স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম (Short-period Normal Price) বলা হয়।

দীর্ঘকালীন বাজারে সাজসরঞ্জাম লইয়া সকল উপকরণ—অর্থাৎ, উৎপাদনের সকল উপাদানের পরিবর্তনসাধন করা সম্ভব। কোন বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা যদি যোগান অপেক্ষা বহুদিন ধরিয়া অধিক থাকে তবে উৎপাদকগণ অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিয়া, নূতন নূতন যন্ত্রপাতি বসাইয়া, উৎপাদনের আয়তন বৃহত্তর করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। ইহার ফলে যদি ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের (decreasing cost) সূত্র ক্রিয়া করে তবে দাম হ্রাস পাইবে; অপরদিকে যদি ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের সূত্র কার্যকর হয় তবে দাম বৃদ্ধি পাইবে। উৎপাদন-ব্যয় সমান থাকিলে দাম একই থাকিবে। দীর্ঘকালীন বাজারে এই দামকেই দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম (Long-period Normal Price) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

অতি-দীর্ঘকালীন বাজারে সাজসরঞ্জামেরও উৎপাদন-ব্যয় পরিবর্তিত হয়; দামের পরিবর্তন ব্যতিরেকেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। এই সকলের ফলে দাম

বাজার-দাম বা স্বাভাবিক দাম হইতে বহুদূরে সরিয়া যাইতে পারে। এই অতি-দীর্ঘকালীন দাম ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত।

উপসংহার ঃ দাম-নির্ধারণ তত্ত্বের উপসংহার হিসাবে আর একটি কথা বলা যাইতে পারে। দেখা গিয়াছে, দাম চাহিদা ও যোগানের অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। চাহিদার পশ্চাতে কার্য করে ক্রেতাদের উপযোগকে সর্বাধিক করিবার ইচ্ছা (desire to maximise utility) এবং যোগানের পশ্চাতে কার্য করে সংগঠকদের মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা (desire to maximise profit) বিশেষ অবস্থায় যখন উভয়েরই প্রচেষ্টা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া তাহারা ক্রয়বিক্রয়ে অগ্রসর হয় তখনই ভারসাম্যের সৃষ্টি হইয়া দাম নির্ধারিত হয়।

টাকাকড়ি ও ব্যাংক-ব্যবস্থা

১২

টাকাকড়ি
(Money)

অর্থবিদ্যা মানুষের জীবনযাত্রায় টাকাকড়ির ভূমিকা লইয়া আলোচনা করে। টাকাকড়ির মাধ্যমেই বর্তমানে বিনিময়কার্য সম্পাদিত হয়; লোকে টাকাকড়ি উপার্জন এবং ব্যয় করিতেই সারাদিন ব্যস্ত থাকে। আমরা দেখিয়াছি যে চিরকালই এইরূপ ছিল না। প্রথমে মানুষকে স্বয়ং ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া অভাব মিটাইতে হইত এবং পরে অভাব বৃদ্ধি পাইলে ও শ্রমবিভাগ দেখা দিলে সে সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় (barter) করিত। দ্রব্য-বিনিময়ে নানারূপ অসুবিধা অনুভূত হওয়ায় টাকাকড়ির উদ্ভব হয়।

সরাসরি দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধা: প্রথমত, দ্রব্য-বিনিময় ব্যাপারে বিনিময়কারী ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে অভাবের সংগতির (coincidence of wants) প্রয়োজন ছিল। যে-ব্যক্তির ধানের পরিবর্তে বস্ত্র সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন ছিল তাহাকে এরূপ এক বস্ত্র-উৎপাদনকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত যাহার ধানের অভাব আছে। ইহা না হইলে প্রত্যক্ষ বিনিময় সম্পাদিত হইত না।

দ্বিতীয়ত, অনেক সময় জিনিসপত্র ইচ্ছামত বিভক্ত করা যাইত না বলিয়া অসুবিধা দেখা দিত। একটি গরুর মূল্য ২০ কুইণ্টাল গম হইলে যাহার মাত্র ২ কুইণ্টাল গমের প্রয়োজন ছিল তাহাকে ২০ কুইণ্টাল গমই লইতে হইত। কারণ, গরুটিকে ত আর ১০ ভাগে ভাগ করিয়া মাত্র ১ ভাগ গম-বিক্রেতাকে দেওয়া যাইত না। তৃতীয়ত, বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মূল্য-নির্ধারণ করাও কঠিন ছিল। ১ কুইণ্টাল গমের বিনিময়ে ১·৫ কুইণ্টাল ধান, ২ কুইণ্টাল তৈলের বিনিময়ে ৫ খানি বস্ত্র, ·৫ খানি বস্ত্রের বিনিময়ে ১ কুইণ্টাল ধান পাওয়া গেলে ১ কুইণ্টাল তৈলের বিনিময়ে কতটা গম পাওয়া যাইবে তাহা নির্ণয় করা বিশেষ কঠিন হইয়া দাঁড়াইত।

টাকাকড়ির প্রচলন হইলে এই সকল অসুবিধা দূর হইয়া যায়। যে-লোক ধানের বিনিময়ে বস্ত্র সংগ্রহ করিতে চায় তাহাকে আর ধানের অভাব আছে এইরূপ বস্ত্র-উৎপাদনকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না, গরু-বিক্রেতাকে বাধ্য হইয়া ২০ কুইণ্টাল গম লইতে হয় না এবং ১ কুইণ্টাল তৈলের বিনিময়ে কি পরিমাণ গম পাওয়া যাইবে তাহার হিসাবের জন্য বিরাট অংক কষিতে হয় না।

টাকাকড়ি হইল বিনিময়ের সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম। সকলেই টাকাকড়ির মাধ্যমে দ্রব্যাদি বিনিময় করে। একখানি ১০ টাকার নোটের বিনিময়ে ঐ পরিমাণ মূল্যের সকল জিনিসই পাওয়া যাইবে। এই নোটকে কাগজী মুদ্রা (paper money)

বলা হয়। কাগজী মুদ্রা ছাড়াও ধাতব মুদ্রা আছে—যথা, পুরাতন টাকা আধুলি সিকি এবং ১, ২, ৩, ৫, ১০, ২০, ২৫, ৫০ পয়সা প্রভৃতি। এই কাগজী ও ধাতব মুদ্রার প্রচলন হইয়াছে বহু পরে। প্রথম প্রথম কোন বিশেষ দ্রব্যকেই টাকাকড়ি বা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হইত। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে গরু, ছাগল, চামড়া, শস্য, কড়ি এমনকি ক্রীতদাসও বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সকল গরু ছাগল বা ক্রীতদাস একই রকমের নহে বলিয়া মূল্য-নির্ধারণের অসুবিধা দূরীভূত হয় নাই। ফলে মানুষকে ধাতব মুদ্রার দিকে ঝুঁকিতে হইয়াছে। ধাতুর মধ্যেও মানুষ তাম্র ব্রোঞ্জ স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণ ও রৌপ্যই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু একসংগে বহু সোনা ও রূপার টাকা বহন করিয়া লইয়া যাওয়া অসুবিধাজনক। প্রথমত, এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কাগজী মুদ্রার প্রচলন হয়। বর্তমানে কাগজী মুদ্রাই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্যলাভ করিয়াছে এবং টাকাকড়ির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক হিসাবে ধাতব মুদ্রা প্রচলিত রহিয়াছে।

টাকাকড়ির কার্যাবলী (Functions of Money)

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে টাকাকড়ির কার্যাবলী সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যাইবে। টাকাকড়ি শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য করে না; ইহা মূল্যেরও পরিমাপ করে। বর্তমানে মূল্য (value) টাকাকড়ির অংকেই প্রকাশ করা হয়। আমরা দেখিয়াছি যে এইভাবে প্রকাশিত মূল্যকে দাম বলে (১৪ পৃষ্ঠা)। আবার টাকাকড়ির অংকেই সঞ্চয় করা হয় এবং দেনাপাওনা মিটান হয়। সুতরাং দেখা যায় যে টাকাকড়ির কার্যাবলী প্রধানত চারিটি: (ক) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য, (খ) মূল্যের পরিমাপ হিসাবে কার্য, (গ) সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য এবং (ঘ) দেনাপাওনা মিটানর মান হিসাবে কার্য।

ক। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য (Function as a Medium of Exchange): ইহাই টাকাকড়ির প্রাথমিক কার্য এবং টাকাকড়ির প্রচলন হয় এই কার্য সম্পাদনের জন্যই। বর্তমানে লোকে সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় না করিয়া টাকাকড়ির মাধ্যমেই করে।

খ। মূল্যের পরিমাপ হিসাবে কার্য (Function as a Measure of Value): বর্তমানে আমরা দ্রব্যাদির বিনিময়-মূল্য নির্ধারণ করি না, টাকাকড়ির অংকে উহাদের 'দাম' নির্ধারণ করি। যখন বলি যে ১ কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম ২ টাকা, তখন ঐ পরিমাণ সরিষার তৈলের মূল্য পরিমাপের জন্য 'টাকাকড়ি' ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে টাকা (Rupee) মূল্য পরিমাপের একক। অন্যান্য

দেশেরও এইরূপ নিজ নিজ একক আছে—যেমন, ইংলণ্ডের পাউণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার, সোবিয়েত ইউনিয়নের রুবল, পাকিস্তানের পাকিস্তানী টাকা ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক বিনিময়ের সুবিধার জন্য বিভিন্ন দেশের টাকাকড়ির 'একক'র মধ্যে বিনিময় হার নির্দিষ্ট থাকে। যেমন, ভারতের একটি টাকার বিনিময়ে ইংলণ্ডের ১ শিলিং ১·৩ পেনি পাওয়া যায়।

গ। সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য (Function as a Store of Value)ঃ লোকের আয় একসংগে ব্যয়িত হয় না। যে-ব্যক্তি মাস-মাহিনা পায় সে সারামাস ধরিয়া ধীরে ধীরে ব্যয় করে; যে-কৃষক মাত্র একপ্রকার শস্য উৎপাদন করে তাহাকে উহার বিনিময়ে সারাবৎসর ব্যয়নির্বাহের উদ্দেশ্যে চালাইতে হয়। পূর্বে এইরূপ বর্তমান আয় হইতে ভবিষ্যৎ জিনিসপত্র মজুত রাখা হইত; বর্তমানে টাকাকড়িই মজুত রাখা হয়। আবার লোকে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, পুত্রকন্যার শিক্ষা ইত্যাদির জন্য সঞ্চয়ও করে। বর্তমানে ইহাও টাকাকড়ির আকারে করা হয়। জিনিসপত্র মজুত রাখা বা স্বর্ণ-রৌপ্য ভূগর্ভে লুকাইয়া রাখা অপেক্ষা টাকাকড়ির আকারে সঞ্চয় করা অনেক সুবিধাজনক ও নিরাপদ। টাকাকড়ি নষ্ট হয় না, মাটির তলায় লুকাইয়া রাখারও প্রয়োজন হয় না। ব্যাংকে, পোস্ট-অফিসে বা সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া উহা জমা রাখা যাইতে পারে। ব্যাংক ও সরকার জমা টাকাকড়িকে উৎপাদনশীল কার্যে নিয়োগ করে। এইভাবে সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য সম্পাদনের দ্বারা টাকাকড়ি অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

ঘ। দেনাপাওনার মান হিসাবে কার্য (Function as a Standard of Deferred Payments)ঃ বর্তমান সমাজে দেনাপাওনা মিটানর কার্য সর্বদাই চলিয়া থাকে। পূর্বে জিনিসপত্র ঋণ করা হইত এবং ঐ জিনিসপত্রেই ঋণ পরিশোধ করা হইত। এই ব্যবস্থার অসুবিধা হইল যে জিনিসপত্র সকল সময় একই প্রকারের হয় না। একটি ছাগল ধার লইয়া পরে ছাগল ফেরত দিতে গেলে মহাজন ভালভাবে দেখিয়া লইবে যে ছাগলটি কিরূপ? মনঃপূত না হইলে সে অন্য একটি ছাগল লইয়া আসিতে বলিবে; কিন্তু খাতকের হয়ত আর ছাগল নাই। টাকাকড়ির মাধ্যমে দেনাপাওনা মিটাইলে এইরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। যে-ব্যক্তি ১০০ টাকা ধার লইয়াছে সে ১০০ টাকাই শোধ দিবে; কিছু সুদ দেওয়ার কথা থাকিলে কিছু সুদও দিবে।

সঞ্চয়ের ভাণ্ডার ও দেনাপাওনার মান হিসাবে কার্য করিবার জন্য টাকাকড়ির মূল্য স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ, যাহারা সঞ্চয় করে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, যে-ব্যক্তি ১০ হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছে, টাকাকড়ির মূল্য অর্ধেক হইয়া গেলে তাহার সঞ্চয়ের মূল্য ৫ হাজার টাকা হইয়া যাইবে; অথবা যে-ব্যক্তি ১০০ টাকা ধার দিয়াছে সে ফেরত পাইবার সময়ে প্রকৃতপক্ষে অর্ধেক ফেরত পাইবে। সুতরাং টাকাকড়ির মূল্য বিশেষ পরিবর্তনশীল হইলে চলিবে না। কিন্তু দেখা যায় যে আধুনিক সমাজে টাকাকড়ির মূল্য প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। এই পরিবর্তন যতটা কম হয় তাহা দেখাই সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক কার্য।

টাকাকড়ির আরও একটি উল্লেখযোগ্য কার্য আছে। টাকাকড়িই বর্তমানে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখিয়াছে। সংগঠক টাকাকড়ি দিয়াই কাঁচামাল ক্রয় করে, শ্রমিককে মজুরি প্রদান করে, জমির মালিকের খাজনা মিটায় এবং মূলধন সরবরাহকারীকে সুদ দেয়। টাকাকড়ি না থাকিলে ইহাদের সকলের জন্যই তাহাকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করিতে হইত; ফলে সে উৎপাদনকার্যে মনোনিবেশ করিবার অবকাশই পাইত না।

টাকাকড়ি কি ? (What is Money ?)

এখন প্রশ্ন করা যায়, টাকাকড়ি কি ? ইংরাজীতে একটি কথা আছে যে যাহাই টাকাকড়ির কার্য সম্পাদন করে তাহাই টাকাকড়ি (money is what money does)। সুতরাং যে-কোন বস্তু বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপ, সঞ্চয়ের ভাণ্ডার এবং লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে কার্য করিবে, তাহাকেই টাকাকড়ি বলিয়া অভিহিত করা যায়। কাগজী মুদ্রায় যদি এই সকল কার্য চলে তবে কাগজী মুদ্রাই টাকাকড়ি।

এই সকল কার্য সম্পাদন করিবার জন্য যে-বস্তু টাকাকড়ি হিসাবে প্রচলিত আছে তাহাকে সর্বজনগ্রাহ্য করিতে হইবে। অর্থাৎ, বিনিময় ও দেনাপাওনা মিটানর কার্যে সকলে ঐ বস্তুকে লইতে স্বীকার করিবে। বর্তমানে যে-প্রকার টাকাকড়ি সকলকেই লইতে হইবে তাহা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ আইন-নির্দিষ্ট টাকাকড়িকে বিহিত মুদ্রা (legal tender money) বলে। বর্তমানে আমাদের দেশে নূতন পয়সার মুদ্রা এবং পুরাতন সিকি আধুলি প্রভৃতি উভয়ই বিহিত মুদ্রা। কিন্তু কিছুদিন পরে পুরাতন সিকি আধুলি বিনিময় ও লেনদেনের কার্যে চলিবে না, কারণ উহারা আর বিহিত মুদ্রা থাকিবে না।

সংজ্ঞা : অতএব, টাকাকড়ির সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায় : বিনিময় ও দেনাপাওনা মিটানর কার্যে যে-বস্তু সর্বজনগ্রাহ্য তাহাই টাকাকড়ি। সঞ্চয় ও হিসাবনিকাশ ইহার অংকেই করা হয়।

ভারতে বিভিন্ন প্রকারের টাকাকড়ি (Kinds of Money in India)

টাকাকড়ির মাধ্যমে হিসাবনিকাশ এবং বিনিময়কার্য সম্পাদন করা হয়। সুতরাং প্রথমত, টাকাকড়ি দুই প্রকারের হইতে পারে : (১) হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি (money of account) এবং (২) আসল টাকাকড়ি (actual money)। হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি আসলে বর্তমান নাও থাকিতে পারে। ভারতে সেদিন পর্যন্ত পাই পয়সার অংকে হিসাব করা হইত ; কিন্তু পাই পয়সার প্রচলন বহুদিন পূর্বেই উঠিয়া গিয়াছিল। সুতরাং আসল টাকাকড়ি হইল তাহাই যাহা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত থাকে। বর্তমানে ভারতে হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি হইল টাকা ও পয়সা। কারণ, ইহাদের অংকেই হিসাবনিকাশ করা হয়। অপরদিকে আসল টাকাকড়ি হইল বিনিময়ের কার্যে ব্যবহৃত সকল প্রকারের মুদ্রা—যথা, কাগজী নোট, বিভিন্ন মূল্যের পয়সা, পুরাতন আধুলি সিকি প্রভৃতি।

আসল টাকাকড়িকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—কাগজী টাকাকড়ি (paper money) এবং ধাতব টাকাকড়ি (metallic money)। কাগজী টাকাকড়ি সরকার বা ব্যাংক প্রচলন করিয়া থাকে। সরকার কর্তৃক পরিচালিত হইলে উহাকে কারেন্সী নোট এবং ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত হইলে উহাকে ব্যাংক-নোট বলা হয়। সরকার যে কারেন্সী নোট প্রচলন করে তাহা দুই প্রকারের হয়—(১) পরিবর্তনীয় (convertible) এবং (২) অপরিবর্তনীয় (inconvertible)। দাবি করা হইলে পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রার পরিবর্তে সরকার স্বর্ণ অথবা রৌপ্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকে ; কিন্তু অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ব্যাংক-নোট সকল সময়েই পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা। আমাদের দেশে সরকার যে ১ টাকার নোট প্রচলন করে উহা অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা এবং অন্য সমস্ত নোট যাহা রিজার্ভ ব্যাংক প্রচলন করে তাহা পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা।

ধাতব মুদ্রা প্রধানত দুই প্রকারের—(১) প্রামাণিক মুদ্রা (Standard Coin) এবং (২) নিদর্শক মুদ্রা (Token Coin)। প্রামাণিক মুদ্রাই দেশের প্রধান মুদ্রা। সাধারণত ইহা স্বর্ণ বা রৌপ্যে নির্মিত হয় এবং ইহার ধাতুমূল্য লিখিত মূল্যের (face value) সমান হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা (Sovereign) ছিল এই ধরনের প্রামাণিক মুদ্রা। ইহাকে গলাইয়া ফেলিলে ২০ শিলিং মূল্যের স্বর্ণ পাওয়া যাইত।

নিদর্শক মুদ্রা বলিতে নিকৃষ্টতর ধাতুনির্মিত মুদ্রাসমুদয়কেই বুঝায়। উহারা মূল্যের নিদর্শক (token of value) মাত্র। অর্থাৎ, উহাদের লিখিত মূল্য ও ধাতব মূল্য

সমান হয় না। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত নিকেলের টাকা, পুরাতন আধুলি, সিকি, নূতন পয়সার মুদ্রা সকলই নিদর্শক মুদ্রা। উহাদের গলাইয়া বিক্রয় করিলে ঐ পরিমাণ মূল্য পাওয়া যায় না।

মুদ্রার আর একটি শ্রেণীবিভাগ হইল সসীম বিহিত মুদ্রা (limited legal tender) এবং অসীম বিহিত মুদ্রার (unlimited legal tender) মধ্যে। কতক প্রকারের মুদ্রা বিনিময় বা দেনাপাওনা মিটানর কার্যে নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক দিলে লোকে লইতে অস্বীকার করিতে পারে। ইহাদিগকে সসীম বিহিত মুদ্রা বলে। অপরদিকে অসীম বিহিত মুদ্রা হইল তাহাই যাহা বিনিময় ও দেনাপাওনা মিটানর কার্যে যে-কোন পরিমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ভারতে সিকি নূতন পয়সার মুদ্রা প্রভৃতি সসীম বিহিত মুদ্রা। ইহাদিগকে ১ টাকার বেশী দিলে লোকে লইতে অস্বীকার করিতে পারে। কিন্তু ১ টাকার মুদ্রা বা নোট অসীম বিহিত মুদ্রা। লোকে ইহাদিগকে যে-কোন পরিমাণে লইতে বাধ্য।

উপরি-উক্ত সকল প্রকারের টাকাকড়িই সরকার বা টাঁকশাল-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রচলিত। সামগ্রিকভাবে ইহাদিগকে কারেন্সী (Currency) বলা হয়। ইহা ছাড়া ব্যাংকের টাকাকড়ি (Bank Money) বা ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়িও আছে। ব্যাংক-ব্যবস্থা টাকাকড়ি সৃজন করে আমানত সৃজন করিয়া। কিভাবে ব্যাংক-ব্যবস্থা ইহা করে তাহার আলোচনা পরে করা হইবে। তবে এখানে বলা প্রয়োজন যে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়িও দেশের মোট টাকাকড়ির একাংশ এবং চেক, ড্রাফ্‌ট ইত্যাদির মাধ্যমে উহাও বিনিময়কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

কাগজী মুদ্রার সুবিধা-অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Paper Money)

বর্তমানে যে কাগজী মুদ্রা ধাতব মুদ্রার উপর প্রাধান্যলাভ করিয়াছে তাহার মূলে আছে কাগজী মুদ্রার বিশেষ কয়েকটি সুবিধা।

সুবিধা: প্রথমত, কাগজী মুদ্রা সহজ বহনযোগ্য। বহু টাকার নোট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যত সুবিধাজনক বহু টাকার মুদ্রা লইয়া যাওয়া তত সুবিধাজনক নহে। ধাতব মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া লইতে অনেক সময় নষ্ট হয়; কাগজী মুদ্রার পরীক্ষার কার্য অতি শীঘ্রই সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়ত, কাগজী নোট মুদ্রণের ব্যয়ও কম। সোনারূপা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া মুদ্রা প্রচলন করিতে যে বিরাট ব্যয় হয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে তাহা বাঁচিয়া যায়। ধাতব মুদ্রা প্রচলিত থাকিলে হস্তান্তরের ফলে অনেক সোনারূপা ক্ষয় হয়। ইহাকে

জাতীয় ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কাগজের নোটের বেলায় এই ক্ষতি হয় না।

তৃতীয়ত, কাগজী মুদ্রাকে সহজেই বদলান যায়। নোট পুরাতন হইয়া গেলে তাহাকে নষ্ট করিয়া তাহার পরিবর্তে আর একখানি নোট সহজেই ছাপিয়া লওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু ধাতব মুদ্রা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তাহাকে বদলান অপেক্ষাকৃত কঠিন।

চতুর্থত, কাগজী মুদ্রার যোগান অতি দ্রুত বৃদ্ধি করা যায়। সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থায় ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। জাতীয় আয়বৃদ্ধির দরুন দেশে যতই ক্রয়বিক্রয় ও লেনদেনের কার্য সম্প্রসারিত হইবে টাকাকড়ির চাহিদা ততই বৃদ্ধি পাইবে। সোনারূপার টাকার যোগান সোনারূপার উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ইহা সকল সময় প্রয়োজনমত বাড়ান যায় না। কিন্তু প্রয়োজনমত কাগজের নোট ছাপিয়া দিলেই হইল। অবশ্য নোট মুদ্রণের বিরুদ্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বর্ণ বা রৌপ্য জমা রাখা হয় ; তবে সাধারণত নোটের মূল্যের একটি অংশমাত্র এইভাবে জমা রাখা হয়। ফলে যত জমা হয় তাহার অনেক অধিক নোট ছাপাইয়া দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকাকড়ি সরবরাহ করা চলে। বর্তমানে ভারতে যে-কোন পরিমাণ নোট ছাপার জন্য ১১৫ কোটি টাকার অধিক স্বর্ণ মজুত রাখিবার প্রয়োজন হয় না।

অসুবিধা : এই যে যত খুশি তত নোট ছাপা চলে ইহাই কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি। ইহার জন্য সরকার রাজস্বসংগ্রহে মনোযোগ না দিয়া নোট ছাপানতেই আগ্রহশীল হইতে পারে। ক্রমাগত নোট ছাপাইয়া গেলে ইহার বিরুদ্ধে জমার পরিমাণ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকিবে এবং একদিন কাগজী মুদ্রা 'আর পরিবর্তনীয় নয়' বলিয়া ঘোষিত হইবে। তখন উহার মূল্য দ্রুত পড়িয়া যাইবে এবং মর্যাদা নষ্ট হইবে। এই অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতির (inflation) চরম অবস্থা বলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মেনীতে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হাংগেরী, গ্রীস এবং চীন দেশে এইরূপ ঘটিয়াছিল। কাগজী নোটের দাম এত পড়িয়া গিয়াছিল যে বহু লোক শেষ পর্যন্ত উহা লইতেই অস্বীকার করিয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, কাগজী নোট বিদেশীরা গ্রহণ করিতে চায় না। বর্তমানে অবশ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কাগজী মুদ্রার বিনিময় হার স্থির করিয়া দেওয়া আছে। কিন্তু ক্রমাগত নোট ছাপাইয়া গেলে এই বিনিময় হার বজায় রাখিতে পারা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে সকল বিদেশীই কাগজী নোট গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে।

তৃতীয়ত, অসাবধানবশত কাগজী মুদ্রা নষ্ট হওয়াও বিচিত্র নয়। এক তাড়া নোট কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে পারে।

১৩

টাকাকড়ির মূল্য
(Value of Money)

টাকাকড়ির মূল্য ও মূল্যস্তর (Value of Money and Price Level)

আমরা দেখিয়াছি যে সঞ্চয়ের ভাণ্ডার এবং দেনাপাওনার হিসাবনিকাশের কার্য করিবার জন্য টাকাকড়ির মূল্য স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন, টাকাকড়ির মূল্য বলিতে কি বুঝায়।

অর্থবিদ্যায় 'মূল্য' শব্দটি বিনিময়-মূল্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং টাকাকড়ির মূল্য বলিতেও উহার বিনিময়-মূল্য বুঝায়। অর্থাৎ, এক একক টাকাকড়ির বিনিময়ে যে-পরিমাণ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাহাই টাকাকড়ির মূল্য। ইহাকে টাকাকড়ির ক্রয়-শক্তি (purchasing power) বলা হয়।

ভারতে টাকাকড়ির একক হইল 'টাকা' (Rupee)। সুতরাং এক টাকার যে-পরিমাণ ক্রয়শক্তি—অর্থাৎ, এক টাকায় যতখানি জিনিসপত্র ক্রয় করিতে পারা যায় তাহাই এদেশে টাকাকড়ির মূল্য। অনুরূপভাবে, ইংলণ্ডে এক পাউণ্ডের বিনিময়ে যতখানি জিনিসপত্র ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, তাহাই ঐ দেশে টাকাকড়ির মূল্য।

টাকাকড়ির মূল্য মূল্যস্তরের (Price Level) বিপরীত। মূল্যস্তর বলিতে বুঝায় বিভিন্ন জিনিসের গড় দাম। এই গড় দাম যদি বাড়িয়া যায় তবে টাকাকড়ির মূল্য কমিয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে ; অপরদিকে গড় দাম বা মূল্যস্তর যদি হ্রাস পায় তবে টাকাকড়ির মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে ধরিতে হইবে। আমাদের দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের তুলনায় জিনিসপত্রের গড় দাম বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে ; সুতরাং টাকাকড়ির মূল্যও বহুগুণ কমিয়া গিয়াছে। সাধারণ কথাবার্তায় লোকে যে প্রায়ই বলে 'টাকার আর দাম নাই' তাহা এই জিনিসপত্রের দামবৃদ্ধি বা টাকার মূল্যহ্রাসের উল্লেখ মাত্র।

মূল্যস্তর পরিবর্তনের কারণ (Reasons for Changes in the Price Level) : মূল্যস্তরের পরিবর্তন প্রধানত দুইটি কারণে ঘটে—(ক) টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তন, (খ) জিনিসপত্রের যোগানে পরিবর্তন। জিনিসপত্রের যোগান যদি পূর্বের মতই থাকে, কিন্তু টাকাকড়ির যোগান যদি বাড়িয়া যায় তবে জিনিসপত্রের গড় দাম বা মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে। অপরদিকে টাকাকড়ির যোগান অপরিবর্তিত থাকিয়া জিনিসপত্রের যোগান বাড়িয়া গেলে গড় দাম বা মূল্যস্তর হ্রাস পাইবে। আবার যদি এরূপ হয় যে টাকাকড়ির যোগান বাড়িল এবং সংগে সংগে জিনিসপত্রেরও যোগান কমিয়া গেল তবে মূল্যস্তর বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমাদের

দেশে ইহাই ঘটিয়াছিল। একদিকে ক্রমাগত নোট ছাপানর দরুন টাকাকড়ির যোগান বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল; অপরদিকে আমদানি কমিয়া যাওয়া, কলকারখানা প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনে নিযুক্ত হওয়া, ইত্যাদি কারণে জনসাধারণের জন্য ভোগ্যদ্রব্যের যোগান অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছিল। ফলে মূল্যস্তর চারি গুণের মত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব (Quantity Theory of Money)

দেখা গেল, মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটে (ক) টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তন এবং (খ) জিনিসপত্রের যোগানে পরিবর্তন—উভয়ের জন্যই। প্রাচীন লেখকগণ কিন্তু মনে করিতেন যে শুধু টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তনের জন্যই মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটে, জিনিসপত্রের যোগানে পরিবর্তনের জন্য নহে। আবার তাঁহারা এই বুঝিয়াছিলেন যে টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তন ঘটে শুধু টাকাকড়ির পরিমাণের পরিবর্তনের জন্যই, অন্য কোন কারণে নহে। ইহার ফলে যে-তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে তাহাকে টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব (Quantity Theory of Money) বলা হয়। তত্ত্বটিকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে: টাকাকড়ির পরিমাণ যেদিকে এবং যতটা পরিবর্তিত হইবে মূল্যস্তরও সেই দিকে এবং ততটা পরিবর্তিত হইবে। টাকাকড়ির পরিমাণ হঠাৎ যদি দ্বিগুণ হয় তবে মূল্যস্তরও দ্বিগুণ হইবে; টাকাকড়ির পরিমাণ যদি অর্ধেক হইয়া যায় মূল্যস্তরও অর্ধেক হইয়া যাইবে।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে টাকাকড়ির মূল্য (Value of Money) মূল্যস্তরের (Price Level) ঠিক বিপরীত। সুতরাং মূল্যস্তর যতটা বৃদ্ধি পায় টাকাকড়ির মূল্যও ততটা কমে এবং অপরদিকে মূল্যস্তর যতটা কমে টাকাকড়ির মূল্য বা ক্রয়শক্তি ততটা বৃদ্ধি পায়।

বিখ্যাত মার্কিন অর্থবিজ্ঞাবিদ ফিশার (Fisher) টাকাকড়ির এই পরিমাণতত্ত্বকে প্রথমে নিম্নলিখিত সমীকরণের রূপে প্রকাশ করেন:

$$PT = MV$$

$$\text{অথবা } P = \frac{MV}{T}$$

সমীকরণটিতে PT হইল টাকাকড়ির চাহিদার এবং MV টাকাকড়ির যোগানের দিক। টাকাকড়ির চাহিদা সৃষ্ট হয় বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র হইতে। ইহার পরিমাণ T হইলে এবং জিনিসপত্রের গড় মূল্য বা মূল্যস্তর P হইলে মোট PT পরিমাণ টাকাকড়ির চাহিদা হইবে। অপরদিকে M হইল নগদ বা সরকার-সৃষ্ট টাকাকড়ির পরিমাণ যাহা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু একটি টাকা দ্বারা অনেকবার

বিনিময়কার্য সম্পাদন করা চলে। আমি যে টাকাটি রামের নিকট হইতে জিনিস বিক্রয় করিয়া পাইলাম তাহা আবার শ্যামকে জিনিস ক্রয় করিবার জন্য দিতে পারি। সুতরাং ঐ টাকাটি দুইটি টাকার কার্য—অর্থাৎ, দুইবার বিনিময় সম্পাদনের কার্য করিতে পারে; অন্য একটি মুদ্রা আবার তিনবার বা চারিবার বিনিময় সম্পাদন করিতে পারে। এইভাবে দেশে যত সরকার-সৃষ্ট মুদ্রা আছে তাহাদের বিনিময় সম্পাদনের একটি গড় নির্ণয় করা যায়। এই গড়কেই V বা টাকাকড়ির প্রচলনগতি (velocity of circulation) বলা হয়। টাকাকড়ির পরিমাণকে টাকাকড়ির প্রচলনগতি দিয়া গুণ করিলে মোট টাকাকড়ির যোগানের পরিমাণ পাওয়া যাইবে। টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বে ইহাকে MV আকারে প্রকাশ করা হয়।

এখানে PT=MV হইলে, MV-কে T দিয়া ভাগ করিলেই P কত তাহা জানা যাইবে। কোন কারণে হঠাৎ যদি M বা মোট টাকাকড়ির পরিমাণ দ্বিগুণ হয় তবে P বা মূল্যস্তরও দ্বিগুণ হইবে—অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্য কমিয়া অর্ধেক হইবে। অপরদিকে কোন কারণে টাকাকড়ির পরিমাণ যদি অর্ধেক হয় তবে মূল্যস্তরও অর্ধেক হইবে—অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্য দ্বিগুণ হইবে।

অধ্যাপক ফিশারের উপরি-উক্ত পরিমাণতত্ত্বে শুধু সরকার-সৃষ্ট বা নগদ টাকাকড়ির কথা ধরা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি ইত্যাদির মাধ্যমেও ক্রয়বিক্রয় চলে। এই কারণে ফিশার পরে নিম্নলিখিতভাবে টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বটির পরিবর্তনসাধন করেন:

$$PT = MV + M'V'$$

এখানে M' বলিতে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি এবং V' বলিতে উহার প্রচলনগতি বুঝাইতেছে। সরকার-সৃষ্ট বা নগদ টাকাকড়িকে উহার প্রচলনগতি দিয়া গুণ করিলে মোট টাকাকড়ির যোগানের একাংশ পাওয়া যাইবে এবং ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়িকে উহার প্রচলনগতি দিয়া গুণ করিলে টাকাকড়ির যোগানের অপরাংশ পাওয়া যাইবে। ইহার ফলে অবশ্য সমীকরণটির প্রকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। ইহা এই প্রকার রূপ ধারণ করিবে মাত্র:

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

এখন P বা মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটিবে শুধু M-এর পরিবর্তনের জন্য নহে, M'-এর পরিবর্তনের জন্যও বটে। অন্যভাবে বলা যায় যে, দেশে নগদ ও ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি —উভয়ের পরিমাণ যতটা বাড়িবে মূল্যস্তরও ততটা বাড়িবে এবং এই দুই প্রকার টাকাকড়ির পরিমাণ যতটা হ্রাস পাইবে মূল্যস্তরও ততটা হ্রাস পাইবে।

সমালোচনা ঃ টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব এই অনুমানের উপর নির্ভরশীল যে টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তিত হইলেও বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্রের (T) এবং টাকাকড়ির প্রচলনগতির (V এবং V′) কোন পরিবর্তন ঘটে না। এই অনুমান ঠিক নহে। দেখা যায় যে টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তনের সংগে সংগে উৎপাদনের পরিমাণেও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। দাম বাড়িলে মুনাফা বেশী হয় বলিয়া উৎপাদকগণ অধিক উৎপাদনে আগ্রহান্বিত হয়; অপরদিকে দাম কমিলে তাহারা উৎপাদনের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। আরও দেখা যায়, টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে উহার প্রচলনগতিও পরিবর্তিত হইয়াছে। ফলে শুধু টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তনের জন্যই মূল্যস্তর পরিবর্তিত হয় না।

মোটকথা, অন্যান্য জিনিসের ন্যায় টাকাকড়ির মূল্য নির্ভর করে উহার চাহিদা ও যোগান—উভয়ের উপর। এই চাহিদা ও যোগান নানা বিষয়ের—যথা, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ, দেশের লোকে কি পরিমাণ টাকাকড়ি ব্যবহার করে এবং কি পরিমাণ সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় (barter) করে,—ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি ভালর দিকে যাইতে থাকে তবে টাকাকড়ির পরিমাণবৃদ্ধি ব্যতিরেকেও মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিবে। ইহা ঘটিবে টাকাকড়ির প্রচলনগতি বাড়িয়া। অপরদিকে দেশে কাজকারবারে যদি মন্দার সূচনা হয় তবে টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়াইলেও মূল্যস্তরে বৃদ্ধি না ঘটিতে পারে। কারণ, সংগে সংগে টাকাকড়ির প্রচলনগতি কমিয়া যাইতে পারে।

অতএব, একমাত্র টাকাকড়ির পরিমাণই টাকাকড়ির মূল্য-নির্ধারণ করে এরূপ ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব আংশিক ও ত্রুটিপূর্ণ।

সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তনের পরিমাপ (Measurement of Changes in the General Price Level)

মূল্যস্তর বা জিনিসপত্রের গড় দাম নানা প্রকারের হইতে পারে—যথা, বিলাসদ্রব্যের মূল্যস্তর, শ্রমিকদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যস্তর, ইত্যাদি। চালডাল, আটা-ময়দা, তৈল, লবণ, মসলাপাতি, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা, কাঁচামাল, উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতি—সকল জিনিসের গড় দামকে 'সাধারণ মূল্যস্তর' বলা যাইতে পারে। এই সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তনই দেশের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেইজন্য বিভিন্ন সময়ে ইহার পরিবর্তনের পরিমাপ করা হয় এবং সাধারণ মূল্যস্তরবৃদ্ধি বা টাকাকড়ির মূল্যহ্রাসের ফলে দরিদ্র চাকুরিয়ারা যাহাতে দুর্দশায় পতিত না হয় তাহার জন্য মাগ্‌গি ভাতার ব্যবস্থা করা হয়, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা হয়, ইত্যাদি। মূল্যস্তর কমিয়া আসিলে—অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্য বৃদ্ধি পাইলে মাগ্‌গি ভাতা আবার কমাইয়া দেওয়া হয়, শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করা হয়।

কিন্তু একসময়ের তুলনায় অন্য একসময় মূল্যস্তর বাড়িল কি কমিল এবং কতটা পরিমাণ বাড়িল বা কমিল তাহা বুঝা যায় কিরূপে? ইহা বুঝিবার উপায় হইল সংশ্লিষ্ট দুই বা ততোধিক সময়ের মূল্যস্তর পাশাপাশি সাজাইয়া পরীক্ষা করা। এই পদ্ধতিকে সূচকসংখ্যা পদ্ধতি (Device of Index Numbers) বলা হয়। সূচক-সংখ্যা প্রণয়ন করিয়া দ্রব্যমূল্য বা উহার বিপরীত টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়।

এই প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে টাকাকড়ির অনাপেক্ষিক মূল্য (absolute value) পরিমাপ করিবার কোন উপায়ই নাই; যাহা করা যায় তাহা হইল উহার আপেক্ষিক মূল্য (relative value)—অর্থাৎ, অন্য এক সময়ের তুলনায় উহার পরিবর্তন নির্ধারণ করা। টাকাকড়ির অনাপেক্ষিক মূল্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে এক একক টাকাকড়ির বিনিময়ে যত প্রকার দ্রব্য ও সেবা যে-পরিমাণ পাওয়া যায় তাহাদের সকলেরই একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতে এক টাকার মূল্য হইল ২ কিলোগ্রাম চাল; ৩ কিলোগ্রাম গম, ½ কিলোগ্রাম ডাল, ১ খানি সূক্ষ্ম শাড়ির এক-দশমাংশ, ১ খানি মোটা ধুতির এক-চতুর্থাংশ, বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-বেতনের এক-ষষ্ঠাংশ, ডাক্তারের ফী'র এক-পঞ্চমাংশ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে যে-তালিকা প্রস্তুত হইবে প্রকৃতপক্ষে তাহা সীমাহীন হইবে। সুতরাং ইহা সম্ভব নয়।

সরল সূচকসংখ্যা প্রণয়ন (Construction of Simple Index Number)

সূচকসংখ্যায় বিভিন্ন সময়ের মূল্যস্তর পাশাপাশি সাজাইয়া গড় দাম বা উহার বিপরীত টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন হিসাব করা হয়। সুতরাং সূচকসংখ্যা হইল বিশেষ পদ্ধতিতে সাজান কতকগুলি মূল্যস্তরের সংখ্যা (a series of price level)।

মূল্যস্তর বিভিন্ন প্রকারের হয় বলিয়া সূচকসংখ্যাও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা যাইতে পারে—যথা, সাধারণ মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয়, শ্রমিকদের জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয়, বিলাসদ্রব্যের দামের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয়, ইত্যাদি। উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে সূচকসংখ্যা প্রণয়ন নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে করা হইয়া থাকে।

(ক) ভিত্তি বৎসর নির্বাচন (Selection of the Base Year): প্রথমেই ভিত্তি বৎসর নির্বাচন করিতে হইবে—অর্থাৎ, যে-বৎসরের 'তুলনায় অন্যান্য বৎসরের দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি পরিমাপ করা হইবে তাহাকে প্রথমে বাছিয়া লইতে হইবে।

(খ) দ্রব্যাদির নির্বাচন (Selection of Commodities): দ্বিতীয়ত, সূচকসংখ্যার উদ্দেশ্য অনুসারে দ্রব্যাদি নির্বাচন করিতে হইবে। যদি শ্রমিকশ্রেণীর

জীবনযাত্রার ব্যয় সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য সূচকসংখ্যা প্রণয়ন করা হয়, তবে শ্রমিকরা যে-যে দ্রব্য ও সেবা সচরাচর ভোগ করিয়া থাকে তাহাদিগকে তালিকাভুক্ত করিতে হইবে। যদি এরূপ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের পরিবর্তে সাধারণ মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয় করিবার জন্য সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করিতে হয় তবে যত বেশী সংখ্যক দ্রব্য ও সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় ততই ভাল।

(গ) দাম সংগ্রহ (Collection of Prices): দ্রব্যাদি নির্বাচনের পর সংশ্লিষ্ট সকল বৎসরে উহাদের দাম সংগ্রহ করা প্রয়োজন। খুচরা দাম (retail prices) সংগ্রহ করিতে পারিলেই ভাল হয়। ইহা সম্ভব না হইলে পাইকারী দামও (wholesale prices) চলিতে পারে।

(ঘ) ভিত্তি বৎসরে প্রত্যেক দ্রব্যের গড় দাম ১০০ করিয়া ধরিয়া তুলনার বৎসরে উহা শতকরা কত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা দেখান প্রয়োজন।

(ঙ) এইবার সংশ্লিষ্ট বৎসরসমূহের দামের গড় লইয়া উহাদের মধ্যে তুলনা করিলেই মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি বুঝা যাইবে। ভিত্তি বৎসরে প্রত্যেক দ্রব্যের দাম ১০০ করিয়া ধরা হয় বলিয়া ঐ বৎসরের গড় ১০০ হইতে বাধ্য। তুলনার বৎসরের গড় ১০০ অপেক্ষা যতটা অধিক বা কম হইবে মূল্যস্তর ততটা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইয়াছে বুঝিতে হইবে।

বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য একটি সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। মনে করা যাউক, ১৯৫৮ সালের তুলনায় ১৯৬৯ সালে প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের মূল্যস্তরের পরিবর্তন নির্ধারণ করা প্রয়োজন। দেশে চাউল গম তৈল ঘৃত ও মৎস্য এই পাঁচ প্রকারের খাদ্যদ্রব্য প্রধানত ব্যবহৃত হইলে সূচকসংখ্যাটি নিম্নের ছকটির মত হইবে।

দ্রব্য	ভিত্তি বৎসরে (১৯৫৮ সাল) দাম	ভিত্তি বৎসরের গড়	১৯৬৯ সালের দাম	১৯৬৯ সালের গড় (১৯৫৮ সালের তুলনায় শতকরা কত ভাগ বৃদ্ধি)
	প্রতি কুইন্টাল টা. প.		প্রতি কুইন্টাল টা. প.	
১। চাউল	৫০ ০০	১০০	২০০ ০০	৪০০
২। গম	৬০ ০০	১০০	৯০ ০০	১৫০
৩। তৈল	২০০ ০০	১০০	২৪০ ০০	১২০
৪। ঘৃত	১০০০ ০০	১০০	১২০০ ০০	১২০
৫। মৎস্য	৩০০ ০০	১০০	৪৫০ ০০	১৫০
		৫০০ ÷ ৫ = ১০০		৯৪০ ÷ ৫ = ১৮৮

এই কাল্পনিক সূচকসংখ্যা অনুসারে ১৯৫৮ সালের তুলনায় ১৯৬৯ সালে প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের দাম গড়ে শতকরা ৮৮ ভাগ বাড়িয়াছে। এইভাবে খাদ্যদ্রব্যের সূচকসংখ্যার পরিবর্তে সাধারণ সূচকসংখ্যা (General Index Number) প্রণয়ন করিয়া যদি দেখা যায় যে, সকল জিনিসপত্রের গড় দাম শতকরা ঐ ৮৮ ভাগ বাড়িয়াছে তবে টাকাকড়ির মূল্য ১৯৫৮ সালের তুলনায় শতকরা ৮৮ ভাগ কমিয়াছে বুঝিতে হইবে।

মুদ্রাস্ফীতি (Inflation)

মুদ্রাস্ফীতি বা ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ ইনফ্লেশন (inflation) বর্তমানে একটি বিশেষ সুপরিচিত শব্দ হইলেও ইহার প্রকৃত অর্থ লইয়া বেশ কিছুটা মতবিরোধ রহিয়াছে। ফলে মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন সংজ্ঞাও প্রচলিত আছে। যাহা হউক, মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, সাধারণ মূল্যস্তর যখন ক্রমাগত বাড়িতে থাকে--অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্য যখন অবিচ্ছিন্নভাবে কমিতে থাকে তখন যে-অবস্থার উদ্ভব হয় তাহাকেই মুদ্রাস্ফীতি বলিয়া অভিহিত করা যায়। মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইবার কারণ হইল জিনিসপত্রের যোগানের তুলনায় লোকের ক্রয়শক্তির (purchasing power) বৃদ্ধি। অন্যভাবে বলিতে গেলে, জিনিসপত্রের যতটা যোগান দেওয়া সম্ভব হয় লোকে তাহার তুলনায় অধিক ব্যয় করিতে সমর্থ হয় বলিয়াই মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অনেকের মতে অবশ্য মূল্যস্তর অবিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পাইলেই উহাকে 'প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি' বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। মূল্যস্তর বৃদ্ধির দরুন মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বলিয়া শিল্পপতিরাও উৎপাদনবৃদ্ধিতে উৎসাহিত হয়। ইহাতে উৎপাদনের যে-সকল উপকরণ অলস অবস্থায় পড়িয়াছিল তাহারা নিয়োজিত হয়। বেকার শ্রমিক কাজ পায়, জমি মূলধন-দ্রব্য প্রভৃতির যে-যে অংশ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল তাহাদিগকে কাজে লাগান হয়, ইত্যাদি। ফলে মূল্যস্তরবৃদ্ধির সংগে সংগে উৎপাদনবৃদ্ধিও ঘটিতে থাকে। এইভাবে যতক্ষণ উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে ততক্ষণ মূল্যস্তরবৃদ্ধিকে 'আংশিক মুদ্রাস্ফীতি' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

কিন্তু আংশিক মুদ্রাস্ফীতি বেশীদিন চলিতে পারে না। একসময় উৎপাদনের সকল অলস উপকরণই নিয়োজিত হইয়া দেশে আসে পূর্ণনিয়োগের অবস্থা (condition of full employment)। তখন আর উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব হয় না এবং শিল্পপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দরুন মজুরি সুদ প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদানের মূল্যসমূহও (factor prices) ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী হয়। এই অবস্থায় লোকের ব্যয় যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় সেই পরিমাণই মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে—অর্থাৎ, মূল্যবৃদ্ধি

পুরাদমে চলিতে থাকে। আধুনিক লেখকগণ এইরূপ অবস্থাকেই 'প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি' (true inflation) আখ্যা দিয়া থাকেন। সুতরাং প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি বলিতে বুঝায় উৎপাদনবৃদ্ধির সম্ভাবনারহিত অবিচ্ছিন্ন মূল্যবৃদ্ধি।

মুদ্রাসংকোচ (Deflation)

মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত অবস্থা হইল মুদ্রাসংকোচ। এই অবস্থায় মোট আয়ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া যায় বলিয়া মোট টাকাকড়ির পরিমাণ এবং ফলে মূল্যস্তরও কমিয়া যাইতে থাকে। এই অবস্থাকেই মুদ্রাসংকোচের অবস্থা বলা হয়।

দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলাফল (Effects of Changes in Prices)

দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলাফল বা প্রভাবকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—যথা, (১) উৎপাদনের উপর প্রভাব এবং (২) বণ্টনের উপর প্রভাব। প্রথমে বর্ধিত দামের প্রভাবের আলোচনা করা হইতেছে।

উৎপাদনের উপর দামবৃদ্ধির প্রভাব: মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদকদের বেশী লাভ হয় বলিয়া তাহারা উৎপাদনবৃদ্ধিতে আগ্রহান্বিত হয়। সেইজন্য অল্পস্বল্প মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে মোট বিনিয়োগ, মোট উৎপাদন বা জাতীয় আয়, মোট নিয়োগ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইয়া অর্থ-ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিতে থাকে। এই কারণে অনেকে বলেন যে সরকারের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত যাহাতে মূল্যস্তর ধীরে ধীরে বাড়িতে পারে।

কিন্তু প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে একথা মোটেই খাটে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই অবস্থায় মাত্র দামই বৃদ্ধি পাইতে থাকে; উৎপাদনবৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা থাকে না। শুধু তাহাই নহে, অনেক সময় দেখা যায় যে এইরূপ মুদ্রাস্ফীতি বাড়িতে বাড়িতে চরমে উঠিয়া গিয়াছে, বা অতিমুদ্রাস্ফীতির (hyperinflation) উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ ঘটিলে উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিশৃংখল হইয়া পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া পড়িতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মেনীতে এইরূপই ঘটিয়াছিল। অতিমুদ্রাস্ফীতির ফলে বহু লোকের সমস্ত আর্থিক সঞ্চয় নষ্ট হইয়াছিল এবং টাকাকড়ি সম্পূর্ণ মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে লোকের উৎপাদন, উপার্জন ও সঞ্চয়ে আগ্রহ একেবারে কমিয়া গিয়াছিল।

বণ্টনের উপর দামবৃদ্ধির প্রভাব: বণ্টনের দিক দিয়া দামবৃদ্ধির ফল সকলের উপর এক নহে। দাম বৃদ্ধি পাইলে কিছু লোকের লাভ হয় এবং কিছু লোকের ক্ষতি হয়। খাতক (debtor), শিল্পপতি, মালমজুতকারী প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীভুক্ত। খাতক সকল সময়ই পূর্বের চুক্তি অনুসারে ঋণ পরিশোধ করে; অথচ দাম বৃদ্ধি পাইলে

ঐ টাকায় পূর্বাপেক্ষা কম জিনিসপত্র পাওয়া যায়। সুতরাং খাতক লাভবান এবং পাওনাদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিল্পপতিদের লাভ হয় প্রধানত দুইটি কারণে। প্রথমত, তাহারা যখন কাঁচামাল ক্রয় করে তখন উহার দাম কম থাকে, কিন্তু যখন তৈয়ারি জিনিস বিক্রয় করে তখন কাঁচামালের দাম বাড়িয়া যায়। তৈয়ারি জিনিস বিক্রয় করিবার সময় সেই সময়কার বর্ধিত দামেই কাঁচামালের হিসাব করে। উদাহরণস্বরূপ, শীতবস্ত্র-উৎপাদক ৮ টাকা পাউণ্ড দামে পশম ক্রয় করিল; কিন্তু তৈয়ারি আলোয়ান বাজারে বিক্রয় করিতে গিয়া দেখিল যে পশমের দাম বাড়িয়া ১০ টাকা পাউণ্ড হইয়াছে। সে এই ১০ টাকা দামে হিসাব করিয়াই আলোয়ানের দাম ঠিক করিবে। দ্বিতীয়ত, তৈয়ারি জিনিসের দাম যে-হারে বৃদ্ধি পায়, মজুরি সুদ ইত্যাদি সেই হারে বৃদ্ধি পায় না। যাহারা মালমজুতের ব্যবসায় করে তাহাদেরও লাভ হয়। কিন্তু যাহারা মাস-মাহিনা অথবা দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরিতে কার্য করে তাহাদের বেতন ও মজুরি দামবৃদ্ধির অনুপাতে বাড়ে না বলিয়া দামবৃদ্ধির ফলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পেনসন্‌ভোগী প্রভৃতির ন্যায় যাহাদের আয় একেবারে ধরাবাঁধা তাহাদের আরও ক্ষতি হয়। শ্রমজীবীরা কিন্তু একদিক দিয়া লাভ করে, কারণ তাহাদের নিয়োগের পরিমাণ বাড়ে। ভারতের ন্যায় দেশে কৃষকের দুই দিক দিয়া লাভ হয়। প্রথমত, ঋণগ্রস্ত কৃষকের ঋণের ভার কমিয়া যায়; দ্বিতীয়ত, কৃষিজ উৎপন্নের দাম বাড়িলেও খাজনা বাড়ে না। পরিশেষে, বর্ধিত দামের ফলে সঞ্চয়ের মূল্য কমিয়া যায়। ইহাতেও অনেকের ক্ষতি হয়।

উৎপাদনের উপর দামহ্রাসের প্রভাব: ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, দামহ্রাস বা মুদ্রাসংকোচের ফলাফল দামবৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত। মূল্যস্তরবৃদ্ধির প্রথম অবস্থায় যেমন উৎপাদন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান প্রভৃতি বাড়িয়া যায় সেইরূপ মূল্যস্তর হ্রাস পাইলে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান কমিয়া যায়। কারণ, মূল্যস্তর কমিলে লাভের পরিবর্তে লোকসানের সম্ভাবনা দেখা দেয় বলিয়া শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা উৎপাদন ও বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। ফলে নিয়োগের পরিমাণও কমিয়া যায়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে বলা যায় যে, দামহ্রাস বা মুদ্রাসংকোচ মুদ্রাস্ফীতি অপেক্ষাও ক্ষতিকর।

বণ্টনের উপর দামহ্রাসের প্রভাব: বণ্টনের উপর দামহ্রাসের প্রভাব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার ফলে পাওনাদার লাভবান এবং খাতক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শিল্পপতিদের মুনাফা কমে, মালমজুতকারীর লোকসান হয়, যাহারা বেতন ও মজুরি পায় তাহাদের অবস্থা সচ্ছল হইয়া উঠে, কিন্তু নিয়োগের পরিমাণ কমে। সুতরাং শ্রেণী হিসাবে তাহাদের ক্ষতিই হয়। কৃষকেরও ক্ষতি হয়। খাজনা সুদ

প্রভৃতির হার একই থাকে অথচ পণ্যের দাম কমার জন্য তাহার আয় কমিয়া যায়। পেনসন্‌ভোগীর ন্যায় লোকের আয় নির্দিষ্ট থাকিলেও অবস্থা পূর্বাপেক্ষা সচ্ছল হইয়া উঠে। নির্দিষ্ট আয়ের বিনিময়ে তাহারা পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে। পূর্বে যাহারা সঞ্চয় করিয়াছে তাহাদেরও অনুরূপ সুবিধা হয়।

উপসংহার : মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধির এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ফলাফলের জন্য মুদ্রামূল্যে যথাসম্ভব স্থায়িত্ব রক্ষারই নির্দেশ দেওয়া হয়। বলা হয় যে, টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষা বা দামের হ্রাসবৃদ্ধি নিবারণ সরকারের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক কার্য।

ভারতে দ্রব্যমূল্য (Prices in India)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় সুরু হইতেই ভারতে দ্রব্যমূল্য নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে (১৯৫১-৫৬ সাল) দ্রব্যমূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল থাকিলেও তাহার পর হইতে এরূপ গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে যে অর্থ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িবার এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বানচাল হইবার উপক্রম হইয়াছে।

এই কারণে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইতে দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণের (price stabilisation) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে।

ভারতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে তিনটি পৃথক পর্যায়ে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যায় : (ক) যুদ্ধকালীন মূল্যবৃদ্ধি, (খ) যুদ্ধোত্তর যুগে মূল্যবৃদ্ধি এবং (গ) পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যের গতি।

ক। যুদ্ধকালীন মূল্যবৃদ্ধি : বলা হইয়াছে যে যুদ্ধ সুরু হইবার প্রায় সংগে সংগেই ভারতে দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগামী হইতে থাকে। ইহার ফলে যুদ্ধের শেষে দেখা যায় যে পাইকারী দ্রব্যাদির দাম প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জীবনধারণের এবং খুচরা দ্রব্যাদির দাম যে ইহা অপেক্ষাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধিকেই যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি (Wartime Inflation) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

এই যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্যবৃদ্ধির কারণ ছিল দুইটি : (ক) টাকাকড়ির অস্বাভাবিক যোগানবৃদ্ধি, (খ) ভোগ্যপণ্যের (consumption goods) অভূতপূর্ব যোগানহ্রাস।

টাকাকড়ির যোগানবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল নানাভাবে। নোট ছাপাইয়া যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করার দরুন কাগজী মুদ্রার পরিমাণ প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ব্যাংক-আমানত বা ব্যাংকের টাকাকড়ির (Bank Money) পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল ৫০০ কোটি টাকার উপর। যুদ্ধকালীন কর্মপ্রচেষ্টার দরুন টাকাকড়ির প্রচলনগতিও

বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অর্থাৎ, ফিশারের সমীকরণের M ও M′ এবং V ও V′ চারিটি উপাদানই বৃদ্ধি পাইয়া টাকাকড়ির মোট যোগানকে বহু পরিমাণে বর্ধিত করিয়াছিল।

অপরদিকে শ্রমিক বিক্ষোভ, যন্ত্রপাতির অভাব প্রভৃতি কারণে উৎপাদনহ্রাস, ভোগ্যপণ্যের পরিবর্তে যুদ্ধোপকরণ উৎপাদন, আমদানীহ্রাস, মালমজুত, কালোবাজার প্রভৃতির জন্য মোট বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির যোগান বা ফিশারের সমীকরণের T বিশেষ হ্রাস পাইয়াছিল। ফলে ঘটিয়াছিল গড় দ্রব্যমূল্য বা P-র অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং সাধারণ লোকের তজ্জনিত অকল্পনীয় দুঃখদুর্দশা। এই মূল্যবৃদ্ধির দরুন একমাত্র ১৯৪৩ সালের বংগীয় দুর্ভিক্ষেই ১৫ লক্ষের উপর লোক মারা গিয়াছিল।

বংগীয় দুর্ভিক্ষের পর সরকার কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া মূল্যবৃদ্ধিকে দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহার মধ্যে কর ও ঋণগ্রহণের মাধ্যমে যথাসম্ভব টাকাকড়ি বাজার হইতে টানিয়া লওয়া, স্বর্ণবিক্রয়, খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্তন, বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ, ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিই প্রধান।

খ। যুদ্ধোত্তর যুগে মূল্যবৃদ্ধিঃ আশা করা হইয়াছিল, এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের দরুন এবং স্বাভাবিক কারণে যুদ্ধোত্তর যুগে মুদ্রাস্ফীতির প্রাবল্য অনেকটা কমিয়া আসিবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। যুদ্ধোত্তর যুগেও টাকাকড়ির পরিমাণবৃদ্ধি ও দ্রব্যাদির পরিমাণহ্রাস একপ্রকার সমান তালেই চলিয়াছিল। ইহার উপর ছিল খাদ্যশস্য চিনি বস্ত্র ইত্যাদির বিনিয়ন্ত্রণ (decontrol) লইয়া পরীক্ষা। খাদ্যদ্রব্য, চিনি ও কাপড়ের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া লইলে উহাদের দাম কমে কি না তাহা লইয়া সরকার পরীক্ষা করিয়াছিল। অর্থাৎ, নিয়ন্ত্রণ কিছুদিনের জন্য উঠাইয়া দিয়াছিল। ফলে যুদ্ধের শেষ হইতে ১৯৪৮ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য নিয়মিত বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারকে উহা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আর এক দফা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। ইহার মধ্যে সরকারী ব্যয়হ্রাস, নূতন নূতন করধার্য, অধিক পরিমাণে ঋণসংগ্রহের প্রচেষ্টা, কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা, দ্রব্যাদির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কঠিনতর করা, ইত্যাদিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই সকল ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হইবার পূর্বেই আসিয়া গেল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগ।

গ। পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যের গতিঃ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগ সুরু হয় ১৯৫১-৫২ সাল হইতে। ঐ সময়ে কোরিয়া যুদ্ধের দরুন সারা পৃথিবীতেই দ্রব্যমূল্যের গতি ছিল বৃদ্ধির দিকে। এই কারণে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের সংগে সংগেই সরকার দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিরোধের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়। টাকাকড়ির পরিমাণহ্রাস ও দ্রব্যাদির পরিমাণবৃদ্ধির জন্য উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহ নূতনভাবে

অবলম্বিত হয়। ইহার ফলে এবং বিশ্বের বাজারে কতকটা মন্দা (recession) দেখা দেওয়ায় ১৯৫২-৫৩ সালে দ্রব্যমূল্য বেশ কতকটা স্থির থাকে এবং জনসাধারণের ধারণা হয় যে দ্রব্যমূল্যে বেশ স্থায়িত্ব আসিয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে দ্রব্যমূল্য ভীষণভাবে কমিতে থাকে এবং উহাতে উৎপাদকগণ, বিশেষ করিয়া কৃষকেরা, ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহার পর ১৯৫৫ সালের মধ্যভাগ হইতে দ্রব্যমূল্য আবার উর্ধ্বগামী হইতে থাকে।

এইভাবে প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে কোন দ্রব্যমূল্যের কোন সময় বৃদ্ধি, কোন সময় হ্রাস ঘটায় নানারূপ অসুবিধা দেখা দেয়। ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারকে দ্রব্যমূল্যে স্থায়িত্ব আনয়নের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। ঐ পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের ব্যয়বৃদ্ধি এবং ঘাটতি ব্যয় (deficit financing) বা নোট ছাপাইয়া ব্যয় নির্বাহের দরুনও দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অবশ্য দ্রব্যমূল্য হ্রাস বা স্থিতিকরণের প্রচেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। কারণ, ঘাটতি ব্যয় বা নোট ছাপানর পরিমাণ কিছুটা কম (অনুমিত ১২০০ কোটি টাকার তুলনায় ৯৪৮ কোটি টাকা) হইলেও আশানুরূপ উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটে নাই। বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্য, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা প্রভৃতির উৎপাদন অনুমান অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছিল।

যাহা হউক, প্রথম পরিকল্পনার শেষে যে মূল্যস্তর ছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে তাহার বৃদ্ধি ঘটে শতকরা ৩০ ভাগের উপর।

এইভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষা শতকরা ৩০ ভাগের উপর বর্ধিত মূল্যস্তর লইয়া তৃতীয় পরিকল্পনা সুরু হয়। উপরন্তু, এই পরিকল্পনা ছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষা আকারে বৃহত্তর। এই দুই কারণে তৃতীয় পরিকল্পনায় দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণকে পরিকল্পনার সাফল্যের অন্যতম সর্ত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল। এই বৃহত্তর পরিকল্পনায় অধিক ব্যয়ের দরুন লোকের আয়বৃদ্ধি ঘটিবে বলিয়া চাহিদাও যে বৃদ্ধি পাইবে সে-সম্বন্ধে কোন দ্বিমত ছিল না। ফলে ঠিক হইয়াছিল যে অপরিহার্য ছাড়া সকল চাহিদাই নিয়ন্ত্রিত করা হইবে। অর্থাৎ, যথাসম্ভব লোকের ভোগ কমাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। অবশ্য ভোগহ্রাসই যথেষ্ট নয়; সংগে সংগে উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই উৎপাদনের লক্ষ্যসমূহ স্থির করা হইয়াছে।

পরিকল্পনায় ভোগ-নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ যে কতকটা কার্যকর হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, দেখা যায় যে পরিকল্পনার প্রথম দেড় বৎসরে দ্রব্যমূল্য আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। কিন্তু ঐ সময়ের পর ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাস হইতে চীনের সহিত সীমান্ত-সংঘর্ষ সুরু হইলে

১৪

ঋণ ও ব্যাংক ব্যবস্থা
(Credit and Banking)

ঋণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of Credit)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যেমন, আমাদের দেশে কৃষকদের অনেকে ফসল বুনার সময় ধানচালের দাদন বা ঋণ লইয়া থাকে। ফসল উঠার পর তাহাদিগকে দাদন-লওয়া ধানচাল ফেরত দিতে হয়; সংগে সংগে সুদ হিসাবেও কিছু অতিরিক্ত ধানচাল প্রদান করিতে হয়। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে টাকাকড়িই ঋণ দেওয়া হয়। ফলে ঋণের কারবার হইয়া দাঁড়াইয়াছে গ্রহীতা কর্তৃক দাতাকে ভবিষ্যতে অর্থপ্রদানের প্রতিশ্রুতি।

ঋণপত্র (Credit Instruments)

ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি মৌখিক এবং লিখিত উভয় প্রকারের হয়। শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতিভংগের অভিযোগ লইয়া আদালতে উপস্থিত হওয়া যায় না; সংগে সংগে সাক্ষ্যপ্রমাণাদিও উপস্থিত করিতে হয়। লিখিত প্রতিশ্রুতি কিন্তু এককভাবেই আদালতে বলবৎযোগ্য; সাধারণ ক্ষেত্রে ইহার উপর সাক্ষ্যপ্রমাণাদির প্রয়োজন হয় না। লিখিত প্রতিশ্রুতি শুধু খাতায় লেখা থাকিতে পারে; আবার উহাকে ঋণপত্রেও নিবদ্ধ করা যাইতে পারে। গৃহস্থের নিকট হইতে পাওনার হিসাব যদি শুধু মুদীর খাতায় লেখা না থাকিয়া হাতচিঠাতে উঠান হয় এবং উহা যদি মুদীর নিকট জমা থাকে তবে ঐ হাতচিঠা হইল ঋণপত্র (credit instrument)। এই ঋণপত্র অবশ্য হস্তান্তরযোগ্য (negotiable) নয়। ইহাতে লিখিত পাওনা স্বয়ং মুদীকেই আদায় করিতে হইবে। প্রথম প্রথম এই ধরনের হস্তান্তরযোগ্যতাহীন (non-negotiable) ঋণপত্রই ব্যবহৃত হইত। পরে হস্তান্তরযোগ্য ঋণপত্রের প্রচলন হয়। স্বর্ণকার, শ্রেষ্ঠী প্রভৃতির নিকট টাকাকড়ি জমা রাখিলে যে-রসিদ পাওয়া যাইত তাহা ক্রমে হস্তান্তরিত হইতে লাগিল। যেমন, জগৎ শেঠের নিকট টাকা জমা রাখিয়া রাম যে-রসিদ পাইল তাহা দিয়া সে শ্যামের নিকট হইতে মাল ক্রয় করিতে সমর্থ হইল। ইহার ফলে রামের নহে, শ্যামেরই টাকা শেঠের নিকট জমা রহিল। এইভাবে হস্তান্তরযোগ্য ঋণপত্র ব্যবহারের যে-সূচনা হয় তাহা দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্রমবিকশিত হইয়া বর্তমান দিনের ব্যবসাবাণিজ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। শুধু যে ব্যবসাবাণিজ্যে ঋণপত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাই নহে, উহাদের সংখ্যাবৃদ্ধিও ঘটিয়াছে। অর্থাৎ, দেখা দিয়াছে বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্র। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান।

ক। প্রতিশ্রুতিপত্র (Promissory Notes): প্রতিশ্রুতিপত্র দ্বারা ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অথবা চাহিবামাত্র ঋণপরিশোধের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। প্রতিশ্রুতিপত্র সাধারণত হস্তান্তরযোগ্য হয়; ঋণদাতা উহাকে অপরের নিকট বিক্রয় করিতে পারে। ভারতে ঋণ-ব্যবসায়ীরা অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিশ্রুতিপত্রের বিরুদ্ধে ঋণপ্রদান করিয়া থাকে; এইরূপ প্রতিশ্রুতিপত্র সাধারণত 'হ্যাণ্ডনোট' বলিয়া পরিচিত।

খ। চেক (Cheques): আমানত (deposit) হইতে নির্দিষ্ট অর্থপ্রদান করিবার জন্য আমানতকারী ব্যাংকের উপর যে লিখিত আদেশ দেয় তাহাকেই চেক বলে। সাধারণত চেক হস্তান্তরযোগ্য প্রতিশ্রুতিপত্র। তবে নিরাপত্তার জন্য যাহার নামে চেক কাটা হইয়াছে তাহাকেই অর্থপ্রদানের নির্দেশ দিয়া উহাকে হস্তান্তর-যোগ্যতাহীন করা যাইতে পারে। চেক আবার ক্রসড্ (crossed) হয়। এইরূপ চেক সোজাসুজি ব্যাংকে লইয়া গেলে নগদ টাকা পাওয়া যায় না। উহাকে প্রথমে ব্যাংকে জমা দিতে হয়; ব্যাংকে জমা দেওয়া হইলে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান চেক কাটিয়াছে তাহার আমানত হইতে যাহার নামে চেক কাটা হইয়াছে তাহার আমানতে টাকা স্থানান্তরিত হয়। তখন সে ইচ্ছা করিলে নগদ টাকা তুলিয়া লইতে পারে। ধরা যাউক, রামবাবু অফিস হইতে চেকে মাহিনা পাইয়াছেন এবং এই চেক হইল ক্রসড্ চেক। রামবাবু ঐ চেক ব্যাংকে লইয়া গেলেই নগদ টাকা পাইবেন না। তাঁহাকে প্রথমে চেকখানি নিজের ব্যাংকে জমা দিতে হইবে। তখন তাঁহার ব্যাংক যে-অফিস চেক প্রদান করিয়াছে তাহার ব্যাংকের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া রামবাবুর আমানতের ঘরে জমা করিবে। জমা হইলে পর রামবাবু নিজে চেক কাটিয়া নগদ টাকা তুলিয়া লইতে পারিবেন, বা চেকের মাধ্যমে গত মাসের দেনাপত্র মিটাইতে পারিবেন। আর অফিসের ব্যাংক ও রামবাবুর ব্যাংক যদি একই ব্যাংক হয় তবে রামবাবু চেকখানি জমা দিলেই অফিসের হিসাব হইতে তাঁহার হিসাবে লিখিত পরিমাণ টাকা হস্তান্তরিত হইবে। সাধারণ হস্তান্তরযোগ্য চেক অপেক্ষা এইরূপ ক্রসড্ চেক নিরাপদ, কারণ ব্যাংকের মাধ্যমেই উহাকে ভাঙাইতে পারা যায়। একটি ব্যাংক অপর একটি ব্যাংকের উপর চেক কাটিলে উহাকে 'ব্যাংকার্স ড্রাফ্‌ট' (Banker's Draft) বলে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, চেককে টাকাকড়ি বলিয়া গণ্য না করিয়া ঋণপত্র বলিয়া গণ্য করা হয় কেন? ইহার একাধিক কারণ আছে। প্রথমত, ব্যাংকে আমানত না থাকিলে চেকের কোন মূল্য নাই। দ্বিতীয়ত, চেকের মাধ্যমে লেনদেনের কার্য একবারেই সমাপ্ত হয় না; আমানত স্থানান্তরিত করিবার বা টাকা তুলিয়া লইবার কার্য তখনও বাকি থাকে। তৃতীয়ত, মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গেলে চেক একখণ্ড কাগজেরই সামিল হয়। চতুর্থত, সকল চেক হস্তান্তরযোগ্য নহে। অতএব, ব্যাংক-আমানতকেই ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি (Bank Money) এবং চেককে টাকাকড়ির পরিবর্ত বা ঋণপত্র বলিয়া গণ্য করা হয়।

গ। হুণ্ডি (Bills of Exchange): 'বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ'কে বাংলায় হুণ্ডি বলিয়া অভিহিত করা হইলেও যাহাকে ঠিক হুণ্ডি বলে তাহার সহিত প্রকৃত বিল অফ্

এক্সচেঞ্জের পার্থক্য আছে। হুণ্ডি লেখা হয় দেশী ভাষায়, বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ লেখা হয় ইংরাজীতে। কতকগুলি হুণ্ডি প্রতিশ্রুতিপত্রেরই মত, আবার কতকগুলি বিল অফ্ এক্সচেঞ্জের ধরনের। যাহা হউক, বিল অফ্ এক্সচেঞ্জের বাংলা প্রতিশব্দ 'হুণ্ডি'ই করিয়া ইহার প্রকৃতি বর্ণনা করা হইতেছে।

একদিক দিয়া হুণ্ডির প্রকৃতি প্রতিশ্রুতিপত্রের প্রকৃতির বিপরীত। প্রতিশ্রুতিপত্র প্রদান করে ঋণগ্রহীতা, হুণ্ডিতে অর্থপ্রদানের নির্দেশ দেয় মালবিক্রেতা। মালবিক্রেতার নির্দেশপত্রে ক্রেতা সম্মতিসূচক স্বাক্ষর করিলে তবেই উহা হুণ্ডিতে পরিণত হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝান যাইতে পারে। ধরা যাউক, ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রীগণপতি বাজোরিয়া লণ্ডনের মিঃ ম্যাকেঞ্জীর নিকট ১ হাজার পাউণ্ড মূল্যের যন্ত্রপাতি তিন মাস পরে দাম দিবার অংগীকার করিয়া ক্রয় করিলেন। এখন মিঃ ম্যাকেঞ্জী শ্রীবাজোরিয়ার নামে একটি বিল কাটিয়া পাঠাইবেন। শ্রীবাজোরিয়া উহাকে 'স্বীকার করিলাম' (accepted) বলিয়া সহি করিলে উহা হুণ্ডিতে পরিণত হইবে। এই হুণ্ডি তিন মাস পরে শ্রীবাজোরিয়ার নিকট প্রেরণ করিলে তিনি ১ হাজার পাউণ্ড দিতে আইনত বাধ্য থাকিবেন। এই তিন মাসের পূর্বেই যদি মিঃ ম্যাকেঞ্জীর টাকার দরকার হয় তবে কোন ব্যাংকের নিকট হইতে ঐ হুণ্ডি তিনি বাট্টা (discount) করিয়া লইতে পারিবেন। সময়ান্তরে ব্যাংক শ্রীবাজোরিয়ার নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লইবে। এইভাবে হুণ্ডির সাহায্যে ব্যবসায়ীরা ধারে মালপত্র ক্রয় করিয়াও আমদানী করিয়া থাকে। ফলে ব্যবসাবাণিজ্য ও আমদানী-রপ্তানী সম্প্রসারিত হয়। ইহা ছাড়াও হুণ্ডির সাহায্যে আমদানী-রপ্তানীর মূল্য সহজে মিটান যায়। কিভাবে ইহা সম্ভব হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে করা হইতেছে।

উপরের উদাহরণে শ্রীবাজোরিয়া মিঃ ম্যাকেঞ্জীর নিকট হইতে ধারে মাল আমদানী করিয়াছেন। সুতরাং তিন মাস পরে শ্রীবাজোরিয়ার সমস্যা হইবে কি করিয়া লণ্ডনে মিঃ ম্যাকেঞ্জীকে টাকা পাঠান যায়। যদি ধরা যায়, ঐ একই সময় ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রীবিশ্বনাথ দত্তের নিকট হইতে লণ্ডনের আমদানীকারক মিঃ টমাস ঐ ১ হাজার পাউণ্ড মূল্যের মাল আমদানী করিয়াছেন তবে সমস্যাটি সহজেই মিটিয়া যাইতে পারে। শ্রীবাজোরিয়া শ্রীদত্তের নিকট হইতে মিঃ টমাসের স্বীকার করা হুণ্ডিটি ক্রয় করিয়া লইয়া মিঃ ম্যাকেঞ্জীকে পাঠাইলে মিঃ ম্যাকেঞ্জী মিঃ টমাসের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন। ফলে শ্রীদত্ত তাঁহার রপ্তানীর মূল্য ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রীবাজোরিয়ার নিকট হইতে এবং মিঃ ম্যাকেঞ্জী তাঁহার রপ্তানীর মূল্য লণ্ডনেরই মিঃ টমাসের নিকট হইতে পাইবেন। সুতরাং কাহাকেও বিদেশ হইতে টাকা আদায়ের বা বিদেশে টাকা পাঠানর ব্যবস্থা করিতে হইবে না। এইভাবে হুণ্ডি বা বিল

ক্রয়বিক্রয়ের জন্য প্রায় প্রত্যেক উন্নত দেশেই বিলের বাজার (Bill Market) আছে এবং বর্তমানে হুণ্ডি অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

ঘ। **তমস্থক (Bonds)** ঃ অন্যান্য ধরনের ঋণপত্রের মধ্যে তমস্থকই প্রধান। তমস্থক মোটামুটি দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র। ডিবেঞ্চার (Debentures) তমস্থকের অন্যতম উদাহরণ।

ব্যাংক (Banks)

ব্যাংক-ব্যবসায়ের উদ্ভব হয় তিনটি প্রধান ব্যবসায় হইতে—যথা, বণিকদের ব্যবসায় বা বাণিজ্য (trade), মহাজনদের ব্যবসায় (money-lending) এবং স্বর্ণকারদের ব্যবসায়। বর্তমান ব্যাংক-ব্যবসায়ীর পূর্বপুরুষ বলিয়া এই তিনজনেরই নামোল্লেখ করিতে হয়। তবে ব্যাংক-ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয় বণিকদের ব্যবসায় হইতে।

ব্যাংক-ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশ ঃ প্রথম প্রথম ব্যবসাবাণিজ্য ধাতব মুদ্রার মাধ্যমেই পরিচালিত হইত। ধাতব মুদ্রা সহজ বহনযোগ্য হইলেও ইহা লুণ্ঠিত হইবার ভয় ছিল। এই কারণে প্রাচীন কালে বণিকরা আসল টাকাকড়ি বহন না করিয়া টাকাকড়ির মালিকানার নির্দেশক লিখিত পত্র বহন করিত। যে-নগরে বণিকের বাসস্থান ছিল সেখানকার কোন প্রখ্যাত ব্যক্তি বণিকের নিকট হইতে টাকা জমা রাখিয়া এইরূপ লিখিত পত্র প্রদান করিত। অনেক সময় আবার বণিক নিজ নামেই ঐ পত্র বাহির করিত। যাহা হউক, ঐ প্রখ্যাত ব্যক্তি বা বণিকের উপর লোকের বিশ্বাস থাকায় তাহারা নগদ টাকাকড়ির পরিবর্তে ঐরূপ লিখিত পত্র লইতে আপত্তি করিত না। প্রয়োজনমত তাহারা পত্র-প্রচলনকারীর নিকট উপস্থিত হইয়া নগদ টাকাও গ্রহণ করিতে পারিত ; অথবা দেনা মিটাইতে ঐ পত্র কাহাকেও সমর্পণ করিতে পারিত। এইভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যে নগদ টাকাকড়ির পরিবর্তে ঋণপত্রের ব্যবহার সুরু হইল। এই ঋণপত্রই পরে বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ বা হুণ্ডিতে পরিণত হয়।

ব্যাংক-ব্যবসায়ীর বংশের ইতিহাসে পরবর্তী পূর্বপুরুষ হইল মহাজন বা ঋণ-ব্যবসায়ী। ঋণের ব্যবসায় অতি প্রাচীন। ইহার উদ্ভব হয় টাকাকড়ির প্রচলনের সংগে সংগেই। অতীতে ঋণ-ব্যবসায়ীকে লোকে শ্রদ্ধার চক্ষে না দেখিলেও তাহার যে উপযোগিতা আছে তাহা তাহারা অস্বীকার করিতে পারে নাই। প্রথম প্রথম মহাজন নিজের সঞ্চিত অর্থই ব্যবসায়ে খাটাইত। এইভাবে সে ঋণের ব্যবসায়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিলে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাহীন সঞ্চিত অর্থের মালিকরা তাহাদের সঞ্চয় খাটাইবার জন্য উহা মহাজনদের হস্তে সমর্পণ করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম মহাজন কিছু কমিশন লইয়া এই টাকা খাটাইবার ব্যবস্থা করিত ; ক্রমেই সে ইহা তাহার নিজের

টাকাকড়ির সহিত মিশাইয়া ফেলিয়া খাটাইতে লাগিল এবং যে তাহার নিকট টাকা খাটাইবার জন্য জমা রাখিয়াছিল তাহাকে নির্দিষ্ট স্থদ দিতে লাগিল। এইভাবে আমানত গ্রহণ ও ঋণপ্রদানের কার্য স্থরু হইল এবং ব্যাংক-ব্যবসায় পূর্ণতর রূপ ধারণ করিল।

চেকের ব্যবহার ব্যাংক-ব্যবসায়ের পরবর্তী অধ্যায়। এই কার্য স্থরু করে ইংরাজ স্বর্ণকারগণ। প্রাচীন ইংলণ্ডে ধনী বণিকরা স্বর্ণকারদের নিকট স্বর্ণ গচ্ছিত রাখিয়া রসিদ লইত এবং গচ্ছিত স্বর্ণ ফেরত লইবার সময় এই রসিদ প্রত্যর্পণ করিত। পরে এই রসিদ প্রত্যেকবারেই স্বর্ণকারের নিকট ফেরত না আসিয়া টাকাকড়ির মত দেনা-পাওনা মিটানর কার্যে হস্তান্তরিত হইতে লাগিল। ইহাতে প্রত্যেকবারেই গচ্ছিত স্বর্ণ উঠাইয়া দেনা মিটান ও পাওনাদারের পক্ষে ঐ স্বর্ণ আবার গচ্ছিত রাখার অস্থবিধা দূর হইল। এইরূপ হস্তান্তরযোগ্য স্বর্ণ আমানতের রসিদই পরবর্তী যুগে ব্যাংক-নোটে পরিণত হয়।

আরও কিছুদিন পরে দেনাপাওনা মিটানর কার্যে সকল সময় আমানত-রসিদও ব্যবহারের প্রয়োজন হইত না। গচ্ছিতকারী তাহার গচ্ছিত স্বর্ণ হইতে কিছু পরিমাণ তাহার পাওনাদারকে প্রদানের জন্য লিখিত নির্দেশ স্বর্ণকারকে দিতে পারিত। এইরূপ লিখিত নির্দেশ চেক ছাড়া আর কিছুই নয়। চেকের উদ্ভব হওয়ায় স্বর্ণকার পুরাপুরি ব্যাংক-ব্যবসায়ীতেই পরিণত হইল।

বর্তমানে ব্যাংক-ব্যবসায়ী মোটামুটি তিন ধরনের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রথমত, সে হুণ্ডি বাট্টা করা ইত্যাদির মাধ্যমে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য পরিচালনায় অর্থসরবরাহ করে। এই কার্য উত্তরাধিকার সূত্রে বণিকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। দ্বিতীয়ত, মহাজনদের মত সে সঞ্চয়সংগ্রহ ও ঋণপ্রদান করে। তৃতীয়ত, সে স্বর্ণকারদের মত নগদ টাকাকড়ি ছাড়াও চেকের মাধ্যমে দেনাপাওনা মিটানর স্থব্যবস্থা করিয়া দেয়।

ব্যাংক-ব্যবসায় কাহাকে বলে? (What is Banking ?): ব্যাংক-ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে উপরি-উক্ত আলোচনায় ব্যাংকের কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে ব্যাংক-ব্যবসায়ী মোটামুটি তিন ধরনের কার্য করিয়া থাকে—যথা, বাণিজ্যে ঋণসরবরাহের কার্য, ঋণগ্রহণ ও ঋণপ্রদানের কার্য এবং চেক বা ঋণপত্রের মাধ্যমে দেনাপাওনা মিটানর কার্য। এই তিন প্রকার কার্যই ঋণসংক্রান্ত কার্য বলিয়া ব্যাংক-ব্যবসায়কে 'ঋণের ব্যবসায়' (business of dealing in credit) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। অর্থাৎ, ব্যাংক ঋণ লইয়া কারবার করে। একজন আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদের মতে, ব্যাংক অর্থসরবরাহ ব্যাপারে অন্যতম মধ্যস্থ; ইহা ঋণ আদানপ্রদানের কারবারী (A bank

is a financial intermediary, a dealer in loans and debt)। বিষয়টিকে একটু ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যাহারা অর্থ সঞ্চয় করে এবং যাহারা সেই অর্থ শিল্পবাণিজ্যে বিনিয়োগ করে তাহারা দুই ভিন্ন শ্রেণীর লোক। ব্যাংকই উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ বা মধ্যস্থতার কার্য করে। উহা সঞ্চয়কারীদের নিকট হইতে আমানত বা ঋণ গ্রহণ করিয়া ঐ অর্থ আবার শিল্পপতি, বণিক প্রভৃতিকে ঋণ হিসাবে প্রদান করে। এইভাবে ঋণের আদানপ্রদানের মাধ্যমে যে-প্রতিষ্ঠান মুনাফালাভের প্রচেষ্টা করে তাহাকেই ব্যাংক বলা যায়।

বিশ্বাসই ঋণের ভিত্তি। যে-ব্যক্তি ব্যাংকে টাকা জমা রাখে সে বিশ্বাস করে যে তাহার টাকা নষ্ট হইবে না। তেমনি ব্যাংকও যখন ঋণপ্রদান করে তখন বিশ্বাস করে যে ঐ টাকা আদায় করা যাইবে। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর বিশ্বাস না থাকিলে ব্যাংক ঋণপ্রদান করিবার সময় সরকারী ঋণপত্র ইত্যাদির ন্যায় বিশ্বাসযোগ্য সম্পদের (assets) জামিন দাবি করে। সুতরাং ব্যাংকের কারবার হইল বিশ্বাসের কারবার। ইংরাজীতে ইহাকেই বলা হয় 'ক্রেডিটে'র (credit) কারবার।

কিন্তু প্রত্যেক ঋণ বা বিশ্বাসের কারবারীই ব্যাংক-ব্যবসায়ী বলিয়া গণ্য নয়। অধিকাংশ সভ্য দেশেই কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান ব্যাংক এবং কোন্ কোন্ ঋণ-ব্যবসায় ব্যাংক-ব্যবসায়ী (banker) বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া থাকে। আমাদের দেশে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন (Banking Companies Act, 1949) দ্বারা এইরূপ ব্যাংক-ব্যবসায় ও ব্যাংক-ব্যবসায়ীর সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে। (১৯৬৫ সালে উহার নাম পরিবর্তন করিয়া ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ আইন (Banking Regulations Act, 1949) করা হইয়াছে।) এই সংজ্ঞা অনুসারে চেক ব্যবহার না করিলে, চলতি আমানত (current account) বা চাহিবামাত্র জমা টাকা ফেরত দিবার ব্যবস্থা না থাকিলে এবং অন্যান্য কাজকারবারে জড়িত থাকিলে কোন প্রতিষ্ঠান ব্যাংক বলিয়া গণ্য হইবে না। উপরন্তু, প্রত্যেক ব্যাংক-ব্যবসায়ীকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank) দ্বারা অনুমোদিত না হইলে কোন ঋণের কারবার আইনের দৃষ্টিতে 'ব্যাংক' বলিয়া পরিগণিত হয় না।

ব্যাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতা (Utility of Banking)

বর্তমান অর্থনৈতিক জগতে ব্যাংক-ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়সংগ্রহ করিয়া এবং সেই সঞ্চয় শিল্পবাণিজ্যে নিয়োগ করিয়া ব্যাংক উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখে। ব্যবসায়ীরা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাংকের নিকট হইতে চলতি মূলধন সংগ্রহ করে। ব্যাংকে টাকা জমা রাখা নিরাপদ; ইহাতে

কিছু কিছু সুদও পাওয়া যায়। এইজন্য লোকে সঞ্চয়ে আগ্রহশীলও হয়। সুতরাং ব্যাংক-ব্যবস্থা শুধু সঞ্চয়সংগ্রহ করে না, সঞ্চয়বৃদ্ধিও করে। অতএব, মূলধন-গঠনে (capital formation) দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ-সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

ব্যাংকগুলি শুধু আমানতের মাধ্যমেই সঞ্চয়সংগ্রহ করে না; অনেক ক্ষেত্রে তাহারা শেয়ার ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করিয়া থাকে। এই সূত্রে বহু পরিমাণে স্থায়ী মূলধন সংগৃহীত হয়।

ব্যাংক-ব্যবস্থা ঋণ সৃজন করিয়া প্রয়োজনমত টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ইহার ফলে শিল্পবাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয়। যদি ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনমত টাকাকড়ি সরবরাহ করা না যাইত তবে সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থা (developing economy) পদে পদে ব্যাহত হইত।

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও অনেকাংশে ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। লোকে দূরে বসিয়া যখন ক্রয়বিক্রয় করে তখন ব্যাংকের মাধ্যমেই টাকাকড়ির লেনদেন হয়। অনেক সময় আবার ধারে ক্রয়বিক্রয় চলে। ক্রেতা তখন নির্দিষ্ট সময়ের পর মূল্য পরিশোধের জন্য এক অংগীকারপত্র বা হুণ্ডি (Bill of Exchange) প্রদান করে। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই টাকাকড়ির প্রয়োজন হইলে বিক্রেতা ঐ হুণ্ডি ব্যাংক হইতে কিছু ডিস্কাউন্ট বাদ দিয়া ভাঙাইয়া লইতে পারে। এইভাবে ধারে বিক্রয় করিয়াও ব্যবসায়ী ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে নগদ টাকাকড়ি সংগ্রহ করিতে পারে।* বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়বিক্রয়ও ব্যাংকের মাধ্যমে হয়।

পরিশেষে, ব্যাংকগুলি অনেক সময় ব্যবসায়ীদের উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা এবং এজেন্ট হিসাবে কার্য করে। ইহাতেও ব্যবসাবাণিজ্য বিশেষ উপকৃত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষার প্রচেষ্টা দ্বারা সমাজ-কল্যাণে নিরত থাকে।

ব্যাংকের কার্যাবলী (Functions of Banks)

ব্যাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতা হইতেই ব্যাংকের নিম্নলিখিত কার্যাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়।

ক। সঞ্চয়সংগ্রহ (Collection of Savings): সঞ্চয়সংগ্রহই ব্যাংকের প্রাথমিক কার্য। ব্যাংক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় আমানত হিসাবে গচ্ছিত রাখে এবং ইহার দরুন সুদ প্রদান করে। আমানত প্রধানত দুই ধরনের—(ক) চলতি আমানত (demand deposit) এবং (খ) মেয়াদী আমানত (time deposit)। চলতি আমানত হইতে আমানতকারী ইচ্ছামত চেক কাটিয়া টাকা তুলিতে পারে;

* ১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।

কিন্তু মেয়াদী আমানত হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা উঠান যায় না। মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে তবেই আমানত ফেরত পাওয়া যায়। তবে মেয়াদী আমানত জামিন রাখিয়া টাকা ধার লওয়া যাইতে পারে। ব্যাংক মেয়াদী আমানত বহুদিন ধরিয়া খাটাইতে পারে বলিয়া উহার সুদ চলতি আমানতের উপর সুদ অপেক্ষা স্বাভাবিকভাবেই অধিক হয়। আমাদের দেশে আরও একপ্রকার আমানত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে জমা আমানত (savings deposit) বলে। ইহা হইতে বৎসরে নির্দিষ্ট সংখ্যক বারের অধিক চেক কাটিয়া তোলা যায় না এবং ইহার সুদ মেয়াদী আমানত অপেক্ষা কম কিন্তু চলতি আমানত অপেক্ষা বেশী হয়।

খ। ঋণ ও বিনিয়োগ (Loans and Investments)ঃ সংগৃহীত সঞ্চয় হইতে ব্যক্তি ও ব্যবসাবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়া ব্যাংকের দ্বিতীয় কার্য। নানাভাবে ব্যাংক এই কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রথমত, উহা সরাসরি ঋণপ্রদান করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, হুণ্ডি ডিস্কাউন্ট করিতে পারে। হুণ্ডি ভাঙানও একপ্রকার ঋণপ্রদান কার্য। তৃতীয়ত, উহা শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, ডিবেঞ্চার অথবা সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া অর্থ বিনিয়োগ (invest) করিতে পারে।

গ। টাকাকড়ির সৃজন (Creation of Money)ঃ টাকাকড়ি সৃজন করা ব্যাংকগুলির অন্যতম প্রধান কার্য। ব্যাংক-ব্যবস্থা এই কার্য সম্পাদন করে আমানত সৃষ্টির দ্বারা। পূর্বে অনেক ব্যাংকই নোট ছাপাইয়া টাকাকড়ির সৃষ্টি করিতে পারিত। বর্তমানে এই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাড়া অন্য কোন ব্যাংকের নাই।

কিভাবে আমানত সৃষ্টির দ্বারা ব্যাংকগুলি টাকাকড়ি সৃজন করে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতে পারে। ব্যাংক যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণপ্রদান করে তখন সাধারণত তাহাকে নগদ টাকা প্রদান করে না, তাহার আমানতের ঘরে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ জমা দেখায় মাত্র। ধরা যাউক, ক তাহার ব্যাংকের নিকট হইতে ১০০০ টাকা ঋণগ্রহণ করিল। পূর্বে ক-এর হিসাবে ব্যাংকে মাত্র ১০০ টাকা আমানত থাকিলে এখন আমানতের পরিমাণ হইবে ১১০০ টাকা (১০০+১০০০)। ক এখন ১১০০ টাকার উপরই চেক কাটিতে পারিবে। ঐ ১০০০ টাকা ক জমা দেয় নাই; ব্যাংক তাহাকে ঋণপ্রদান করিয়াই উহা সৃজন করিয়াছে। সুতরাং উহা হইল সৃষ্ট আমানত (created deposit)। এইজন্য ইংরাজীতে বলা হয় যে প্রত্যেকটি ঋণ একটি করিয়া আমানতের সৃষ্টি করিয়া থাকে (every loan creates a deposit)। ব্যাংক-আমানত টাকাকড়ি (Money) বলিয়া ব্যাংক আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে টাকাকড়িও সৃজন করিয়া থাকে।

স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন উঠিবে যে, ক-এর হিসাবে ১০০০ টাকার আমানত সৃষ্টি

করা হইল, তাহার টাকা ক যখন আজ বা কাল চেক কাটিয়া তুলিয়া লইবে তখন ব্যাংক টাকা দিবে কোথা হইতে? ইহার উত্তরে অর্থবিদ্যাবিদগণ বলেন, দেশে চেক ব্যবহারের বিশেষ প্রচলন থাকিলে ক চেক কাটিয়া দেনা মিটাইবে এবং যে-ব্যক্তি চেক পাইবে সে তাহার ব্যাংকে উহা জমা দিবে। ফলে ক-এর হিসাব হইতে আমানত আর একজনের হিসাবে স্থানান্তরিত হইবে মাত্র—সকল ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ঠিকই থাকিয়া যাইবে। তবে দেশে মোট যত পরিমাণ ব্যাংক-আমানত থাকে তাহার একটা অংশ লোকে নগদ টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহার করে। এই অংশ দশভাগের একভাগ হইলে ১০০০ টাকার নূতন আমানত বা ব্যাংকের টাকাকড়ি সৃষ্ট হইলে ব্যাংকগুলিকে এক শতকের মত নগদ টাকা রাখিয়া দিতে হইবে। সুতরাং ব্যাংকগুলির যদি নগদ টাকাকড়ির পরিমাণ দশভাগের একভাগ অপেক্ষা ১০০টাকা অধিক হয়, তবেই আমাদের উদাহরণে উহাদের পক্ষে ১০০০ টাকার আমানত সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে, নচেৎ নহে। ধরা যাউক, দেশে সকল ব্যাংকে মোট আমানতের পরিমাণ হইল ১ কোটি টাকা এবং উহাদের হাতে ১০ লক্ষ ১ শত নগদ টাকাকড়ি বা কারেন্সী রহিয়াছে। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলি আরও ১ হাজার টাকার আমানত সৃজন করিতে পারে।

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে এখানে দেশের ব্যাংক বা ব্যাংক-ব্যবস্থার (the entire banking system) আমানত সৃজনের কথা বলা হইয়াছে, একটিমাত্র ব্যাংকের নহে। বস্তুত, প্রাপ্ত আমানতের অধিক ঋণপ্রদানের ক্ষমতা এককভাবে কোন ব্যাংকের নাই, তবে সকল ব্যাংক একসংগে উপরের প্রাপ্ত আমানতের অধিক ঋণপ্রদান করিতে পারে এবং করিয়া থাকে আমানত সৃজন করিয়া।

ঘ। অন্যান্য কার্য (Other Functions): ব্যাংক অন্যান্য কার্যও সম্পাদন করে। ইহা মুদ্রা-বিনিময় (money-changing) করে, স্বর্ণ-রৌপ্য টাকাকড়ি স্থানান্তরে প্রেরণ করে, স্বর্ণ-রৌপ্য ক্রয়বিক্রয় করে, শেয়ার-ডিবেঞ্চার ক্রয়বিক্রয়ে সহায়তা করে। উপরন্তু, ব্যাংক মক্কেলের এজেন্ট বা ট্রাষ্টী হিসাবে বাড়ীভাড়া আদায় করে; উহা ডিভিডেণ্ড আদায়, চিঠিপত্র প্রদান, হিসাবপত্র রাখা প্রভৃতি কার্যও করিয়া থাকে। পূর্বের স্বর্ণকারদের মত এখনও ব্যাংকগুলি মূল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করে।

বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক (Types of Bank)

ব্যাংকের কার্যাবলীর আলোচনা হইতে এ-ধারণা করা অবশ্যই ভুল হইবে যে সকল কার্যই প্রত্যেক ব্যাংক সম্পাদন করিয়া থাকে। শিল্পজগতে বর্তমানে যেরূপ শ্রমবিভাগ দেখা যায়, ব্যাংক-ব্যবস্থাতেও সেইরূপ বিশেষীকৃত কার্য (specialised functions) পরিদৃষ্ট হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানই যেরূপ

সকল প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করে না, তেমনি কোন ব্যাংকই সকল প্রকার ব্যাংকিং কার্য সম্পাদন করে না। ফলে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

এই বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের মধ্যে (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক, (খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক, (গ) বিনিময় ব্যাংক, (ঘ) শিল্প ব্যাংক, (ঙ) জমিবন্ধকী ব্যাংক এবং (চ) সমবায় ব্যাংকই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank): বর্তমানে প্রত্যেক সভ্য দেশেই একটি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম রিজার্ভ ব্যাংক (Reserve Bank of India)। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যাংক-সমাজের সমাজপতি। দেশের অভ্যন্তরে সকল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ, দেশের কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থা পরিচালনা, দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষা করা এবং নানাভাবে উন্নয়ন কার্যে সহায়তা করা ইহার দায়িত্ব।

প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাগজী মুদ্রা প্রচলনের একমাত্র অধিকারী। আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী ও সরকারী তত্ত্বাবধানে ইহা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়ত, মুদ্রার ন্যায় ঋণের পরিমাণের উপরও টাকাকড়ির যোগান নির্ভর করে বলিয়া দেশের ঋণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ভারও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর ন্যস্ত। কি পরিমাণ টাকাকড়ির যোগান দেওয়া হইবে তাহা নির্ধারণ করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক মোট মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সচেষ্ট থাকে। টাকাকড়ির যোগান হ্রাস করিবার প্রয়োজন হইলে উহা নোট ছাপান কমাইয়া দেয় এবং অন্যান্য ব্যাংককে ঋণদান হ্রাস করিতে নির্দেশ দেয় বা বাধ্য করে; অপরদিকে টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করা স্থির হইলে নোট ছাপান বাড়াইয়া দেয় এবং ব্যাংকগুলিকে ঋণদানে উৎসাহিত করে। এইভাবে টাকাকড়ির যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রামূল্যের স্থায়িত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করে।

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্য সমস্ত ব্যাংকের ব্যাংক। এই সমস্ত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট একটি করিয়া হিসাব এবং তাহাদের গৃহীত আমানতের কিছু অংশ জমা রাখিতে হয়। ইহার পরিবর্তে তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে কিছু সুবিধাও পাইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাহাদের স্বল্পকালীন ঋণদান করে। প্রথম শ্রেণীর হুণ্ডি (first class bills of exchange) পুনর্বাট্টা (rediscount) করে, ইত্যাদি।

চতুর্থত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক। ইহা সরকারের টাকাকড়ি জমা রাখে, প্রয়োজন হইলে সরকারকে স্বল্পমেয়াদী ঋণপ্রদান করে এবং সরকারী ঋণ (Public Debt) পরিচালনা করে।

পঞ্চমত, অন্যান্য দেশের মুদ্রার সহিত নির্দিষ্ট বিনিময় হার বজায় রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্য। এই উদ্দেশ্যে ইহাকে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয় করিতে হয়।

পরিশেষে, দেশের শিল্পবাণিজ্য যাহাতে সুপরিচালিত হয়, ব্যাংক ফেল পড়িয়া লোকের আমানত যাহাতে নষ্ট না হয়, ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখাও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্তব্য। মোটকথা, ব্যাংক-ব্যবস্থা দেশের শিল্পবাণিজ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে, তাহার ভালমন্দ সমস্ত কিছুর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক দায়ী।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ঋণ-নিয়ন্ত্রণ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। বলা হইয়াছে যে, টাকাকড়ির যোগান মুদ্রার ন্যায় ঋণের উপরও নির্ভর করে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে টাকাকড়ির সৃজন করিয়া উহার যোগান বৃদ্ধি করিতে পারে। ব্যাংকসমূহের এই ক্ষমতা যাহাতে সাধারণ স্বার্থের পরিপন্থী না হয় তাহার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি দেখে যে, অন্যান্য ব্যাংক অতিরিক্ত ঋণদান করিতেছে বা যে-সময় ঋণদানের মাধ্যমে টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন সে-সময় ঋণদানে বিরত থাকিতেছে তখন উহা নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিতে পারে।

ক। **নৈতিক প্রণোদন (Moral Suasion) ঃ** ইহা দ্বারা বুঝায় ব্যাংকগুলির বিচারবুদ্ধির নিকট আবেদন করা—তাহাদের বলা হয় যে, তাহারা দেশের স্বার্থ-বিরুদ্ধ কার্য করিতেছে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে সংযত হওয়া কর্তব্য।

খ। **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হারের পরিবর্তন (Changes in the Bank Rate) ঃ** নৈতিক প্রণোদনে বিশেষ ফল না হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য যে-সকল পন্থা অনুসরণ করে, সুদের হারের পরিবর্তন তাহার অন্যতম। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বৃদ্ধি করিলে অন্যান্য ব্যাংকও উহা বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইবে। কারণ, প্রয়োজনমত তাহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতেই ঋণ লইতে হয়। সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে লোকে কম ঋণ গ্রহণ করিবে। ফলে শেষ পর্যন্ত মোট ঋণের পরিমাণ কমিয়া যাইবে।

গ। **খোলা বাজারে কারবার (Open Market Operations) ঃ** খোলা বাজারে কারবারের অর্থ হইল জনসাধারণের নিকট সরকারী ঋণপত্র ক্রয়বিক্রয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন জনসাধারণের নিকট সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করে তখন ক্রেতা আমানত হইতে টাকাকড়ি তুলিয়া লইয়া উহার মূল্য প্রদান করে। ফলে ব্যাংকসমূহের আমানতের পরিমাণ হ্রাস পায় বলিয়া ঋণদানের ক্ষমতাও কমিয়া যায়। অপরদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণপত্র ক্রয় করিলে ঐ টাকা ব্যাংকে আমানত পড়ে এবং ব্যাংকগুলির ঋণদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ঘ। **জমার অনুপাতে পরিবর্তন (Variation in the Reserve Ratio) :** অন্যান্য ব্যাংকের আমানতের যে-অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক ক্ষেত্রে তাহার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে। নূতন আইন অনুসারে আমাদের দেশের রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট তপশীলী ব্যাংকগুলি (Scheduled Banks) তাহাদের মোট চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ আইনত জমা রাখিতে বাধ্য। রিজার্ভ ব্যাংক এই জমার অনুপাতকে ৫ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারে। অর্থাৎ, ব্যাংকগুলিকে তাহাদের চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ১৫ ভাগ পর্যন্ত জমা দিবার নির্দেশ দিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট অধিক টাকা জমা দিতে হইলে ব্যাংকগুলির ঋণদানের ক্ষমতা কমিয়া যায় ; আবার জমার পরিমাণ কম হইলে ঋণদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ঙ। **ঋণ-বরাদ্দ নীতি (Rationing of Credit) :** পরিশেষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ-বরাদ্দ করিবার ক্ষমতাও থাকিতে পারে। এইরূপ হইলে ইহা নির্দেশ দিতে পারে যে, কোন্ ব্যাংক কত পরিমাণ ঋণ প্রদান করিতে পারিবে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Banks)

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আলোচনা প্রসংগে যে-সকল 'অন্যান্য ব্যাংকে'র কথা বারবার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদিগকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। জনসাধারণের নিকট হইতে আমানতের মাধ্যমে সঞ্চয়সংগ্রহ, এইরূপে সংগৃহীত অর্থ হইতে ব্যক্তি ও শিল্পবাণিজ্যকে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ঋণদান করা, হুণ্ডি ক্রয়বিক্রয় দ্বারা আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করা, মক্কেলের পক্ষে এজেণ্ট ও ট্রাষ্টীর কার্য করা, মূল্যবান জিনিস ও দলিলপত্র গচ্ছিত রাখা, ইত্যাদিই বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী। বস্তুত, পূর্বে যে-ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা প্রধানত বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী (১৪২-৪৪ পৃষ্ঠা)।

বাণিজ্যিক ব্যাংককে যৌথ পুঁজি ব্যাংকও (Joint Stock Bank) বলা হয়। এরূপ বর্ণনার কারণ সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। ইংলণ্ডে প্রথমে একমাত্র 'ব্যাংক অফ্ ইংলণ্ড'ই বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্য পরিচালনা করিত এবং উহা যৌথ পুঁজির ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় হইতে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককেই যৌথ পুঁজি ব্যাংক বলিয়া অভিহিত করা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করে না, কারণ যে-আমানতের মাধ্যমে উহা অর্থ-সংগ্রহ করে তাহা স্বল্পমেয়াদী হয়। এই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংক জমিবন্ধকী ব্যবসায় হইতে বিরত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আবার বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়কার্য, শিল্পবাণিজ্যের শেয়ার-ডিবেঞ্চার বিক্রয়কার্য ইত্যাদি বিশেষীকৃত কার্য (specialised functions) বলিয়া ইহাও সম্পাদন করে না।

বাণিজ্যিক ব্যাংক-ব্যবসায়ের নীতি (Principles of Commercial Banking) : বাণিজ্যিক ব্যাংক-ব্যবসায় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতিগুলি ভালভাবে মানিয়া চলিলে তবেই বাণিজ্যিক ব্যাংক-ব্যবসায় সফল হইতে পারে। মূলনীতি হইল সংখ্যায় তিনটি—যথা, (ক) নিরাপত্তা (security), (খ) মূলধনের নগদ অবস্থা (liquidity of funds), এবং (গ) মুনাফা অর্জন (profit earning)। নীতি তিনটির ব্যাখ্যায় শেষ হইতে সুরু করা যাইতে পারে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের লক্ষ্য হইল যথাসম্ভব অধিক মুনাফা অর্জন করা। 'বাণিজ্যিক ব্যাংক' নাম হইতেই এই নীতির সন্ধান পাওয়া যায়। উপরন্তু, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যৌথ মূলধনের ভিত্তিতে গঠিত হয় বলিয়া উহার পক্ষে যথাসম্ভব মুনাফা অর্জন করার প্রচেষ্টা করিতেই হয়, কারণ বেশী বেশী লভ্যাংশ (dividend) ঘোষণা করিয়া অংশীদারগণকে (shareholders) সন্তুষ্ট রাখিতে হয়।

অপরদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যকরী মূলধনের অধিকাংশ আসে স্বল্পমেয়াদী আমানত (short-term deposits) হইতে। এই কারণেই উহারা দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রদান বা বিনিয়োগ (investment) করিতে পারে না। কিন্তু ঋণ ও বিনিয়োগ স্বল্পমেয়াদী হইলে উহার উপর সুদও কম হয়। ফলে মুনাফার পরিমাণও কম হয়।

অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী ঋণ ও বিনিয়োগ হইতেও অধিক সুদ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল ঋণের বিশেষ নিরাপত্তা (security) থাকে না—অর্থাৎ, আসল টাকা ফেরত পাওয়া যাইবে কি না, সে-সম্পর্কে সন্দেহ থাকে।

আবার স্বল্পমেয়াদী আমানতের অধিকাংশই হয় যাহাকে বলে দাবি আমানত (demand deposits)। ইহার অর্থ হইল যে দাবি করিবামাত্র এই আমানতের টাকা আমানতকারীকে ফেরত দিতে হইবে। কোনক্রমে ফেরত দিতে অপারগ হইলে ব্যাংকের দুর্ণাম রটিয়া যাইবে। সংগে সংগে সকলেই টাকা উঠাইয়া লইতে ছুটিবে। ইহাকে ব্যাংক-ব্যবসায়ের ভাষায় 'রান' (run) বলে। রানের ফলে ব্যাংক ফেল পড়িতে পারে। এই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংককে এমনভাবে ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগ করিতে হয় যাহাতে মূলধনের নগদ অবস্থা বজায় থাকে—অর্থাৎ, যাহাতে আমানতকারীরা টাকা উঠাইতে আসিলেই টাকা ফেরত দেওয়া যায়।

উপরি-বর্ণিত নীতি তিনটির প্রথম দুইটি স্পষ্টতই শেষেরটির বিরোধী। অধিক নিরাপত্তা ও মূলধনের নগদ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিলে মুনাফার পরিমাণ কম হয়। অপরদিকে আবার দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান ও বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করিলে মূলধনের নগদ অবস্থা বজায় থাকে না বলিয়া আমানতকারীরা টাকা ফেরত লইতে আসিলে টাকা দেওয়া সম্ভব নাও হইতে পারে। স্বল্পমেয়াদী কিন্তু

অধিক ঝুঁকির (risk) ঋণ বা বিনিয়োগের ফলে আয় হয়ত বেশী হইতে পারে কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে মূলধনের নিরাপত্তা থাকে না। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংককে দেখিতে হয় যে কিভাবে যথাসম্ভব অধিক মুনাফা অর্জন করা যায় এবং সংগে সংগে আবার কিভাবে মূলধনের নগদ অবস্থা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা যায়। যে-বাণিজ্যিক ব্যাংক এই সামঞ্জস্য-বিধান যত করিতে পারে তাহা ততই সফল হইবে। অপরদিকে যে-বাণিজ্যিক ব্যাংক উহা করিতে পারিবে না তাহা অংশীদারদের সন্তুষ্ট করিতে না পারার দরুন ক্ষুদ্রই থাকিয়া যাইবে, অথবা মূলধনের নগদ অবস্থা বা নিরাপত্তা বজায় রাখিতে না পারার দরুন ফেল পড়িবে।

বিনিময় ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক ও জমিবন্ধকী ব্যাংক (Exchange Banks, Industrial Banks and Land Mortgage Banks)

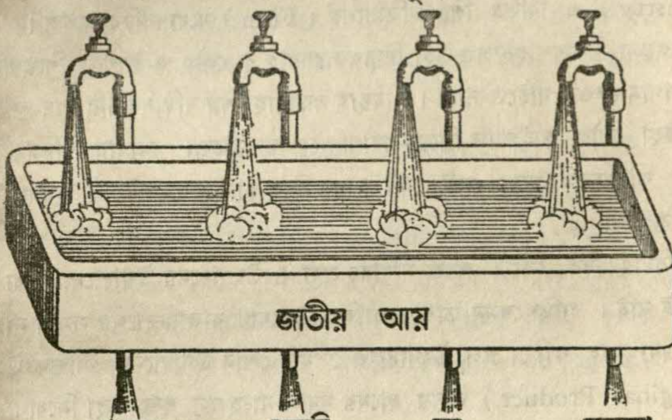
যে-সকল ব্যাংক প্রধানত বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়কার্য করিয়া থাকে তাহাদিগকে বিনিময় ব্যাংক (Exchange Banks), যে-সকল ব্যাংক প্রধানত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান বা উহাদের শেয়ার-ডিবেঞ্চারে অর্থ বিনিয়োগ করে তাহাদিগকে শিল্প ব্যাংক (Industrial Banks) এবং যে-সকল ব্যাংক জমিবন্ধকী কার্য করে তাহাদিগকে জমিবন্ধকী ব্যাংক (Land Mortgage Banks) বলা হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য মুনাফা লাভ করা। কিন্তু অনেক সময় মুনাফার উদ্দেশ্য ছাড়াও ব্যাংক গড়িয়া উঠে। এই সকল ব্যাংক সমবায় ব্যাংক (Co-operative Banks) নামে অভিহিত। পারস্পরিক সহায়তায় স্বল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করা এইরূপ ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

● বণ্টনতত্ত্ব

১৫ | উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের আয় (Different Types of Factor Incomes)

আমরা দেখিয়াছি যে উৎপাদনের উপাদান সংখ্যায় চারিটি—(ক) জমি, (খ) শ্রম, (গ) মূলধন এবং (ঘ) সংগঠন। ইহারাই পারস্পরিক সহযোগিতায় জাতীয় আয় সৃষ্টি করে এবং নীট জাতীয় আয় ইহাদের মধ্যে খাজনা মজুরি সুদ ও মুনাফা হিসাবে বণ্টিত হয়। এই কর্মগত বণ্টনই অর্থবিদ্যায় বণ্টন (Distribution) বলিয়া অভিহিত এবং খাজনা মজুরি সুদ ও মুনাফাকে উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় (Factor Incomes) বলা হয়।



কিভাবে নীট জাতীয় আয় উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়? (How is Net National Income distributed among the Factors of Production ?)

নীট জাতীয় আয়কে লভ্যাংশ বা বণ্টনযোগ্য জাতীয় আয় (National Dividend) বলা হয়। নীট জাতীয় আয়ের যে যে অংশ উৎপাদনের উপাদানসমূহ পাইয়া থাকে তাহা উহাদের উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণের জন্য দাম ছাড়া আর কিছুই নয়। উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণের জন্য জমির দাম হইল খাজনা, শ্রমের দাম মজুরি, মূলধনের দাম সুদ এবং সংগঠন-নৈপুণ্যের দাম মুনাফা। সুতরাং সাধারণ দাম যেভাবে নির্ধারিত হয়, ইহারাও সেইভাবে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়।

উপাদানসমূহের চাহিদা ও যোগান : উৎপাদনের উপাদানসমূহের চাহিদা সৃষ্টি করে সংগঠক এবং উপাদান যোগান দেয় উহার মালিক। যোগানের দিক দিয়া সাধারণ দ্রব্যাদির সহিত উৎপাদনের উপাদানসমূহের কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমত, সকল উপাদানের যোগানই প্রয়োজনমত বাড়ান যায় না। উদাহরণস্বরূপ, জমির যোগান প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ, শ্রমের যোগান কতকটা জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল, ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, চাহিদা কমিলে জমির যোগানের হ্রাসও ঘটে না এবং শ্রমিকদের অল্প মজুরিতে কাজ করিতে হয়। তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে যোগানবৃদ্ধি যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহার উপর সরবরাহকারীর বিশেষ হাত থাকে না। মূলধনের পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করে জাতীয় আয়, দেশের শান্তিশৃংখলা, ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর। এগুলি সঞ্চয়কারীর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে।

তবুও বলা যায়, মোটামুটিভাবে উৎপাদনের উপাদানসমূহের যোগান বিভিন্ন শিল্প (Industry) ও বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের (Firm) মধ্যে পরিবর্তনশীল। ভূগর্ভে সঞ্চিত কয়লা সীমাবদ্ধ হইলেও উহা বিদ্যুৎ সরবরাহ বা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে চাহিদা-মত যোগান দেওয়া যাইতে পারে। বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্প যদি কয়লার দাম কম দেয় তবে উহা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেই যোগান দেওয়া হইবে। আবার বিভিন্ন লৌহ ও ইস্পাত কারখানার মধ্যে যেটি বেশী দাম দিতে চাহিবে সেইটিতেই কয়লা যোগান দেওয়া হইবে।

চাহিদার দিক হইতে অবশ্য সাধারণ দ্রব্য ও উৎপাদনের উপাদানের মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই। ব্যক্তি যেমন তাহার প্রান্তিক উপযোগ বাজার-দামের সমান না-হওয়া পর্যন্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়া চলে, উৎপাদকও তেমনি কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন (Marginal Product) উহার দামের সমান না-হওয়া পর্যন্ত উহা নিয়োগ করিয়া চলে।

ধরা যাউক, একটি কারখানায় ১০০ জন শ্রমিক নিযুক্ত আছে। এই ১০০ জন শ্রমিকের জন্য যে-মোট উৎপাদন হয় তাহা হইতে ৯৯ জন শ্রমিকের মোট উৎপাদন বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন। ইহা ৫০ টাকা হইলে ১০০ জন শ্রমিককেই যদি নিযুক্ত রাখিতে হয় তবে নিয়োগকর্তা কাহাকেও ৫০ টাকার বেশী মজুরি দিতে পারে না। ১০০-র উপর যদি আরও ১ জন শ্রমিক নিয়োগ করিতে হয় তবে প্রান্তিক উৎপাদন (ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর হইলে) ৫০ টাকারও কম হইবে। সুতরাং সকল শ্রমিকেরই মজুরি কমিয়া যাইবে।

কিন্তু শ্রমিক কম মজুরি লইতে রাজী হইবে কেন? হইবে কি না-হইবে তাহা নির্ভর করিবে অন্যান্য শিল্প ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের চাহিদার উপর। অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিক

যদি ৫০ টাকা পায় তবে সে ৫০ টাকার কমে কাজ করিতে রাজী হইবে না। তেমনি মূলধন-মালিকও যে-প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত কম সুদ দিতে চাহিবে তাহাকে মূলধন যোগাইতে সাধারণ ক্ষেত্রে সম্মত হইবে না। এইভাবে নিয়োগকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সকল ক্ষেত্রেই এক হয়।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশেষ বিশেষ শিল্পের এক একটি প্রতিষ্ঠানকে শিল্প-প্রতিষ্ঠান বলা হয়—যেমন, একটি পাটকল একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সকল পাটকল মিলাইয়া হইল পাটকল শিল্প।

উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান আবার পরস্পরের পরিবর্ত (substitute) হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। একটি যন্ত্রের পরিবর্তে দুইজন শ্রমিক নিয়োগ অথবা দুইজন শ্রমিকের পরিবর্তে একটি যন্ত্র বসান যাইতে পারে। এই কারণে মূলধনের যোগান-দাম (Supply Price) অপেক্ষাকৃত অধিক হইলে সংগঠক অধিক শ্রমিক নিয়োগের দিকে ঝুঁকিবে এবং শ্রমের যোগান-দাম অনুরূপ হইলে সংগঠক যন্ত্র বসাইতে (মূলধন নিয়োগে) আগ্রহান্বিত হইবে। ইহার ফলে উৎপাদনের সকল উপাদানেরই প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইবে।

এই সকলের ফলে উৎপাদনের প্রত্যেক উপাদানের চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইয়া ভারসাম্য অবস্থার সৃষ্টি করিবে। ভারসাম্য অবস্থায় (১) প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সকল নিয়োগের (employment) ক্ষেত্রেই এক হইবে ; (২) প্রত্যেক নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইবে, এবং (৩) প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন উহার দামের সমান হইবে। ইহাই কর্মগত বণ্টনের তত্ত্ব। ইহা চাহিদা ও যোগানের তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নয়।

খাজনা
(Rent)

চুক্তি অনুযায়ী খাজনা এবং অর্থনৈতিক খাজনা (Contract Rent and Economic Rent)

জমিজায়গা ব্যবহারের জন্য বৎসরান্তে জমির মালিককে যে অর্থ বা ভাড়া দেওয়া হয় সাধারণ ভাষায় তাহাকেই খাজনা বলে। অর্থবিদ্যায় এই খাজনা 'চুক্তি অনুযায়ী খাজনা' (Contract Rent) নামে অভিহিত। চুক্তি অনুযায়ী খাজনা লইয়া অর্থবিদ্যায় আলোচনা করা হয় না। অর্থবিদ্যার আলোচ্য খাজনাকে 'অর্থনৈতিক খাজনা' (Economic Rent) বলা হয়। অর্থনৈতিক খাজনা বলিতে উৎপাদনের কোন উপাদানের যোগানের সীমাবদ্ধতার দরুন যে-আয় হয় তাহাকে বুঝায়। জমির যোগান প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। স্থতরাং শুধু জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য যে-আয় হয় তাহাই অর্থনৈতিক খাজনা। জমির উপর ঘরবাড়ী কূপ-নলকূপ প্রভৃতি থাকিলে উহাদের জন্য দেয় অর্থ অর্থনৈতিক খাজনার অন্তর্ভুক্ত নয়। এই সকল ঘরবাড়ী, কূপ-নলকূপ মূলধন ব্যতীত কিছুই নয় ; স্থতরাং উহাদের দরুন যে-অর্থ প্রদান করা হয় তাহাকে স্থদ হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে, খাজনা হিসাবে নহে। দ্বিতীয়ত, জমি ভাড়া দিয়াও মালিক কিছু কিছু তদারককার্য করিতে পারে এবং ইহার দরুনও সে কিছু অর্থ আদায় করিতে পারে। ইহাও অর্থনৈতিক খাজনার অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ ইহা পারিশ্রমিক বা মজুরি হিসাবে গণ্য। এইভাবে চুক্তি অনুযায়ী বা মোট (gross) খাজনা হইতে স্থদ, মজুরি প্রভৃতি বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই অর্থনৈতিক খাজনা।

অর্থনৈতিক খাজনাকে 'উৎপাদকের উদ্বৃত্ত' (producer's surplus) এই আখ্যা দেওয়া হয়। অর্থাৎ, উৎপাদন-ব্যয়ের (স্বাভাবিক মুনাফা ধরিয়া) অতিরিক্ত যাহা কিছু থাকে তাহাই অর্থনৈতিক খাজনা। কোন জমি হইতে যদি ১০০ টাকার ফসল পাওয়া যায় এবং ঐ জমি চাষ করার দরুন মোট ৯০ টাকা ব্যয় হয় তবে ১০ টাকা হইল অর্থনৈতিক খাজনা। বিষয়টিকে আরও একটু ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, ঐ জমিতে ফসল উৎপাদন করিতে কৃষকের বীজ সার গরু-লাঙল প্রভৃতি বাবদ ব্যয় হইয়াছে ৫০ টাকা, সে নিজের পরিশ্রমের দাম ধরিয়াছে ৩০ টাকা এবং মুনাফা বাবদ ধরিয়াছে ১০ টাকা। তাহা হইলে মোট উৎপাদন-ব্যয় দাঁড়ায় (৫০ + ৩০ + ১০ =) ৯০ টাকা ; কিন্তু ফসল বিক্রয় হইয়াছে ১০০ টাকার। এই (১০০ − ৯০ =) ১০ টাকা হইল উৎপাদকের উদ্বৃত্ত। কৃষক ইহা মজুরি হিসাবে লইতে পারে না, মুনাফা বলিয়াও দাবি করিতে পারে না। স্থতরাং ইহা সম্পূর্ণ জমিরই দান ;

ফলে ইহা সম্পূর্ণ জমির মালিকের নিকটই যাইবে। কৃষক যদি নিজে জমির মালিক হয় তবে সে নিজেই ইহা গ্রহণ করিবে, অপর কেহ মালিক হইলে তাহাকে দিতে হইবে। কৃষক জমির মালিককে উদ্বৃত্ত টাকা দিতে রাজী না হইলে মালিক হয় নিজেই চাষের ব্যবস্থা করিবে, না-হয় ঐ জমি অপর একজনকে বন্দোবস্ত দিবে।

খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডোর তত্ত্ব (Ricardo's Theory of Rent)

অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভব হয় কেন, এ-সম্বন্ধে প্রথম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন বিখ্যাত অর্থবিদ্যাবিদ ডেভিড রিকার্ডো। রিকার্ডোর তত্ত্বের সংশোধিত রূপই বর্তমানের স্বীকৃত খাজনাতত্ত্ব (Theory of Rent)।

রিকার্ডোর মতে, জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর উৎপাদিকাশক্তির জন্য দেয় অর্থই খাজনা। খাজনার উদ্ভব হয় তিনটি কারণে—(ক) জমির পরিমাণের সীমাবদ্ধতা, (খ) বিভিন্ন জমির উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য, এবং (গ) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা। তৃতীয় কারণটির জন্য একটিমাত্র জমি হইতে দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। সুতরাং প্রয়োজন হয় বিভিন্ন জমি চাষ করিবার। কিন্তু সকল জমির উৎপাদিকাশক্তি সমান নহে বলিয়া একই ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকার জমি হইতে উৎপন্ন ফসলে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যের পরিমাণই হইল অধিক উর্বর জমির খাজনা।

রিকার্ডোকে অনুসরণ করিয়া একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে এই সকল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

বর্তমানে দণ্ডকারণ্যে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা চলিতেছে। উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে গিয়া বসবাস করিতে বিশেষ চাহিতেছে না। যাহা হউক, দণ্ডকারণ্য পরিষ্কার করিয়া বহু পরিমাণ জমিকে চাষযোগ্য করা হইল এবং কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুকে বুঝাইয়া-সুজাইয়া লইয়া যাওয়া হইল এবং প্রথম প্রথম তাহাদের বিনা খাজনায় জমি চাষ করিতে দেওয়া হইল। এই সকল উদ্বাস্তু গিয়া প্রথমে সর্বাপেক্ষা ভাল জমিগুলি বাছিয়া লইয়া কৃষিকার্য সুরু করিবে। ভাল জমির যোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ না হওয়ার জন্য কেহই কোন খাজনা দিবে না এবং ঐ সকল জমি হইতে উৎপন্ন ফসল স্বল্পসংখ্যক উদ্বাস্তুর জন্য পর্যাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

এই প্রথম দল উদ্বাস্তু যদি দণ্ডকারণ্যে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে তবে আরও উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্য অভিমুখে যাত্রা করিবে। প্রথম দল উদ্বাস্তুর মধ্যে জনসংখ্যা স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে ক্রমে এমন একদিন আসিবে যখন প্রথম শ্রেণীর বা সর্বাপেক্ষা উর্বর জমি আর পড়িয়া থাকিবে না। তখন লোকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বা অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমি চাষ করিতে বাধ্য হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে একই

পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলেও উৎপাদন কিন্তু প্রথম শ্রেণীর জমির তুলনায় কম হইবে। প্রথম শ্রেণীর জমিতে যদি বিঘা প্রতি ১০০ টাকা ব্যয় করিয়া ২৫ কুইণ্টাল শস্য উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে বিঘা প্রতি ঐ পরিমাণ ব্যয়ে হয়ত ২০ কুইণ্টাল শস্য উৎপন্ন হইবে। এক্ষেত্রে (২৫ কুইণ্টাল – ২০ কুইণ্টাল =) ৫ কুইণ্টাল শস্য হইবে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উপর প্রথম শ্রেণীর জমির উদ্বৃত্ত বা প্রথম শ্রেণীর জমির অর্থনৈতিক খাজনা। সরকার সুযোগ বুঝিয়া প্রথম শ্রেণীর জমির মালিকদের নিকট হইতে এই খাজনা আদায় করিতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে কিন্তু এই সময় কোন খাজনার উদ্ভব হইবে না। কারণ, উহা হইতে উৎপন্ন ফসলের দাম উৎপাদন-ব্যয়ের ঠিক সমান হয়—কোনই উদ্বৃত্ত থাকে না। আমাদের উদাহরণে উৎপাদন-ব্যয় প্রত্যেক ক্ষেত্রে ১০০ টাকা করিয়া ধরা হইয়াছে। প্রতি কুইণ্টাল ফসলের দাম যদি ৫ টাকা করিয়া হয় তবে প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে ১২৫ টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি হইতে ১০০ টাকা করিয়া পাওয়া যাইবে। ১০০ টাকাই উৎপাদন-ব্যয় হওয়ার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির কৃষক খাজনা হিসাবে কিছুই দিতে পারিবে না। জোর করিয়া কিছু আদায় করা হইলে সে ঐ শ্রেণীর জমি চাষ করা ছাড়িয়া দিবে এবং প্রয়োজন হইলে দণ্ডকারণ্য হইতে সে আবার পশ্চিমবংগে ফিরিয়া আসিবে।



প্রথম শ্রেণীর জমি দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি তৃতীয় শ্রেণীর জমি

এইরূপ যে-সকল জমি হইতে শুধু উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান হয়—কোন উদ্বৃত্ত থাকে না, রিকার্ডো তাহাদিগকে 'নিকৃষ্ট জমি' (Inferior Land) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বর্তমানে উহাদিগকে 'প্রান্তিক জমি' (Marginal Land) বলা হয়।

দণ্ডকারণ্যে জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইলে ফসলের দাম বাড়িতে থাকিবে। তখন লোকে তৃতীয় শ্রেণীর জমির দিকে ঝুঁকিবে। ধরা যাউক, তৃতীয় শ্রেণীর জমি হইতে বিঘা প্রতি ১৫ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হয় এবং ইহার দাম ঠিক ১০০ টাকা—

অর্থাৎ, উৎপাদন-ব্যয়ের সমান। এখন এই তৃতীয় শ্রেণীর জমিই প্রান্তিক বা খাজনাহীন জমি বলিয়া পরিগণিত হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করা হইলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে (২৫ কুইণ্টাল – ১৫ কুইণ্টাল =) ১০ কুইণ্টাল; দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে (২০ কুইণ্টাল – ১৫ কুইণ্টাল =) ৫ কুইণ্টাল। এই ১০ কুইণ্টাল ও ৫ কুইণ্টাল হইল যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির বিঘা প্রতি খাজনা। তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে কৃষিকার্য সুরু হওয়ার ফলে প্রথম শ্রেণীর জমির অর্থনৈতিক খাজনা ৫ কুইণ্টাল হইতে বাড়িয়া ১০ কুইণ্টালে দাঁড়াইয়াছে। দণ্ডকারণ্যের কৃষকদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকিলে খাজনার সমস্তটাই ঐখানকার জমির মালিক সরকারের হস্তে যাইবে। আর সরকার যদি অর্থ নৈতিক খাজনার অতিরিক্ত দাবি করে তবে উদ্বাস্তু বাঙালী আবার পশ্চিমবংগ অভিমুখে যাত্রা করিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, খাজনার উদ্ভব হয় তিনটি কারণে—(১) জমির যোগানের সীমাবদ্ধতা, (২) বিভিন্ন জমির উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য এবং (৩) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা এবং জমি প্রকৃতির দান হইলেও খাজনা দিতে হয় কৃষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য। ইহাই রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব।

সমালোচনা : রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে বিভিন্ন উর্বরতাসম্পন্ন জমির উৎপাদনে যে-পার্থক্য তাহাই অর্থনৈতিক খাজনা। রিকার্ডোর আর একটি প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে খাজনা দামের অংগীভূত নহে, কারণ চাহিদাবৃদ্ধির ফলে ফসলের মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার জন্যই খাজনার উদ্ভব ও বৃদ্ধি ঘটে এবং এই কারণেই প্রান্তিক জমির উপর কোন খাজনা দেওয়া হয় না।

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ রিকার্ডোর উপরি-উক্ত তত্ত্বের সারাংশ স্বীকার করিয়া লইলেও ইহার কতকগুলি বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমত, বলা হয় যে জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তি বলিয়া কিছুই নাই। নিয়মিত কৃষিকার্যের ফলে জমির উর্বরতাশক্তি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। অপরদিকে মানুষ সার প্রয়োগ, সেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়ত, শুধু বিভিন্ন জমির উর্বরতাশক্তির পার্থক্য হেতুই খাজনার উদ্ভব হয় না; একই জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়ার ফলেও ইহা হইতে পারে।

তৃতীয়ত, রিকার্ডো যে-প্রান্তিক জমির কল্পনা করিয়াছেন তাহাও ভ্রান্ত। কোন জমি কোন বিশেষ ফসল উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিলে উহা প্রান্তিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে; কিন্তু ইহা অন্য এক কার্যে ব্যবহৃত হইলে ইহার উপর উদ্বৃত্ত বা খাজনার

সাক্ষাৎ মিলিতে পারে। কোন জমিতে ধান উৎপন্ন হইলে উহাতে মাত্র উৎপাদন-ব্যয় পোষাইতে পারে, কিন্তু গম উৎপাদন করা হইলে উৎপাদন-ব্যয় কুলাইয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে।

পরিশেষে, খাজনা দামের অংগীভূত নহে বলিয়া রিকার্ডোর যে-অভিমত, আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ তাহারও বিরোধিতা করেন। এ-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

চূড়ান্ত বা আধুনিক খাজনাতত্ত্ব (Final or Modern Theory of Rent)

রিকার্ডোর মতবাদের সংশোধিত রূপই চূড়ান্ত বা আধুনিক খাজনাতত্ত্ব। সংক্ষেপে ইহাকে এইভাবে বর্ণনা করা যায়ঃ খাজনা উৎপাদকের উদ্বৃত্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। উৎপাদনের উপাদানের যোগানের সীমাবদ্ধতার জন্যই ইহার উদ্ভব হয়। জমির ক্ষেত্রে যোগান প্রকৃতির দ্বারা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট এবং জমি ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির অধীন বলিয়া উৎপাদকের উদ্বৃত্তের উদ্ভব হইতে দেখা যায়। ফসলের উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে লোকে একই জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিতে পারে, অথবা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমি কৃষিকার্যের অধীনে আনয়ন করিতে পারে। বিশেষ ক্ষেত্রে কোন্ পন্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা নির্ভর করে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির হার ও নিকৃষ্ট জমির উৎপন্নের হারের পার্থক্যের উপর। শ্রম ও মূলধন বাবদ ১০০ টাকা একই জমিতে দ্বিতীয়বার নিয়োগ করা হইলে যদি ২০ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হয় এবং ঐ টাকা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে নিয়োগ করিলে যদি ১৮ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হয় তবে কৃষক প্রথম পন্থাই অবলম্বন করিবে। এক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে প্রথম দফা শ্রম ও মূলধন নিয়োগের ফলে ২৫ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হইলে, দ্বিতীয় দফা শ্রম ও মূলধন নিয়োগের ফলে প্রথমবারের দরুন উদ্বৃত্ত হইবে (২৫ কুইণ্টাল – ২০ কুইণ্টাল =) ৫ কুইণ্টাল ফসল। ইহাই এই জমির খাজনা, তাহা কৃষক বা জমির মালিক যে-কেহই করুক না কেন।

খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Rent and Price)ঃ রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে খাজনা দামের অংগীভূত নহে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে খাজনা ও দামের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। দাম বৃদ্ধি পাইলেই নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর জমি কৃষিকার্যের অধীনে আনয়ন করা হয়। ইহাকে ব্যাপক কৃষিকার্য বলে। ইহার ফলে উৎকৃষ্ট জমিতে খাজনার উদ্ভব হয় এবং ক্রমশ ইহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ বলেন, খাজনা দামের অংগীভূত হয় না—এইরূপ অভিমত প্রকাশ করাও সর্বাবস্থায় ঠিক নয়। জমি নানা কার্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া একটি

উৎপাদনক্ষেত্র হইতে সরাইয়া উহাকে অন্য উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্ত করিলে দাম বাবদ কিছু দিতে হয়। এই দামই খাজনা এবং ইহা উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়। ফলে ইহা দামের অংগীভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে, দাম চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয় বলিয়া, জমির যোগান চাহিদার তুলনায় স্বল্প হইলে কোন উৎপাদনকার্যে উহাকে ব্যবহার করার জন্য সংগঠককে উহার দাম দিতেই হইবে। এই দাম সে উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে ধরিবে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের দাম হইতে উহার সংকুলানের ব্যবস্থা করিবে। যেমন, কৃষক যদি কোন জমি হইতে ১০০ টাকার ফসল পায়, তবে তাহাকে উহার মধ্য হইতেই খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং ব্যক্তিগত উৎপাদকের দিক হইতে খাজনাকে দামের অংগীভূত হইতে দেখা যায়।

খাজনা ও জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Rent and Population): জনসংখ্যার সংগে খাজনার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। নূতন দেশে যখন জনসংখ্যা স্বল্প থাকে তখন কোন খাজনার উদ্ভব নাও হইতে পারে। কারণ, তখন উৎকৃষ্ট জমি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া কোন উদ্‌বৃত্ত দেখা দেয় না; কিন্তু এই উদ্‌বৃত্তই হইল খাজনা। তারপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পায় বলিয়া দেশ ব্যাপক অথবা আত্যন্তিক কৃষিকার্যের পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ, হয় তখন অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমি চাষ করিতে সুরু করে, না-হয় একই জমিতে অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিতে থাকে। এই দুইটি পদ্ধতির যে-কোনটিই অবলম্বন করা হউক না কেন, ফসল উৎপাদনের হার পূর্বাপেক্ষা কম হইবে। সুতরাং উদ্ভব ঘটিবে উৎপাদকের উদ্‌বৃত্ত (producer's surplus) বা অর্থনৈতিক খাজনার। ইহার পর জনসংখ্যা যতই বাড়িতে থাকিবে, আরও নিকৃষ্ট জমিতে চাষ বা পুরাতন জমিতে আরও শ্রম ও মূলধন নিয়োগের দরুন খাজনার পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাইয়া চলিবে। আমাদের উদাহরণে (১৫৮ পৃষ্ঠা) দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে কৃষিকার্য সুরু হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির মধ্যে উৎপাদনের পার্থক্য দেখা দিল ৫ কুইণ্টাল শস্য। ইহাই প্রথম শ্রেণীর জমির খাজনা। ইহার পর জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইলে যখন তৃতীয় শ্রেণীর জমিতেও চাষ আরম্ভ হইল তখন প্রথম শ্রেণীর জমির খাজনা বৃদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল ১০ কুইণ্টালে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে খাজনার উদ্ভব ঘটিল।

অতএব, জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে খাজনা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, জনসংখ্যা-হ্রাসের ফলে খাজনা হ্রাস পায়। এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে জনসংখ্যাবৃদ্ধি বলিতে শুধু দেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধি বুঝায় না, সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যাবৃদ্ধিই বুঝায়, কারণ এক দেশের উৎপন্ন শস্য অন্য দেশে চালান যায়। মোটকথা যে দেশেই হউক না কেন, জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুন ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেই খাজনা বৃদ্ধি পাইবে।

১৭ | মজুরি
(Wages)

আর্থিক মজুরি এবং প্রকৃত মজুরি (Money Wages and Real Wages)

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের দাম বা মজুরি কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার আলোচনা করিবার পূর্বে আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। শ্রমিককে যে মাস-মাহিনা অথবা সাপ্তাহিক বা দৈনিক মজুরি দেওয়া হয় তাহাই তাহার আর্থিক মজুরি। এই মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক তাহার ভোগ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করে। অনেক সময় আবার মজুরি আংশিকভাবে টাকাকড়িতে এবং আংশিকভাবে জিনিসপত্রে প্রদান করা হয়। মোটকথা, শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক যে-সকল দ্রব্য ও সেবা ভোগ করিতে পারে তাহাই তাহার প্রকৃত মজুরি। আর্থিক মজুরি স্বল্প হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক হইতে পারে, কারণ শ্রমিক হয়ত বিনা পয়সায় বসবাসের স্থান পায়, সস্তায় খাদ্যদ্রব্য পায়, বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগসুবিধা পায়, ইত্যাদি।

প্রকৃত মজুরি নির্ধারণ করিতে হইলে আর্থিক মজুরি ব্যতিরেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

প্রকৃত মজুরি কি কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়ঃ অস্থায়ী চাকরির আর্থিক মজুরি আপাতদৃষ্টিতে অধিক হইলে স্থায়ী চাকরির অল্প মজুরি শ্রেয়। ইহাতে প্রকৃত মজুরি অনেক বেশী। কারণ, অস্থায়ী চাকরির স্থায়িত্ব নাই বলিয়া শ্রমিক যে-কোন সময় বেকার হইয়া পড়িতে পারে। ফলে তাহার মোট উপার্জন কম হইতে পারে।

যে-সকল চাকরিতে উপরি-আয়ের সম্ভাবনা আছে (যেমন, শিক্ষকদের গৃহ-শিক্ষকতার কার্য বা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করা, টাইপিস্টদের দৈনিক কার্যের পরে অন্যত্র কিছু উপরি-কাজ ইত্যাদি) সেই সকল চাকরিতে প্রকৃত মজুরি বেশী। ইহা ব্যতীত অনেক চাকরিতে অন্য রকম সুবিধাও দেওয়া হয়—যেমন, পূর্বোল্লিখিত বিনা পয়সায় বসবাসের স্থান, সস্তায় খাদ্যদ্রব্য, বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ, বিনামূল্যে রেলভ্রমণ, বাৎসরিক বোনাস, পেনসন্, পারিবারিক পেনসন্ ইত্যাদি। ঐ সকল চাকরিতে আর্থিক মজুরি অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক। অপ্রীতিকর কার্য বা আয়াসসাধ্য কার্যের—যথা, ইঞ্জিন-চালকের কার্যের—আর্থিক মজুরি অধিক হইলেও প্রকৃত মজুরি কম, কারণ তাহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া কাজ করিতে পারে না বলিয়া সারা জীবনে মোট উপার্জন কম করে।

প্রকৃত মজুরি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বিশেষ করিয়া জিনিসপত্রের মূল্যস্তরের উপর নির্ভর করে। বর্তমানে ৫ টাকা দিয়া যে ভোগ্যবস্তু ক্রয় করা যায় যুদ্ধের পূর্বে তাহা ১ টাকায় ক্রয় করা চলিত। সুতরাং যুদ্ধের পূর্বে যাহারা ১০০ টাকা উপার্জন করিত তাহাদের প্রকৃত মজুরি বর্তমানে যাহারা ১০০ টাকা উপার্জন করে তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। অতএব, স্মরণ রাখিতে হইবে যে মূল্যস্তরের পরিবর্তনের সংগে প্রকৃত মজুরি কমিতে বা বাড়িতে পারে।

শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বা জীবনযাত্রার মান তাহাদের আর্থিক মজুরির উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে প্রকৃত মজুরির উপর। শ্রমিকদের অবস্থা ভাল কি মন্দ এবং তাহাদের মজুরি যথেষ্ট কি না, তাহা বিচার করিতে হইলে দেখা দরকার তাহারা কি পরিমাণ সুযোগসুবিধা ও দ্রব্যাদি ভোগ করিতে সমর্থ। শুধু আর্থিক মজুরির পরিমাণ দেখিয়া শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থার বিচার করা চলে না।

আবার জীবনযাত্রার মান ছাড়াও সামাজিক মর্যাদা, পদোন্নতির সুযোগ, সাফল্যের আশা, স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি এমন অনেক বিষয় আছে অর্থের মাপকাঠিতে যাহাদের পরিমাপ করা চলে না। প্রকৃত মজুরি নির্ধারণের সময় এগুলি সম্পর্কেও বিচার করিতে হইবে। কেন শ্রমিক অনেক ক্ষেত্রে অধিক মজুরির কাজ ছাড়িয়া অল্প মজুরির কাজই পছন্দ করে তাহার কারণও এই বিচারের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। মার্শালের (Prof. Alfred Marshall) ভাষায়, কোন বৃত্তির আকর্ষণ উহার আর্থিক মজুরির উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে উহার নীট সুবিধার (net advantages) উপর। অর্থাৎ এক ক্ষেত্রে আর্থিক মজুরি যতটা বেশী অন্য ক্ষেত্রে অন্যান্য সুযোগসুবিধা যদি তাহা অপেক্ষা অধিক হয় তবে শ্রমিক দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিয়োগের দিকেই ঝুঁকিবে। কারণ, ইহাতে তাহার প্রকৃত মজুরি অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে।

মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয়? (How is the Rate of Wages Determined ?)

মজুরির হার নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে দুইটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(ক) প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব এবং (খ) জীবনযাত্রার মানতত্ত্ব।

প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব (Marginal Productivity Theory of Wages)

এই তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হয় যে শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট এবং সকল শ্রমিকই সমান দক্ষতাসম্পন্ন। ইহার ফলে মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং সকল শ্রমিক একই মজুরি পায়। অতএব, মজুরি হইল সর্বাপেক্ষা কম উৎপাদনশীল শ্রমিকের (least productive worker) উৎপাদনের সমান।

শ্রমের চাহিদা সৃষ্টি করে নিয়োগকর্তা। সুতরাং নিয়োগকর্তা যে-মজুরি দিতে রাজী থাকে তাহাই শ্রমের চাহিদা-দাম (Demand Price)। ভোগ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রের ন্যায় শ্রমের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন চাহিদা-দামে বিভিন্ন পরিমাণ শ্রমের চাহিদা থাকে। নিয়োগকর্তা ক্রমাগত শ্রমিক নিয়োগ করিয়া গেলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়ার জন্য শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমিতে থাকে ; ফলে শ্রমের চাহিদার পরিমাণও কমিয়া যায়। কমিতে কমিতে প্রান্তিক উৎপাদন এমন এক অবস্থায় আসে যেখানে উহা বাজারে প্রচলিত মজুরির সমান হয়। ইহার পর আরও শ্রমিক নিয়োগ করিলে নিয়োগকর্তার লোকসান হইবে। সুতরাং সে সেইখানেই থামে। সকল শ্রমিকের দক্ষতা সমান বলিয়া এই প্রান্তিক শ্রমিকের উৎপাদনই মজুরির হার নির্ধারিত করে।

ধরা যাউক, কোন নিয়োগকর্তা ইতিমধ্যেই ৯০ জন শ্রমিক নিযুক্ত করিয়াছে এবং আরও এক বা একাধিক শ্রমিক নিযুক্ত করা হইবে কি না তাহাই তাহার সমস্যা। এই ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা ৯১-তম, ৯২-তম ইত্যাদি শ্রমিক নিয়োগ করিলে প্রান্তিক উৎপাদন কিরূপ হইবে তাহা হিসাব করিবে। যদি ৯০ জন শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ৪০ টাকা, ৯১ জনের প্রান্তিক উৎপাদন ৩৫ টাকা এবং ৯২ জনের প্রান্তিক উৎপাদন ৩০ টাকা হয় তবে ৯২ জন শ্রমিককে নিয়োগ করিতে গেলে সংগঠক ঐ শেষ শ্রমিককে ৩০ টাকার অধিক মজুরি দিতে পারিবে না ; ৯১ জন শ্রমিককে নিয়োগ করিলে অবশ্য শেষ বা প্রান্তিক শ্রমিককে ৩৫ টাকা করিয়া মজুরি দেওয়া যায়। ধরা যাউক, ৯২-তম শ্রমিক ৩০ টাকা মজুরিতেই কাজ করিতে রাজী হইল। তখন সকল শ্রমিককেই ঐ মজুরি লইতে হইবে, কারণ তাহারা সকলে সমদক্ষতাসম্পন্ন। কেহ যদি উহার বেশী দাবি করে তবে সংগঠক তাহাকে বরখাস্ত করিয়া অন্য একজন শ্রমিককে নিযুক্ত করিবে।

এখন প্রশ্ন হইল, শ্রমিকরা ঐ ৩০ টাকা মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হইবে কেন? রাজী হইবে এই কারণে যে অন্য কোন শিল্প বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান ইহার অধিক মজুরি দিবে না। সংগঠক বা নিয়োগকর্তাগণের মধ্যেও প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকে বলিয়া সকল ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়। যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন অধিক থাকে তাহা আরও শ্রমিক নিয়োগ করিয়া মুনাফা বাড়াইতে আগ্রহশীল হয়। কিন্তু অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিলে প্রান্তিক উৎপাদন কমিয়া আসে। এইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রান্তিক উৎপাদন পরস্পরের সহিত সমতালাভের চেষ্টা করে। ভারসাম্য অবস্থায় মজুরির হার প্রত্যেক শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয় এবং প্রান্তিক উৎপাদন সকল ক্ষেত্রে সমান বলিয়া মজুরির হারও এক হয়।

সমালোচনা: প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্বের প্রধান ত্রুটি হইল যে ইহা শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট বলিয়া ধরিয়া লয়। পণ্যের ক্ষেত্রে যোগান নির্দিষ্ট হইলে উহার দাম যেমন প্রান্তিক উপযোগ দ্বারাই নির্ণীত হয়, তেমনি শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট থাকিলে মজুরি প্রধানত শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট নাও থাকিতে পারে—প্রান্তিক উৎপাদন অতি অল্প বলিয়া শ্রমিক অল্প মজুরিতে কাজ করিতে রাজী নাও হইতে পারে। এরূপ ঘটিলে নিয়োগহ্রাসের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া মজুরির হার বাড়াইয়া দিবে। সুতরাং মজুরি-নির্ধারণ ব্যাপারে শুধু শ্রমের চাহিদার দিকেই দৃষ্টি দিলে চলিবে না। উহার যোগানের দিকও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

জীবনযাত্রার মানতত্ত্ব (Standard of Living Theory of Wages)

শ্রমের জীবনযাত্রার মানতত্ত্বে এই যোগানের দিকেরই বিচার করা হয়। প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ মনে করিতেন যে মজুরি শুধু জীবনযাত্রার মান দ্বারাই নির্ধারিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মজুরি শ্রমিকরা যে জীবনযাত্রার মানে অভ্যস্ত তাহা বজায় রাখিবার সমান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা সেই মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হয় না। ফলে শ্রমের যোগান কমিয়া যায় এবং নিয়োগহ্রাসের জন্য প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবেই মজুরি বাড়িয়া জীবনযাত্রার মানের সমান হয়।

এই তত্ত্বও পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ইহা যোগানের দিকটাই দেখে—চাহিদার অবস্থার প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত করে না।

উপসংহার: উপসংহার হিসাবে আমরা বলিতে পারি যে প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব বা জীবনযাত্রার মানতত্ত্ব কোনটাই মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা পুরাপুরি ব্যাখ্যা করে না। মজুরি হইল শ্রমের দাম। সুতরাং ইহা যে-কোন দামের ন্যায় চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে নিরূপিত হয়। চাহিদার দিকে মজুরির উর্ধ্বতন মাত্রা হইল শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন এবং যোগানের দিকে ন্যূনতম মাত্রা হইল শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান বা জীবনযাত্রার জন্য ব্যয়। এই দুই মাত্রার মধ্যে নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের দরাদরি দ্বারা মজুরি নির্ধারিত হয়।

শ্রমিক সংঘ ও মজুরি (Trade Unions and Wages)

শ্রমিকরা নিয়োগকর্তার সহিত দর কষাকষি করে শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে। ইহাকে যৌথ দরাদরি (Collective Bargaining) বলা হয়। নিয়োগকর্তা অধিকাংশ সময়ই শক্তিশালী, তাহার সহিত একা দরাদরি করিয়া শ্রমিক পারিয়া উঠে না। উপরন্তু, একদিন শ্রম না করিলে উহা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়—অর্থাৎ, একদিন কর্মহীন অবস্থায় থাকিলে যে উপার্জন হ্রাস পায় তাহা কোনদিনই পূরণ হয় না। শ্রমিকদের

অলস অবস্থায় বসিয়া থাকিবার সামর্থ্যও কম। এই সকল কারণের জন্য তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া দরাদরির মাধ্যমে নিয়োগকর্তার নিকট হইতে উপযুক্ত মজুরি আদায়ের চেষ্টা করে।

উপযুক্ত মজুরি বলিতে বুঝায় প্রান্তিক উৎপাদনের সমান মজুরি। মজুরির উর্ধ্বতন মাত্রা শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারা নির্ধারিত হইলেও নিয়োগকর্তা সকল সময় শ্রমিককে ইহা অপেক্ষা অল্প দিতেই চেষ্টা করে। শ্রমিক সংঘের কাজ হইল দুর্বল নিঃসহায় শ্রম-বিক্রয়কারীদের জন্য শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান মজুরি আদায়ের প্রচেষ্টা করা। ইহা ছাড়াও শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাইয়া কৃত্রিম সংখ্যাল্পতার সৃষ্টি করে। ফলে শ্রমিকের যোগান কম হয় এবং শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। মজুরি প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয় বলিয়া ইহাতে মজুরিও বৃদ্ধি পায়।

তবে যৌথ দরাদরির মাধ্যমে শ্রমিক সংঘ যে সকল সময় মজুরি বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারিবে এমন কোন কথা নাই। আবার একবার মজুরি বাড়াইয়া লইতে সমর্থ হইলেও উহা বজায় রাখিতে পারিবে কি না, সে-বিষয়েও নিশ্চয়তা নাই। শ্রমিক সংঘের মজুরিবৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা এবং বর্ধিত মজুরি বজায় রাখিবার ক্ষমতা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি মজুরির হার কম হয় তবে শ্রমিক সংঘের মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা বিফল হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, মজুরিবৃদ্ধির ফলে জিনিসের দাম বাড়িয়া যদি চাহিদা হ্রাস পায় তাহা হইলেও মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা বিশেষ কার্যকর হইবে না। তৃতীয়ত, বর্ধিত মজুরি যদি প্রান্তিক উৎপাদনের অধিক হয় তবে উহা বজায় রাখা কঠিন হইবে এবং বজায় থাকিলেও লোকসান এড়ানর দরুন মালিক নিয়োগের পরিমাণ কমাইয়া দিবে। সে বর্তমানে যাহারা নিযুক্ত আছে তাহাদের ছাঁটাই করিতে সমর্থ না হইলেও নূতন লোক নিয়োগ করিবে না। অতএব, শ্রমিক সংঘের মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা সকল সময় সফল নাও হইতে পারে।

অবশ্য মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টাই শ্রমিক সংঘের একমাত্র কার্য নহে; উহার অন্যান্য কার্যও রহিয়াছে। শ্রমিক সংঘ নানাভাবে শ্রম-কল্যাণ (labour welfare) সাধন করে এবং শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। অতএব বলা হয় যে শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন, শ্রম-কল্যাণসাধন ও অন্যান্যভাবে শ্রমিক-স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাহাদের যে স্থায়ী সংগঠন থাকে তাহাকেই শ্রমিক সংঘ বলা হয়।

মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে, শ্রমিক সংঘের কার্যাবলী দুই প্রকারের: (ক) সৌভ্রাত্রমূলক কার্য (fraternal functions) এবং (খ) সংগ্রামমূলক কার্য (militant functincs)।

সৌভ্রাত্রমূলক কার্য বলিতে পারস্পরিক কল্যাণের জন্য যে-সকল কার্য সম্পাদন করা হয় তাহাদের বুঝায়—যথা, নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বয়ঃপ্রাপ্তদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও পরিচালনা, খেলাধুলা ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা, ইত্যাদি। আমাদের দেশে অনেক শ্রমিক সংঘ বর্তমানে এই সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে।

সংগ্রামমূলক কার্য বলিতে বুঝায় যৌথ দরাদরির মাধ্যমে মজুরি ও কার্যের সর্তাবলীর উন্নতিসাধন। ইহার মধ্যে আছে মজুরি ও মাগ্‌গি ভাতা বৃদ্ধি, শ্রমের সময়হ্রাস, কারখানার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন, নিয়োগহ্রাস বা ছাঁটাই-এ বাধা দেওয়া, ইত্যাদি।

যৌথ দরাদরির জন্য শ্রমিক সংঘ যে-সকল পন্থা অবলম্বন করে তাহাদের মধ্যে (ক) কথাবার্তা চালান (Negotiation), (খ) দাবি পেশ ও আপোষের প্রচেষ্টা (Conciliation), (গ) সালিসী বিচার (Arbitration) এবং (ঘ) ধর্মঘটই প্রধান। ধর্মঘটই শ্রমিক সংঘের শ্রেষ্ঠ ও শেষ হাতিয়ার ; ইহার দ্বারাই নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে শক্তির পরীক্ষা হয়। সুতরাং এই পদ্ধতি অবলম্বনে শ্রমিক সংঘকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। ধর্মঘট ব্যর্থ হইলে শ্রমিক সংঘই ভাঙিয়া যাইতে পারে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে ধর্মঘটের মাধ্যমেই হউক আর অন্য পদ্ধতিতেই হউক শ্রমিক সংঘ কখনও প্রান্তিক উৎপাদনের অধিক মজুরি আদায় করিতে পারে না। নিয়োগকর্তাকে যদি প্রান্তিক উৎপাদনের অধিক মজুরি দিতে বাধ্য করা হয় তবে তাহার পক্ষে ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকিতে পারে না।

মজুরির হারে পার্থক্য (Differences in the Rate of Wages)

শ্রম-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি অবাধ প্রতিযোগিতা চালু থাকে এবং শ্রম যদি সম্পূর্ণ গতিশীল হয়—অর্থাৎ শ্রমিক যদি এক কাজ হইতে সহজে অন্য কাজে যাইতে পারে—তবে সকল ক্ষেত্রেই মজুরির হার এক হইবে। দেশে ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা বাড়িলে সকল উকিল যদি ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করিতে পারেন তবে ইঞ্জিনিয়ার ও উকিলের উপার্জনে কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহা হয় না বলিয়াই মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায়।

যে-যে কারণে শ্রমের পূর্ণ গতিশীলতা বা শ্রম-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকে না তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান।

(ক) **কার্যের সাধারণ আকর্ষণ :** যে-কাজ যত বেশী অপ্রীতিকর তাহার মজুরি তত অধিক। সাধারণ মজুর অপেক্ষা মেথরকে যে বেশী পারিশ্রমিক দেওয়া হয় ইহাই তাহার কারণ। শিক্ষকতা কতকটা প্রীতিকর বলিয়া শিক্ষকদের বেতন অন্যান্য শ্রেণীর লোকের তুলনায় কম।

(খ) অনুশীলন বা শিক্ষানবীস কার্যে সুবিধা-অসুবিধা : যে-কার্য অনুশীলন করা যত কঠিন, যত ব্যয়সাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ তাহার মজুরিও তত অধিক হইবে। ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হইতে বহু অর্থ, সময় ও পরিশ্রম লাগে। সেইজন্য তাঁহারা সাধারণ গ্রাজুয়েট হইতে অধিক মজুরি পাইয়া থাকেন। এই কারণেই আবার দক্ষ শ্রমিকের মজুরি অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি হইতে অধিক হয়।

(গ) নিয়োগের স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা : যে-সকল কার্যে নিয়োগ নিয়মিত তাহাদের মজুরি অপেক্ষাকৃত স্বল্প হয়। রাজমিস্ত্রীকে বৎসরে কয়েক মাস বসিয়া থাকিতে হয় বলিয়া স্বাভাবিকভাবেই সে অপেক্ষাকৃত অধিক মজুরি দাবি করে। অপরপক্ষে যে-শ্রমিক কারখানায় সারা বৎসর ধরিয়া নিযুক্ত থাকে সে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হয়।

(ঘ) দায়িত্বশীল বা দায়িত্বশূন্য কাজ : কার্য দায়িত্বশীল হইলে মজুরিও অধিক হইবে। খাজাঞ্চির কার্যের মজুরি বেশী, কারণ ইহাতে দায়িত্ব আছে। অপরদিকে যে-কেরানী শুধু চিঠিপত্র ছাড়ার ব্যবস্থা করে (despatcher) তাহার কাজ কতকটা দায়িত্বশূন্য বলিয়া তাহার মজুরিও কম।

(ঙ) ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা : ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা থাকিলে লোকে বর্তমানে স্বল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিতে রাজী হয়। এইজন্য শিক্ষানবীসরা (apprentices) সামান্য ভাতাতেই কাজ করে ; আইন-ব্যবসায়ীদিগকেও প্রথম প্রথম সামান্য পারিশ্রমিকে ও বিনা পারিশ্রমিকে কার্য করিতে দেখা যায়।

(চ) আঞ্চলিক কারণ : আঞ্চলিক কারণেও মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায়। যে-ব্যক্তি সহরে বাস চালাইয়া থাকে সে পল্লীগ্রামের বাসচালক অপেক্ষা অধিক বেতন পায় ; সহরের দিনমজুরও পল্লীগ্রামের দিনমজুর হইতে অধিক মজুরি পায়। আবার আসাম মণিপুর হিমাচলপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে মজুরির যে-হার তাহা অপেক্ষা পশ্চিমবংগ মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে মজুরির হার অধিক।

উপরে যে-বিষয়গুলি বর্ণনা করা হইল তাহারা শ্রমের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়াই বিভিন্ন ক্ষেত্রে মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায়। যে উৎপাদন ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে শ্রমের যোগান অধিক সেখানে মজুরির হারও কম। শিক্ষক বহু সংখ্যায় পাওয়া যায় বলিয়া শিক্ষকগণ অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় স্বল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিতে বাধ্য হন ; কেরানীর কার্যের জন্য শ্রমের যোগান অধিক বলিয়া কেরানীর বেতন অধিক হয় না। অনুরূপভাবেই চাহিদার তুলনায় যোগান অধিক বলিয়া গ্রামাঞ্চলে বা অনুন্নত অঞ্চলে মজুরি কম এবং নগরাঞ্চল ও উন্নত অঞ্চলে মজুরি বেশী হয়।

১৮ | সুদ
(Interest)

সুদ কাহাকে বলে? (What is Interest?)

মূলধন কর্জ লওয়ার জন্য যে-দাম দিতে হয় তাহাকেই সুদ বলে। সাধারণত বাৎসরিক হারে এই দামের হিসাব করা হয়। যেমন, কোন ঋণগ্রহীতা যদি ১০০ টাকা ধার লইয়া বৎসরান্তে ১০৬ টাকা ফেরত দিতে অংগীকারাবদ্ধ হয় তাহা হইলে আমরা বলিয়া থাকি যে সুদের বাৎসরিক হার হইল শতকরা ৬ টাকা। অতএব দেখা যাইতেছে, ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে নির্দিষ্ট সময়ের পর আসল ছাড়াও যে-অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে তাহাই সুদ।

নীট সুদ এবং মোট সুদ (Net Interest and Gross Interest)

মাত্র মূলধন ব্যবহারের জন্য যে-দাম দিতে হয় তাহাকেই নীট (net or pure or economic) সুদ বলা হয়; মূলধন কর্জ করিলেই এই সুদ দিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে যে-সুদ প্রদান করিয়া থাকে তাহার মধ্যে নীট সুদ ব্যতীত অন্যান্য জিনিসের দাম থাকে—যেমন, আদায় সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকিতে পারে, ঋণগ্রহীতার মৃত্যু বা দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। এই ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তার দরুন ঋণদাতা নীট সুদ ব্যতীত কিছু অতিরিক্ত আদায় করে। আবার লেনদেনসংক্রান্ত হিসাবপত্র প্রভৃতি বাবদ ঋণদাতাকে ব্যয় করিতে হয়; অনেক সময় তাহাকে ঋণ আদায়ের জন্য হাংগামা পোহাইতে হয়। ইহার দাম হিসাবেও ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিয়া থাকে। অতএব, ঋণগ্রহীতাকে সুদ হিসাবে যাহা দিতে হয় তাহার মধ্যে ঝুঁকি হাংগামা ও আদায়পত্রের খরচ প্রভৃতি বাবদ দেয় অর্থও থাকে। সুতরাং উহাকে মোট বা অপরিশুদ্ধ (gross) সুদ বলা হয়। এই মোট সুদ হইতে ঝুঁকি, আদায়পত্রের খরচ প্রভৃতি বাবদ দেয় অর্থ বাদ দিলে নীট সুদ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, কোনপ্রকার ঝুঁকি বা ঝঞ্ঝাট না থাকিলে ঋণের জন্য যে-সুদ আদায় করা হয় তাহাই নীট সুদ।

এই কারণেই বিভিন্ন প্রকারের ঋণের মধ্যে সুদের হারে পার্থক্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের যে-অতিরিক্ত হারে সুদ দিতে হয় তাহার অন্যতম কারণ হইল যে এই ঋণের ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা এবং আদায়ের ঝঞ্ঝাট বেশী। অপরপক্ষে সরকারকে আমরা যে-ঋণ দিয়া থাকি তাহার সুদ যে অপেক্ষাকৃত কম হয় তাহার কারণ এইরূপ ঋণের পরিশোধ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বা আদায়ের ঝঞ্ঝাট কম।

সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়? (How is the Rate of Interest Determined ?)

সুদ মূলধন ব্যবহারের দাম। সুতরাং জিনিসপত্রের দামের ন্যায়ই উহা চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। ঋণগ্রহীতাদের নিকট মূলধনের উপযোগিতা আছে বলিয়াই মূলধনের চাহিদা এবং উহার জন্য সুদ দেওয়া হয়। ব্যবসায়ী শ্রেণী মূলধনের জন্য সুদ দিতে প্রস্তুত থাকে মূলধনের উৎপাদনশীল কার্যে নিয়োজিত করা যায় বলিয়া। ঋণ-করা মূলধন সাজসরঞ্জাম, কাঁচামাল প্রভৃতিতে নিয়োগ করিয়া উৎপাদকগণ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে সচেষ্ট থাকে। মূলধন নিয়োগের ফলে উৎপাদকের যতটা পরিমাণ আয় হয় ততটা পরিমাণ সুদই দিতে সে রাজী হইবে। মূলধনের নিয়োগের ফলে যে-আয় হয় সুদের হার তাহার অধিক হইলে সে ঋণ করিবে না। যেমন, ১০০ টাকা ধার করিয়া যদি উৎপাদক বৎসরে ৫ টাকা আয় করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে সে ৫ টাকার অধিক সুদ দিতে রাজী হইবে না। কারণ, তাহা হইলে তাহার লোকসান হইবে। সুতরাং সে যখন মূলধন বাড়ায় তখন সে দুইটি বিষয় বিচার করিয়া দেখে—(১) অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগের ফলে আয় কত হইবে, এবং (২) মূলধনের সুদ কত? যেখানে মূলধন হইতে আয় ও মূলধনের সুদ সমান হয় সেখানেই সে থামিয়া যায় এবং আর মূলধন কর্জ করিয়া উৎপাদনে নিয়োগ করে না। অন্যভাবে বলা যায়, চাহিদার দিক হইতে সুদের হার মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়।

মূলধনের চাহিদা : আমরা দেখিয়াছি যে, উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের সহিত ক্রমাগত একটিমাত্র উপাদান যোগ করা হইতে থাকিলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে থাকে (৪১-৪২ পৃষ্ঠা)। এখন যদি অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া অধিক মাত্রায় মূলধন প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদনের হার কমিতে থাকিবে। মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন কমিতে থাকিলে ব্যবসায়িগণ সুদ বেশী দিতে রাজী থাকিবে না এবং তাহাদের ঋণের চাহিদা হ্রাস পাইবে। অতএব, সুদের হার না কমাইলে লগ্নিদারেরা লগ্নি করিতে পারিবে না এবং তাহাদের নিজেদের মধ্যে ঋণপ্রদানের জন্য প্রতিযোগিতার ফলে সুদের হার হ্রাস পাইবে। অতএব, চাহিদার দিক হইতে সুদের হার মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। সুদের হার অধিক হইলে মূলধনের চাহিদা কমিবে, কারণ যে-সকল ক্ষেত্রে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন বেশী মাত্র সেই সকল ক্ষেত্রেই মূলধন নিয়োজিত হইবে। আর সুদের হার স্বল্প হইলে মূলধনের চাহিদা অধিক হইবে, কারণ যে-সকল ক্ষেত্রে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন কম সেই সকল ক্ষেত্রেও মূলধন নিয়োজিত হইবে। এখানে মনে রাখিতে

হইবে যে, ব্যবসায়ী যখন উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য মূলধন নিয়োগ করে তখন সে মূলধন হইতে কতটা লাভের সম্ভাবনা (expectation) আছে সেই বিচার দ্বারাই পরিচালিত হয়। লাভের সম্ভাবনা বিচার করিয়া সে কত সুদে ঋণ করিবে তাহা ঠিক করে।

ব্যবসায়ী ছাড়া সাধারণ লোক এবং সরকার ঋণ করিয়া থাকে। ইহারাও মূলধনের বাজারে চাহিদার সৃষ্টি করে। সাধারণ লোকে ঘর বাড়ী বা প্রত্যক্ষ ভোগের জন্য ঋণ করিয়া থাকে। সরকার যুদ্ধ পরিচালনার মত অনুৎপাদনশীল কার্যের জন্য এবং ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প, সমাজ-কল্যাণকর কার্য প্রভৃতির জন্য ঋণ করে। যুদ্ধের জন্য সরকার যে-ঋণ করে তাহা সুদের হারের উপর বিশেষ নির্ভর করে না, কারণ যুদ্ধজয়ের জন্য যে-কোন সুদেই সরকারকে ঋণ করিতে হয়। শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারকে ঋণ করিবার সময় সুদের হারের সহিত উৎপাদনকে বিচার করিয়া দেখিতে হয়। যাহা হউক, চাহিদা যে-সূত্র হইতেই আসুক না কেন, উহা অধিক হইলে মূলধনের সুদ বাড়িবে এবং উহা স্বল্প হইলে সুদ কম হইবে।

মূলধনের যোগান: এই ত গেল চাহিদার দিক। এখন যোগানের দিকও দেখা প্রয়োজন। সঞ্চয় হইতে লগ্নি-মূলধন আসে। এই সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রধানত লোকের আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আয়ের পরিমাণ ঠিক থাকিলে এবং সুদের হার বেশী হইলে লোকে অধিক সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইবে; আর সুদের হার যদি কম হয় তাহা হইলে লোকে ততটা সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক হইবে না। কিন্তু লোক হয়ত সুদ না থাকিলেও সঞ্চয় করে; কিন্তু সঞ্চয়ের জন্য দাম হিসাবে সুদ দেওয়া না হইলে অধিকাংশ লোকই সঞ্চয় করিতে আগ্রহান্বিত হয় না। ইহার কারণ, লোকে ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানের ভোগকে অধিক কাম্য মনে করে। সঞ্চয় করার অর্থ হইল বর্তমানে ভোগকে স্থগিত রাখিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা করা। অতএব, এই প্রতীক্ষার (waiting) জন্য উপযুক্ত মূল্য না দেওয়া হইলে লোকে সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিবে কেন? যেমন, ১০০ টাকা ধার দিয়া যদি দশ বৎসর পরে ঐ ১০০ টাকাই মাত্র ফেরত পাওয়া যায়, তাহা হইলে সাধারণত লোকে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিতে চাহিবে না। মানুষ বর্তমান সময়কে যতটা প্রাধান্য দেয় ভবিষ্যৎকে ততটা দেয় না। সেইজন্য লোককে বর্তমান ভোগপ্রবৃত্তি ও বর্তমান সময়প্রীতি হইতে মুক্ত করিয়া সঞ্চয়ে উৎসাহিত করিতে হইলে সুদ দিতে হয়। এই সুদই হইল প্রতীক্ষার বা বর্তমান সময়ের প্রতি আকর্ষণকে পরিহার করিবার জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেয় দাম। লোককে যত অধিক সঞ্চয় করিতে হয় তত অধিক বর্তমান ভোগ বা বর্তমান সময়ের প্রতি আকর্ষণকে ত্যাগ করিতে হয়। অর্থাৎ, সঞ্চয়ের দরুন ত্যাগস্বীকারের মাত্রা সঞ্চয়বৃদ্ধির সংগে সংগেই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং লোককে অধিক মাত্রায় ত্যাগস্বীকার

করিতে রাজী করাইবার জন্য অধিক হারে সুদ প্রদান করিতে হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সুদের হার উচ্চ হইলে লোকে অধিক সঞ্চয়ের যোগান দিবে, আর সুদের হার কম হইলে সঞ্চয়ের যোগান কমিয়া যাইবে।

দেখা গেল, সুদের হার বেশী হইলে মূলধনের চাহিদা কমে কিন্তু যোগান বাড়ে। অপরদিকে সুদের হার কম হইলে উহার চাহিদা বাড়ে কিন্তু যোগান কমে। এইভাবে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে যে-হারে মূলধনের চাহিদার-পরিমাণ মূলধনের যোগানের পরিমাণের সমান হয় সেই হারই বাজারে সুদের হার বলিয়া গণ্য হয়। ইহাকে সুদের সাম্যাবস্থার হার (Equilibrium Rate of Interest) বলে। সুদের হার ইহার অধিক হইলে বাজারে মূলধনের যোগান মূলধনের চাহিদা অপেক্ষা অধিক হইবে; ফলে ঋণদাতাদের মধ্যে ঋণপ্রদানের জন্য প্রতিযোগিতা চলিবে এবং সুদের হার কমিয়া আবার সাম্যাবস্থার হারে দাঁড়াইবে। অপরদিকে সুদের হার সাম্যাবস্থার হার হইতে কম হইলে মূলধনের চাহিদা মূলধনের যোগান অপেক্ষা অধিক হইবে; ফলে ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ঋণগ্রহণের জন্য প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিবে এবং সুদের হার আবার বাড়িয়া সাম্যাবস্থার হারে আসিয়া দাঁড়াইবে।

নিম্নের উদাহরণটি হইতে সুদ নির্ধারণের উপরি-উক্ত নিয়মটি সহজেই বুঝা যাইবে:

(হিসাব টাকায়)

সুদের হার (শতকরা)	মূলধনের চাহিদা	মূলধনের যোগান
৮	১৫,০০০	৫০,০০০
৭	১৮,০০০	৪০,০০০
৬	২২,০০০	৩০,০০০
৫	২৫,০০০	২৫,০০০
৪	৩৫,০০০	২০,০০০
৩	৫০,০০০	১৫,০০০

এই হিসাবে দেখা যায় যে বাজারে সুদের হার মূলধনের চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে ৫ টাকায় আসিয়া স্থির হইবে, কারণ ঐ সুদে মূলধনের যতটা চাহিদা ঠিক ততটাই যোগান হয়। সুদ যদি ৬ টাকা হয় তাহা হইলে ঋণগ্রহীতারা ২২,০০০ টাকা ঋণ করিতে ইচ্ছুক থাকে, কিন্তু ঋণদাতারা ৩০,০০০ টাকা লগ্নি করিতে চাহে। ফলে ঋণদাতাদের মধ্যে ঋণপ্রদানের জন্য প্রতিযোগিতা চলে এবং সুদের হার ৫ টাকায় নামিয়া আসে। অপরদিকে সুদ যখন ৪ টাকা ঋণগ্রহীতারা তখন ৩৫,০০০ টাকা ঋণ করিতে ব্যগ্র কিন্তু ঋণদাতারা মাত্র ২০,০০০ টাকা লগ্নি করিতে রাজী থাকে। ফলে ঋণগ্রহণের জন্য ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে এবং সুদের হার বাড়িয়া ৫ টাকা হয়। সুতরাং ৫ টাকা সুদের হারেই চাহিদা ও যোগান সাম্যাবস্থায় আসে।

কেইন্‌সের স্থদতত্ত্ব (Keynesian Theory of Interest)

স্থদের হার যে মূলধনের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয় বিখ্যাত ইংরাজ অর্থবিত্তাবিদ লর্ড কেইন্‌স (Lord Keynes) এই তত্ত্বের বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, স্থদ নির্ধারিত হয় টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগান (demand for and supply of money) দ্বারা। প্রত্যেকেই কিছু পরিমাণ টাকাকড়ি নগদ অবস্থায় (in liquid form) রাখিতে চায়। ইহার মূলে তিনটি উদ্দেশ্য কার্য করিয়া থাকে।

ক। **লেনদেন-উদ্দেশ্য (Transactions Motive) :** প্রথমত, জিনিসপত্র ক্রয় করা, লোকজনকে দেওয়া ইত্যাদির উদ্দেশ্যে প্রত্যেকেরই কিছু পরিমাণ নগদ টাকা হাতে রাখার প্রয়োজন হয়। যেমন, যাহারা মাস-মাহিনা পায় তাহাদের হাতে মাহিনার দিন যে-টাকা আসে তাহা দিয়া সারা মাস চালাইতে হয়। স্থতরাং তাহাদিগকে সারা মাস ধরিয়াই নগদ টাকা হাতে রাখিতে হয়। ইহা ছাড়া বাড়ীর ট্যাক্স, বীমার প্রিমিয়াম প্রভৃতির জন্য সময়ান্তরে যে-সকল পাওনা মিটাইতে হয় তাহার জন্যও নগদ টাকা না রাখিলে চলে না।

খ। **সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য (Precautionary Motive) :** তারপর আছে অস্থখবিস্থখ, দুর্ঘটনা ইত্যাদি। ইহাদের জন্যও কিছু নগদ টাকা রাখিবার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেকেই অনুভব করিয়া থাকে।

গ। **ফটকা কারবারের উদ্দেশ্য (Speculative Motive) :** বাজারে বহু ধরনের ঋণপত্র (bonds) থাকে যাহাতে অর্থ লগ্নি করিয়া লাভবান হওয়া যায়। যেমন, যখন ঋণপত্রের দাম কম থাকে তখন উহা ক্রয় করিয়া পরে যখন উহার দাম বাড়ে তখন বিক্রয় করিলে মুনাফা হয়। অতএব, স্থযোগ বুঝিয়া এই বণ্ডে বা ঋণপত্রে অর্থ লগ্নি করিবার উদ্দেশ্যে লোকে নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখে।

এইভাবে বিভিন্ন লোকের যে নগদ টাকাকড়ি হাতে রাখিবার আকাংক্ষা তাহাই টাকাকড়ির চাহিদা সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই আকাংক্ষাকে বলা হয় নগদাকাংক্ষা (liquidity preference)। এই আকাংক্ষা—অর্থাৎ লোকে কত টাকা নগদ অবস্থায় রাখিতে চায় তাহা—স্থদের সহিত সম্পর্কিত। স্থদের হার অধিক হইলে লোকে টাকা ব্যাংকে বেশীদিন ধরিয়া জমা রাখিয়া স্থদ ভোগ করিতে চাহিবে ; অপরপক্ষে স্থদের হার কম হইলে নগদ অবস্থাতেই রাখিতে ইচ্ছুক হইবে। কত কত স্থদে লোক কি কি পরিমাণ নগদ টাকা রাখিতে চায় তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহাকে বলা হয় নগদাকাংক্ষার তালিকা (Liquidity Preference Schedule)। পরবর্তী পৃষ্ঠায় এইরূপ একটি তালিকার উদাহরণ দেওয়া হইল :

সুদের হার (শতকরা)	টাকাকড়ির চাহিদা বা নগদাকাংক্ষা
১	২০০০ কোটি টাকা
২	১৮০০ " "
৩	১৫০০ " "
৪	১০০০ " "
৫	৮০০ " "
৬	৬০০ " "

টাকাকড়ির যোগান আসে সরকার ও ব্যাংক-ব্যবস্থার নিকট হইতে। সরকার দেয় কারেন্সী বা বিহিত মুদ্রার (legal tender money) যোগান এবং ব্যাংক-ব্যবস্থা যোগান দেয় ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ির (bank money)। বিশেষ সময়ে টাকাকড়ির যোগান নির্দিষ্ট থাকে। ধরা যাউক, ভারতে কোন বিশেষ সময়ে মোট টাকাকড়ির যোগান হইল ১৫০০ কোটি টাকা। উপরের নগদাকাংক্ষা তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, সুদের হার শতকরা ৩ টাকা হইলে টাকাকড়ির চাহিদার পরিমাণও হইবে ঐ পরিমাণ। সুতরাং শতকরা ৩ টাকা সুদে টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান এবং ঐ ৩ টাকাই হইল সুদের ভারসাম্য-হার (equilibrium rate of interest)।

সুদের হার নির্ধারণের এই তত্ত্ব কেন সুদ দিতে হয় তাহাও ব্যাখ্যা করে। কেইন্‌সের মতে, সুদ সঞ্চয়ের পুরস্কার বা প্রতীক্ষার মূল্য নহে ; সুদ দিতে হয় লোকের নগদাকাংক্ষা জয় করিবার জন্য। লোক যদি সঞ্চয় করিয়া টাকা মাটির নীচে পুতিয়া রাখে তাহা হইলে সে কোন সুদ ভোগ করিতে পারে না। আবার তাহারা যদি বর্তমানের পরিবর্তে ভবিষ্যতে ভোগ করিবার জন্য টাকা ব্যাংকে রাখিয়া দেয় তাহা হইলেই যে সুদ ভোগ করিবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ, টাকা চলতি আমানতে (demand deposits) রাখিলে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না ; টাকা মেয়াদী আমানত (time or fixed deposits) হিসাবে রাখিলে তবেই সুদ পাওয়া যায়। দেখা যায় যে, আমানতের মেয়াদ যত বেশী হয় সুদের হারও তত অধিক হয়। যেমন, ১ বৎসরের জন্য রাখিলে শতকরা ৫ টাকা হারে এবং ৫ বৎসরের জন্য রাখিলে শতকরা ৬½ টাকা বা ৭ টাকা হারে সুদ পাওয়া যায়। মোটকথা, লোকে যত বেশী নগদাকাংক্ষা পরিত্যাগ করিবে, সুদের হারও তত অধিক হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে কেইন্‌সের সুদতত্ত্বের মূল উপাদান হইল নগদাকাংক্ষা। এইজন্য ইহাকে সুদের নগদাকাংক্ষা তত্ত্ব (Liquidity Preference Theory of Interest) বলা হয়।

সুদের হারে পার্থক্য (Differences in the Rate of Interest)

যেমন, একই ধরনের পণ্যের দাম প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যোগান ও চাহিদার ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে একই থাকে, তেমনি একই ধরনের ঋণের সুদও বাজারে একই থাকার প্রবণতা দেখা যায়। তবে ঋণের শ্রেণীবিভাগ আছে এবং এইজন্য বাজারে বিভিন্ন ধরনের ঋণের সুদ বিভিন্ন হইতে দেখা যায়।

দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদ স্বল্পমেয়াদী ঋণের সুদ অপেক্ষা স্বাভাবিকভাবেই অধিক। কারণ, এক্ষেত্রে মহাজনের বিনিয়োগযোগ্য অর্থ দীর্ঘকালব্যাপী ঋণগ্রহীতার প্রয়োজন মিটায়।

অনেক সময় ঋণে অনিশ্চয়তা থাকিয়া যায়। দরিদ্র অপরিচিত ও অসাধু ব্যক্তিকে ঋণদানে মহাজনরা অনিচ্ছুক হয় বা ঋণ দিতে স্বীকৃত হইলেও জামিন রাখিয়া দেয় বা অতি উচ্চ হারে সুদ দাবি করে। কারণ, অনেক সময় এরূপ ক্ষেত্রে আসল টাকা ফেরত না পাইবার আশংকা থাকে। সুতরাং ঝুঁকি বেশী হইলে মহাজনরা উচ্চ হারে সুদ দাবি করে।

অনেক সময় সুদ আদায়ের জন্য পরিশ্রম ও ব্যয় হয়। চিঠিপত্র লেখা, লোক নিয়োগ করা, ইত্যাদির জন্য হাংগামা বেশী হইলে সুদ বেশী দিতে হয়। আমাদের দেশে কাবুলিওয়ালারা যে উচ্চ হারে সুদ গ্রহণ করে তাহার অন্যতম কারণ আদায়ের অসুবিধা।

সরকার অনেক সময় জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। স্থায়িত্ব অনুসারে এই ঋণের উপর বার্ষিক শতকরা অল্প হারে সুদ দেওয়া হয়। এই অল্প সুদে ঋণগ্রহণে কেন সরকার সফল হয় তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। সরকারের নিকট হইতে মূলধন ফেরত না পাওয়ার কোন আশংকা থাকে না। সরকারের ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতায় লোকের সম্পূর্ণ আস্থা থাকে। উপরন্তু, এই ঋণের জন্য সুদ আদায়ের কোন হাংগামা নাই। আইনের বলে কোম্পানীগুলি, বীমা কোম্পানী ও ব্যাংকগুলি সরকারী ঋণপত্রে টাকাকড়ি খাটাইতে বাধ্য হয়। সুতরাং যোগান অধিক বলিয়া সরকারী ঋণের সুদের হার কম হয়।

কৃষকদের বেলায় অবস্থা ঠিক বিপরীত। তাহাদের ঋণের চাহিদা প্রচুর। কিন্তু গ্রামে ঋণ দিবার মত সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ অল্প। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে মহাজনই হইল ঋণপ্রদানের প্রধান সূত্র। দ্বিতীয়ত, দরিদ্র কৃষককে ঋণ দেওয়ার মধ্যে অনেক ঝুঁকি থাকে। শস্যের ফলন ভাল হইলে ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা থাকে, না-হইলে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা কম হয়। অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়া কৃষকরা ধার লইবার সময় কোন জামিন বা বন্ধক দিতে পারে না। সমবায় সমিতির ঋণ,

তাকাভি ঋণ বা জমিবন্ধকী ব্যাংক হইতে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণও অতি অল্প বলিয়া মহাজনরা অতি উচ্চ হারে স্থদ দাবি করে এবং কৃষকদের প্রয়োজন বেশী বলিয়া উহা দিতে বাধ্য হয়।

সহরের ব্যাংকগুলি শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীকে যে স্বল্পমেয়াদী ধার দেয় তাহার জন্য জামিন রাখিয়া দেয়; এইজন্য ঋণের ঝুঁকি বিশেষ থাকে না। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ীদের আয় কৃষকদের আয়ের মত অতটা অনিশ্চিত নয়; সুতরাং মূলধন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম। এই সকল কারণে সহরের ব্যাংকগুলি মহাজনদের তুলনায় অনেক কম স্থদে টাকা ধার দেয়।

১৯ | মুনাফা
(Profit)

মুনাফার প্রকৃতি (Nature of Profit)

উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয় হইতে মুনাফা একটু পৃথক প্রকৃতির। প্রথমত, মুনাফা হইল পরিচালনা ও ঝুঁকি বহনের জন্য সংগঠকের পুরস্কার বা দাম। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের দাম চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট থাকে। জমির মালিক কত খাজনা পাইবে, শ্রমিক কত মজুরি পাইবে এবং মূলধন সরবরাহকারী কত সুদ পাইবে তাহা এই সকল ব্যক্তি ও সংগঠকের মধ্যে পূর্ব চুক্তি অনুসারে নির্ধারিত থাকে। কিন্তু সংগঠকের পুরস্কার এইভাবে কোনমতে নির্দিষ্ট থাকে না।

দ্বিতীয়ত, জমি (কাঁচামাল ও খাজনা), শ্রমিক ও মূলধন সরবরাহকারীর প্রাপ্য মিটাইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তাহাই মুনাফা হিসাবে পরিগণিত হয়। এই কারণে মুনাফা একেবারে শূন্য হইতে পারে, অথবা ঋণাত্মক (negative) হইতে পারে। খাজনা মজুরি বা সুদ কিন্তু কখনই ঋণাত্মক হয় না।

তৃতীয়ত, খাজনা মজুরি ও সুদের হারে সহসা খুব বেশী পরিবর্তন হয় না, কিন্তু মুনাফার হারে অত্যধিক পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়। এক বৎসর হয়ত মুনাফা প্রচুর হইল, পরের বৎসর প্রচুর ক্ষতি হইল—এইরূপও দেখা যায়।

মোট ও নীট মুনাফা (Gross and Net Profit)

ব্যবসায়-সংগঠক প্রাপ্ত আয় হইতে খাজনা মজুরি ও সুদ চুকাইয়া দিয়া যে-অর্থ পুরস্কার বা সংগঠন পরিচালনার দাম বলিয়া দাবি করে তাহাকে মুনাফা বলে। অনেক সময় সংগঠক নিজের জমিতে উৎপাদন করে এবং নিজেই উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে ও মূলধন নিয়োগ করে। সেক্ষেত্রে মজুরি বাদ দিয়া আয়ের সবটাই সে মুনাফা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কারণ, নিজের জমি ও মূলধন বলিয়া খাজনা ও সুদ পরকে দিতে হয় না। এই মুনাফাকে মোট মুনাফা (Gross Profit) বলা হয়। কিন্তু জমি ও মূলধন নিজেরই হউক বা পরেরই হউক মোট মুনাফা হইতে নির্দিষ্ট হারে খাজনা মজুরি ও সুদ বাদ দিলে যে-উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকে নীট মুনাফা (Net Profit) বলা হয়। নীট মুনাফার মধ্যে নিম্নোক্ত উপাদানগুলি থাকে।

(ক) সংগঠক ব্যবসায়ে স্বয়ং পরিশ্রম করার জন্য পারিশ্রমিক দাবি করে। এই ধরনের শ্রমের জন্য লোক রাখিতে হইলে তাহাকে মজুরি দিতে হইত, অথবা সংগঠক যদি অন্যত্র কাজ করিত তাহা হইলেও সে পারিশ্রমিক পাইত। সুতরাং সংগঠকের নিজের শ্রমের মজুরি হইল মুনাফার একটি উপাদান।

(খ) সংগঠকের সর্বপ্রধান কার্য ঝুঁকি বহন করা। 'হয় রাজা নয় ফকির' হইবার সম্ভাবনা সকল ব্যবসায়ে অল্পবিস্তর আছেই। সংগঠকের যেমন লাভের আশা আছে তেমনি লোকসানের আশংকাও আছে। এই ঝুঁকিবহনের জন্য সে যে-অর্থ দাবি করে তাহাই মুনাফার প্রধান অংশ। অর্থাগমের আশা না থাকিলে কেহই ঝুঁকি লইতে স্বীকৃত হইত না।

(গ) অনেক সময় একচেটিয়া বা আংশিক একচেটিয়া কারবার থাকিলে সংগঠক অধিক মুনাফার আশা করে। এই ধরনের মুনাফাকে 'একচেটিয়া কারবারের মুনাফা' বলা হয়। বাস্তব জগতে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বিরল বলিয়া অধিকাংশ ব্যবসায়ের মধ্যে 'একচেটিয়া মুনাফা'র অংশ অল্পবিস্তর আছেই।

(ঘ) অনেক সময় হঠাৎ সুযোগ আসিলে সংগঠকরা 'বেশ মোটা' লাভ করিয়া থাকে। বর্তমানে অনেক জিনিসের আমদানী বন্ধ হওয়ায় যাহাদের নিকট ঐ জিনিস পূর্ব হইতেই মজুত করা আছে, তাহারা অচিন্তনীয় মুনাফা করিতেছে। গত যুদ্ধের সময় ১ পাউণ্ড কুইনাইন অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। এই ধরনের মুনাফাকে আকস্মিক মুনাফা (windfall profit) বলা হয়।

স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit)

স্বাভাবিক মুনাফার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। সংগঠকের পক্ষে পরিচালনার পারিশ্রমিক ও ব্যবসায় বা উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করিবার পুরস্কারকে স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অল্পদিনের জন্য সে বেগার খাটিতে পারে, ভবিষ্যৎ লাভের আশায় উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের কথা ধরিলে প্রত্যেক ব্যবসায়ী ঝুঁকিবহন ও পরিশ্রম বাবদ কিছু মুনাফা অর্জন করিবেই। নচেৎ সে ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিবে।

জাতীয় আয়

২০ | জাতীয় আয়
(National Income)

জাতীয় আয় বা বণ্টনযোগ্য জাতীয় লভ্যাংশ কাহাকে বলে ? (What is National Income or National Dividend ?)

ইতিমধ্যেই আমরা দেখিয়াছি যে উৎপাদনের উপাদানসমূহ পরস্পরের সহায়তায় জাতীয় আয় সৃষ্টি করে এবং নীট জাতীয় আয়ই তাহাদের মধ্যে খাজনা মজুরি সুদ ও মুনাফা হিসাবে বণ্টিত হয় (১৫৩ পৃষ্ঠা)। বস্তুত, উৎপাদন হইতেই জাতীয় আয় সৃষ্ট হয়। দেশের বিভিন্ন দিকে এই উৎপাদনকার্য অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে। জমিতে কৃষিকার্য হইতেছে, কলকারখানায় বিভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, খনি হইতে খনিজ পদার্থ উত্তোলন করা হইতেছে, শিক্ষক শিক্ষাদান করিতেছেন, উকিল-মোক্তার মামলা লড়িতেছেন, পুলিস-চৌকিদার শান্তিশৃংখলা রক্ষা করিতেছে। এইরূপ বহুমুখী কর্ম-প্রচেষ্টার ফলে মানুষের অভাবপূরণের বহু রকমের উপকরণ উৎপন্ন হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি হইল বস্তুগত দ্রব্য আর কতকগুলি অ-বস্তুগত দ্রব্য বা সেবা। ইহাদের অর্থমূল্যের সমষ্টিই জাতীয় আয়। অতএব, জাতীয় আয় হইল কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (সাধারণত এক বৎসরের মধ্যে) দেশে উৎপন্ন সমগ্র দ্রব্য ও সেবার (নীট) অর্থমূল্য।

উৎপাদনের পরিবর্তে আয়ের দিক হইতেও জাতীয় আয়কে দেখা যাইতে পারে। যাহারা উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে তাহাদের হস্তেই উৎপন্ন দ্রব্য আয় হিসাবে গিয়া পৌছায়। কোন কারখানায় উৎপাদনকার্যের ফলে যে-আয় হয় তাহার একাংশ পায় জমির মালিক খাজনা হিসাবে, একাংশ শ্রমিকরা পায় মজুরি হিসাবে, একাংশ যায় মূলধন-সরবরাহকারীদের নিকট সুদ হিসাবে এবং বাকিটা সংগঠক মুনাফা হিসাবে ভোগ করে। এইভাবে কলকারখানা ক্ষেতখামার খনি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন-কার্যে অংশগ্রহণ করিয়া দেশের লোক খাজনা মজুরি সুদ ও মুনাফা অর্জন করিতেছে। দেশের সমস্ত লোকের অর্জিত আয়কে যোগ দেওয়া হইলে দেশের সামগ্রিক বা জাতীয় আয় পাওয়া যাইবে। ইহাকে বণ্টনযোগ্য জাতীয় লভ্যাংশও (National Dividend) বলা হয়। কারণ, কোম্পানীর নীট আয় যেমন লভ্যাংশ হিসাবে অংশীদারদের মধ্যে বণ্টিত হয় তেমনি জাতীয় উৎপাদনের নীট অংশও উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে খাজনা সুদ ইত্যাদি হিসাবে বণ্টিত হয়।

আবার লোকে যাহা আয় করে তাহার একাংশ ভোগ এবং অপরাংশ সঞ্চয় করে। সুতরাং দেশের সকল লোকের ভোগ ও সঞ্চয় যোগ দিলেও জাতীয় আয়ের হিসাব পাওয়া যাইবে।

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, একদল স্কুলের ছাত্র শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে সন্দেশ আম ও কেক লইয়া পিকনিক করিতে গেল। তাহারা কত সন্দেশ আম ও কেক লইয়া গিয়াছিল তাহা তিনটি উপায়ে জানা যাইতে পারে। প্রথমত, আমরা সন্দেশ ও কেকের দোকান এবং আমওয়ালার নিকট হইতে সংবাদ লইতে পারি যে তাহারা কত কত সন্দেশ কেক ও আম সরবরাহ করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি যে কয়টি করিয়া সন্দেশ আম ও কেক পাইয়াছে। তৃতীয়ত, তাহাদের ইহাও জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাহারা কে কয়টি আম সন্দেশ ও কেক খাইয়াছে এবং কে কয়টি পকেটে পুরিয়া লইয়া আসিয়াছে। এই তিন প্রকার অনুসন্ধানের ফল একই হইবে।

প্রথম পদ্ধতিতে জাতীয় আয়ের হিসাব করা হইলে—অর্থাৎ এক বৎসরে দেশে সমগ্র উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবার অর্থমূল্যের সমষ্টি গণনা করা হইলে—উহাকে উৎপাদন-পদ্ধতি (The 'Output' Method) বলা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে হিসাব করা হইলে—অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদানসমূহের বার্ষিক আয় যোগ দেওয়া হইলে—উহাকে আয়-পদ্ধতি (The 'Incomes Received' Method) বলা হয়। তৃতীয় পদ্ধতিতে হিসাব করা হইলে—অর্থাৎ বৎসরে দেশের মোট ভোগ ও বিনিয়োগ বা সম্পদসৃষ্টি কত হইয়াছে তাহার সমষ্টি গণনা করা হইলে—উহাকে ভোগ-সহ-বিনিয়োগ পদ্ধতি (The 'Consumption-*plus*-Investment' Method) বলা হয়। অবশ্য যে-পদ্ধতিই অনুসৃত হউক না কেন ফল একই পাওয়া যাইবে।

জাতীয় আয়ের গণনা (Measurement of National Income)

এইভাবে জাতীয় আয় হিসাব করার পদ্ধতি তিনটি হইলেও সাধারণত প্রথম দুইটি পদ্ধতিই—উৎপাদন-পদ্ধতি ও আয়-পদ্ধতি অনুসৃত হয়। এখন পদ্ধতি দুইটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা যাইতে পারে।

১। **উৎপাদন-পদ্ধতি (The 'Output' Method) :** উৎপাদন-পদ্ধতিতে 'নীট জাতীয় উৎপাদনে'র (Net National Product) অর্থমূল্যের হিসাব করা হয়। এই 'নীট' শব্দটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। দেশে বৎসরে যে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং সেবামূলক কার্যাদি সম্পাদিত হয় তাহাদের অর্থমূল্যের সমষ্টিকে বলা হয় 'মোট জাতীয় উৎপাদন' (Gross National Product বা সংক্ষেপে GNP)। ঐ সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইবার ফলে কলকারখানা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূলধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা না করিলে উৎপাদন একদিন কমিয়া যাইবে। অতএব, মূলধন-দ্রব্যকে অটুট রাখিয়াই বৎসরের উৎপন্নের

হিসাব করিতে হইবে। এইজন্য দেখা যায় যে কারখানার মালিক প্রভৃতি প্রত্যেক বৎসর ক্ষয়ক্ষতি বাবদ আলাদাভাবে আয়ের একাংশ 'অবপূর্তি তহবিলে' (depreciation fund) জমা রাখে। একটি সেলাই-কলের দাম যদি ৩০০ টাকা হয় এবং কলটি যদি ১০ বৎসর চলে তবে দরজীর দোকানের মালিকের পক্ষে বৎসরে ৩০ টাকা করিয়া জমা রাখা উচিত। নচেৎ ১০ বৎসর পরে তাহাকে সেলাই-কলের অভাবে দোকান বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এইভাবে বৎসরে মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে ঐ সময়ে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ অর্থ বাদ দিয়া জাতীয় উৎপাদনের হিসাব করা হইলে তাহাকেই বলা হয় 'নীট জাতীয় উৎপাদন' (Net National Product বা সংক্ষেপে NNP)। সংক্ষেপে নীট জাতীয় উৎপাদনকে নিম্নে ছকের সাহায্যে দেখান হইল।

মোট জাতীয় উৎপাদন
GROSS NATIONAL PRODUCT বা GNP

↓

হইতে মূলধনের অবপূর্তি বা বিনাশ বাদ দিলে পাওয়া যায়

↓

নীট জাতীয় উৎপাদন
NET NATIONAL PRODUCT বা NNP

এই নীট জাতীয় উৎপাদনই খাজনা মজুরি সুদ ও মুনাফা হিসাবে উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়, মোট জাতীয় উৎপাদন নহে।

উৎপাদন-পদ্ধতিতে জাতীয় আয় গণনা করিবার সময় আরও দুইটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে: (ক) যে-সকল দ্রব্য ও সেবা বাজারে বিক্রীত হয় না, উৎপাদকগণ যাহাদের নিজেরাই ভোগ করে তাহাদের অর্থমূল্যও সাধারণত জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে। যেমন, আমাদের দেশে কৃষকেরা উৎপন্ন শস্যের একাংশ বিক্রয় না করিয়া নিজেরাই ভোগ করে বা অনেকেই নিজের বাড়ীতে বসবাস করে। এইরূপ ক্ষেত্রে ঐ শস্যের এবং ঐ বাড়ীর আশ্রয়দানের অর্থমূল্য হিসাব করিয়া উহাকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। অবশ্য আমরা নিজেরাই যে-সকল কাজ করিয়া

লই—যেমন, মুচি না ডাকিয়া নিজের জুতায় কালি দিয়া থাকি—তাহার হিসাব ধরা হইবে না, কারণ উহার অর্থমূল্য নির্ধারণ করা কঠিন। (খ) জাতীয় আয় পরিমাপের সময় একই দ্রব্যের অর্থমূল্য যাহাতে দুইবার গণনা করা না হয় তাহা দেখিতে হইবে। যেমন, কাপড়ের দামের মধ্যেই কাপড় তৈয়ারির সুতার দাম রহিয়া গিয়াছে বলিয়া কাপড়ের দামের সহিত আবার সুতার দাম পৃথকভাবে যোগ দেওয়া চলিবে না। এইজন্য উৎপাদন-পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হিসাবের সময় চূড়ান্ত বা সম্পূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্যের (final product) অর্থমূল্যই ধরা হয়, অর্ধসমাপ্ত দ্রব্য বা কাঁচামালের অর্থমূল্য ধরা হয় না।

২। **আয়-পদ্ধতি (The 'Incomes Received' Method):** বলা হইয়াছে, নীট জাতীয় উৎপাদনই উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে তাহাদের আয় হিসাবে বন্টিত হয়। ইহাকে বণ্টনযোগ্য জাতীয় আয় বা জাতীয় লভ্যাংশ (National Dividend) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে জাতীয় আয়ের হিসাব করিবার সময় একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে: যাহার সহিত উৎপাদনকার্যের কোন সম্পর্ক নাই সেরূপ আয়কে হিসাবে ধরা হইবে না। এইজন্য হস্তান্তর-পাওনাকে হিসাবের বাহিরে রাখা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি বৎসরে ২০০০ টাকা আয় করিয়া তাহা হইতে ১০০ টাকা কোন আত্মীয়কে সাহায্য করে তবে আত্মীয়ের সাহায্যস্বরূপ প্রাপ্তি ঐ ১০০ টাকাকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না। অনুরূপভাবে সরকার যুদ্ধ-পরিচালনার জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়া ঋণদাতাদের যে-সুদ দেয় তাহাকেও জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলিবে না। কারণ, এই সুদ উৎপাদনকার্যে মূলধন সরবরাহের জন্য সুদ নহে, ইহার ফলে জাতীয় উৎপাদন কোনপ্রকার বৃদ্ধি পায় নাই।

ভারতের জাতীয় আয় (National Income of India)

১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত ভারতের জাতীয় আয়ের প্রাথমিক হিসাব (preliminary estimates) পাওয়া গিয়াছে।* হিসাবটি হইতে দেখা যায় যে ঐ ১৯৬৪-৬৫ সালে মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ১৫,০৫০ কোটি টাকা। মোট জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দিয়া ভাগ দিলে গড় বা মাথাপিছু জাতীয় আয় (*Per Capita* National Income) পাওয়া যায়। ১৯৬৪-৬৫ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় বা প্রত্যেক ভারতবাসীর গড় আয় ছিল ৩১৭ টাকা। ১৯৫০-৫১ সালে বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সুরুর ঠিক পূর্বে ভারতের মোট জাতীয় আয় ছিল ৮৮৫০ কোটি টাকা এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ২৪৭·৫০ টাকা। অতএব, ১৯৬৪-৬৫ সালের প্রাথমিক

---

* ১৯৬৫-৬৬ সালের প্রাথমিক হিসাবও (provisional estimates) প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্ট আকারে ১৮৮ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

হিসাব হইতে দেখা যায় যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীন প্রথম চৌদ্দ বৎসরে মোট জাতীয় আয় প্রায় ৭০ শতাংশ এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভারতের জাতীয় আয়ের গতি ও প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য নিম্নে ছকটি দেওয়া হইল।

নিম্নের ছকটি হইতে দেখা যাইতেছে যে ভারতের জাতীয় আয় প্রধানত চারিটি সূত্র হইতে অর্জিত হয়—যথা, (১) কৃষি ও অনুরূপ কার্য, (২) খনি এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প, (৩) ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ এবং (৪) অন্যান্য সেবামূলক কার্য। বিদেশ হইতে অর্জিত নীট আয় ধনাত্মক (positive) নহে, ঋণাত্মক (negative)। সুতরাং ইহাকে জাতীয় আয়ের অন্যতম সূত্র বলিয়া গণ্য করা চলে না। এখন সূত্রগুলির সামান্য ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীন প্রথম চৌদ্দ বৎসরে (১৯৫১-৬৫ সাল)
ভারতের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি
(হিসাব কোটি টাকায়—১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে)

জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান সূত্র	১৯৫০-৫১ সাল (ভিত্তি বৎসর)	১৯৬৪-৬৫ সাল	শতকরা বৃদ্ধি
১। কৃষি ও অনুরূপ কার্য	৪৩৪০	৬৫০০	
২। খনি এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প	১৪৮০	২৫৫০	
৩। ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ	১৬৬০	২৯৭০	
৪। অন্যান্য সেবামূলক কার্য	১৩৯০	৩১৪০	
৫। বিদেশ হইতে অর্জিত নীট আয়	−২০	−১১০	
মোট	৮৮৫০	১৫,০৫০	৭০
মাথাপিছু আয় (টাকা)	২৪৭·৫০	৩১৭·০০	২৮

কৃষি ও অনুরূপ কার্য বলিতে বুঝায় কৃষিকার্য, পশুপালন, মৎস্যের চাষ, অরণ্যজাত দ্রব্য উৎপাদন ইত্যাদি। এইগুলিই সামগ্রিকভাবে ভারতের জাতীয় আয়ের সর্বপ্রধান সূত্র। মোট জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৪৩-৪৪ ভাগ এই সূত্র হইতেই অর্জিত হয়। ভারত যে কৃষিপ্রধান দেশ ইহা তাহারই পরিচায়ক।

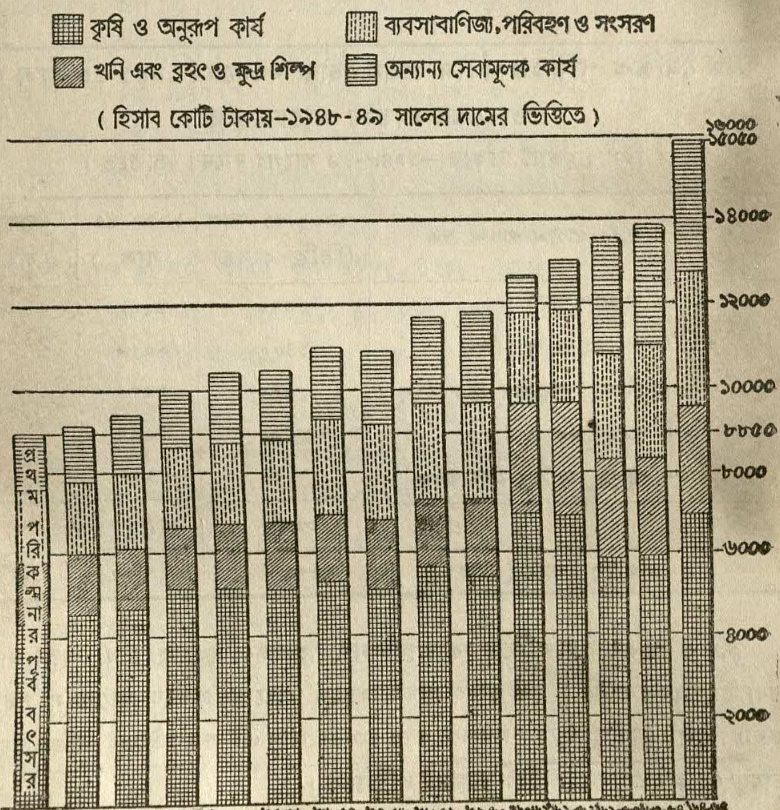
জাতীয় আয়ের দ্বিতীয় প্রধান সূত্র হইল খনিজ দ্রব্য উৎপাদন এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প। এই সূত্র হইতে মোট শতকরা ১৬-১৭ ভাগের মত জাতীয় আয় অর্জিত হয়।

ভারত যে শিল্পে অনুন্নত দেশ তাহা ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায়। তবে শিল্প-প্রসারের ফলে এই সূত্র হইতে আয়ের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

জাতীয় আয়ের তৃতীয় সূত্র হইল ব্যবসাবাণিজ্য (Commerce), পরিবহণ ও সংসরণ (Transport and Communication)। ইহা হইতে আয়ের পরিমাণ সামান্য বেশী—মোট শতকরা ১৯-২০ ভাগের মত।

অন্যান্য সেবামূলক কার্য বলিতে বুঝায় ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি বিভিন্ন পেশা এবং সকল প্রকারের চাকরি ইত্যাদি। এই সূত্র হইতে আয়ের পরিমাণ ঐ তৃতীয় সূত্রেরই মত শতকরা ২০-২১ ভাগ।

ভারতের জাতীয় আয়ের গতি



নিম্নের ছকটিতে ভারতের মোট জাতীয় আয়ে বিভিন্ন সূত্রের অংশ (শতকরা ভাগ) একসংগে দেখান হইল।

জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান সূত্র	১৯৫০-৫১ সাল	১৯৬৪-৬৫ সাল
১। কৃষি ও অনুরূপ কার্য	৫১	৪৩
২। খনি এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প	১৬	১৭
৩। ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ	১৮	১৯
৪। অন্যান্য সেবামূলক কার্য	১৫	২১
	১০০	১০০

ভারতের জাতীয় আয় হইতে কি জানা যায়ঃ উপরের ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে, মোট জাতীয় আয়ে কৃষি ও অনুরূপ কার্যের অংশ হ্রাস পাইয়া খনি ও শিল্পের অংশ কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশে যে শিল্পপ্রসার ঘটিতেছে ইহা তাহাই নির্দেশ করে। তবুও মোট জাতীয় আয় অর্জনে কৃষি ও অনুরূপ কার্যেরই প্রাধান্য রহিয়াছে এবং শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতির অংশ অতি সামান্য। ইহা জীবনযাত্রার নিম্ন মানেরই লক্ষণ।

ভারতে জীবনযাত্রার মান বা স্তর যে বিশেষ নিম্ন এবং উহার উন্নয়নের গতি যে অতি মন্থর তাহা মাথাপিছু আয়ের দিকে লক্ষ্য করিলেই অতি সহজে বুঝা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে (১৯৬০-৬১ সাল) ভারতে মাথাপিছু বা গড় আয় ছিল মাত্র ২৯৩ টাকা। তুলনায় ঐ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডে মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ৯৮০০ টাকা ও ৪৩০০ টাকার মত। উপরন্তু, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাধীন সময় হইতে জাতীয় আয় বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু মাথাপিছু আয়ের সম্প্রসারণ ততটা দ্রুত হারে হইতেছে না। ১৮৫ পৃষ্ঠার ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীন প্রথম চৌদ্দ বৎসরে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল শতকরা ৭০ ভাগ, কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুন মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল মাত্র শতকরা ২৮ ভাগ। অতএব, মাথাপিছু আয় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে—(১) জাতীয় আয়বৃদ্ধির হারকে আরও বাড়াইতে হইবে এবং (২) সংগে সংগে জনসংখ্যাকেও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত না হইলে বর্ধিত জাতীয় আয় বর্ধিত জনসংখ্যাকে খাওয়াইতে পরাইতেই ব্যয় হইয়া যাইবে, লোকের জীবনযাত্রার মানে কোন উন্নতি দেখা দিবে না।

পরিশিষ্ট

১৯৬৫-৬৬ সালে ভারতের জাতীয় আয়—প্রাথমিক হিসাব (India's National Income in 1965-66—Provisional Estimates)

(হিসাব কোটি টাকায়—১৯৬০-৬১ সালের দামের ভিত্তিতে)*

১। কৃষি ও অনুরূপ কার্য	৬৭০৪
২। খনি এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প	৩৬৫৫
৩। ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ	২৪৪৭
৪। অন্যান্য সেবামূলক কার্য	২৭৪৭
৫। বিদেশ হইতে অর্জিত নীট আয়	−১১২
মোট	১৫,৪৪১

* বর্তমানে ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব করা হইতেছে ১৯৬০-৬১ সালের দামের ভিত্তিতে।

পৌরবিজ্ঞান

১

পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি

(Subject Matter and Scope of Civics)

ভূমিকা

বর্তমানে আমরা সভ্য সমাজে বাস করিয়া সুশৃংখল জীবন যাপন করি। আহারের জন্য আমাদের প্রত্যেককে খাদ্য উৎপাদন করিতে হয় না, পরিধানের জন্য পোশাক তৈয়ারি করিতে হয় না। চালডাল তরিতরকারি মাছমাংস জামাকাপড় বাজার হইতে কিনিয়া লইলেই হইল। বর্তমানে দেশের এক অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে অন্য অঞ্চল হইতে খাদ্য সরবরাহ করা হয়; সারা দেশ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইলে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করা হয়। ইহাতেও না কুলাইলে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দের (food control and rationing) ব্যবস্থা করা হয়।

আমাদের যাতায়াতের জন্য মোটরবাস রেলগাড়ী ট্রামগাড়ী প্রভৃতি যানবাহন নিয়মিত চলিতেছে, আমাদের শিক্ষার জন্য স্কুলকলেজ খোলা আছে, চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা আছে। আবার চোরডাকাত প্রভৃতি দুষ্কর্মকারীর হাত হইতে আমাদের রক্ষা করিবার জন্য পুলিস আদালত জেল প্রভৃতি আছে, দেশকে অন্য দেশের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সৈন্যবাহিনী আছে, ইত্যাদি।

এই সকলের ফলে আমরা শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বাস করিয়া থাকি। কিন্তু চিরকালই এই অবস্থা ছিল না। এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে দীর্ঘদিন ধরিয়া, অতি ধীরে ধীরে। এমন একদিন ছিল যখন মানুষ দলবদ্ধভাবে বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে ফলমূল আহরণ এবং মৎস্য ও পশুপক্ষী শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যাহা সংগৃহীত হইত প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্য হইলেও দলের সকলে মিলিয়া তাহা সমভাবে ভোগ করিত। মানুষের যে-কোন সংঘবদ্ধ অবস্থাকেই সমাজ আখ্যা দেওয়া যায় বলিয়া এই অবস্থাতেও মানুষ সমাজবদ্ধ ছিল বলা যায় এবং এই সমাজ ছিল সমভোগী সমাজ।

তারপর যত দিন যাইতে লাগিল মানুষ পশুপালন, কৃষিকার্য ও উৎপাদনের অন্যান্য কলাকৌশল শিখিল। ইহার ফলে আদিম সমাজগুলির মধ্যে দেখা দিল এক বিরাট পরিবর্তন। লোকে কৃষিকার্যের জন্য একস্থানে বসবাস করিতে বাধ্য হওয়ায় গ্রাম-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিল এবং কৃষিজমি, গৃহপালিত পশু, ইত্যাদি নিজের বলিয়া মনে করিতে সুরু করায় ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির (private property) উদ্ভব হইল। সমভোগী সমাজ আর রহিল না। তখন এক জনগোষ্ঠী আর এক জনগোষ্ঠীর পশু,

শস্য ও অন্যান্য সম্পদ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করায় দেখা দিল যুদ্ধবিগ্রহ। গ্রামীণ সমাজের মধ্যেও জমিজমা ইত্যাদি লইয়া বিভিন্ন লোকের মধ্যে ঝগড়াবিবাদের সৃষ্টি হইতে লাগিল। সুতরাং তখন প্রয়োজন হইয়া পড়িল যুদ্ধ-পরিচালনা ও ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য একটি বিশেষ কর্তৃত্বের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুদ্ধনায়কগণ এই কর্তৃত্ব অধিকার করিয়া কায়েম হইয়া বসিলেন এবং ক্রমে যুদ্ধনায়কগণ রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং তাঁহাদের অধীনে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল।

পৌরবিজ্ঞান (Civics)

তারপর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে; সমাজ ও রাষ্ট্র বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। আজ মানুষ কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক; আবার সে শ্রমিক সংঘ, সাহিত্য সভা, ফুটবল ক্লাব প্রভৃতির ন্যায় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনেরও সদস্য। তাহার সুখদুঃখ, আশা-আকাংক্ষা রাষ্ট্র ও সামাজিক সংগঠনসমূহের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সদস্য হিসাবে মানুষের আচরণই আমাদের আলোচ্য বিষয়। যে-শাস্ত্র এই আলোচনা করে ইংরাজীতে তাহাকে 'সিভিক্‌স' (Civics) এবং বাংলায় 'পৌরবিজ্ঞান' বলা হয়।

অর্থ ও বিষয়বস্তু (Meaning and Subject Matter)

ইংরাজী 'সিভিক্‌স' (Civics) শব্দটি দুইটি ল্যাটিন শব্দ হইতে আসিয়াছে—যথা, সিভিটাস্ (civitas) এবং সিভিস (civis)। সিভিটাস্ শব্দের অর্থ 'নগর-রাষ্ট্র' এবং সিভিস শব্দের অর্থ 'নাগরিক'। সুতরাং ইংরাজী শব্দগত অর্থে সিভিক্‌স বলিতে বুঝায় রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পর্কিত বিষয়সমূহের পর্যালোচনা।

নাগরিককে বাংলায় 'পুরবাসী' বলিয়া অভিহিত করা হয়। সুতরাং বাংলা শব্দগত অর্থে পৌরবিজ্ঞান হইল পুরবাসীর আচরণের শাস্ত্র বা বিজ্ঞান।

শাস্ত্র হিসাবে পৌরবিজ্ঞান অতি পুরাতন। প্রাচীন ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য দেশ এই শাস্ত্রের বেশ কিছু চর্চা করিয়াছিল; তবে সুসম্বদ্ধভাবে ইহার আলোচনা করে প্রথমে প্রাচীন গ্রীস এবং পরে প্রাচীন রোম। এই গ্রীক ও রোমকদের শাস্ত্রই উত্তরাধিকারসূত্রে আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেও বর্তমান দিনে পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র পূর্বাপেক্ষা ব্যাপকতর হইয়াছে। ইহার কারণ, প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন রোমের নাগরিক-জীবন এবং বর্তমান দিনের নাগরিক-জীবনের মধ্যে হইল আকাশ-পাতাল তফাত।

গ্রীক ও রোমক যুগে পুরবাসী বা নাগরিকের জীবনের একটিমাত্র দিক ছিল। নাগরিক তখন ছিল মাত্র রাষ্ট্রেরই সভ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল রাষ্ট্র একটিমাত্র

নগর লইয়াই গঠিত হইত এবং রাষ্ট্র (State) ও সমাজ (society) আজিকার দিনের মত পরস্পর হইতে পৃথক ছিল না, সম্পূর্ণ একই ছিল। ঐরূপ রাষ্ট্রকে 'নগর-রাষ্ট্র' (city State) বলা হয়। নগর-রাষ্ট্র ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন, ব্যবসাবাণিজ্য, শিক্ষা, আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি সকল কিছুরই ব্যবস্থা করিত—নাগরিকগণকে নিজেদের কিছু করিতে হইত না। সুতরাং তখন ব্যক্তিকে একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে দেখাই যথেষ্ট ছিল। এই কারণে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও কার্যাবলী, রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক হিসাবে ব্যক্তির আচরণ এবং রাষ্ট্র ও নাগরিক উভয়ের সহিত সম্পর্কিত সমস্যাসমূহের পর্যালোচনাই ছিল পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

কিন্তু আজিকার দিনের রাষ্ট্রগুলি প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স বা স্পার্টার ন্যায় ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র নয়, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় বৃহৎ 'জাতীয় রাষ্ট্র' (Nation States)। এইরূপ জাতীয় রাষ্ট্র নাগরিকগণের জন্য সকল ব্যবস্থাই করিতে পারে না। তাই তাহাদিগকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও আত্মবিকাশের জন্য পৌরসভা ও গ্রাম-পঞ্চায়েতের ন্যায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সংঘ ও বণিক সমিতির ন্যায় অর্থনৈতিক সংস্থা, সাহিত্য সভা ও কলা পরিষদের ন্যায় সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রভৃতি গড়িয়া তুলিতে হয়। সুতরাং পরিবর্তিত অবস্থায় পৌরবিজ্ঞান এই সকল প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবেও মানুষের আচরণের পর্যালোচনা করে। অর্থাৎ, রাষ্ট্র ও সমাজের সভ্য হিসাবে নাগরিকের কাজকর্ম পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু, বর্তমান যুগের নাগরিক বৃহত্তর মানব-সমাজের সভ্য হিসাবে বিশ্বের সমস্যা লইয়াও বিব্রত। ফলে ইহাদের আলোচনাও পৌরবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি (Scope of the Study of Civics)

উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, বর্তমানে পৌরবিজ্ঞান চারিটি দিক হইতে নাগরিকের আচরণের পর্যালোচনা করে—যথা, (১) রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে, (২) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে, (৩) বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার সদস্য হিসাবে, এবং (৪) বৃহত্তর মানব-সমাজের সভ্য হিসাবে। পৌরবিজ্ঞানের পরিধি (scope) সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিবার জন্য নাগরিক-জীবনের এই সকল দিক সম্বন্ধে আরও কিছুটা আলোচনা করা হইতেছে।

ক। **রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে নাগরিক :** প্রত্যেক নাগরিকই কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য—ইহাতে তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন নাই। যেমন, আমরা সকলেই ভারত-রাষ্ট্রের সভ্য, মার্কিনীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভ্য, ইত্যাদি। রাষ্ট্রই সুশৃংখল সমাজজীবন সম্ভব করিয়া নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ করিয়া তাহাকে আত্মবিকাশের

সুযোগ প্রদান করে। সুতরাং রাষ্ট্রের সমস্যা হইল নাগরিকের প্রাথমিক সমস্যা, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য তাহার পক্ষে প্রাথমিক কর্তব্য। দেশ সুশাসিত হইলে তবেই নাগরিক ভালভাবে বাঁচিতে পারে—সে তাহার জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক দিকসমূহের বিকাশের সুযোগ পাইতে পারে। সুতরাং পৌরবিজ্ঞানে প্রথমেই রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে নাগরিকের আচরণের পর্যালোচনা করা হয়।

খ। **স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে নাগরিক :** নাগরিক-জীবনের উপর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাবও কম নহে। দেশব্যাপী রেল-ধর্মঘট, ডাক ধর্মঘট আমাদের বিশেষ বিব্রত করিয়া তুলে। পৌর-কর্মচারিগণের ধর্মঘটও আমাদের কম বিব্রত করে না। উপরন্তু, বর্তমান যুগে পঞ্চায়েত মিউনিসিপ্যালিটি করপোরেশন প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান নাগরিকতার প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে কার্য করে। এই সকল স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যার সমাধান করিয়া নাগরিক এই শিক্ষালাভ করে যে, কিভাবে পরস্পরের সমবায়ে সাধারণ সমস্যার সমাধান করিতে হয়—সাধারণের কার্য সম্পাদন করিতে হয়। এইভাবে গড়িয়া উঠে দায়িত্ববোধ ও আত্মনির্ভরশীলতা। তখন নাগরিক বৃহত্তর জাতীয় দায়িত্বপালনের উপযোগী হইয়া উঠে। এই কারণে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে আলোচনা নাগরিকের শাস্ত্র পৌরবিজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গ। **অন্যান্য সামাজিক সংস্থার সদস্য হিসাবে নাগরিক :** তৃতীয়ত, বর্তমান দিনে নাগরিক সাহিত্য সভা, সংগীত একাডেমী, সেবা সমিতি, বণিক সমিতি, শ্রমিক সংঘ, ধর্ম সংস্থা প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। রাষ্ট্র ও স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও ইহাদের মাধ্যমে নাগরিক তাহার জীবনকে বিকশিত করিতে সচেষ্ট হয়। সুতরাং এই সকল সংঘের সভ্য হিসাবে নাগরিকের আচরণের পর্যালোচনা না করিলে পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

ঘ। **বৃহত্তর মানব-সমাজের সভ্য হিসাবে নাগরিক :** পরিশেষে, নাগরিক-জীবনের উপর আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহের প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, গমনাগমনের সুযোগসুবিধা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের ফলে কোন দেশই আজ অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে পারে না। ফলে পৃথিবীর কোন স্থানে যুদ্ধবিগ্রহ সুরু হইলে অন্যান্য দেশের লোকও চিন্তিত হইয়া পড়ে। তাহাদের ভয় হয়, এ-যুদ্ধ হয়ত ছড়াইয়া পড়িবে, এ-যুদ্ধ হইতেই হয়ত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হইবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে আণবিক ও পারমাণবিক বোমা ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে হয়ত সমগ্র পৃথিবীই ধ্বংস হইয়া যাইবে। আবার শুধু যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ধ্বংসের কথাও নয়।

বর্তমানে আমরা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি নানা দেশ হইতে সাহায্য পাইতেছি। যদি কোন কারণে এই সকল সাহায্য বন্ধ হয় তবে আমাদের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হয়ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে; ফলে দৃষ্টির সম্মুখ হইতে মুছিয়া যাইবে উন্নততর জীবনযাত্রার চিত্র। তাই আমরা মার্কিন সাহায্যদান লইয়া জল্পনাকল্পনা করি, পৃথিবীর যে-কোন স্থানে সংঘর্ষের সংবাদ আগ্রহ সহকারে পাঠ করি, বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্যের গতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করি। অনেক সময় আবার শুধু জল্পনাকল্পনা, আলাপ-আলোচনা করিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি না; যাহাতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সংকটাপন্ন না হইয়া উঠে—সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, প্রস্তাব গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে তাহার প্রচেষ্টাও করিয়া থাকি।

অতএব, নাগরিকের শাস্ত্র পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা শুধু রাষ্ট্র, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংঘের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। নাগরিককে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয় বলিয়া, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations) ন্যায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সফলতার প্রচেষ্টা করিতে হয় বলিয়া পৌরবিজ্ঞান নাগরিক-জীবনের এই আন্তর্জাতিক দিকটির আলোচনাও করে।

পৌরবিজ্ঞানের আদর্শ: নাগরিক-জীবনের সামাজিক দিক আর একভাবে আন্তর্জাতিকতার সহিত সম্পর্কিত। পূর্বে সাহিত্য সভা, সেবা সমিতি প্রভৃতি যে-সকল সামাজিক সংঘের উল্লেখ করা হইয়াছে অনেক সময় তাহাদের কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়; আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ (International Labour Organisation, সংক্ষেপে ILO) সেণ্ট্ জন এ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতির ন্যায় অনেক সময় আবার ইহারা সমগ্র বিশ্বেও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক শান্তি ও মৈত্রীর পথে পরস্পরের সহিত সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হয়। মার্কিন শ্রমিক ভারতীয় শ্রমিককে মিত্র বলিয়া মনে করে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের ভারতীয় কর্মী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া সেবাকার্যে নিযুক্ত হন। কি করিয়া এই বন্ধনসূত্রকে দৃঢ়তর ও বিস্তৃততর করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে একই গোষ্ঠীভূত করা যায়—যুগ যুগ ধরিয়া দার্শনিকগণ এই স্বপ্নই দেখিয়া আসিতেছেন। কল্যাণকৃৎ শাস্ত্র হিসাবে এই 'এক পৃথিবী'র (one world) স্বপ্ন সফল করাও পৌরবিজ্ঞানের আদর্শ।

পূর্বে অবশ্য পৌরবিজ্ঞানের এই আদর্শ ছিল না; ফলে উহার পরিধিও এত ব্যাপক ছিল না। তখন নগর-রাষ্ট্রের সভ্যের জন্য মাত্র 'সুন্দর নগরে'র (city beautiful) পথনির্দেশ করাই ছিল পৌরবিজ্ঞানের একমাত্র আদর্শ। কিন্তু আজ নাগরিকের পক্ষে নগর বা স্থানীয় জীবনকে সুন্দর করিতে হইবে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করিতে হইবে,

সংঘজীবনকে সার্থক করিতে হইবে এবং মানবতা ও বিশ্বপ্রেমের প্রচার ও প্রয়াস করিয়া এক নূতন পৃথিবী গঠন করিতে হইবে বলিয়া পৌরবিজ্ঞানকেও সকল দিকেই পথনির্দেশ করিতে হইবে।

পৌরবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা (Utility of the Study of Civics)

বর্তমানে পৌরবিজ্ঞান আলোচনার গুরুত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কারণ বর্তমান যুগ হইল গণতন্ত্রের যুগ। গণতন্ত্রে নাগরিকরাই প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। সুতরাং নাগরিকগণের পক্ষে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ অযোগ্য প্রতিনিধিসমূহ নির্বাচিত হইয়া গণতন্ত্রকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিবে। পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা নাগরিকগণকে এই প্রয়োজনীয় জ্ঞান সরবরাহ করে।

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র পরিচালিত হয় জনমতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। সুতরাং জনমতকে সুষ্ঠু সবল ও কল্যাণকামী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা ইহাতে সহায়তা করে। পৌরবিজ্ঞানের আলোচনার ফলে নাগরিকগণ নাগরিক-জীবনের সমস্যাসমূহের প্রকৃতি অনুধাবন করিতে পারে, বুঝিতে পারে যে বিভিন্ন সমাধানের মধ্যে কোন্‌টি কাম্য এবং কোন্‌টি অকাম্য। সুতরাং তাহারা যাহা কাম্য, যাহা কল্যাণকর তাহারই পক্ষ সমর্থন করে। ফলে শাসকবর্গও ঐ পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হন।

তৃতীয়ত, পৌরবিজ্ঞানের আলোচনার ফলে নাগরিকগণের দেশপ্রীতি গভীর হয়। ইহাতে দেশের শাসন-ব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা দৃঢ় হয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটে। দেশ যে তাহাদেরই দেশ, সরকার যে তাহাদেরই সরকার এ-সম্বন্ধে নাগরিকগণ সচেতন হইয়া উঠে বলিয়া বিদ্রোহের সম্ভাবনা হ্রাস পায়, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার মত মনোবলও গড়িয়া উঠে। ফলে অন্যান্য দেশ এই দেশকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে থাকে।

পরিশেষে, পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা নাগরিককে বৃহত্তর দায়িত্ব সম্বন্ধেও সচেতন করিয়া তুলে। সে ভাবিতে শিখে যে সমগ্র মানবজাতি যেন একই পরিবার। অতএব, বিশ্বশান্তিতে, বিশ্বের সমৃদ্ধিতেই দেশের সমৃদ্ধি। আত্মঘাতী যুদ্ধ প্রভৃতির ফলে বিশ্ব যদি ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয় তবে দেশও বাঁচিবে না।

পূর্বে আমাদের দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন পৌরবিজ্ঞানের আলোচনার এতটা গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু বর্তমানে স্বাধীন দেশের প্রত্যেক ভাবী নাগরিককেই পৌরবিজ্ঞান পাঠ করিতে হইবে।

ভারতীয় পৌর আদর্শ এবং বর্তমান যুগ (Indian Civic Ideals and the Present Age)

বলা হইয়াছে, প্রাচীন ভারতও পৌরবিজ্ঞান বা পুরবাসীর শাস্ত্রের বেশ কিছু চর্চা করিয়াছিল। ফলে প্রাচীন ভারতেও পৌর আদর্শ পরিস্ফুটিত হইয়াছিল। গ্রীক ও রোমকদের পৌর আদর্শের লক্ষ্য ছিল নগরকে সুন্দর করিয়া তোলা, প্রাচীন ভারতে পৌর আদর্শের লক্ষ্য ছিল গ্রামকে সুন্দর করিয়া তোলা। ইহার কারণ, এই গ্রামই ছিল প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তি।

পঞ্চায়েতের অধীনে পরিচালিত গ্রামসমূহ বহু পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিত। এক রাজার রাজ্য অন্য এক রাজা কাড়িয়া লইলেও গ্রাম-ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিত না। গ্রামগুলি পুরাতন রাজার পরিবর্তে নূতন রাজাকে কর প্রদান করিয়া পূর্বের মত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। স্বাভাবিকভাবেই গ্রামকে সুন্দর করিয়া তোলাই ছিল তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। অবশ্য মৎস্যন্যায় বা অরাজকতা ঘটিলে গ্রামের জীবন-যাত্রাতেও বিশৃংখলা দেখা দিত। সেইজন্য অরাজকতা পরিহার করাও ছিল প্রাচীন ভারতের নাগরিক-জীবনের আদর্শ।

এই প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের তুলনাতেও যে বর্তমান দিনের পৌর আদর্শ বহু পরিমাণ ব্যাপকতর হইয়াছে তাহা উপরের আলোচনা হইতে সহজেই অনুধাবন করা যাইবে। এখন আর গ্রামকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলা এবং অরাজকতা পরিহার করাই নাগরিক-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। ইহার উপর লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করিয়া গঠন করা, সংঘজীবনকে সার্থক করা এবং মানবতা ও বিশ্বপ্রেমের পথে এক নূতন পৃথিবী গঠন করা।

২

ব্যক্তি ও সমাজ

(The Individual and Society)

পৌরবিজ্ঞানকে নাগরিকতার শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে এই শাস্ত্র রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক হিসাবে এবং বিভিন্ন সংঘের সদস্য হিসাবে মানুষের আচরণের পর্যালোচনা করে। রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন সংঘ সমাজেরই অংগ বলিয়া বলা যায়, পৌরবিজ্ঞান সমাজের সভ্য হিসাবে মানুষের আচরণ লইয়া আলোচনা করে। এখন প্রশ্ন : সমাজ কাহাকে বলে ? সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য কি ? ব্যক্তির সংগে সমাজের সম্পর্কই বা কি ?

সমাজ (Society)

বলা হয়, যত্র জীব তত্র সমাজ—অর্থাৎ জীবের সাক্ষাৎ পাইলেই সমাজের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই উক্তির অর্থ হইল দলবদ্ধতাই সমাজবদ্ধতা। অর্থ ছাড়াও উক্তিটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে—যথা, দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধভাবে ছাড়া জীব বাঁচিতে পারে না। সুতরাং যে-সকল জীব পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে তাহাদের সকলেরই সমাজ আছে—সমাজ-গঠন মানুষের কোন কিছু একচেটিয়া ব্যাপার নয়। বস্তুত, প্রাণিতত্ত্ব ভূতত্ত্ব প্রভৃতি হইতে জানা যায় যে অতীতে যে-সকল জীব দল বাঁধিয়া বাস না করিয়া বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিত তাহারা পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাদের কংকাল ও জীবাশ্ম (fossil) যাদুঘরে রাখা আছে।

দলবদ্ধতা গড়িয়া উঠে সমতা (likeness) এবং বিভিন্নতা (difference) উভয়েরই ভিত্তিতে। একই ধরনের জীব পরস্পরের সহিত মিলিত হয়—বিভিন্ন ধরনের জীব নহে। ফলে দেখা যায় যে সমজাতীয় পশুপক্ষীই দল বাঁধিয়া বাস করিতেছে। টিয়াপাখীর ঝাঁকের মধ্যে শালিক দেখা যায় না, নেকড়ের পালের মধ্যে শিয়াল থাকে না। এই কারণে ইংরাজীতে উক্তি প্রচলিত আছে যে, একই জাতের পাখী ঝাঁক বাঁধে (Birds of a feather flock together)। সুতরাং সমতার ভিত্তিতে মিলন এবং বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নতা হইল দলবদ্ধতার প্রকৃতি। মানুষের দলবদ্ধতা বা সংঘবদ্ধতার মধ্যে ঐ একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়।

দলবদ্ধ জীবনের সুবিধা (Advantages of Group Life) : শুধু যে বাঁচিয়া থাকার জন্যই দলবদ্ধতা প্রয়োজনীয়, তাহাই নহে। দলবদ্ধতা বা সংঘবদ্ধতার ফলেই উন্নত জীবন সম্ভব হয়। বিষয়টির সামান্য ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। দলবদ্ধতার তাৎপর্য হইল পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (interdependence)। আহার্য সংগ্রহের জন্য পশুপক্ষীরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, আবার আত্মরক্ষার জন্যও তাহারা

পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। মানুষের ক্ষেত্রে এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা শ্রমবিভাগ (division of labour) ও সমবায়ের (co-operation) রূপ গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহাদের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিয়াছে মানব-সভ্যতা।

উন্নত জীবন আরও সম্ভব হয় ভাবের আদানপ্রদানের জন্য। ভাবের এই আদানপ্রদানের মাধ্যম হইল ভাষা। অন্যান্য দলবদ্ধ জীব ভাষাকে ততটা কাজে লাগাইতে পারে নাই যতটা পারিয়াছে মানুষ। ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই মানুষ চিন্তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়াছে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নূতন জীবন গঠনের প্রচেষ্টা করিয়াছে। ফলে সভ্যতা হইয়াছে ঐশ্বর্যবান এবং গড়িয়া উঠিয়াছে যাহাকে বলা হয় সংস্কৃতি (culture)।*

মানব-সমাজ (The Human Society)

সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনার পর এখন মানব-সমাজের প্রকৃতি আলোচনা করা যাইতে পারে। মানুষ তাহার সামাজিক প্রকৃতি লাভ করিয়াছে সেই সকল জীব হইতে যাহারা হইল তাহার পূর্বপুরুষ। সুতরাং মানুষের সামাজিক প্রকৃতি বা স্বাভাবিক সংঘবদ্ধতা মানুষের উত্তরাধিকার—মানুষ পৃথিবীতে মানুষ বলিয়া পরিচিত হওয়ার পর ইহার সৃষ্টি হয় নাই।

---

* সভ্যতা (civilisation) এবং সংস্কৃতি (culture) একই বস্তু নয়। সভ্যতা হইল সুন্দর জীবনের বহিরাবরণ, অপরদিকে সংস্কৃতি হইল ঐ সুন্দর জীবনের সত্তা বা প্রাণ। পূর্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত আরও কিছুটা যোগ করিয়া মানুষ সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব করিতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক পুরুষকেই (generation) নূতন করিয়া সংস্কৃতির অনুশীলন করিতে হয়। এই কারণে সভ্যতার অগ্রগতি নিয়মিত ঘটিলেও সংস্কৃতির অবনতি দেখা দিতে পারে। যেমন, বলা হয় যে কৃষি শিল্পবাণিজ্য পরিবহণ প্রভৃতির উন্নতির ফলে আমাদের—ভারতবাসীদের—জীবনযাত্রা উন্নততর হইতেছে, আমাদের সভ্যতা সমৃদ্ধ হইতেছে। কিন্তু সংগে সংগে আমরা জীবনের মূল্যবোধ (sense of values)—অর্থাৎ ভালমন্দের বিচার—হইতে দিন দিন সরিয়া যাইতেছি। অন্যভাবে বলা যায়, দিন দিন সভ্য হইয়া উঠিলেও আমরা আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি বজায় রাখিতে পারি নাই। আমাদের এই প্রাচীন সংস্কৃতির উপাদান ছিল সরল অনাড়ম্বর জীবন কিন্তু উচ্চ চিন্তা (plain living and high thinking), হৃদয়ের প্রসারতা এবং ফলে সমাজদরদ। সমাজদরদী সংস্কৃতিবান ব্যক্তির নিকট সমগ্র সমাজই তাঁহার পরিবার, সমাজের সকল সদস্যই তাঁহার পরিজন। এই দৃষ্টিভংগিই নাগরিকের প্রকৃত দৃষ্টিভংগি। সুতরাং নাগরিকতার শাস্ত্র পৌরবিজ্ঞানে সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিমেয়।

মানুষের সামাজিক প্রকৃতি সম্বন্ধে এই মতবাদ ডারউইনের তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। ডারউইন তাঁহার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন ১৮৫৯ সালে। ইহার পূর্বে মানুষের আগমন সম্বন্ধে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ বাইবেলের উপাখ্যানে বিশ্বাস করিত। বাইবেলের উপাখ্যান অনুসারে ঈশ্বর প্রথম পুরুষ ও নারী আদম ও ঈভকে সৃষ্টি করিয়া স্বর্গোদ্যানে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পরে শয়তানের প্রলোভনে স্বর্গ হইতে আদম ও ঈভের পতন ঘটে। স্বর্গ হইতে পতনের পর তাহারা পৃথিবীতে আসিয়া বাস করিতে থাকে এবং তাহাদের সন্তানসন্ততিদের লইয়া ক্রমে মানবজাতির উদ্ভব ঘটে।

বাইবেলের এই উপাখ্যানের বিরোধিতা করিয়া ডারউইন প্রচার করেন যে মানুষ আসিয়াছে বিবর্তনের ধারা বাহিয়া—দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফলে। হঠাৎ একদিন খেয়ালের ফলে ঈশ্বর মানব-মানবী সৃষ্টি করেন নাই এবং আর একদিন শয়তান কর্তৃক প্রলুব্ধ হওয়ার ফলে তাহাদিগকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দেন নাই। অতএব, মানুষের আগমনের ইতিহাসের সন্ধান করিতে হইবে জীবজগতের বিবর্তনের মধ্যে এবং এই সন্ধানের ফলে দেখা যাইবে যে মানুষের পূর্বপুরুষদের মধ্যে সামাজিক প্রবৃত্তির দরুনই মানবজাতির উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। বস্তুত, যে-সকল জীব মানুষের পূর্বপুরুষ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যদি সংঘবদ্ধতা না থাকিত তবে অতীতের অনেক জীবের মত তাহারাও পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত, এবং ফলে পৃথিবীতে মানুষের আগমন কোনদিনই ঘটিত না।

বিবর্তনের ধারা বাহিয়া মানুষ যখন পৃথিবীতে মানুষ বলিয়া পরিচিত হইল তখন সে ছিল অত্যন্ত অসহায় ও দুর্বল। চারিদিকে তাহার ছিল প্রতিকূল পরিবেশ। এই প্রতিকূল পরিবেশকে দুই ভাগ করিয়া দেখান যায়—(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ (the physical environment) এবং (খ) অর্থনৈতিক পরিবেশ (the economic environment)। প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক দিয়া যেমন ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাত প্লাবন ঋতু-পরিবর্তন প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া মানুষকে বাঁচিতে হইত, তেমনি আবার অধিকতর শক্তিশালী জীবজন্তুর বিরুদ্ধেও আত্মরক্ষা করিতে হইত। দুই কাজই ছিল সমান কঠিন, কারণ মানুষ যে শুধু প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধেই অসহায় ছিল তাহা নহে, শারীরিক গঠন ও শক্তিতে অনেক জীবজন্তুর তুলনায়ও সে ছিল একান্ত ন্যূন।

প্রধানত এই শারীরিক দুর্বলতার জন্যই তাহার অর্থনৈতিক পরিবেশ ছিল বিশেষ প্রতিকূল। তখন ছিল খাদ্যাহরণের (food-gathering) যুগ। মানুষ তখন ফসল ফলাইতে শিখে নাই, পশুপালনও করিতে শিখে নাই। বনজংগল হইতে ফলমূল আহরণ করিয়া এবং জীবজন্তু শিকার করিয়া তাহাকে প্রাণ ধারণ করিতে হইত।

কিন্তু এই জীবজন্তু শিকারই ছিল অনেক সময় বিশেষ কঠিন কাজ, কারণ বহু ক্ষেত্রেই খাদ্য হিসাবে নির্বাচিত জীবজন্তু ছিল মানুষ অপেক্ষা শক্তিশালী।

এই প্রতিকূল প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশকে মানুষ ধীরে ধীরে অনুকূল করিয়া তুলিল সামাজিক পরিবেশকে (the social environment) সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিয়া। পূর্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত স্বাভাবিক সংঘবদ্ধতাকে মানুষ এমনভাবে কাজে লাগাইল যে মাত্র সে অন্যান্য জীবের উপর প্রভুত্বই স্থাপন করিল না, ধীরে ধীরে প্রকৃতিকেও বশে আনিল। মানুষের এই প্রভুত্বের মূলে আছে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি (rationality)। এই কারণে মানব-সমাজের ইতিহাসকে বুদ্ধিবৃত্তির বিজয়-অভিযানের ইতিহাস বলিয়া অভিহিত করা যায়। এই অভিযান আজও শেষ হয় নাই। ফলে মানব-সমাজ আজও রূপান্তরের পথে চলিয়াছে।

মানব-সমাজের বর্তমান রূপ (Present Form of Human Society)

বিরতিবিহীন রূপান্তরের ফলে মানব-সমাজ বর্তমানে বিশেষ জটিল রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহাকে বলা হয় জাতীয় সমাজ (National Society) বা জাতীয় সম্প্রদায় (National Community)। এই জাতীয় সমাজ বা সম্প্রদায় বিভিন্ন সংঘ (Associations) এবং প্রতিষ্ঠানের (Institutions) সমবায়ে গঠিত।

সংঘ (Associations) : সংঘ বলিতে বুঝায় মানুষের সামাজিক প্রকৃতির ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন সংগঠনকে—যেমন, ধর্মীয় সংগঠন, শ্রমিক সংঘ (trade union), বণিক সংঘ (merchants' association or chamber of commerce) প্রভৃতির ন্যায় অর্থনৈতিক সংগঠন, সাহিত্য সভা ও জ্ঞানবিজ্ঞান পরিষদের ন্যায় সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রভৃতি। ইহা ছাড়াও আছে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন। ধর্মীয় সংগঠন, অর্থনৈতিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রভৃতি মানুষ স্বেচ্ছায় স্থাপন করে এবং স্বেচ্ছায় উহাদের সদস্য হয়। রাষ্ট্র কিন্তু মানুষের আবশ্যিক সংগঠন (compulsory association)—মানুষ রাষ্ট্রের সভ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে। রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে পার্থক্য লইয়া পরে আরও আলোচনা করা হইবে।

প্রতিষ্ঠান (Institutions) : প্রতিষ্ঠান বলিতে বুঝায় বিধিনিয়মের উপর স্থাপিত ব্যবস্থাকে—যথা, সম্পত্তি, বিবাহ, ধর্মাচরণ প্রভৃতি। ইহাদের প্রত্যেকটিই বিধিনিয়মের উপর স্থাপিত। যেমন, কে বা কাহারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে, সে-সম্বন্ধে প্রত্যেক সমাজেরই বিধিনিয়ম থাকে। সুতরাং সম্পত্তি একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা। অনুরূপভাবে, কাহাকে বিবাহ করা যাইবে এবং কাহাকে করা যাইবে না, সে-সম্বন্ধেও প্রত্যেক সমাজের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন থাকে। অতএব, বিবাহও একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান।

আধুনিক লেখকগণের অনেকের মতে, রাষ্ট্র (State) অন্যতম সংঘ হইলেও রাষ্ট্রের প্রতিভূ (agent) সরকার (Government) প্রতিষ্ঠান ছাড়া কিছু নয়। কিভাবে শাসনকার্য চলিবে, শাসক-শাসিতের মধ্যে কি সম্পর্ক হইবে—ইত্যাদি সকলই নির্ধারিত হয় বিধিনিয়মের ভিত্তিতে। সুতরাং সরকার নিয়মমাফিক কার্য করে বলিয়া ইহা একটি ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান মাত্র। রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনায় এ-সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা করা হইবে।

উপরে বলা হইয়াছে যে, আজিকার দিনের সমাজ—অর্থাৎ জাতীয় সমাজের রূপ বিশেষ জটিল। ইহার কারণ হইল দ্বিবিধ : (ক) যে-সকল সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের সমবায়ে এই জাতীয় সমাজ গঠিত তাহারা সংখ্যায় বহু; (খ) এই সকল সংঘ ও প্রতিষ্ঠান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরস্পরের সহিত সংগতিবিহীন এবং অনেক ক্ষেত্রে আবার পরস্পর-বিরোধী। যেমন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিক সংঘের উদ্দেশ্যের সহিত বণিক সংঘের উদ্দেশ্যের মিল থাকে না, আবার বণিক সংঘসমূহের উদ্দেশ্যও সকল সময় এক থাকে না। এমনকি অনেক সময় পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি বিদ্যালয়ের, দুইটি ক্রীড়া সংঘের লক্ষ্যও বিভিন্ন হইতে দেখা যায়। আপাতদৃষ্টিতে ক্রীড়া সংঘগুলির লক্ষ্য হইল খেলাধূলার প্রসার করা এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করা। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে পাশাপাশি দুইটি ক্রীড়া সংঘের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে মাত্র অপর দলকে পরাস্ত করা। এই লক্ষ্যের দরুন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ। আবার ঠিক এই কারণেই একই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুইটি শ্রমিক সংঘের মধ্যে লাগিয়া থাকে সংঘাত।

এই সকল দ্বন্দ্বসংঘাতের মীমাংসা এবং বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সমন্বয়-সাধন করিবার জন্য সমাজের একটি কর্তৃত্বের প্রয়োজন হয়। সমাজের আবশ্যিক সংঘ (compulsory association) রাষ্ট্রই হইল এই কর্তৃত্ব। রাষ্ট্র বিভিন্ন সংঘ, বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়া সমাজজীবনের মধ্যে সংহতি বজায় রাখে, সমাজ-জীবনকে সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিতে প্রচেষ্টা করে। এবং এই কার্য রাষ্ট্র সম্পাদন করে তাহার প্রতিভূ সরকারের মাধ্যমে।

সমাজজীবনকে সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তোলা বলিতে শুধুমাত্র জাতীয় সমাজেরই সংহতিসাধন বা সুসংগঠন বুঝায় না, কারণ আজিকার দিনে বিচ্ছিন্নভাবে কোন জাতীয় সমাজই কাম্যভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না, এমনকি বাঁচিতেও পারে না। বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির ফলে পৃথিবী অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক দেশই আজ অন্যান্য দেশের সহিত অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে বাণিজ্য-সম্পর্ক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা। অপরদিকে আবার

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে লাগিয়া আছে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ লইয়া সংঘাত। এই সংঘাত সংঘর্ষে পরিণত হইলে—অর্থাৎ যুদ্ধ বাধিলে—উহা ছড়াইয়া পড়িতে পারে এবং এই যুদ্ধে আণবিক পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইতে পারে। যাহাতে ইহা না ঘটে, যাহাতে বিভিন্ন দেশের স্বার্থ ও লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন সম্ভব হয় তাহা দেখাও জাতীয় সমাজের পক্ষে অপরিহার্য। জাতীয় সমাজের পক্ষে এই কার্যও সম্পাদন করে রাষ্ট্র এবং সম্পাদন করে উহার প্রতিভূ সরকারের মাধ্যমে।

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Individual and Society)

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক লইয়া আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে যে, ব্যক্তি (individual) বলিতে কি বুঝায়? প্রশ্নটির তাৎপর্য অনুধাবন করিবার জন্য আর একটি প্রশ্ন করা যাইতে পারে: আমি কে? ভারতের বাহিরে কোন দেশে এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিব, আমি একজন ভারতীয় এবং ভারতের অন্য কোন অঞ্চল হইলে বলিব, আমি একজন বাঙালী। পেশার দিক হইতে আমি একজন শিক্ষক বা ডাক্তার বা অফিস-কর্মচারী বা কারখানার শ্রমিক। বর্ণের দিক হইতে আমি একজন ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ বা বৈদ্য অথবা অন্য কোন বর্ণ। আমার এই যে পরিচয় ইহার প্রত্যেকটিই আমার সামাজিক পরিচয়, স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে আমার পরিচয় নহে। বস্তুত, সমাজভুক্ত ব্যক্তির স্বতন্ত্র পরিচয় কিছু নাই বলিলেই চলে। মাত্র রবিনসন ক্রুশোর ন্যায় সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিরই স্বতন্ত্র পরিচয় আছে—সে রবিনসন ক্রুশো ছাড়া আর কিছুই নয়।

শুধু যে সমাজের পরিচয়েই ব্যক্তির পরিচয় তাহা নহে, ব্যক্তিজীবনও সমাজজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আমি ভারতীয়, বাঙালী, শিক্ষক, মধ্যবিত্ত ব্যক্তি। সুতরাং আমার জীবন, ধ্যানধারণা, আচার-আচরণ ভারতীয় হিসাবে, বাঙালী হিসাবে, মধ্যবিত্ত হিসাবে কিছু-না-কিছু পরিমাণে গড়িয়া উঠিবেই। বাঙালী হিসাবেই আমার কথা ধরা যাউক। আমার খাদ্য বেশভূষা শিক্ষাদীক্ষা আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি মোটামুটি বাঙালীরই জীবনযাত্রা প্রণালী হইতে গৃহীত। বাঙালী যেভাবে চিন্তা করে আমিও অনেকটা সেইভাবে চিন্তা করি। বাংলার সমস্যা আমাকেও বিপর্যস্ত করে। অপরদিকে আবার আমার আচার-আচরণ দ্বারা আমার প্রতিবেশী প্রভাবান্বিত হয় এবং ফলে পরোক্ষভাবে বাঙালী সমাজও কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়। আমি যদি ধুতিপাঞ্জাবী ছাড়িয়া কোটপ্যান্ট পরিতে শিখি, তবে হয়ত আমার কোন কোন প্রতিবেশী আমার অনুকরণ করিবে। ফলে বাঙালী সমাজের মধ্যে কোটপ্যান্ট কিছুটা

চালু হইবে। আমি যদি বাঙালীর খাদ্য ছাড়িয়া অন্য খাদ্যের দিকে ঝুঁকি তবে আমার দেখাদেখি কিছুসংখ্যক ব্যক্তি ঐ খাদ্যের দিকে ঝুঁকিতে পারে। মোটকথা, ব্যক্তির প্রত্যেকটি কার্যের ফলাফল কোন-না-কোন ভাবে সমাজকে স্পর্শ করে বলিয়া এবং সমাজের পরিচয়েই ব্যক্তির পরিচয় বলিয়া ব্যক্তির সংগে সমাজের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। এখন প্রশ্ন হইল: এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঠিক কি প্রকৃতির? এ-সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। এইগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়—(ক) আংগিক মতবাদ (Organic Theory) এবং (খ) যান্ত্রিক মতবাদ (Mechanistic Theory)।

ক। আংগিক মতবাদ (Organic Theory): ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আংগিক মতবাদের বক্তব্য হইল যে এই সম্পর্ক সম্পূর্ণ অংগাংগি সম্পর্ক—অর্থাৎ সমাজের প্রকৃতি জীবদেহের ন্যায় এবং ব্যক্তি সমাজের অংগস্বরূপ। জীবের কোন অংগের যেমন পৃথক সত্তা বলিয়া কোন কিছু থাকিতে পারে না, তেমনি ব্যক্তিরও সমাজের বাহিরে পৃথক অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। জীব যদি বাঁচিয়া থাকে তবেই অংগপ্রত্যংগের অস্তিত্ব থাকিতে পারে, জীব যদি সুস্থ থাকে তবেই অংগপ্রত্যংগ সুস্থ থাকিতে পারে, জীব যদি স্বাস্থ্যবান হয় তবেই বিভিন্ন অংগপ্রত্যংগ স্বাস্থ্যবান হইতে পারে। তেমনি সমাজ বর্তমান থাকিলে তবেই ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে, সমাজ সুষ্ঠুভাবে চলিলে তবেই ব্যক্তি সুখী হইতে পারে এবং সমাজ উন্নতির পথে চলিলে তবেই ব্যক্তির জীবন কাম্যভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে। এই আংগিক মতবাদের বর্ণনা করিতে গিয়া একজন লেখক বলিয়াছেন, হস্তের সহিত সমগ্র দেহের যেরূপ সম্পর্ক, বৃক্ষপত্রের সহিত বৃক্ষের যেরূপ সম্পর্ক—ব্যক্তির সহিত সমাজেরও সেইরূপ সম্পর্ক।

আংগিক মতবাদের সূত্রপাতের সন্ধান পাওয়া যায় গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের মতবাদে। প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের মতে, মানুষ সামাজিক জীব (man is a social animal) এবং এই কারণে মাত্র সমাজের মধ্য দিয়াই সে তাহার জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে। প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের এই মতবাদ একরূপ অখণ্ডনীয়, কিন্তু ইহা হইতে পরবর্তী যুগে যে-আংগিক মতবাদের অবতারণা করা হইয়াছে তাহা মোটেই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নহে। প্রথমেই দেখান যায় যে, সমাজভুক্ত ব্যক্তি কোন দিক দিয়াই জীবের অংগপ্রত্যংগের সমান নহে। ব্যক্তিকে সমাজ হইতে বিচ্যুত করিলে ব্যক্তি বাঁচিতে পারে, কিন্তু হাত পা বা অন্য কোন অংগকে দেহ হইতে ছিন্ন করিলে ঐ অংগ সংগে সংগেই বিনষ্ট হইয়া যায়। দ্বিতীয়ত, কোন অংগের পক্ষে একাধিক জীবদেহের সহিত যুক্ত থাকা অসম্ভব, মানুষ কিন্তু একাধিক

সংঘের সহিত যুক্ত থাকিতে পারে—এক সমাজ পরিত্যাগ করিয়া অপর আর এক সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে।

তৃতীয়ত, অনেক সময় ব্যক্তির স্বার্থকে সমাজের স্বার্থের বিরোধী হইতে দেখা যায়, কিন্তু জীবের কোন অংগের স্বার্থ সমগ্র জীবদেহের স্বার্থের বিরোধী হইতে পারে না। যেমন, খাদ্যসংকটের সময় খাদ্য মজুত করিয়া কালোবাজারে বেচিলে সমাজের ক্ষতি হইবে সত্য কিন্তু ব্যবসায়ীদের যে লাভ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; অপরদিকে কিন্তু কথামালার উপকথার ন্যায় অংগপ্রত্যংগ যদি উদরের সহিত অসহযোগ করে তবে উদরের সংগে সংগে সকল অংগপ্রত্যংগই দুর্বল হইয়া পড়িবে।

মোটকথা, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক অংগপ্রত্যংগ ও জীবদেহের মধ্যে সম্পর্কের সহিত কোনমতেই তুলনীয় নহে। সুতরাং আংগিক মতবাদকে ভ্রান্ত মতবাদ বলিয়া স্বচ্ছন্দেই অভিহিত করা চলে। তবে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্দেশ করে বলিয়া এই মতবাদের যে কিছুটা মূল্য আছে তাহাও অনস্বীকার্য।

খ। যান্ত্রিক মতবাদ (Mechanistic Theory) : যান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে মানুষ কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় সমাজ স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণ কৃত্রিম—উহা মাত্র কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত। এই সকল উদ্দেশ্যের বাহিরে ব্যক্তির উপর সমাজের কোন প্রভাব বা ক্ষমতা নাই, ব্যক্তিরও সমাজের সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

এই যান্ত্রিক মতবাদের বিশেষ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সামাজিক চুক্তি মতবাদে (Social Contract Theory)। এই মতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে, আদিম যুগে মানুষের মধ্যে চুক্তির ফলেই সমাজের উদ্ভব হইয়াছে। কেন আদিম মানুষ চুক্তি করিতে অগ্রসর হইয়াছিল সে-সম্বন্ধে এই মতবাদের ব্যাখ্যাকারগণ একমত নহেন। কাহারও মতে, অরাজক জীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শান্তিশৃংখলার মধ্যে বাস করিবার উদ্দেশ্যেই আদিম মানুষ চুক্তির মাধ্যমে সমাজ গঠন করিয়াছিল। কাহারও মতে আবার মানুষ চুক্তি সম্পাদন করিয়া শুধু জীবনকেই নিরাপদ করিতে চাহে নাই, সামাজিক বিধিব্যবস্থার মাধ্যমে ধনসম্পত্তির অধিকারও (property rights) সংরক্ষিত করিতে চাহিয়াছিল।

রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রসংগে সামাজিক চুক্তি মতবাদ আবার আলোচনা করা যাইবে। তখন দেখা যাইবে যে মতবাদটি মোটেই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। প্রথমত, ইহা ভ্রান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। চুক্তি বলিতে বুঝায় আইনানুমোদিত বুঝাপড়া। অর্থাৎ, আইনসংগতভাবে পরস্পরের মধ্যে যে-অংগীকার করা হয় তাহাকেই চুক্তি বলে। সুতরাং চুক্তির পূর্বে প্রয়োজন হইল আইনের। এই আইন অবশ্য সামাজিক

বিধিনিয়মও হইতে পারে, আবার বিধিবদ্ধ (codified) রাষ্ট্রের আইনও হইতে পারে। যাহা হউক, চুক্তির পূর্বে প্রয়োজন হইল কোন-ন-কোন প্রকার আইনের। সামাজিক চুক্তি মতবাদে কিন্তু ইহা অস্বীকার করা হইয়াছে, ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে সামাজিক বিধিব্যবস্থা রূপ গ্রহণ করিবার পূর্বেই মানুষ চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল। ইহা কিরূপে সম্ভব তাহা অনুমান করা যায় না। সামাজিক বিধিব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবার পূর্বে তাহাদের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা জন্মিল কি করিয়া? আর যদি ধারণাই না জন্মিয়া থাকে তবে তাহাদের ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনের কথাই বা ভাবিল কি করিয়া? সুতরাং সামাজিক চুক্তি মতবাদ যে ভ্রান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা অনস্বীকার্য।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ মানুষের প্রকৃতি, বিবর্তনবাদ প্রভৃতিরও বিরোধী। সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুসারে চুক্তির মাধ্যমে সমাজ গঠনের পূর্বে মানুষ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিত। ইহা কোনমতে সম্ভব নয়, কারণ দল বাঁধিয়া বাস করাই মানুষের স্বভাব। মানুষ অন্যতম সংঘবদ্ধ জীব (a gregarious animal)। সুতরাং সামাজিক চুক্তি মতবাদকে মানিয়া লইতে হইলে মানুষের এই প্রকৃতিকে অস্বীকার করিতে হয়।

বিবর্তনবাদ অনুসারে মানুষ ধীরে ধীরে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পথে অগ্রসর হইয়াছে। সংঘবদ্ধভাবে বাস করিতে করিতে মানুষ নিজেকে পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়াছে; অপরদিকে আবার পরিবেশকেও নিজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইয়াছে। এই বিবর্তনের এক অধ্যায়ে সে নিজেকে ব্যক্তি (individual) হিসাবে অনুভব করিয়াছে; তখনই সে সমাজ সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে এবং সমাজকে তাহার ধ্যানধারণা অনুসারে গড়িয়া তুলিবার কথা ভাবিয়াছে বা প্রচেষ্টা করিয়াছে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের কিন্তু বক্তব্য হইল যে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করিবার পূর্বেই মানুষ ব্যক্তি হিসাবে সচেতন ছিল; এই ব্যক্তিজীবনের অসুবিধা দূর করিবার জন্য কৃত্রিম সংঘবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনীয়তাও সে অনুভব করিয়াছিল। সুতরাং মানুষ পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ সুরু করিল এবং ঐ পরামর্শের ফলস্বরূপ একদিন সমাজ গঠিত হইল।

এইরূপ ধারণা কোনমতেই গ্রহণীয় নয়। সংঘবদ্ধতা মানুষের স্বভাবগত। ব্যক্তি বা সমাজ কেহই কাহারও পূর্ববর্তী নহে। মানুষের স্বাভাবিক সংঘবদ্ধতার ফলে সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে; অনেক ক্ষেত্রে আবার মানুষ সচেতনভাবে সমাজের রূপদানের প্রচেষ্টাও করিয়াছে। এই দুইপ্রকার শক্তির (forces) কার্যের ফলেই এবং দীর্ঘ বিবর্তনের ধারা বাহিয়া রূপ গ্রহণ করিয়াছে আজিকার দিনের সমাজ-ব্যবস্থা—যে

সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা সুশৃংখল জীবন যাপন করি এবং নিজেদের সভ্য বলিয়া অভিহিত করিয়া গর্ব অনুভব করি।

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক (True Relation between Individual and Society) : দেখা গেল যে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কের সন্ধান আংগিক মতবাদ বা যান্ত্রিক মতবাদ কোনটিতেই পাওয়া যায় না। কিন্তু আবার প্রকৃত সম্পর্কের সন্ধান এই দুই মতবাদের মধ্যেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এই দুই মতবাদের মধ্যে এমন কয়েকটি বক্তব্য আছে যেগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করিলেই ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যথার্থ ব্যাখ্যাটি সংক্ষেপে হইল এইরূপ : ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক আংগিক সম্পর্কও নয়, আবার যান্ত্রিক সম্পর্কও নয়। ব্যক্তি সমাজের অংগীভূত বটে কিন্তু কোন অংগ বা প্রত্যংগ নয়। মানুষ স্বেচ্ছায় সচেতনভাবে সমাজ গঠন করে নাই, তবে সমাজকে যে সে অনেক ক্ষেত্রে নিজের চিন্তাবিশ্বাস অনুসারে গড়িয়া তুলিতে প্রচেষ্টা করিয়াছে তাহা সত্য এবং এই প্রচেষ্টা এখনও করিয়া চলিতেছে। মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং এই প্রচেষ্টা করিয়া চলিবেই।

কি অর্থে মানুষ সামাজিক জীব (In What Sense Man is a Social Animal) : এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন যে, কি অর্থে মানুষ সামাজিক জীব। নচেৎ মানুষ অবশ্যই কেন তাহার চিন্তাবিশ্বাস ধ্যানধারণা অনুসারে সমাজকে গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা করিবে—তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে না।

'মানুষ সামাজিক জীব'—উক্তিটি গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটলের। এ্যারিস্টটল আরও বলিয়াছেন, যে-ব্যক্তি সমাজে বাস করে না হয় সে পশু, না-হয় দেবতা।

এ্যারিস্টটলের এই উক্তির যদি এই অর্থ করা হয় যে একমাত্র মানুষই সামাজিক জীব তবে উক্তিটি সত্য নহে। কারণ, আমরা ইতিমধ্যেই দেখিয়াছি যে সামাজিক জীব বলিতে বুঝায় দলবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ জীব এবং অধিকাংশ জীবই সংঘবদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, 'মানুষ সামাজিক জীব' বলিতে যদি বুঝান হয় যে সংঘবদ্ধতাই মানুষের প্রকৃতি—অর্থাৎ সকল সময়ই মানুষ অপরের সহিত মিলিত হইতে চাহে, তবে তাহাও সত্য নহে। সংঘবদ্ধতা মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু এই প্রবৃত্তির ব্যাপারে মানুষে মানুষে প্রভূত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কাহারও কাছে হয়ত পরিবারই তাহার মিলনের ক্ষেত্র—পরিবারই তাহার গোষ্ঠী, অপর কাহারও কাছে তাহার গোষ্ঠী হইল সমগ্র বিশ্ব। এইজন্য সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে যে, সংকীর্ণচেতা ব্যক্তি সর্বদাই আপন-পরের মধ্যে ভেদাভেদ করিয়া থাকে, কিন্তু উদার মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সারা বিশ্বই তাঁহার আত্মীয়। অর্থাৎ, উদারচিত্ত ব্যক্তির নিকট

সংঘবদ্ধতার অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি মাত্র তাঁহার পরিবার, গ্রাম বা সহর বা দেশের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে পারে না, তাঁহার সংঘবদ্ধতার প্রবৃত্তি সার্থক হইয়া উঠে সারা বিশ্বের মধ্যে। পৃথিবীর সকল লোককেই তিনি আপনজন বলিয়া মনে করেন, সারা বিশ্বকেই পরিবার বলিয়া গণ্য করেন। এইরূপ উদারমনা ব্যক্তিকে বিশ্বমানব (Universal Man) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

এইরূপ উদারমনা ব্যক্তির সংখ্যা কিন্তু অত্যল্প। তাঁহাদিগকে আমরা মহাপুরুষ আখ্যাও দিয়া থাকি। যুগে যুগে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, মানুষের সংঘবদ্ধ জীবন পরিবার গ্রাম বা দেশের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে পারে না, এই গণ্ডি সমগ্র বিশ্বে সম্প্রসারিত।

পথ চলিতে গিয়া এই সকল মহাপুরুষের কথা আমরা ভুলিয়া গিয়া আমাদের নিজস্ব প্রকৃতিতেই প্রকাশিত হই। এই প্রকৃতিকে জার্মান দার্শনিক কাণ্ট (Kant) 'অসামাজিক সামাজিকতা' (unsocial sociableness) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বুঝায় যে সামাজিকতা (sociableness) এবং দ্বন্দ্বপ্রীতি (pugnacity) —উভয়ই মানুষের প্রকৃতিগত। মানুষ যেমন একদিকে অপরের সহিত মিলিত হইতে চাহে, অপরদিকে তেমনি আবার অপরের সহিত কলহেও লিপ্ত হইতে চাহে। এই মিলনের আকাংক্ষা প্রকাশ পায় সহযোগিতার (co-operation) মধ্যে ; আর কলহপ্রীতি প্রকাশ পায় অসহযোগ ও সংঘর্ষের (conflict) মধ্যে। সহযোগিতা ও সংঘর্ষ যে সকল সময় প্রত্যক্ষ তাহা নয়, উহারা পরোক্ষ রূপও ধারণ করে। যেমন, আমরা যখন পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া খেলাধূলা করি, বারোয়ারী পূজা করি, চোরডাকাতের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য পাড়ায় রক্ষীবাহিনী (defence party) গঠন করি তখন ঐ সহযোগিতা হইল প্রত্যক্ষ। কিন্তু যখন কলকারখানায় শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে দ্রব্য উৎপাদন করি, স্কুলকলেজে শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করি তখন ঐ সহযোগিতা হইল পরোক্ষ। অনুরূপভাবে, যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসাবে আমরা পরস্পরকে দোষারোপ করি, প্রতিবেশীর সংগে মামলামকদ্দমায় লিপ্ত হই, অন্য দেশের সহিত যুদ্ধ করি তখন ঐ সংঘর্ষ হইল প্রত্যক্ষ। অপরদিকে আবার যখন অপরের সহিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হই, একজনকে সমর্থন করিয়া অপর একজনের ক্ষতি করিবার প্রচেষ্টা করি তখন ঐ সংঘর্ষ সম্পূর্ণ পরোক্ষ।

যাহা হউক, এই সহযোগিতা এবং সংঘর্ষ (co-operation and conflict) উভয়ের সমন্বয়েই মানব-সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে—শুধু সহযোগিতা মানুষের সামাজিক প্রকৃতির ফলে নয়। এই সহযোগিতা ও সংঘর্ষের সমন্বয়ে যাহা সৃষ্ট হইয়াছে তাহাকে

বলা হয় সামাজিক উত্তরাধিকার (social heritage)। সামাজিক উত্তরাধিকার ভাবভাষা জ্ঞানবিজ্ঞান আচার-আচরণ প্রভৃতি মানুষের যাহা কিছু গর্বের বস্তু সকলই লইয়া গঠিত। মানুষ এই উত্তরাধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ করে এবং ইহাকে আশ্রয় করিয়াই তাহার জীবন গড়িয়া উঠে। যে-সমাজের উত্তরাধকার যত ঐশ্বর্যবান (rich) সে-সমাজে ব্যক্তির জীবনের বিকাশের সম্ভাবনাও তত বেশী। 'মানুষ সামাজিক জীব'—এই উক্তির দ্বারা মূলত এই সামাজিক উত্তরাধিকারেরই নির্দেশ করা হয়। বলা হয়, সামাজিক উত্তরাধিকার ব্যতীত ব্যক্তি (individual) মানুষ হিসাবে তাহার জীবনকে বিকশিত করিতে সমর্থ হয় না। আরও বলা হয় যে, সমাজে—অর্থাৎ সংঘবদ্ধভাবে—বাস না করিলে সে বাঁচতেই পারে না। মানুষ যদি সংঘবদ্ধ না হইত তবে অতীতের অনেক জীবের মত বিলুপ্তই হইয়া যাইত—পৃথিবীতে 'মানুষ' বলিয়া কোন জীবের আগমন কোনদিনই ঘটিত না।

অতএব, মানুষ সামাজিক জীব বলিতে দুইটি জিনিস বুঝায় : (ক) সংঘবদ্ধতা মানুষের বাঁচার পক্ষে অপরিহার্য, এবং (খ) সামাজিক উত্তরাধিকার ব্যতীত মানুষের ব্যক্তিত্ব, মানুষের সম্ভাবনা পরিস্ফুট হইতে পারে না।

এই প্রসংগে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সামাজিক উত্তরাধিকার যে সরাসরি মানুষের ব্যক্তিত্বকে, মানুষের মধ্যে সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তাহা নহে। এই উত্তরাধিকারের মধ্যে থাকে মাত্র ব্যক্তিত্ববিকাশের সম্ভাবনা—ইহা আনিয়া দেয় ব্যক্তিত্ববিকাশের সুযোগসুবিধা (opportunities)। এই সুযোগসুবিধাগুলিকে বর্তমানে অধিকার (Rights) বলিয়া অভিহিত করা যায়। কে নিজেকে কতটা বিকশিত করিতে সমর্থ হইবে তাহা নির্ভর করে তাহার নিজের উপর—সে সামাজিক উত্তরাধিকারকে কতটা কাজে লাগাইতে পারিয়াছে তাহার উপর। প্রত্যেক সমাজের কর্তব্য হইল মাত্র উত্তরাধিকারকে বজায় রাখা এবং উহাকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তোলা, এবং সকলে যাহাতে এই উত্তরাধিকারকে সমভাবে ভোগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। এই শেষেরটিকে বলা হয় সাম্যের নীতি (principle of equality)। এ-সম্বন্ধে নাগরিকের অধিকার প্রসংগে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

৩ | রাষ্ট্র
(State)

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও সংজ্ঞা (Nature and Definition of the State)

বর্তমানে নাগরিক-জীবনের কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া আছে রাষ্ট্র। সুতরাং পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা বহুলাংশে রাষ্ট্র সম্বন্ধেই আলোচনা।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। তবুও বলা যায় যে কেন্দ্রীয় ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করাই ইহার লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রাষ্ট্রকে এক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহাকে বলা হয় সার্বভৌম ক্ষমতা বা সার্বভৌমিকতা (sovereignty)।

সার্বভৌমিকতাকে 'সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতা' ('united power of the community'—MacIver) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ক্ষমতা অন্য কোন সামাজিক সংগঠনের নাই। সমাজের এই সম্মিলিত ক্ষমতা আইন প্রণয়ন ও আইন বলবৎ করিবার ক্ষমতা। আইন রাষ্ট্রের নিয়মাবলী মাত্র। অন্যান্য সংঘের নিয়মাবলী হইতে ইহার পার্থক্য এইখানে যে আইন মান্য করা প্রত্যেক ব্যক্তি ও সংঘের পক্ষে বাধ্যতামূলক, কিন্তু অন্যান্য সংঘের নিয়মাবলী পালন করা সভ্যদের পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে। আইন অমান্য করিলে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করিতে পারে; অন্য যে-কোন সংঘের নিয়মাবলী ভংগ করিলে সেই সংঘ অনুনয়-বিনয় করিতে পারে, সভাপদচ্যুত করিতে পারে—কিন্তু বলপ্রয়োগ করিতে পারে না। রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের এইখানেই পার্থক্য।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা : রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন ও বলবৎ করিবার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্রপতি উইলসন্ (President Wilson) রাষ্ট্রের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন : "রাষ্ট্র হইল আইনানুসারে সংগঠিত, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী এক জনসমষ্টি" (A State is a people organised for law within a definite territory)। উইলসনের প্রায় প্রতিধ্বনি করিয়াই ব্লুণ্টস্‌লি (Bluntschli) বলিয়াছেন, কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজই রাষ্ট্র। এক্ষেত্রে 'রাষ্ট্রনৈতিকভাবে' শব্দটির অর্থ হইল 'আইনানুসারে'। আইনই রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল।

উইলসন্ এবং ব্লুণ্টস্‌লি প্রদত্ত সংজ্ঞা দুইটি বিজ্ঞানসম্মত হইলেও রাষ্ট্রের অন্যান্য অসংখ্য সংজ্ঞার মতই কিছুটা অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। সুতরাং ইহাদের হইতে রাষ্ট্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় না। সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় অধ্যাপক গার্ণার-প্রদত্ত সংজ্ঞা হইতে। গার্ণারের সংজ্ঞা অবশ্য মৌলিক নয়; ইহা বিভিন্ন

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী-প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলির সমন্বয় মাত্র। গার্ণারের মতে, "রাষ্ট্র হইল বহুসংখ্যক ব্যক্তি লইয়া গঠিত এমন একটি জনসমাজ যাহা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যাহা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত এবং যাহার একটি সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা আছে—যে শাসন-ব্যবস্থার প্রতি অধিবাসীদের অধিকাংশ স্বভাবতই আনুগত্য স্বীকার করে।*

রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the State)

এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিয়া রাষ্ট্রের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করা যাইতে পারে—যথা, (১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার, (৪) স্থায়িত্ব এবং (৫) বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বা সার্বভৌমিকতা। রাষ্ট্র-গঠনের পক্ষে এই পাঁচটি উপাদানই অপরিহার্য। রাষ্ট্র বলিতে শুধু জনসমাজ বা ভূখণ্ড বা শাসন-ব্যবস্থা বা স্থায়িত্ব বা সার্বভৌম শক্তি বুঝায় না। এই পাঁচটি উপাদান লইয়া গঠিত যে-প্রতিষ্ঠান তাহাকেই 'রাষ্ট্র' আখ্যা দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের এই উপাদান বা লক্ষণগুলির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

জনসমষ্টি (Population): আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন। মানুষের জন্যই সমাজ, মানুষের জন্যই রাষ্ট্র। মানুষকে বাদ দিয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কল্পনাও করা যায় না। জনমানবশূন্য মরুভূমিতে রাষ্ট্রের উদ্ভব কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং রাষ্ট্র-গঠনের জন্য প্রথম অপরিহার্য উপাদান হইল জনসমষ্টি।

জনসমষ্টির সংখ্যা সম্বন্ধে কোন প্রচলিত নিয়ম নাই। প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মনে করিতেন যে স্বল্প সংখ্যাই সুশাসনের পক্ষে অত্যাবশ্যক, কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিক উন্নতি প্রভৃতির ফলে বৃহৎ জনসংখ্যা সুশাসনের অন্তরায় হিসাবে পরিগণিত হয় না। পূর্বে দিল্লী হইতে বাংলাদেশ শাসন করাই কঠিন ছিল; আধুনিক যুগে ইংরাজদের পক্ষে সমগ্র পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশও শাসন করা কঠিন হয় নাই। প্রাচীন গ্রীকরা দশ হাজার জনসংখ্যাকেই সুশাসনের দিক হইতে কাম্য মনে করিতেন; বর্তমানে ঐ একই দিক দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার ১৯-২০ কোটির মত লোককে, ভারত তাহার ৫৩ কোটির অধিক লোককে অকাম্য বিবেচনা করে না। তবে কাম্য জনসংখ্যা নির্বাচনে একমাত্র সুশাসনকে মাপকাঠি করিলে চলিবে না, দেশের আর্থিক সম্পদ কি পরিমাণ জনসংখ্যার উপযোগী তাহাও দেখিতে হইবে।

---

* "A State is a community of persons, *more or less numerous*, permanently occupying a definite portion of a territory, independent of external control, ... and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience."

নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Territory) : সীমারেখা দ্বারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। জনসমাজের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা নিজস্ব বাসভূমি না থাকিলে রাষ্ট্র গঠিত হয় না। ইতিহাসে যাযাবর জাতির মধ্যে সংগঠনের উদাহরণ পাওয়া যায়। এই সকল যাযাবর জনসমাজ নিয়ন্ত্রণ ও আইনের অধীন ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে মানব-সমাজের এইরূপ অবস্থাকে 'রাষ্ট্র' আখ্যা দেওয়া হয় না। যাযাবর জনসমাজ যখনই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকে, তখনই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্র বলিয়া কোনকিছুর কল্পনাও করা যায় না।

রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সার্বভৌম শক্তির এলাকা যে কতদূর বিস্তৃত তাহা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড না থাকিলে নির্ধারণ করা যায় না। রাষ্ট্রের সীমা যতদূর বিস্তৃত, সার্বভৌম শক্তির এলাকাও ততদূর ব্যাপ্ত। রাষ্ট্রের সীমা বলিতে স্থল জল ও বায়ুমণ্ডল বুঝায়। এইজন্য সার্বভৌম শক্তির এলাকা সীমারেখা দ্বারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের, ভূখণ্ডের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের এবং ভূখণ্ডের উপকূলবর্তী সমুদ্রের কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া ধরা হয়।

রাষ্ট্রের জনসমষ্টির ন্যায় ভূখণ্ডের আয়তনেরও কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই। প্রাচীন গ্রীকদের নিকট একটিমাত্র নগর ছিল রাষ্ট্রের পক্ষে পর্যাপ্ত, আবার রোমকদের নিকট সমগ্র পৃথিবীও যথেষ্ট ছিল না। রোমকদের মতই প্রাচীন ভারতের নৃপতিগণ সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে চাহিতেন। বর্তমান যুগে অতি ক্ষুদ্র বা অতি বৃহৎ ভূখণ্ড কোনটিও কাম্য বিবেচিত হয় না। ভূখণ্ড অতি ক্ষুদ্র হইলে স্বাধীনতা বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে; আবার অতি বৃহৎ হইলে সুশাসন ব্যাহত হয়। সুতরাং যে-পরিমাণ ভূখণ্ড থাকিলে স্বাধীনতা ও সুশাসন উভয়ই সম্ভব সেই পরিমাণ ভূখণ্ডই কাম্য।

শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার (Government) : জনসমাজ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাষ্ট্র-গঠনের জন্য পরবর্তী যে-উপাদানের প্রয়োজন হয় তাহা হইল সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার। রাষ্ট্র একটি সংগঠন। যে-কোন সংগঠনের পরিচালনার ভার একদল ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্র-পরিচালনার ভার যাঁহাদের উপর থাকে, সমষ্টিগতভাবে তাঁহারা সরকার বলিয়া পরিচিত। সরকার রাষ্ট্রীয় সংগঠনের অন্তর্বর্তী সংগঠন। রাষ্ট্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি ধারণা মাত্র; ইহা মূর্ত হইয়া উঠে সরকারের মধ্যে। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সরকারই রাষ্ট্রের হইয়া কার্য পরিচালনা করে। সরকার না থাকিলে জনসমষ্টি বিশৃঙ্খল জনতায় পরিণত হইয়া সুন্দর সুশৃংখল সমাজ সৃষ্টির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইত; ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভব হইত না।

স্থায়িত্ব (Permanence) : স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জনসমাজ স্থায়ীভাবে সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থার অধীনে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করিলে, তবেই রাষ্ট্রের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে। তাই বলিয়া ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী। কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ততদিনই বজায় থাকে, যতদিন ঐ রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী থাকে। অপর রাষ্ট্র কর্তৃক বিজিত হইলে বা অপর রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলে ঐ রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতা হারায়। ফলে রাষ্ট্রের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়।

সার্বভৌমিকতা (Sovereignty) : পূর্বেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে সার্বভৌমিকতা বা চরম ক্ষমতা রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং তত্ত্বগত সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংগঠন হইতে পৃথক করে।* ইহাও বলা হইয়াছে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া একমাত্র রাষ্ট্রই আইন প্রণয়ন ও বলবৎ করিতে পারে।

সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক আছে—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। রাষ্ট্রাভ্যন্তরে শেষ কথাটি বলিবার, শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার, চূড়ান্ত আদেশ জারি করিবার ক্ষমতাকেই আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা বলা হয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই ইচ্ছা ও আদেশের অনুবর্তী হইয়া চলিতে হয়। বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলিতে বুঝায় বহিঃশক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বা স্বাধীনতা। সুতরাং সার্বভৌম রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইবে।

ভারত-রাষ্ট্র : ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারত একটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ঐ তারিখের পূর্বে ভারতবর্ষে জনসমাজ ছিল, সীমারেখা দ্বারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছিল, সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থাও ছিল, কিন্তু সার্বভৌম শক্তির অধিকারী না হওয়ায় ভারতবর্ষ পৃথক রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইত না। উক্ত তারিখে ভারতবাসীর হস্তে সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইলে ভারত রাষ্ট্র-পর্যায়ভুক্ত হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার, স্থায়িত্ব এবং সার্বভৌমিকতা —এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকিবে। ইহাদের কোনটির অভাব হইলে সংগঠনকে 'রাষ্ট্র' বলিয়া অভিহিত করা যায় না। ভারত একটি রাষ্ট্র, কারণ ইহার উক্ত সকল বৈশিষ্ট্যই আছে ; পশ্চিমবংগ আসাম প্রভৃতি রাষ্ট্র নহে, কারণ ইহাদের সার্বভৌমিকতা নাই। ইহারা ভারতীয় রাজ্যসংঘ বা

* সার্বভৌমিকতাকে তত্ত্বগত বলা হইয়াছে, কারণ সার্বভৌমিকতা বলিতে যে বহিঃশক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বুঝায় তাহা বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রেরই নাই। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই অল্পবিস্তর বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এক একটি অংশ মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলি (Units) কখনই রাষ্ট্র নহে। বাংলায় ইহাদের 'রাজ্য' বা 'প্রদেশ' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।*

রাষ্ট্র-বিচারের মাপকাঠি: কোন দেশ রাষ্ট্র কি না, তাহা বিচারের মাপকাঠি কি? আধুনিক লেখকগণের মতে, এই মাপকাঠি হইল অন্যান্য রাষ্ট্রের অথবা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations) ন্যায় আন্তর্জাতিক সংগঠনের স্বীকৃতি। রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য অন্তত কিছুসংখ্যক রাষ্ট্রের বা কোন আন্তর্জাতিক সংঘের স্বীকৃতি পাইতেই হইবে।

রাষ্ট্র ও সরকার (State and Government)

রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সরকারের মাধ্যমে। সেইজন্য সাধারণ লোকে রাষ্ট্র বলিতে সরকারকেই জানে, তাহারা রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না। প্রাচীন কালেও অনেক সময় 'রাষ্ট্র' ও 'সরকার' শব্দ দুইটির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হইত না। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই বলিয়াছিলেন, "আমিই রাষ্ট্র"। ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট রাজাদেরও দুই-একজন অনুরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। এইভাবে 'রাষ্ট্র' ও 'সরকার' শব্দ দুইটি একই অর্থে ব্যবহৃত হইলেও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করিবার প্রয়োজন আছে।

রাষ্ট্র হইল নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী, বহিঃশাসন হইতে মুক্ত, সুসংগঠিত জনসমাজ। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হইল সুশৃংখল সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রের এই কার্য সম্পাদিত হয় সরকারের মাধ্যমে। সুতরাং সরকার রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য-সাধন করিবার যন্ত্র মাত্র; সরকারই রাষ্ট্র নহে।

অধ্যাপক গার্ণার কয়েকটি উপমার সাহায্যে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে এই পার্থক্যটি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। তাহার মধ্যে একটি উপমায় তিনি রাষ্ট্রকে প্রাণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রাণীর মস্তিষ্কটাই যেমন প্রাণী নহে, তেমনি সরকারও রাষ্ট্র নহে। তবুও মস্তিষ্কের নির্দেশে প্রাণীটি যেমন চলাফেরা করে, তেমনি সরকারের নির্দেশেই রাষ্ট্রের কার্য পরিচালিত হয়। সুতরাং সরকার রাষ্ট্রের মস্তিষ্কস্বরূপ।

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখিয়াছি যে রাষ্ট্র কয়েকটি উপাদান লইয়া গঠিত হয়। সরকার ব্যতীত রাষ্ট্র গঠিত হয় না সত্য, কিন্তু সরকার রাষ্ট্র-গঠনের পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র

---

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলিকে (Units) 'রাজ্য' (States) বলা হয়; কানাডায় ইহারা 'প্রদেশ' (Provinces) বলিয়া অভিহিত। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ইহাদের 'প্রদেশ' আখ্যাই দেওয়া হইয়াছিল।

উপাদান নহে—অন্যতম উপাদান মাত্র। রাষ্ট্র-গঠনের জন্য সরকার ছাড়া আরও চারিটি উপাদান—যথা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমাজ, সার্বভৌমিকতা ও স্থায়িত্ব প্রয়োজন। সুতরাং সরকার রাষ্ট্রের অংশ মাত্র। অংশকে সমগ্র বলিয়া মনে করিলে যেরূপ ভুল হয়, সরকারকে রাষ্ট্র বলিয়া মনে করিলে সেইরূপই ভুল হইবে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের সভ্যসংখ্যা সরকারের সভ্যসংখ্যা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। রাষ্ট্র গঠিত হয় দেশের সমগ্র জনসাধারণকে লইয়া, কিন্তু সরকার গঠিত হয় মাত্র শাসনকার্য পরিচালকগণকে লইয়া। 'শাসনকার্য পরিচালকগণ' বলিতে যাঁহারা আইন প্রণয়ন, শাসন-ব্যবস্থা ও বিচার-ব্যবস্থা পরিচালনা করেন মাত্র তাঁহাদের বুঝায়। তাঁহাদের সংখ্যা দেশের সমগ্র জনসাধারণের শতাংশের একাংশও নয়।

চতুর্থত, স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সরকার কিন্তু চিরপরিবর্তনশীল। সরকারের পরিবর্তনের অর্থ শাসকগণের পরিবর্তন। শাসকগণের পরিবর্তনে রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয় না। রাশিয়ার জারের, জার্মেনীর কাইজারের পতন হইয়াছিল; কিন্তু রাশিয়া বা জার্মান রাষ্ট্রের পতন হয় নাই। মিশরের রাজা ফারুকের হাত হইতে শাসনভার সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তে আসিয়াছিল; কিন্তু ইহাতে মিশরীয় রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানেও সামরিক কর্তৃপক্ষ শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইহাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন সংঘটিত হয় নাই। আবার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলায় সরকার থাকায় আজ এই দল সরকার গঠন করিতেছে, কাল অপর দল সরকার গঠন করিতেছে। সরকারের এই ভাঙাগড়ার মধ্যে রাষ্ট্র কিন্তু ভাঙিতেছে না বা নূতন করিয়া গড়িতেছে না। স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সরকারের পরিবর্তনশীলতার মধ্যে রাষ্ট্র সাধারণত অপরিবর্তিত অবস্থাতেই থাকে।

পঞ্চমত, সকল রাষ্ট্র একই ধরনের—অর্থাৎ সকল রাষ্ট্রই জনসমাজ, ভূখণ্ড প্রভৃতি উপাদানের দ্বারা গঠিত। সরকার কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হয়—অর্থাৎ সকল সরকারের একই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। শাসনক্ষমতা একজনের হস্তে থাকিতে পারে, কয়েকজনের হস্তে থাকিতে পারে, আবার সমগ্র জনসাধারণের হস্তে থাকিতে পারে। আর একদিক দিয়া দেখিলে শাসনক্ষমতা ইংলণ্ডের ন্যায় একই সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকিতে পারে, আবার ভারতের ন্যায় সমগ্র দেশের সরকার ও দেশের অংশসমূহের সরকারগুলির মধ্যে বণ্টিতও হইতে পারে। ইহার ফলে আমরা নায়কতন্ত্র (Dictatorship), গণতন্ত্র (Democracy), যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Federal Government), এককেন্দ্রিক সরকার (Unitary Government) প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সরকারের সাক্ষাৎ পাই।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ (State and other Associations)

সমাজের আলোচনা প্রসংগে বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে সমাজের ধারণা জাতির (Nation) পরিপ্রেক্ষিতে করিয়া বলা হয় জাতীয় সমাজ—যেমন, ভারতীয় সমাজ, মার্কিন সমাজ ইত্যাদি। ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই সকল জাতীয় সমাজের অভ্যন্তরে দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকে : (ক) রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্র এবং (খ) অন্যান্য সংঘ—যথা, ধর্ম সংস্থা, শ্রমিক সংঘ, বণিক সমিতি, সাহিত্য সভা, কলা পরিষদ ইত্যাদি। রাষ্ট্রের ন্যায় এই সকল সংঘও মানুষের সামাজিক প্রকৃতির ফল। বর্তমান যুগে একমাত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমেই মানুষের জীবনের সকল দিক পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে পারে না বলিয়াই এই সকল সংঘের উদ্ভব হয়। বস্তুত, আধুনিক জীবনের ইহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে মানুষ এই সকল সংঘের সহিত নিজেকে বিশেষ জড়াইয়া ফেলে।

এইভাবে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ—উভয়ই মানুষের সামাজিক প্রকৃতির ফল হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও রহিয়াছে যথেষ্ট।

প্রথমত, রাষ্ট্রের সভ্যপদ মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না ; অন্যান্য সংঘের সভ্যপদ কিন্তু মানুষের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। রাষ্ট্রের সভ্যপদ সাধারণত মানুষের জন্ম দ্বারা নির্ধারিত হয় ; অপরদিকে সংঘের সভ্যপদ নির্ভর করে ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর। আবশ্যিকভাবে আমি ভারত-রাষ্ট্রের সভ্য, কিন্তু ফুটবল ক্লাব, সাহিত্য সভা প্রভৃতির সভ্য না হইলেও আমার চলে। উপরন্তু, কোন ব্যক্তি একসংগে একাধিক রাষ্ট্রের সভ্য হইতে পারে না, কিন্তু সে একাধিক সংঘের সভ্য হইতে পারে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফলে, কিন্তু অন্যান্য সংঘ মানুষ স্বেচ্ছায় গঠন করিয়াছে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সংঘের মধ্যে সংগঠনগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকে। এই ভূখণ্ডের বাহিরে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইতে পারে না ; ইহার বাহির হইতে উহা সভ্য সংগ্রহও করিতে পারে না। অন্যান্য সংঘের কার্যক্ষেত্র কিন্তু এইরূপ সীমানির্দিষ্ট নহে অথবা তাহাদের সভ্যগ্রহণের বেলাতেও এরূপ কোন বাধা নাই। ভারত-রাষ্ট্র পাকিস্তানে গিয়া রেলপথ পাতিতে পারে না বা ঐ দেশ হইতে সভ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের ন্যায় সামাজিক প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান ইংলণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—যে-কোন দেশেই শাখা খুলিতে বা যে-কোন দেশ হইতেই সভ্য সংগ্রহ করিতে পারে।

চতুর্থত, উদ্দেশ্যের দিক দিয়াও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। অন্যান্য সংঘের সাধারণত দুই-একটি করিয়া উদ্দেশ্য থাকে। ফলে ইহাদের কার্যাবলীও সংখ্যায় পরিমিত। যেমন, ক্রীড়া সংঘের উদ্দেশ্য হইল ক্রীড়ার ব্যবস্থা করা, ধর্ম সংস্থার

উদ্দেশ্য ধর্ম প্রচার করা, ইত্যাদি। সুতরাং ক্রীড়া সংঘের কার্য ক্রীড়া-ব্যবস্থায় এবং ধর্ম সংস্থার কার্য ধর্মপ্রচারেই সমাপ্ত হইয়া যায়। ক্রীড়া সংঘ ধর্মের ব্যাপারে বা ধর্ম সংস্থা খেলাধূলার ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামায় না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কিন্তু আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তনের মাধ্যমে সমাজের সর্বাংগীণ কল্যাণসাধন করা। এই কারণে রাষ্ট্র মাত্র দুই-একটি কার্য সম্পাদন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সমাজের কল্যাণের জন্য যখন যাহা প্রয়োজন তখন তাহাই উহাকে করিতে হয়। ফলে আধুনিক যুগে রাষ্ট্র কর্মমুখর হইয়া উঠিয়াছে—পূর্বে যে-সকল কার্য ব্যক্তি স্বয়ং সম্পাদন করিত বর্তমানে তাহার অধিকাংশই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রভুক্ত হইয়াছে। রাষ্ট্র বর্তমানে মোটরবাস চালায়, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দের ব্যবস্থা করে, কলকারখানা স্থাপন করে, জলসেচ বিদ্যুৎ-উৎপাদন প্রভৃতির ব্যবস্থা করে, ইত্যাদি। অন্যভাবে বলিতে গেলে, অন্যান্য সংঘের উদ্দেশ্য বিশেষ বলিয়া উহাদের কার্যক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ; রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধারণ বলিয়া উহার কার্যক্ষেত্রও সীমাহীন।

পঞ্চমত, রাষ্ট্র সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু অন্যান্য সংঘ দীর্ঘস্থায়ী নাও হইতে পারে। অন্যান্য সংঘের উদ্দেশ্য সাধিত হইলেও উহাদের বিলুপ্তি ঘটিতে পারে। এইরূপে প্রত্যেক জাতীয় সমাজে কত সংঘই না লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, নূতন নূতন কত সংঘেরই না উদ্ভব ঘটিতেছে। সামাজিক সংগঠনের এই চিরপরিবর্তনের মধ্যে অধিকাংশ সময় রাষ্ট্র নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকে।

পরিশেষে, রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল ক্ষমতাগত। একমাত্র রাষ্ট্রই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এই কারণে রাষ্ট্র উহার নিয়মাবলী বা আইন মান্য করাইতে বাধ্য করিতে পারে, বলপ্রয়োগ করিতে পারে। কিন্তু অন্যান্য সংঘের বলপ্রয়োগ করিবার ক্ষমতা নাই। তাহারা অনুনয়-বিনয় করিতে পারে—সভ্যপদচ্যুত করিতে পারে—কিন্তু বাধ্য করিতে পারে না বা নিয়মভংগকারীকে শারীরিক শাস্তিপ্রদানও করিতে পারে না।

এই সার্বভৌম বা সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতার জন্যই আবার প্রত্যেক সংঘকে রাষ্ট্রের ইচ্ছা, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতে হয়। না মানিলে রাষ্ট্র ঐ সংঘের বিলোপসাধন করিতে পারে। উহার স্থলে নূতন সংঘের সৃষ্টিও করিতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংঘের নিয়ামক, বিনাশক ও সৃষ্টিকর্তা—এই তিন রূপেই দেখা যায়।

৪ | রাষ্ট্রের উৎপত্তি
(Origin of the State)

মানুষের স্বাভাবিক সংঘবদ্ধতাই সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ। উদ্ভবের পর বহুদিন পর্যন্ত এই দুই সংগঠন মানুষের কোন প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই ক্রমবিকশিত হইতেছিল। তারপর এমন এক অবস্থা আসিল যখন মানুষ ইহাদের উপযোগিতা ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল এবং ইহাদিগকে পরিকল্পিত পথে পরিচালিত করিতে সচেষ্ট হইল। ইহার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু মতবাদের সৃষ্টি হইল। এইভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সৃষ্ট মতবাদগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(ক) বৈজ্ঞানিক মতবাদ এবং (খ) কল্পনাপ্রসূত মতবাদ।

মানুষের সংঘবদ্ধতার ফলেই যে সমাজ ক্রমবিকশিত হইয়া একদিন রাষ্ট্রের উদ্ভব সূচিত করিয়াছে, রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে ইহাই হইল বৈজ্ঞানিক মতবাদ। আধুনিক কালে নানা বিদ্যার চর্চার ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির এইরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘন তমসাবৃত ছিল। তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিতেন। ফলে কল্পনাপ্রসূত মতবাদসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির মধ্যে কিছু কিছু সত্য নিহিত আছে বলিয়া ইহাদের আলোচনা প্রয়োজন। উপরন্তু, কোন মতবাদকে যদি প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে তাহার বিপরীত মতবাদগুলিকে খণ্ডন করা প্রয়োজন। এই দিক দিয়াও রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির পর্যালোচনার সার্থকতা রহিয়াছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত (Theories of the Origin of the State)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির মধ্যে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদই প্রধান। অপরদিকে রাষ্ট্রের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদে। এখন প্রথমে কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির আলোচনা করিয়া পরে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিবৃত করা হইতেছে।

ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ (Theory of Divine Origin)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির মধ্যে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই মতবাদের মূল বিষয়ের বর্ণনা এইভাবে করা যায়: রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁহারই ইচ্ছায় পরিচালিত। ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁহার প্রতিনিধির

মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। রাজা হইলেন ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি। সুতরাং রাজার আদেশ অমান্য করার অর্থ ঈশ্বরের ইচ্ছা অমান্য করা। অর্থাৎ, রাজদ্রোহিতার অর্থ ধর্মদ্রোহিতা। ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া রাজা একমাত্র ঈশ্বরের নিকটই দায়িত্বশীল; প্রজাদের নিকট তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। তিনি প্রজাদের মতামত ও প্রচলিত আইনকানুনের উর্ধ্বে।

অনেক সময় নৃপতিবিহীন রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। এরূপ রাষ্ট্র ধর্মশাস্ত্রের নীতি অনুসারে শাসিত হয় এবং রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হইলেও তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্রগুলি ধর্মীয় রাষ্ট্র (Theocratic States) নামে অভিহিত। এইরূপ ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রাচীন কালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা যে ঈশ্বর-প্রেরিত শাসক ইহাতে প্রাচীন ভারতীয়গণ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। এইজন্য বিভিন্ন রাজবংশের নাম ছিল সূর্যবংশ চন্দ্রবংশ ইত্যাদি। ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসাবে ব্রাহ্মণ তখন রাজার মাথায় মুকুট পরাইয়া দিতেন। এখনও অনেক জাপানী তাহাদের রাজবংশকে সূর্য হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করে। ইউরোপে মোটামুটিভাবে ষোড়শ শতাব্দী অবধি ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদই ছিল সর্বপ্রধান মতবাদ। তাহার পর হইতে সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রচার, গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণার উদ্ভব প্রভৃতির ফলে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের প্রভাব ক্রমশ কমিয়া আসিতে থাকে এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইহা একরূপ ঐতিহাসিক মতবাদে পরিণত হয়।

সমালোচনা : বর্তমানে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদে বিশ্বাস শিক্ষিত লোক সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিয়াছে বলা চলে। রাষ্ট্রকে ঈশ্বর-সৃষ্ট মনে করিলে আইনকানুনকে সমালোচনার উর্ধ্বে রাখিতে হয়। ইহার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন করা। বুদ্ধি দিয়া, যুক্তি দিয়া বিচার করিলে স্বেচ্ছাচারিতাকে কোনমতেই সমর্থন করিতে পারা যায় না।

দ্বিতীয়ত, রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইলেও অত্যাচারী রাজাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিতে মন চায় না। ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি এত নির্দয় হইতে পারেন না যে তিনি নির্মম অত্যাচারীকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিবেন। তৈমুর লং, নাদির শা প্রভৃতিকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা অসম্ভব।

তৃতীয়ত, ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ রাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন শাসন-ব্যবস্থায় ঈশ্বরের প্রতিনিধির সন্ধান দিতে পারে না। ভারতের ন্যায় প্রজাতন্ত্রে ঈশ্বরের প্রতিনিধি কে? এ-প্রশ্নের উত্তর এই মতবাদে পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহা অসম্পূর্ণ মতবাদ।

এই সকল কারণে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ বর্তমানে পরিত্যক্ত হইলেও ইতিহাসের দিক দিয়া ইহার কিছুটা মূল্য আছে। মানুষ যখন বর্বর ও বিশৃংখল জীবন যাপন করিত, যখন ধর্ম ছাড়া আর কিছুই মানিত না তখন রাজা ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি এইরূপ প্রচার করিয়া আনুগত্য ও নিয়মানুবর্তিতার (allegiance and discipline) শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। রাজাও অনেক সময় বিশ্বাস করিতেন যে তিনি ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি ; ফলে প্রকৃতই প্রজাপালন করিতে চেষ্টা করিতেন। এই দুই-এর ফলে সুশৃংখল সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা বা রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল।

বলপ্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force)

এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে মাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা। মতবাদের সমর্থকগণের মতে, মানুষ যে শুধু সামাজিক জীব তাহা নহে, কলহপ্রিয় জীবও বটে। ক্ষমতালিপ্সা মানুষের অন্যতম প্রবৃত্তি। কলহপ্রীতি ও ক্ষমতালিপ্সার জন্য সে আদিম কাল হইতেই বলপ্রয়োগ করিয়া আসিতেছে। বলপ্রয়োগ দ্বারা প্রথমে বলবান ব্যক্তি বা বলশালী জনগোষ্ঠী (clan) কতিপয় দুর্বল ব্যক্তি বা কোন দুর্বল গোষ্ঠীকে বশীভূত করিয়া তাহার বা তাহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিল। এইরূপে উপজাতির (tribe) উদ্ভব হইল। তারপর বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বাধিল সংঘর্ষ। সংঘর্ষের ফলে বিজয়ী উপজাতি বিজিত উপজাতির উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিল। বিজয়ী উপজাতির দলপতি নরপতি বলিয়া স্বীকৃত হইল। এইভাবে উদ্ভব হইল রাষ্ট্রের।

রাষ্ট্রের উৎপত্তির এই বলপ্রয়োগ মতবাদ সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ডক্টর লীকক (Dr. Stephen Leacock)। তিনি বলেন, "ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সন্ধান করিতে হইবে মানুষের দ্বারা মানুষের উপর আক্রমণ ও তাহাদিগকে অধীনতায় আনয়ন করার মধ্যে, স্বার্থান্ধ বলবানের প্রভুত্বলিপ্সার মধ্যে।"

সমালোচনা: রাষ্ট্রের উদ্ভবে যে পাশবিক বলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। তরবারির দ্বারাই পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এ-মত স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায় না যে, একমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রের উদ্ভবে যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, ধর্মের বন্ধন, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি প্রভৃতি শক্তি কার্য করিয়াছে। কোন দলপতি গোষ্ঠী বা উপজাতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিত না, যদি-না গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিগণের অধিকাংশ তাহার আনুগত্য স্বীকার করিত। এই প্রসংগে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে। উক্তিটি হইল, "প্রজার শক্তিতেই রাজা শক্তিমান, নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত।" কতকটা স্বাভাবিক সংঘবদ্ধতার প্রেরণায়, কতকটা ধর্মভয়ে, কতকটা উপযোগিতার জন্য এবং কতকটা

বলপ্রয়োগে বশীভূত হইয়াই মানুষ রাজনেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিল—একমাত্র বল-প্রয়োগের কারণে করে নাই। সুতরাং বলপ্রয়োগকে রাষ্ট্রের উদ্ভবের একমাত্র কারণ বলিয়া বর্ণনা করিলে ভুল হইবে ; ইহা অন্যতম কারণ মাত্র।

পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal and Matriarchal Theories)

পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে পরিবার সম্প্রসারিত হইয়াই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। এই দুই মতবাদ কিন্তু অনেকাংশে পরস্পরবিরোধী। পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে আদিম সমাজে পিতাই ছিলেন গৃহস্বামী এবং পিতার দিক হইতে বংশ ও উত্তরাধিকার প্রভৃতি নির্ণীত হইত। মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে বংশ ও উত্তরাধিকার নির্ধারিত হইত মাতার দিক হইতে, পিতার দিক হইতে নহে।

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ: পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থকগণ বলেন, আদিম যুগের সমাজ ছিল কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি। পরিবারের উপর প্রবীণতম পুরুষসভ্য বা গৃহস্বামীর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। এক পরিবার যখন কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত হইল তখন এই সকল পরিবারের উপর আদি পরিবারের গৃহস্বামীর কর্তৃত্ব বজায় রহিল। এইভাবে উপজাতির (tribe) উদ্ভব হইল। উপজাতির মধ্যে কেহ কেহ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া বসবাস করিতে লাগিল এবং ফলে একটির স্থলে কয়েকটি উপজাতির সৃষ্টি হইল। আত্মীয়তাবোধে এই উপজাতিগুলির মধ্যে সংহতি বজায় রহিল ; তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিয়া কার্য করিতে লাগিল এবং ক্রমে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিল।

দুই দিক দিয়া পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথম সমালোচনা অনুসারে সমাজ প্রথমে মাতৃতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত হইয়াছিল এবং পরে আসিয়াছিল পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। অর্থাৎ, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পূর্ববর্তী।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচকগণ বলেন, সমাজ-সংগঠনের আদিমতম রূপ গোষ্ঠী (clan), পরিবার নহে। পারিবারিক জীবন সুরু হইয়াছিল বহু পরে—সামাজিক জীবন ক্রমবিকাশের পথে বহুদূর অগ্রসর হইলে।

উপসংহারে বলিতে পারা যায় যে রাষ্ট্রের উদ্ভব বিশেষ জটিলতায় আবৃত ; পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের মত অত সরলভাবে ইহার ব্যাখ্যা করা যায় না।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ: মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে প্রাচীন কালে পরিবারের উপর কর্তৃত্ব ছিল মাতার, পিতার নহে। ক্রমে এই কর্তৃত্ব সমগ্র উপজাতির (tribe) উপর পরিব্যাপ্ত হইল। এইভাবে প্রবীণতমা গৃহকর্ত্রী জননেত্রী হইয়া বসিলেন এবং রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটিল।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পূর্ববর্তী আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ইহা স্বীকার করেন। কিন্তু শারীরিক ক্ষমতায় নারী পুরুষ অপেক্ষা ন্যূন। সুতরাং স্ত্রীলোক যে সর্বস্থানেই এবং বহুদিন ধরিয়া পুরুষের উপর প্রভুত্ব করিয়াছে—এইরূপ মতবাদ অযৌক্তিক। প্রথমে সমাজ মাতৃতান্ত্রিক থাকিলেও কিছুদিন পরেই নারীর প্রভুত্বের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল পুরুষের কর্তৃত্ব। উপরন্তু, পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের মতই মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ একমাত্র পরিবার সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করে। সুতরাং প্রথমোক্ত মতবাদের মতই ইহা রাষ্ট্রের উদ্ভবের আংশিক বা অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা মাত্র। আত্মীয়তাবোধ বা পরিবারের সম্প্রসারণ ছাড়াও যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি প্রভৃতি নানা কারণে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদই সমধিক প্রসিদ্ধ। মতবাদটি সম্বন্ধে পূর্বেই কিছুটা আলোচনা করা হইয়াছে (১৭-১৮ পৃষ্ঠা)। এই কল্পনাপ্রসূত মতবাদ অনুসারে আদিম মানুষের মধ্যে চুক্তির ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে।

মতবাদের সংক্ষিপ্তসার : সংক্ষেপে এই মতবাদকে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে : রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষ 'প্রাকৃতিক অবস্থা'র (state of Nature) মধ্যে বাস করিত। কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, এই অবস্থায় সমাজও সংগঠিত হয় নাই ; আবার কয়েকজনের মতে, তখন সমাজ সংগঠিত হইয়াছিল, কিন্তু রাজনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে নাই। 'প্রাকৃতিক অবস্থা'য় সমাজ সংগঠিত হউক আর না-হউক, রাষ্ট্রের উদ্ভব না হওয়ায় তখন মানুষের দ্বারা প্রণীত কোন আইনকানুন ছিল না। মানুষ তখন যথেচ্ছভাবে বিচরণ এবং যথেচ্ছভাবে জীবন যাপন করিত। এই যথেচ্ছাচারিতার উপর কোন বাধা ছিল না। অনেকে কিন্তু বলেন যে একমাত্র বাধা ছিল কতকগুলি 'স্বাভাবিক আইন' (Natural Laws) বা ন্যায়বোধের স্বাভাবিক নীতি। এই সকল 'স্বাভাবিক নীতি'র ফলে মানুষের হিংসা, হত্যা করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিগুলি দমিত থাকিত। এই অবস্থায় বেশী দিন বাস করা সম্ভব না হওয়ায় আদিম মানুষ পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্রের পত্তন করিল। রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে স্বাভাবিক আইনের স্থানাধিকার করিল মানুষের দ্বারা প্রণীত আইনকানুন।

আদিম মানুষের মধ্যে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে—এই মতবাদ অতি প্রাচীন। প্রাচীন গ্রীসের রাজনৈতিক সাহিত্যে এবং আমাদের দেশে মহাভারত ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই মতবাদকে পরিস্ফুটিত করিয়া ইহার বর্তমান রূপদান করিয়াছেন তিনজন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। ইহারা হইলেন সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ চিন্তাবীর হবস্ ও লক্ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক রুশো।

হবস্ (Hobbes) : হবসের মতে, প্রাকৃতিক অবস্থায় কোনরূপ সমাজজীবনের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই কারণে এই অবস্থা ছিল অতি ভয়াবহ। আদিম মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কোন বিরাম ছিল না। কোনরূপ আইনকানুনের বাধা ছিল না* বলিয়া তখন অসৎ উপায়ে ও নির্মমভাবে স্বার্থসাধনের চেষ্টা করিত। ফলে প্রত্যেকেই ছিল প্রত্যেকের শত্রু এবং প্রত্যেকেই ছিল প্রতিবেশীর ভয়ে ভীত; সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ প্রতিবেশীকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত না। প্রতিবেশীকে এড়াইবার একমাত্র উপায় ছিল নিঃসংগ জীবন যাপন করা। আদিম মানুষ তাহাই করিতে লাগিল। ফলে জীবন হইয়া উঠিল নিঃসংগ, অসহায়, ঘৃণ্য, পাশবিক এবং অনিশ্চিত (Life became solitary, poor, nasty, brutish and short)।

তারপর মানুষ এই দুর্বিষহ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের উপায় খুঁজিতে লাগিল। মুক্তি আসিল সমাজ-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া। আদিম মনুষ্যগণ নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া সমস্ত ক্ষমতা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের (assembly of men) হস্তে তুলিয়া দিল। এইভাবে চুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ হইলেন সার্বভৌম (sovereign)। সার্বভৌম শক্তির উদ্ভবের ফলে প্রাকৃতিক অবস্থার অবসান ঘটিল, বিরোধ সংযত হইল এবং প্রতিষ্ঠিত হইল সুশৃংখল সমাজজীবন বা রাষ্ট্র।

লক্ (Locke) : লক্ যে প্রাকৃতিক অবস্থার চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা হবস্-কল্পিত প্রাকৃতিক অবস্থার মত ভয়াবহ নহে। হবসের ধারণার বিরোধিতা করিয়া লক্ বলেন যে প্রাকৃতিক অবস্থায় একপ্রকার সমাজজীবন গঠিত হইয়াছিল। এইজন্য প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল শান্তি শুভেচ্ছা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার রাজ্য। এই অবস্থায় মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত 'স্বাভাবিক আইন' (Natural Laws) বা ন্যায়বোধের স্বাভাবিক নীতি দ্বারা।

তবুও প্রাকৃতিক অবস্থার অনেক ত্রুটি ছিল। প্রথমত, কোন্‌টি ন্যায়বোধের স্বাভাবিক নীতি এবং কোন্‌টি নয়—সে-সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। দ্বিতীয়ত, এই সকল নীতির ব্যাখ্যার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তৃতীয়ত, আইন ভংগ করিলে যেরূপ শাস্তিপ্রদান করা হয় এই সকল নীতি ভংগ করিলে সেরূপ কোন শাস্তিপ্রদানের বন্দোবস্ত ছিল না।

---

* হবস্ প্রাকৃতিক অবস্থায় 'স্বাভাবিক আইন' বা ন্যায়বোধের স্বাভাবিক নীতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই।

এই সকল অসম্পূর্ণতার জন্য প্রাকৃতিক অবস্থায় জীবন যাপন নিরাপদ হইতে পারে নাই। এই নিরাপত্তার জন্যই মানুষ চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রের। এই চুক্তি হইয়াছিল সম্প্রদায়ের সকলের সহিত প্রধান বা রাজা বলিয়া নির্বাচিত ব্যক্তির সংগে।

রুশো (Rousseau):- লক্ হইতে আরও এক স্তর উর্ধ্বে উঠিয়া রুশো বলিয়াছেন যে প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল একরূপ মর্ত্যের স্বর্গ। এই অবস্থায় সমাজ সম্পূর্ণ সাম্যবাদী ছিল এবং মানুষ সুন্দর সহজ সুখী ও সরল জীবন যাপন করিত। কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে এই আদিম সরলতা ও সুখ ক্রমশ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, এবং মানুষ নিজের এবং অপরের দ্রব্যের মধ্যে প্রভেদ করিতে শিখিল। তখন প্রাকৃতিক অবস্থা প্রকৃতপক্ষেই হবস্-কল্পিত প্রাকৃতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি হইয়া দাঁড়াইল। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সংঘর্ষ, নরহত্যা, যুদ্ধবিগ্রহ প্রাকৃতিক অবস্থার বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়ায় মানুষ ইহা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। এখানেও মুক্তি আসিল চুক্তির মাধ্যমে, রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া।

হবস্ ও লকের মত রুশোর কল্পিত চুক্তিতে কিন্তু রাজার স্থান নাই। আদিম মনুষ্যগণ চুক্তি দ্বারা ক্ষমতা কোন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে সমর্পণ করে নাই, ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছিল চুক্তি দ্বারা সৃষ্ট সমাজকে যাহাকে রুশো 'সাধারণের ইচ্ছা' (General Will) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

সমালোচনা : সামাজিক চুক্তি মতবাদ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক চিন্তাজগতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর হইতেই বিভিন্ন দিকে সমালোচিত হইয়া ইহার প্রভাব কমিয়া আসিতে থাকে।

এই মতবাদের প্রধান বিরুদ্ধ সমালোচনা হইল যে ইহা অনৈতিহাসিক। আদিম যুগে রাজনৈতিক চেতনাশূন্য মনুষ্যগণ হঠাৎ একদিন পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র-গঠন করিল এইরূপ উদাহরণ কোন দেশের ইতিহাসেই পাওয়া যায় না। সুতরাং রাষ্ট্রের উৎপত্তির ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা হিসাবে এই মতবাদ সত্য নহে।

দ্বিতীয়ত, এই মতবাদ ভ্রান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। চুক্তি বলিতে বুঝায় আইনানুমোদিত বুঝাপড়া। অর্থাৎ, আইনসংগতভাবে পরস্পরের মধ্যে যে-অংগীকার করা হয় তাহাকেই চুক্তি বলে। সুতরাং চুক্তির পূর্বে প্রয়োজন হইল আইন প্রণয়নের। সামাজিক চুক্তি মতবাদে কল্পনা করা হইয়াছে যে রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বেই, আইন প্রণয়নের পূর্বেই, মানুষ চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল। এইরূপ ধারণা যুক্তির দ্বারা কখনই সমর্থিত হইতে পারে না।

তৃতীয়ত, যে প্রাকৃতিক অবস্থায় আদিম মনুষ্যগণ রাষ্ট্র-গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে তাহাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। লোকে রাষ্ট্রের উপযোগিতা বুঝিতে পারে, ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাহাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার (political consciousness) উন্মেষ হইলে। আদিম মনুষ্যগণ রাষ্ট্র কাহাকে বলে তাহা জানিত না ; সংগঠন সম্বন্ধেও তাহাদের কোন ধারণা ছিল না। এই অবস্থায় তাহারা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিল কিরূপে ? কি করিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল যে রাষ্ট্র গঠিত হইলেই তাহাদের প্রাকৃতিক অবস্থার দুঃখদুর্দশার অবসান ঘটিবে ? এই প্রশ্নের উত্তর সামাজিক চুক্তি মতবাদে পাওয়া যায় না।

চতুর্থত, অনেকের মতে এই মতবাদ বিশেষ বিপজ্জনক—ইহা রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার ঘোরতর পরিপন্থী। শাসক ও শাসিতের মধ্যে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে এই ধারণা প্রচার করা হয় বলিয়া শাসিতেরা সকল সময় শাসকের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়ায়। ফলে দেখা দেয় গণ-অভ্যুত্থান বা বিপ্লব। বস্তুত, অষ্টাদশ শতাব্দীর দুইটি প্রধান বিপ্লব—ফরাসী বিপ্লব এবং আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা-সংগ্রাম বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল সামাজিক চুক্তি মতবাদ হইতে।

উপরি-উক্ত ত্রুটির জন্য রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বর্তমানে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। অন্যতম রাজনৈতিক আদর্শ গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণার পরিস্ফুটনে এই মতবাদ বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের পূর্বে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদই ছিল প্রচলিত মতবাদ। ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ অনুসারে রাজার ক্ষমতা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত ; সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুসারে ক্ষমতা কিন্তু জনসাধারণ বা শাসিতের নিকট হইতে চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত। এইভাবে শাসিতকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস বলিয়া বর্ণনা করিয়া গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করা হইয়াছে—ঈশ্বরের আদেশের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে জনমতের প্রাধান্য।

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (Historical or Evolutionary Theory)

দেখা গেল যে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ—কোনটিই গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ কোনটিই যথেষ্ট নহে। এ-সম্বন্ধে গার্ণার সুস্পষ্টভাবেই

বলিয়াছেন, "রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে, পাশবিক শক্তিরও ফল নহে, প্রস্তাব বা চুক্তির দ্বারাও সৃষ্ট হয় নাই। শুধু পরিবারের সম্প্রসারণ বলিয়াও ইহাকে গ্রহণ করা যায় না।" তবে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা যাইবে কিভাবে? রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য মতবাদ কি? রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদে। এই মতবাদ দীর্ঘ ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফল—মানুষের কল্পনা-সৃষ্ট নহে। এই মতবাদ অনুসারে মানব-সমাজ দীর্ঘদিন ধরিয়া বিবর্তিত হইয়া বর্তমানের জটিল রূপ গ্রহণ করিয়াছে—হঠাৎ একদিন ঈশ্বরের খেয়াল বা মানুষের প্রচেষ্টার ফলে সৃষ্ট হয় নাই। এ-সম্বন্ধে বার্জেসের (Burgess) উক্তি হইল, "রাষ্ট্র মানব-সমাজের বিরতিবিহীন ক্রমবিকাশের ফল" (The State is the product of continuous development of human society)।

কবে এবং কিভাবে রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। তবে একথা ঠিক যে মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্ব অতি আদিম কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং ধীরে ধীরে এই সামাজিক কর্তৃত্ব রাজনৈতিক কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহাও বলা যায় যে অন্তত কয়েকটি শক্তি এই রূপান্তরকার্যে—অর্থাৎ রাষ্ট্র-গঠনে, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। শক্তিগুলি হইল রক্তের সম্বন্ধ বা আত্মীয়তাবোধ, ধর্ম, যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি এবং রাজনৈতিক চেতনা। এখন ইহাদের সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহাদের আলোচনা পৃথক পৃথক ভাবে করা হইলেও পৃথক পৃথক ভাবে কার্য করে নাই। রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পরিমাণে পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত থাকিয়া ইহারা সকলেই একসংগে কার্য করিয়াছে। তবে কোন্‌টি কোন্ সময় কিভাবে এবং কতটা পরিমাণে কার্যকর হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

১। **রক্তের সম্বন্ধ (Kinship)ঃ** রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাস সুরু করিতে পারা যায় সমাজে পারিবারিক জীবনের সূত্রপাতের পর হইতে। পারিবারিক জীবনের পূর্বে মানুষ যখন সাম্যবাদী সমাজজীবন যাপন করিত তখন তাহারা আনুগত্যের শিক্ষা লাভ করে নাই। অথচ আনুগত্যই প্রকৃত সংঘবদ্ধ জীবনের মূলসূত্র। মানুষের আনুগত্য প্রথম প্রকাশ পায় পারিবারিক জীবনে। পরিবারের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শনের সংগে সংগে তাহারা গৃহকর্তারও আদেশপালন করিতে শিখে। এইভাবে আনুগত্যের ভিত্তিতে নূতন সংঘবদ্ধ জীবনের সূত্রপাত হয়।

পরিবারের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে একই পরিবার বহু পরিবারে বিভক্ত হইয়া গেল। তখন আর গৃহকর্তার পক্ষে সকল পরিবারের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা

সম্ভব হইল না। এই অবস্থাতে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে সংহতি বজায় রাখিল আত্মীয়তাবোধ। বিভিন্ন পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ একই পূর্বপুরুষের বংশধর হইয়া নিজেদের পরিচয় দিত বলিয়া তাহারা পরস্পরের সহিত ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ রহিল। এইভাবে এক নূতন গোষ্ঠীজীবনের* (a new clan life) উদ্ভব হইল। এইরূপ গোষ্ঠীর উপর সামগ্রিকভাবে কর্তৃত্ব করিতেন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবীণতম ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-প্রধান। সকলে তাঁহার আদেশপালন করিয়া চলিত।

২। **ধর্ম (Religion) ঃ** রক্তের সম্বন্ধ বা আত্মীয়তাবোধের সমসাময়িক আর একটি শক্তি যাহা প্রাচীন সমাজের সংহতি বজায় রাখিয়াছিল তাহা হইল ধর্ম। গোষ্ঠীর সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যখন আত্মীয়তাবোধ শিথিল হইয়া পড়িল তখন ধর্ম না থাকিলে সমাজ যে ধ্বংস হইত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

ধর্ম বলিতে তখনকার দিনের লোক বুঝিত প্রকৃতি-পূজা এবং পূর্বপুরুষদের পূজা। আদিম মানুষ ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, ঋতু-পরিবর্তন, জীব ও উদ্ভিদের মৃত্যু প্রভৃতি স্বাভাবিক ঘটনাকে দেবতার কোপ বলিয়া মনে করিত এবং ইহাদের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বজ্রের দেবতা, ঋতুর দেবতা, সংহারের দেবতা প্রভৃতির পূজা করিত। অপরদিকে তাহারা আবার বিশ্বাস করিত যে যত রোগশোক দুঃখদুর্দশা পূর্বপুরুষদেরই অভিশাপের ফল। সুতরাং পূর্বপুরুষদের সন্তুষ্ট রাখিবার জন্যও তাহারা তাঁহাদের পূজা করিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল পূজাপার্বণ সম্পাদিত হইত গোষ্ঠীপতির অধীনে। তখন লোকের বিশ্বাস ছিল যে মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মা প্রবীণদের মাধ্যমেই পৃথিবীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে এবং বজ্র ঋতু সংহার প্রভৃতির দেবতাগণকে কিভাবে সন্তুষ্ট করিতে হয় তাহা একমাত্র প্রবীণরাই জানেন। গোষ্ঠীপতিই ছিলেন প্রবীণতম ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহাকে অমান্য করার অর্থ পূর্বপুরুষদের আত্মা ও অসংখ্য দেবদেবীর অভিশাপ কুড়ান। এইভাবে গোষ্ঠীপতি সমাজের প্রধান পুরোহিত হিসাবে স্বীকৃত হইয়া ধর্মাচরণ পরিচালনা করিতে লাগিলেন; সংগে সংগে আবার সমাজকে শাসনও করিতে লাগিলেন। সকল সময়ই যে গোষ্ঠীপতি সমাজ শাসন করিতেন তাহা নহে। অনেক ক্ষেত্রে লোকে গোষ্ঠীপতি অপেক্ষা যাদুকরদেরই বশ্যতা স্বীকার করিত, কারণ যাদুবিদ্যার সাহায্যে তাহারা লোককে ভীত করিতে সমর্থ হইত। যাহা হউক, ক্রমে সমাজের উপর গোষ্ঠীপতি বা যাদুকরের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

---

* নূতন গোষ্ঠীজীবন বলা হইতেছে, কারণ আদিমতম যুগে যখন পরিবারের উদ্ভব হয় নাই তখনও মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বাস করিত। এই অবস্থাকে 'পুরাতন গোষ্ঠীজীবন' বলা হয়।

৩। **যুদ্ধবিগ্রহ (War) :** যুদ্ধবিগ্রহ রাষ্ট্রের উদ্ভবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ণ খাদ্যাহরণের যুগ হইতে মানুষ যখন পশুচারণ যুগে গিয়া পড়িল তখন হইতেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকিত। পরবর্তী—অর্থাৎ কৃষিকর্মের যুগে এই সংঘর্ষের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইল। সুবিধা পাইলেই এক দল অপর দলের উপর আক্রমণ করিয়া উহার কৃষিজমি, ফসল, গৃহপালিত পশু প্রভৃতি কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিত। অনেক সময় আবার যাহারা পরাজিত হইত তাহাদের বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া ক্রীতদাসেও পরিণত করিত। ফলে জনগোষ্ঠীকে সর্বদাই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত। আত্মরক্ষা করিতে করিতে তাহারা একদিন আক্রমণ করিতেও শিখিল এবং ফলে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়া দাঁড়াইল সমাজজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধবিগ্রহ সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়ায় যুদ্ধনায়কের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাইল। যুদ্ধের সময় নেতৃত্ব করা ছাড়াও তিনি শান্তির সময়ে আভ্যন্তরীণ বিবাদবিসংবাদের মীমাংসা করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষেত্রে আবার তিনি সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিতের কার্যও করিতেন। এইরূপে যুদ্ধনায়ক সমাজের সর্বক্ষমতার অধিকারী হইয়া একদিন রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।

৪। **ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি (Private Property) :** ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভব মানুষকে রাজনৈতিক জীবনের পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভবের পূর্বে আইনকানুনের কোন প্রয়োজন ছিল না। তখন সমাজ ছিল পূর্ণ সাম্যবাদী। আহৃত খাদ্য সকলে মিলিয়া সমভাবে ভোগ করিত; শিশু ছিল জনগোষ্ঠীর সকলের শিশু। তারপর মানুষ যখন পশুচারণ জীবনে গিয়া উপনীত হইল তখন ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভবের জন্য চৌর্যবৃত্তির বিরুদ্ধে এবং উত্তরাধিকারের সম্পর্কে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে এই সম্পর্কে প্রণীত হইল বিভিন্ন নিয়মকানুন ও প্রথা। পশুচারণ জীবনের পর মানুষ যখন কৃষি-জীবন সুরু করিল তখন ভূমি ও ক্রীতদাসকেই প্রধান সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হইতে লাগিল। কৃষি-জীবনে অধিকতর ধনবৈষম্যের ফলে ধনসম্পত্তি লইয়া বিবাদবিসংবাদ মীমাংসার জন্য আরও অধিক সংখ্যক নিয়মকানুন প্রণীত হইল। তারপর পণ্য বিনিময়-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বাণিজ্যের প্রসার হইল এবং ইহার ফলে উদ্ভব হইল বণিকশ্রেণীর। বণিকশ্রেণীর স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে এক জনগোষ্ঠীকে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সহিত বিরোধ সংযত করিতে হইত; অনেক সময় আবার বিরোধে লিপ্ত হইতে হইত।

এইভাবে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়ন ও যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সরকারের সৃষ্টি অপরিহার্য করিয়া তুলে। সরকার সৃষ্ট হওয়ায় রাষ্ট্রের গঠন সম্পূর্ণ হইল।

৫। **রাজনৈতিক চেতনা (Political Consciousness)ঃ** রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশে রাজনৈতিক চেতনার ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না। আদিম কাল হইতেই মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বাস করিলেও তাহারা সংঘবদ্ধতার আদর্শ সম্বন্ধে সুরু হইতেই সচেতন ছিল না। প্রথমে আত্মীয়তাবোধ ও ধর্মের বন্ধন গোষ্ঠীর প্রতি অন্ধ আনুগত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। তখন লোকে ভয়ে বা অপরের অনুকরণে গোষ্ঠীপতিদের আনুগত্য স্বীকার করিত। এই অন্ধ আনুগত্যের যুগকে 'রাজনৈতিক অবচেতনা'র যুগ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। গোষ্ঠী ক্রমশ সম্প্রসারিত হইতে থাকিলে এই অবচেতনা ঘুচিয়া গেল। বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘাতের ফলে মানুষ দলীয় ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হইল—বুঝিল ঐক্য ব্যতীত সংঘর্ষে জয়ী হওয়া সম্ভব নয়। এই অবস্থাকে 'রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ' (dawn of political consciousness) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের ফলে লোকে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে যুদ্ধনায়কদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিল এবং ইহার ফলে যুদ্ধনায়কদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্বীকৃত হইল।

শান্তির সময়েও লোকে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির সংরক্ষণ এবং বিবাদবিসংবাদ মীমাংসার জন্য সচেতনভাবে ঐ যুদ্ধনায়কদের অনুগত হইয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে যুদ্ধনায়কগণ রাজার আসনে বসিলেন এবং প্রজার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাজার অধীনে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিল।

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদের মূল্যঃ ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রত্যেকটি মতবাদের কিছু-না-কিছু অংশের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, রক্তের সম্বন্ধ পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের নির্দেশ করে; দ্বিতীয়ত, ধর্ম ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের ইংগিত দেয়, তৃতীয়ত, যুদ্ধ-বিগ্রহ রাষ্ট্র-গঠনে বলপ্রয়োগের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং চতুর্থত, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি ও রাজনৈতিক চেতনা সামাজিক চুক্তিবাদের আভাস দেয়। এই কারণগুলির কোনটিই এককভাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব ব্যাখ্যা করে না, অথচ ইহাদের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশে অল্পবিস্তর সহায়তা করিয়াছে। ঐতিহাসিক মতবাদের সার্থকতা এইখানে যে অন্য কোন মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির সকল কারণের ব্যাখ্যা সমভাবে করে নাই; তাহারা একটিমাত্র শক্তিকে রাষ্ট্রের উদ্ভবের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া ভুল করিয়াছে।

৫ আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী
(Ends and Functions of the Modern State)

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য (Ends of the State)

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ একমত হইতে পারেন নাই। এ্যারিস্টটল প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকের মতে, রাষ্ট্র সামাজিক সংগঠনের চরম বিকাশ ; সুন্দর জীবন সম্ভব করিবার জন্যই ইহার অস্তিত্ব। রাষ্ট্র ব্যতীত মানুষের পক্ষে সুন্দর জীবন উপলব্ধি করা বা আত্মবিকাশ কোনমতেই সম্ভব নয়। অপরদিকে আবার কাহারও কাহারও ধারণায়, রাষ্ট্র অকল্যাণকর অথচ অপরিহার্য সংগঠন মাত্র। মানুষের প্রকৃতিগত ত্রুটির জন্যই ইহার অস্তিত্ব। মানুষের মধ্যে যদি হিংসা দ্বেষ পরদ্রব্য-লোভ হত্যার ইচ্ছা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিগুলি না থাকিত তবে ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন হইত না। বস্তুত, এগুলিকে দমিত রাখাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই দুই বিপরীত চরম মতবাদের মধ্যপন্থাও অনেকে অনুসরণ করিয়াছেন। মোটামুটিভাবে ইহাদের মতে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ : (ক) আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া সুশৃংখল সমাজজীবন সম্ভব করা, (খ) জনসাধারণের আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক কল্যাণের পথ সুগম করা এবং (গ) মানব-সভ্যতার উন্নয়নে সহায়তা করিয়া বিশ্বজনীন উদ্দেশ্যসাধন করা।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আধুনিক অভিমত (Modern View about the End of the State) : ল্যাস্কি প্রভৃতি আধুনিক লেখকের মত হইল যে, উপরি-উক্তভাবে চিরকাল ও সর্বদেশের লোকের জন্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যায় না। দেশ ও কাল ভেদে রাষ্ট্রেরও উদ্দেশ্যের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে।

তবুও সাধারণভাবে বলিতে পারা যায় যে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সুন্দর জীবন সম্ভব করা। এই সুন্দর জীবন সকলেরই সুন্দর জীবন—ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের নয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের কল্যাণসাধন—শ্রেণী বা ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থসাধন নয়। জনসাধারণের কল্যাণের পরিবর্তে রাষ্ট্র যদি কোন শ্রেণী বা ব্যক্তির স্বার্থসাধনে নিয়োজিত থাকে তবে ঐ রাষ্ট্র উদ্দেশ্যচ্যুত হইয়াছে—আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এ্যারিস্টটল এরূপ রাষ্ট্রকে 'বিকৃত রাষ্ট্র' (Perverted State) আখ্যা দিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে মতবাদ (Theories of State Functions)

সর্বসাধারণের কল্যাণসাধন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করিলে প্রশ্ন উঠে যে, কোন্ কোন্ কার্য সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্র এই উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারে? দুঃখের বিষয়

এ-সম্বন্ধেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মোটেই একমত নহেন। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে দুইটি প্রধান মতবাদ প্রচলিত আছে—(ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং (খ) সমাজতন্ত্রবাদ।

ক। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) : যে সরকার সর্বাপেক্ষা কম শাসন করে তাহাই শ্রেষ্ঠ—ইহাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল বক্তব্য। এই প্রকার শাসনের উদ্দেশ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণের মতে, ইহা রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য। একমাত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংরক্ষণ দ্বারাই রাষ্ট্র তাহার উদ্দেশ্যসাধন—অর্থাৎ সর্বসাধারণের কল্যাণসাধন করিতে পারে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংরক্ষণ যখন রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য তখন উহার কার্যাবলী হইবে ন্যূনতম—সংখ্যায় মাত্র দুইটি : (১) দেশে শান্তিশৃংখলা প্রতিষ্ঠার দ্বারা ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সম্পত্তি রক্ষা করা এবং (২) বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করা। সুতরাং রাষ্ট্রের কার্য হইল পুলিসের ন্যায় রক্ষাকার্য মাত্র। এইজন্য এই প্রকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রকে পুলিসী রাষ্ট্র (Police State) বলা হয়।

সমর্থন : নানা দিক হইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থন করা হইয়াছে। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যক্তিই তাহার নিজের ভালমন্দ সম্যকভাবে বুঝিতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে কর্তব্য ব্যক্তিকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া।

জীববিজ্ঞানের দিক হইতে যুক্তি দেখান হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে যোগ্যতমেরই বাঁচিবার অধিকার আছে। সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া দুর্বলকে রক্ষা করা অযৌক্তিক ও অন্যায়।

অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক হইতে বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ফলে অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে এবং ইহাতে ভোগ্যদ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন এবং স্বল্প দামে বিক্রীত হয়। সুতরাং সমাজও বিশেষ লাভবান হয়।

অভিজ্ঞতা হইতে ইহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, শান্তিশৃংখলা রক্ষা ছাড়া সমাজজীবনের অন্যান্য অংশে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে অনেক সময় বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বলিতে বুঝায় সরকারী হস্তক্ষেপ এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালনা বলিতে বুঝায় দলীয় সরকার (Party Government) কর্তৃক পরিচালনা। দলীয় সরকারের নীতি প্রায়ই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। আবার সরকার বিভিন্ন নীতি লইয়া পরীক্ষাও চালায়। ফলে জনসাধারণের জীবন হইয়া উঠে ব্যতিব্যস্ত; ইহাতে সময় ও অর্থের অপচয় ঘটে।

ত্রুটি : কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ত্রুটিগুলি উপেক্ষণীয় নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তিনটি প্রধান ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত—যথা, (ক) প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের ভালমন্দ

বুঝিবার সমান ক্ষমতা ও দূরদৃষ্টি আছে ; (খ) প্রত্যেকেরই নিজের মংগলসাধনের জন্য অপরের সমান ক্ষমতা ও স্বাধীনতা আছে এবং (গ) প্রত্যেকে নিজ নিজ অভাবপূরণের চেষ্টা করিলে সমাজের কল্যাণ আপনাআপনিই সাধিত হয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচকগণ দেখাইয়াছেন যে এই তিনটি ধারণাই ভ্রান্ত। প্রথমত, প্রত্যেকেরই ভালমন্দ বুঝিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা নাই। এক কারণে মানুষ কর্মপ্রচেষ্টায় অনেক সময় অন্ধভাবে অগ্রসর হয়। উদাহরণস্বরূপ, খাদ্য-সংকটের সময় খাদ্য-মজুতের উল্লেখ করিতে পারা যায়। খাদ্য-সংকট দেখা দিলে লোকে অন্ধভাবে খাদ্য-মজুতে অগ্রসর হইয়া অবস্থাকে আরও সংগীন করিয়া তুলে। সুতরাং অন্ধ কর্ম-প্রচেষ্টাকে হাত ধরিয়া ঠিক পথে লইয়া যাইবার জন্য প্রয়োজন হইল রাষ্ট্রের। আমাদের উদাহরণে রাষ্ট্র ব্যক্তির খাদ্য-মজুতের স্বাধীনতাকে খর্ব করিয়া খাদ্য-সংকটকে দূর করিতে চেষ্টা করিবে।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকেরই নিজের মংগলসাধনের জন্য অপরের সমান ক্ষমতা থাকে না। কারখানার মালিকের সহিত দরাদরি করিয়া শ্রমিক কখনই শ্রমের উচিত মূল্য আদায় করিতে পারে না। সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অধীনে শ্রমিকের 'দরাদরির অবাধ স্বাধীনতা'র অর্থ তাহার পক্ষে অর্ধাহারে বা অনাহারে থাকিবার স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ স্বাধীনতাকে আদর্শ হিসাবে কখনই সমর্থন করিতে পারা যায় না। অতএব, রাষ্ট্রের কর্তব্য মালিকের স্বাধীনতাকে খর্ব করিয়া তাহাকে ন্যায্য মজুরি প্রদান করিতে বাধ্য করা।

তৃতীয়ত, প্রত্যেকেই তাহার ব্যক্তিগত অভাবপূরণের চেষ্টা করিলেই যে সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে না তাহা পূর্বোক্ত উদাহরণ হইতেই বুঝা যাইবে। সকলেই খাদ্য-মজুতের চেষ্টা করিলে দেশে খাদ্য-সংকট দূর না হইয়া বরং বিপরীত ফলই হইবে।

উপসংহার : রাষ্ট্র যে মাত্র পুলিস-সংগঠন নহে, একথা বর্তমানে সকলেই স্বীকার করেন। রক্ষাকার্য ছাড়াও এমন কতকগুলি কার্য আছে যাহা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ব্যতীত সম্ভব নহে। উদাহরণস্বরূপ, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন বা বেকার-সমস্যার সমাধানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অবশ্য একটি বিশেষ গুণও আছে। ইহা ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা দেয়, তাহাকে উদ্যোগী করিয়া তুলে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই আত্মনির্ভরশীলতা ও উদ্যোগ বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। এই কারণে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভূমিকা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

খ। সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) ঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিবাদস্বরূপ সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম। সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্র কখনই সমাজ-জীবনের সামগ্রিক কল্যাণসাধন করিতে পারে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রে থাকে

অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা। ইহার ফলে ক্ষমতাবান ও ধনীরা বিশেষ সুবিধাভোগ করে এবং দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তি পশুর পর্যায়ে নামিয়া আসে। মালিকের সহিত দরাদরির সমান ক্ষমতা থাকে না বলিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণী সর্বদা বেকারাবস্থা, অর্ধাহার ও অনাহারের মধ্যে বাস করে। দ্বিতীয়ত, এই কারণে সমাজে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ লাগিয়াই থাকে। তৃতীয়ত, অবাধ প্রতিযোগিতার জন্য কাম্য ভোগ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন এবং স্বল্প দামে বিক্রীত হইবে—এরূপ ধারণা করা ভুল। পুঁজিপতি মাত্র সেই সকল দ্রব্যই উৎপাদনে মনোযোগী হয় যাহাতে তাহার মুনাফার সম্ভাবনা অধিক থাকে। ঔষধের পরিবর্তে যদি মদ্য বিক্রয় করিয়া বেশী লাভ হয় তবে সে ঔষধের কারখানা তুলিয়া দিয়া মদের কারখানাই খুলিবে। ফলে ঔষধের উৎপাদন কমিবে কিন্তু সমাজে মদ্যপানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

প্রকৃতি ও লক্ষ্য : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এই সকল কুফল দূর করিবার উদ্দেশ্যে যে কর্মমুখর রাষ্ট্রের তত্ত্ব প্রচার করা হয়, তাহাই সংক্ষেপে সমাজতন্ত্রবাদ নামে অভিহিত। সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের পক্ষে শুধু রক্ষাকার্য বা পুলিসের কার্য সম্পাদন করিলেই চলিবে না; রাষ্ট্রকে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা নিজ মালিকানায় আনিয়া পরিকল্পিত পদ্ধতিতে উহার পরিচালনার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। ইহাতে যথেষ্ট উৎপাদন হইবে, শ্রমিক ন্যায্য মজুরি পাইবে এবং ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচিবে। ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ত্রুটিগুলি দূরীভূত হইবে। অবশ্য ইহাতেও যদি সমাজ-জীবনে পূর্ণ মংগলের পদধ্বনি শুনা না যায়, তবে রাষ্ট্রকে ব্যক্তি-জীবনের অন্যান্য দিকেও হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। মোটকথা, সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সীমা নির্দেশ করা যায় না। সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে ব্যক্তিগত মুনাফা নাই, শোষণ নাই, মানুষে মানুষে ভেদ নাই—যেখানে সকলেই সুখী, সকলেই তৃপ্ত। এইরূপ সমাজ-গঠনের জন্য প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রকে ব্যক্তির জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সর্ববিষয়ে বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও দার্শনিকের (friend, guide and philosopher) কাজ করিতে হইবে। এইরূপ সমাজে ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা কিছু থাকিবে না; সে হইবে সমাজ বা রাষ্ট্রেরই একটি অংশ। সমাজের মংগলকেই সে নিজের মংগল বলিয়া গণ্য করিবে এবং ঐ মংগলসাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকিবে। এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি হইল সমাজতন্ত্রবাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ (Forms of Socialism) :

সমাজতন্ত্রের মূলনীতি সম্বন্ধে সকলে একমত হইলেও উহা উপলব্ধির পদ্ধতি এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার গঠন সম্পর্কে সমর্থকগণের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য সমাজতন্ত্রবাদ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে—যথা,

রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ, সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ, যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদ।

ক। **রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ (State Socialism) :** রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ সমষ্টিবাদ (Collectivism) নামেও অভিহিত। ইহা ধীরে ধীরে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে উৎপাদন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করিয়া সমাজে সাম্য ও সর্বাধিক কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। বলা হয়, ভারত এইরূপ সমাজতন্ত্রবাদের পথেই চলিয়াছে।

খ। **সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism) :** সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। সমাজতন্ত্রবাদের এই রূপ অনুসারে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রকে নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে। রাষ্ট্র গঠিত হইবে শ্রমিক এবং যাহারা উৎপন্ন দ্রব্য ভোগ করে—অর্থাৎ জনসাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া। এইরূপ পুনর্গঠিত রাষ্ট্র দেশরক্ষা, করধার্য প্রভৃতি সাধারণ কার্য সম্পাদন করিবে মাত্র—উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইবে শ্রমিক সংঘগুলির (Trade Unions or Trade Guilds) দ্বারা। তবে যাহারা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করে (consumers) তাহাদেরও সংঘ থাকিবে। শ্রমিক সংঘগুলি ভোগ্যপণ্যক্রেতাদের এই সকল সংঘের সহিত পরামর্শ করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের দাম নির্ধারণ প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করিবে।

গ। **যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism) :** যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ কিন্তু শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির পরিবর্তে অর্থনৈতিক বিপ্লবের পক্ষপাতী। ধর্মঘট, ধ্বংসাত্মক কার্য (sabotage) প্রভৃতির দ্বারা অর্থনৈতিক বিপ্লব আনয়ন করিয়া রাষ্ট্রের অবসান ঘটাইতে পারে। রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইলে পর শ্রমিক সংঘগুলি মিলিয়া একটি শ্রমিক সমবায় (Confederation of Labour) গঠন করিবে। ইহা রেলপথ, ডাক বিভাগ, মুদ্রা-ব্যবস্থা পরিচালনা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কার্য সম্পাদন করিবে। বিশেষ বিশেষ ধরনের উৎপাদন-ব্যবস্থা থাকিবে বিশেষ বিশেষ শ্রমিক সংঘের হস্তে—যথা, বয়ন-শিল্প পরিচালনা করিবে বয়ন শ্রমিক সংঘ, ইত্যাদি।

ঘ। **সাম্যবাদ (Communism) :** সাম্যবাদও রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করিতে চায়। সাম্যবাদিগণের মতে, শ্রমিকশ্রেণীর শোষণের উদ্দেশ্যে ধনতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখাই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিলে শোষণের অবসান ঘটিবে এবং ফলে রাষ্ট্রেরও প্রয়োজনীয়তা ফুরাইবে। অবশ্য ধনতান্ত্রিক যুগের পরই রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয় না। ধনতন্ত্রের পর আসে সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র কিন্তু আপনা হইতেই

আসে না ; ইহা আনয়ন করে সর্বহারার বিপ্লব (Proletarian Revolution)। সমাজতান্ত্রিক যুগে পূর্বেকার পুঁজিপতি এবং জমিদার জোতদার মহাজনগণ নানারূপ ছলে-বলে-কৌশলে আবার পূর্বতন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিতে চায়। ইহাদের বাধা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তির। তারপর সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা পরিচালিত হইতে থাকিলে একদিন এরূপ অবস্থা আসিবে যখন প্রত্যেকে সমাজের জন্য আনন্দ সহকারেই সাধ্যমত কার্য করিবে এবং প্রয়োজনমত ভোগ্যদ্রব্যাদি পাইবে। এই অবস্থায় শোষণ ও মুনাফা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ায় রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন ফুরাইবে। সুতরাং রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হইবে (The State will wither away) এবং প্রতিষ্ঠিত হইবে সাম্যবাদী সমাজ (Communistic Society)।

সমাজতন্ত্রবাদের সমালোচনা : সমাজতন্ত্রবাদ অসাম্য ও অন্যায়ের জগতে সাম্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ যে কোনমতেই সমর্থনীয় নয়, ধনী-দরিদ্র ও শ্রমিক-মালিকের ব্যবধান যে কোনমতেই সুন্দর সমাজ-জীবনের সহায়ক নহে—ইহাই সমাজতন্ত্রবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং সমাজতন্ত্রবাদ নির্দেশ দেয় যে প্রকৃতির সকল দানে (in all gifts of Nature) সাধারণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হউক, মানুষে মানুষে সাম্য স্থাপিত হউক এবং সকল শোষণের অবসান ঘটিয়া মানুষ পরস্পরের সহিত সৌভ্রাত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হউক। অতএব, আদর্শের জগতে সমাজতন্ত্রবাদের স্থান অতি উচ্চে।

কিন্তু প্রশ্ন হইল, ইহা কি সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে বিরুদ্ধবাদীরা বলেন সমাজতন্ত্রবাদের অধীনে সামগ্রিক কাজকর্ম (collective activity) এত বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে যে তাহা কোন রাষ্ট্র বা সমাজের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হইবে না। দ্বিতীয়ত, বলা হয় যে মানুষের প্রকৃতি বিচারে সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থকগণ ভুল করিয়াছেন। মানুষ সমাজের জন্য আনন্দ সহকারে কার্য করিতে চায় না—ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই চায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সমাজতন্ত্রবাদ মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

আরও বলা হয় যে, সমাজতন্ত্রবাদ কাম্যও নহে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় বলিয়া জীবন হইয়া উঠে যান্ত্রিক। পরিচালকগণের কোন মুনাফার সম্ভাবনা নাই বলিয়া উৎকোচ, স্বজনপ্রীতি ও অন্যান্য দুর্নীতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে ; পরিচালকগণ পদে পদে ভুল করিতে পারেন ; ইত্যাদি।

উপরি-উক্ত ত্রুটি সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রবাদের মূল ধারণা প্রায় সর্বত্রই গৃহীত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই আজ অল্পবিস্তর সমাজতন্ত্রবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করিয়াছে।

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী (Functions of Modern States)

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত হইত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ দ্বারা। তারপর হইতে নানা কারণের জন্য দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রসারই প্রধান।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রসারিত হইলেও পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংখ্যায় এখনও নগণ্য। অধিকাংশ রাষ্ট্রই বর্তমানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে একটা মীমাংসা করিয়া তাহাদের কার্যক্ষেত্র নির্ধারণ করিয়াছে। ইহা অবশ্য সত্য যে গতি হইল কর্মক্ষেত্র প্রসার করার দিকে। এই সকল আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়ঃ (১) মুখ্য বা অপরিহার্য কার্য বা কর্তব্য এবং (২) গৌণ বা ইচ্ছামূলক কার্য বা কর্তব্য।

মুখ্য বা অপরিহার্য কার্য হইল সেইগুলি যেগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে রাষ্ট্র সম্পাদন না করিয়া পারে না। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্রকে আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা এবং বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে তাহাকে পুলিসবাহিনী, স্থল-নৌ-বিমানবাহিনী প্রভৃতি রক্ষিবাহিনী পোষণ করিতে হয়। আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলার জন্য শুধু পুলিসবাহিনী পোষণই যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্র হইল আইন অনুসারে গঠিত জনসমাজ। সুতরাং আইন প্রণয়নেরও প্রয়োজন আছে। আইন না থাকিলে শুধু পুলিসবাহিনী দ্বারা শান্তিরক্ষা অরাজকতারই নামান্তর। আইন প্রণয়নের সংগে সংগে বিচার-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করাও প্রয়োজনীয়। সুতরাং রাষ্ট্রকে ইহাও করিতে হয়।

বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র রক্ষিবাহিনী পোষণ করিয়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা যায় না। সুতরাং রাষ্ট্রকে অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ (diplomatic relations) স্থাপন করিতে হয়, পররাষ্ট্র-নীতি (foreign policy) নির্ধারণ করিতে হয়, ইত্যাদি।

গৌণ কার্য হইল সেইগুলি যাহা রাষ্ট্র সম্পাদন করে নিজের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া নয়—সমাজজীবনকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্যই। শুধু আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াই পূর্ণাংগ সমাজ-জীবন গঠন করা সম্ভব হয় না। সুতরাং প্রয়োজন হয় অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদনের। এই কর্তব্যগুলি প্রধানত হইলঃ (১) শিক্ষার ব্যবস্থা করা, (২) জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করা, (৩) ডাক বিভাগ, রেলপথ, বিমানপথ পরিচালনা করা, (৪) পরিবহণের অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, (৫) মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থা (currency and credit)

পরিচালনা করা, (৬) ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজন হইলে সরকারী কর্তৃত্বে আনয়ন করা, (৭) শ্রমিকদের কল্যাণসাধন করা, (৮) বেকার-সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হওয়া, (৯) কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা করা এবং (১০) কতকগুলি বিশেষ শিল্প-গঠন এবং ইহাদের পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করা।

উন্নততর রাষ্ট্র আরও অগ্রসর হয়। ইহা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার (planning) দ্বারা দেশের সর্বাংগীণ উন্নতিসাধনের চেষ্টা করে এবং দেশের সম্পদ ও সুযোগ যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে ন্যায্যভাবে বন্টিত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখে।

উপরি-উক্ত গৌণ কর্তব্যগুলির অধিকাংশই সমাজতন্ত্রবাদের মূল নীতি দ্বারা নির্দিষ্ট। এইগুলি ব্যক্তির হস্তে রাখিলে সমাজের মংগল হইতে পারে না, কারণ ব্যক্তি হয় সঠিকভাবে ইহার পরিচালনা করিতে পারে না—না-হয় অধিক মুনাফার লোভে সমাজের ক্ষতি করে। যে-সকল রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রবাদকে পুরাপুরি গ্রহণ করে নাই অথচ উপরি-উক্ত গৌণ কর্তব্যগুলি সম্পাদন করিতেছে, তাহাদিগকে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র বা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র (Social Welfare States or Welfare States) বলা হয়। সমাজের সেবার উদ্দেশ্যে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র নিজের কর্মক্ষেত্র দিন দিন প্রসার করিয়া চলিয়াছে।

ভারতের উদাহরণ লইয়া সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইতে পারে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান (Constitution) অনুসারে ভারতীয় রাষ্ট্রকে সমাজ-কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

সংবিধানের এই নির্দেশের রূপদান করিবার জন্য ভারতীয় রাষ্ট্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (economic planning) গ্রহণ করিয়াছে। সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ, ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার, সেচ-ব্যবস্থার প্রসার ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, রাষ্ট্রের মালিকানায় নূতন নূতন শিল্পের পত্তন, পরিবহণের উন্নতিবিধান, কৃষি ও কুটির শিল্পের পুনর্গঠন প্রভৃতি এই পরিকল্পনারই অন্তর্ভুক্ত। ইহা ছাড়া ভারত-রাষ্ট্র অন্যান্য দিকেও হস্তক্ষেপ করিতেছে। বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতেছে, খাদ্যাভাবের সময় বিদেশ হইতে খাদ্য আনয়ন করিতেছে, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দের (food control and rationing) ব্যবস্থা করিতেছে, নানাভাবে শ্রমিকদের কল্যাণসাধনের প্রচেষ্টা করিতেছে, ইত্যাদি। জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতিসাধনের দিকেও রাষ্ট্র দৃষ্টি দিতেছে।

বলা হয়, এইভাবে সমাজ-কল্যাণের পথ বাহিয়া ভারত সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

৬ নাগরিকতা
(Citizenship)

পৌরবিজ্ঞানে সমাজ ও রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে মানুষের আচরণের আলোচনা করা হয়। এ-পর্যন্ত সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল; এখন ইহাদের সভ্য নাগরিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

নাগরিক (Citizen)

শব্দগত অর্থ ধরিলে নাগরিক হইল নগরবাসী। ইহার কারণ প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্র ছিল ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র (City States)। সুতরাং যাহারা নগর-রাষ্ট্রের সভ্য ছিল তাহাদেরই 'নাগরিক' বলা হইত। কিন্তু নাগরিকতা সম্পর্কে বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগের ধারণা এবং প্রাচীন গ্রীসের ধারণার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রহিয়াছে। প্রাচীন গ্রীসে নগর ও রাষ্ট্র অভিন্ন থাকিলেও নগরের সকল অধিবাসীই নাগরিক-অধিকার ভোগ করিত না। রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক বলিয়া পরিগণিত তাহারাই, যাহারা নগর-রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করিত। প্রত্যেক গ্রীক নাগরিকই প্রত্যক্ষভাবে একাধারে সৈন্য, বিচারক ও শাসনকার্য পরিচালনাকারী সংস্থার সদস্য ছিল। তাই গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটলের মতে, যাহারা শাসনকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে মাত্র তাহারাই নাগরিক। এই সকল নাগরিক মাত্র শাসন-পরিচালনার কার্যেই ব্যাপৃত থাকিত, আর তাহাদের জীবনধারণের দ্রব্যাদি যোগাইত অসংখ্য ক্রীতদাস। উহারা জনসংখ্যার অধিকাংশ হইলেও শাসনকার্যে উহাদের কোন অংশ ছিল না; সুতরাং উহারা নাগরিক-পর্যায়ভুক্ত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, খ্রীষ্টপূর্ব ৪১৩ অব্দে এথেন্স নগর-রাষ্ট্রে ১ লক্ষ ১৫ হাজার পুরুষের মধ্যে ৫০ হাজার ছিল ক্রীতদাস এবং এথেনীয় নাগরিকদের সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার; আর বাকী ১৫ হাজার ছিল বিদেশীয়।

রোমক সভ্যতার যুগেও নাগরিক-অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫১ অব্দে দেখা যায় প্যাট্রিসিয়ান (Patricians) বা অভিজাতশ্রেণীই মাত্র নাগরিক-অধিকার ভোগ করিতে সমর্থ ছিল; অন্যান্যরা নাগরিকতা পাইত না। পরে অবশ্য নাগরিক-অধিকার কেবলমাত্র স্বাধীন ব্যক্তিদের দেওয়া হয়। সামন্তপ্রথার যুগে (Feudal Age) অধিকাংশ লোক ছিল ভূমিদাস (serfs) এবং তাহাদের কোনপ্রকার নাগরিক-অধিকার ছিল না।

তারপর সমাজ-বিবর্তনের ফলে দাসত্বপ্রথা ও সামন্তযুগের অবসান ঘটে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে জাতীয় রাষ্ট্র প্রবর্তিত হয়। ফলে নাগরিক-অধিকার সম্প্রসারিত হয়।

সংজ্ঞা : বর্তমানে সাধারণত 'নাগরিক' বলিতে সেই সকল ব্যক্তিকে বুঝায় যাহারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকারের ফলে আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সভ্য বা আপন জন বলিয়া পরিগণিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মিলারের (Mr. Justice Miller) ভাষায় বলা যায় : "নাগরিকগণ রাজনৈতিক সংগঠনের সভ্য। তাহারা সেই জনসমষ্টি যাহার দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং তাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য সরকারের প্রতিষ্ঠা করে বা সরকারের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে।"

কে বা কাহারা নাগরিক হইবে এবং কোন্ কোন্ সর্তে নাগরিক-অধিকার অর্জিত হইবে, কোন্ কোন্ কারণে নাগরিকতার বিলুপ্তি ঘটিবে ইত্যাদি বিষয় প্রত্যেক রাষ্ট্র আইন করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। রাষ্ট্রের সভ্য বা আপন জন রূপে পরিগণিত হইবার ফলে তাহারা কতকগুলি অধিকার ভোগ করিতে সমর্থ হয় যাহা বিদেশীয়রা পায় না। এগুলিকে সাধারণত রাজনৈতিক অধিকার (political rights) বলা হয়। অবশ্য সকল নাগরিকের সকল সময় পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার নাও থাকিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নির্বাচন করিবার এবং নির্বাচিত হইবার অধিকারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে কোন ভারতীয় নাগরিক ২১ বৎসর বয়স্ক না হইলে লোকসভা কিংবা কোন বিধানসভার নির্বাচনে ভোটদানে সমর্থ হয় না এবং ২৫ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে লোকসভা কিংবা কোন বিধানসভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হইতে পারে না। আবার যে-ব্যক্তি বিকৃত মস্তিষ্ক অথবা যে বেআইনী বা দুর্নীতিপরায়ণ কার্যে লিপ্ত হয় তাহাকে নির্বাচন করিবার এবং নির্বাচিত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায়।

আইনের দৃষ্টিতে নাগরিকের লক্ষণ : যাহা হউক, বলা যাইতে পারে যে আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, রাষ্ট্র কর্তৃক সভ্য বলিয়া স্বীকার এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগ হইল নাগরিকের লক্ষণ।

অধিকার দায়িত্ব বা কর্তব্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নাগরিক যেমন রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে কতকগুলি সুযোগসুবিধা বা অধিকার ভোগ করে :তেমনি আবার তাহাকে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি কতকগুলি কর্তব্যও পালন করিতে হয়। এই কারণে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ নাগরিকের আইনগত ধারণা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। ইঁহারা অধিকারের সহিত নাগরিকের কর্তব্যের উপরও সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন নাগরিকের প্রাথমিক কর্তব্য হইলেও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে নাগরিককে অন্যান্য কর্তব্যপালনের দ্বারাও সমাজের মংগলসাধনের প্রচেষ্টা করিতে হইবে। নাগরিকের এই লক্ষণ বিচার করিয়া

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী নাগরিকের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন : "যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সভ্য এবং রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিয়া পূর্ণভাবে আত্মবিকাশের জন্য সচেষ্ট এবং সমাজের সর্বাধিক মংগল সম্পর্কে সচেতন থাকে তাহাকেই নাগরিক আখ্যা দেওয়া যায়।" লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ল্যাস্কিও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "নাগরিকতা হইল সমাজের কল্যাণসাধনের জন্য নিজের জ্ঞানসম্পন্ন বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ।"* সমাজের মধ্যে ব্যক্তির প্রকাশ ; সমাজকে অবলম্বন করিয়াই সে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে। সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের পক্ষে টিকিয়া থাকা সম্ভব নয়, আত্মবিকাশ ত দূরের কথা। সমাজের কল্যাণ ব্যক্তি-কল্যাণের সূচনা করে। তাই নাগরিককে সমাজের মংগলে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তাহাকে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহার বিচারবুদ্ধি যাহাতে জ্ঞানপ্রসূত হয় তাহাও দেখিতে হইবে, কারণ অশিক্ষিত অজ্ঞের বিচারবুদ্ধি সমাজ-কল্যাণের সহায়ক হইতে পারে না। এইরূপ ব্যক্তি সমাজের জটিল সমস্যা বুঝিয়াই উঠিতে পারে না।

স্বজাতীয় ও প্রজা (Nationals and Subjects) : নাগরিকতার আলোচনা প্রসংগে 'স্বজাতীয়' ও 'প্রজা' শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। 'স্বজাতীয়' (Nationals) শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক সময় ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত সমতা প্রভৃতির বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ একই জাতির (Nation) অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের 'স্বজাতীয়' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই অর্থে বিভিন্ন দেশে যে ভারতীয়গণ বসবাস করে তাহাদের আমরা আমাদের স্বজাতীয় বলিয়া মনে করি। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনে (International Law) 'স্বজাতীয়' শব্দটিকে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। এই দ্বিতীয় অর্থে কোন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদানকারী সমস্ত ব্যক্তিকেই ঐ রাষ্ট্রের 'স্বজাতীয়' বলা হয়। কিন্তু স্বজাতীয় হইলেই যে নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে এরূপ কোন কথা নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরও ফিলিপাইনের অধিবাসীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা দেওয়া হয় না, যদিও তাহারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। বর্তমানেও তাহাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'স্বজাতীয়' বলিয়া অভিহিত করা হয়, নাগরিক বলিয়া নহে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, সকল নাগরিকই স্বজাতীয়, কিন্তু সকল স্বজাতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য নাও হইতে পারে।

---

* "Citizenship is the contribution of one's instructed judgement to the public good."

'প্রজা' (Subjects) শব্দটির মধ্যেও যথেষ্ট অস্পষ্টতা রহিয়াছে। অনেক লেখক আছেন যাহারা ভোটাধিকারী নয় এমন সমস্ত স্বজাতীয়কে 'প্রজা' বলিয়া অভিহিত করার পক্ষপাতী। এই অর্থ গ্রহণ করিলে রাষ্ট্রের সভ্যদের দুই ভাগ করিয়া যাহারা পূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে তাহাদের নাগরিক আখ্যা দিতে হয়, আর যাহারা ঐ অধিকার আংশিকভাবে ভোগ করে তাহাদের 'প্রজা' বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। কিন্তু প্রজা শব্দটির সহিত রাজতন্ত্রের স্মৃতি বিজড়িত আছে বলিয়া অনেকে ইহার ব্যবহারে আপত্তি করেন। তাই গণতান্ত্রিক দেশ-সমূহে রাষ্ট্র-সভ্যদের 'নাগরিক' আখ্যাই দেওয়া হয়। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সকল ভারতীয়ই ভারতের নাগরিক—কেহই ভারত-রাষ্ট্রের 'প্রজা' নহে।

নাগরিক ও বিদেশীয় (Citizens and Aliens) ঃ নাগরিক রাষ্ট্রের আপন জন। আপন জন হিসাবে রাষ্ট্রের প্রতি তাহার স্থায়ী আনুগত্য থাকে। রাষ্ট্রও তাহাকে নাগরিক হিসাবে কতকগুলি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অধিকার প্রদান করে। অপরদিকে বিদেশীয় (Aliens) হইল অপর কোন রাষ্ট্রের সভ্য বা সেই রাষ্ট্রের আপন জন। সুতরাং তাহার স্থায়ী আনুগত্য হইল নিজ রাষ্ট্রের প্রতি। অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত সে অপর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাস করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে ঐ বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতি অস্থায়ী আনুগত্য প্রদর্শন করিতে হয়, সম্পূর্ণভাবে ঐ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে থাকিতে হয় এবং সাধারণ আইনকানুন মানিয়া চলিতে হয়। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে—অর্থাৎ বৈদেশিক রাষ্ট্রের আইনকানুন ভংগ করিলে ঐ বৈদেশিক রাষ্ট্রের নাগরিকের মত তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। আবার বিদেশীয়কে নাগরিকের মতই কর প্রভৃতি প্রদান করিতে হয়। তবে নাগরিকদের মত তাহাকে সৈন্যবাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করান যায় না।

বিদেশীয় হইলেও কতকগুলি বিষয়ে নাগরিকের মত তাহাকে অধিকার প্রদান করা হয়। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে এই অধিকারের পরিমাণ ক্রমশই সম্প্রসারিত হইতেছে। জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিদেশীয়ের অন্যতম স্বীকৃত অধিকার। অপরাপর সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রেও নাগরিক ও বিদেশীয়দের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য করা হয় না। আমাদের দেশে নাগরিকের জন্য সংবিধানে যে-সকল মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই বিদেশীয়রা সমভাবে ভোগ করিতে পারে। যেমন, সম্পত্তির অধিকার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জীবনের অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি ভারতে অবস্থানকারী বিদেশীয় ভারতীয় নাগরিকের মতই ভোগ করিয়া থাকে।

কিন্তু বিদেশীয়দের সাধারণত রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় না। এই অধিকার একমাত্র নাগরিকরাই ভোগ করিতে পারে। ভারতে একমাত্র নাগরিকরাই আইনসভার সদস্য নির্বাচন করিবার অথবা সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার অধিকার ভোগ করে; ভারতে অবস্থানকারী কোন বিদেশীয়, যেমন রুশ বা চৈনিক বা মার্কিন নাগরিক, ঐ অধিকার ভোগ করিতে সমর্থ নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই আবার জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে বিদেশীয়দের রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত অথবা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে পারে। সুতরাং সভ্যতার অগ্রগতি এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের ফলে বিদেশীয়ের মর্যাদা ও অধিকার সামাজিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নাগরিক ও বিদেশীয়দের মধ্যে এখনও পার্থক্য রহিয়াছে।

বিদেশীয়দের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। অনেক রাষ্ট্রে বসবাসকারী ও অ-বসবাসকারী বিদেশীয়দের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। যাহারা বৈদেশিক রাষ্ট্রে বসবাসের অভিপ্রায়ে অবস্থান করে তাহাদিগকে বসবাসকারী বিদেশীয় (resident or domiciled aliens) আখ্যা দেওয়া হয়। আর যাহারা সাময়িকভাবে বৈদেশিক রাষ্ট্রে অবস্থান করে তাহাদিগকে অ-বসবাসকারী বিদেশীয় (non-resident aliens or temporary sojourners) বলা হয়। এই দুই শ্রেণীর বিদেশীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রে স্থাবর সম্পত্তি ভোগদখল করিবার অধিকার একমাত্র বসবাসকারী বিদেশীয়দেরই থাকে।

অন্য আর একভাবেও বিদেশীয়দের ভাগ করা যায়। বিদেশীয়রা মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয় (friendly aliens) অথবা শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয় (enemy aliens) হইতে পারে। যুদ্ধ বাধিলে শত্রুপক্ষীয় বৈদেশিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয় বলা হয়; আর যে-সকল বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সংগ্রাম থাকে না তাহাদের নাগরিকদের মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয় বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতের সহিত অপর কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সংগ্রাম বাধিলে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকরা ভারতের নিকট শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। অপরপক্ষে ভারতের সহিত সংগ্রাম নাই এমন সমস্ত রাষ্ট্রের নাগরিকরা ভারতের নিকট মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয় থাকিবে।

নাগরিকতা অর্জন (Acquisition of Citizenship)

প্রধানত দুইটি পদ্ধতিতে নাগরিকতা অর্জন করা যায়: (১) জন্ম দ্বারা (by birth or descent) এবং (২) রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদন দ্বারা (by formal grant or conferment by the State)। যাহারা প্রথম উপায়ে নাগরিকতা অর্জন করে তাহাদিগকে জন্মসূত্রে নাগরিক (natural-born citizens) এবং যাহারা রাষ্ট্রের অনুমোদন দ্বারা নাগরিক হিসাবে গৃহীত হয় তাহাদিগকে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক (naturalised citizens) বলা হয়।

ক। **জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি (Acquisition of Citizenship by Birth) ঃ** জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের আবার দুইটি মূলনীতি আছে—রক্তের সম্পর্ক-নীতি (*Jus Sanguinis*) এবং জন্মস্থান-নীতি (*Jus Soli* or *Jus Loci*)।

১। **রক্তের সম্পর্ক-নীতি ঃ** রক্তের সম্পর্ক-নীতি অনুসারে শিশু যে-স্থানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন সে পিতামাতার নাগরিকতা পাইবে—অর্থাৎ পিতামাতা যে-রাষ্ট্রের নাগরিক সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় নাগরিকতা আইনের একটি নিয়ম অনুসারে ভারতের বাহিরে ভারতীয় নাগরিকের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সে ভারতীয় নাগরিকতা পাইবে।

২। **জন্মস্থান-নীতি ঃ** অপরদিকে জন্মস্থান-নীতি অনুসারে শিশু যে-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করে সেই রাষ্ট্রেরই নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে—তাহার পিতামাতা যে-রাষ্ট্রেরই নাগরিক হউন না কেন। যেমন, ভারতীয় নাগরিকতা আইনের একটি নিয়ম অনুসারে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে ভারতের অভ্যন্তরে যে-ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। কোন জাহাজে বা বিমানে জন্ম হইলে ঐ জাহাজ বা বিমান যে-রাষ্ট্রের সেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জন্ম হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে পররাষ্ট্রদূতের ক্ষেত্রে জন্মস্থান-নীতি প্রযুক্ত হয় না। যেমন, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ভারতে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে জন্মস্থান-নীতি তাহার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।

দুইটি নীতির মধ্যে তুলনা ঃ উপরি-উক্ত দুইটি নীতির মধ্যে রক্তের সম্পর্ক-নীতি অপেক্ষাকৃত পুরাতন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এই নীতি অনুসৃত হইত। পরে রাষ্ট্রের ভূমিগত সার্বভৌমিকতার* ধারণা প্রসারের সংগে জন্মস্থান-নীতিও গৃহীত হয়। যাহা হউক, পৃথিবীর সর্বত্র একই নীতি অনুসৃত হয় না ; অনেক রাষ্ট্রই উভয় নীতিকে অল্পবিস্তর অনুসরণ করিয়া থাকে। আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে ভারত রক্তের সম্পর্ক-নীতি ও জন্মস্থান-নীতি উভয়কেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অনুরূপভাবে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি নীতিই প্রচলিত। জন্মস্থান-নীতি অনুসরণের ফলে যাহারা ইংলণ্ড কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করে তাহারা স্বতই ঐ দেশের নাগরিকতা পায় ; আবার বিদেশে অবস্থানকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা ইংলণ্ডের কোন নাগরিকের সন্তানসন্ততি হইলে সে যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা ইংলণ্ডের নাগরিকতা অর্জন করে।

---

* রাষ্ট্রের ভূখণ্ড যতদূর বিস্তৃত উহার সার্বভৌমিকতা ততদূর পরিব্যাপ্ত। ইহাকেই ভূমিগত সার্বভৌমিকতা বলা হয়।

এইভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্র নাগরিকতা অর্জন সম্পর্কে বিভিন্ন নীতির অনুসরণ করার ফলে অসংগতি ও বিরোধের উদ্ভব হয়। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন নাগরিকের সন্তান যদি ইংলণ্ডের সীমানার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয় তাহা হইলে সে জন্মস্থান-নীতি অনুসারে ইংলণ্ডের, কিন্তু রক্তের সম্পর্ক-নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। এইভাবে দ্বৈত নাগরিকতার (double citizenship) সমস্যা দেখা দিবে—একই ব্যক্তি দুইটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা পাইবার অধিকারী হইবে এবং দুই রাষ্ট্রই তাহাকে আপন নাগরিক বলিয়া দাবি করিলে বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দিবে।

অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে মীমাংসার ব্যবস্থাও আছে। সাধারণত এরূপ নাগরিক রাষ্ট্রের সীমানার বাহিরে থাকিলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ঐ ব্যক্তিকে আপন জন বলিয়া দাবি করে না। অনেক ক্ষেত্রে আবার দ্বৈত নাগরিকতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহাকে যে-কোন একটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা বাছিয়া লওয়ার সুযোগও দেওয়া হয়। ভারতীয় আইনের এক নিয়ম অনুযায়ী কোন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি একই সময় ভারত এবং অপর কোন দেশের নাগরিক হইলে সে-ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ভারতীয় নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে পারে। উপরি-উক্ত ব্যবস্থা ছাড়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে চুক্তির সাহায্যেও দ্বৈত নাগরিকতার সমস্যার সমাধান করা হয়।

এখন প্রশ্ন হইল, জন্মস্থান-নীতি ও রক্তের সম্পর্ক-নীতির মধ্যে কোন্‌টি যুক্তিসংগত ? গুণাগুণ বিচার করিয়া বলা যায় যে, দুইটি নীতির কোনটি সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত নয়। জন্মস্থান-নীতির একমাত্র গুণ হইল যে জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির নাগরিকতা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। কিন্তু অন্যান্য দিক হইতে দেখিলে জন্মস্থান-নীতি অযৌক্তিক ও অকাম্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়। কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করা নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা এবং উহার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির নাগরিকতা নির্ধারণ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্তিসংগত নহে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন ভ্রাম্যমাণ মার্কিন নাগরিকের তিনটি পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে অবস্থানকালে তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে জন্মস্থান-নীতি অনুযায়ী ঐ তিনটি সন্তান ভিন্ন ভিন্ন তিনটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিবে। এইরূপ অদ্ভুত অবস্থাকে কোনপ্রকারে যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা যায় না।

রক্তের সম্পর্ক-নীতি এই দিক হইতে ত্রুটিবিহীন। কিন্তু জন্মস্থান যেমন সহজেই নির্ণয় করা যায়, পিতার নাগরিকতা অনেক ক্ষেত্রে অত সহজে প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্ক-নীতি অনুসারে নাগরিকতা নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। যাহা হউক, সকল দিক বিচার করিয়া দেখিলে রক্তের সম্পর্ক-নীতিকেই অপেক্ষাকৃত সমীচীন এবং স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

খ। অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক হইবার পদ্ধতি (Acquisition of Citizenship by Naturalisation): অনুমোদন দ্বারা বিদেশীয় পররাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিতে পারে। 'অনুমোদন' (naturalisation) শব্দটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ—উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে অনুমোদন বলিতে বুঝায় বিবাহ, সম্পত্তি ক্রয়, সৈন্যবাহিনীতে যোগদান, সরকারী চাকরিতে প্রবেশ, দীর্ঘকাল বসবাস প্রভৃতি উপায়ের যে-কোনটিকে অবলম্বন করিয়া পররাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গৃহীত হওয়া। মোটকথা, যে-কোন ভাবেই বিদেশীয়কে নাগরিকতা প্রদান করা হইলে ব্যাপক অর্থে তাহাকে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক (naturalised citizen) বলা হয়।

ইংলণ্ড ভারত প্রভৃতি দেশে 'অনুমোদন' শব্দটি সাধারণত সংকীর্ণ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সংকীর্ণ অর্থে 'অনুমোদন' বলিতে বুঝায় কতকগুলি নির্দিষ্ট সর্ত পূরণ করিয়া শাসন বিভাগ বা আদালতের মাধ্যমে পররাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গৃহীত হওয়া। এইভাবে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক হইবার জন্য বিদেশীয়কে বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাইতে হয়; তাহাকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নাগরিকতার জন্য আবেদন করিতে হয় এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট সর্ত পালন করিলে তবেই আবেদন করিতে পারা যায়। এই সকল সর্তের মধ্যে 'বসবাসের সর্ত' (condition of domicile) প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত। ভারত ও ইংলণ্ডে নিয়ম আছে যে আবেদনকারী অন্তত ৪ বৎসর কাল বসবাস করিয়াছে বা অন্তত ঐ সময়ের জন্য সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত হইয়াছে অথবা অংশত বসবাস ও অংশত সরকারী চাকরিতে তাহার ৪ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে এইরূপ প্রমাণ তাহাকে দিতে হইবে। বসবাসের সর্ত ব্যতীত আবেদনকারীকে অন্যান্য সর্ত পূরণ করিতে হইতে পারে। যেমন, ভারত ও ইংলণ্ডে নিয়ম আছে যে আবেদনকারী বিদেশীয়কে প্রমাণ করিতে হইবে—প্রথমত, সে সচ্চরিত্র; দ্বিতীয়ত, নাগরিকতা প্রদত্ত হইলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের অভিপ্রায় তাহার আছে; এবং তৃতীয়ত, ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষা ও ভারতের ক্ষেত্রে সংবিধানে উল্লিখিত ১৫টি ভাষার* যে-কোন একটিতে সে যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন।

পূর্ণ বা আংশিক নাগরিকতা অর্জন: অনুমোদনের মাধ্যমে নাগরিকতা অর্জন পূর্ণ (grand) বা আংশিক (partial) হইতে পারে। যে-সকল রাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিক এবং অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকের মধ্যে কোনপ্রকার ভেদাভেদ করা হয় না, সেই সকল রাষ্ট্রে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা পূর্ণ নাগরিকতা। ভারত ও ইংলণ্ডে অনুমোদন-পদ্ধতির সাহায্যে এইরূপ পূর্ণ নাগরিকতা অর্জিত হয়। অর্থাৎ, এই দুইটি দেশে জন্মসূত্রে নাগরিক ও অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক একই মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করে।

* ১৫তম ভাষা হইল সিন্ধি (Sindhi)।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিক এবং অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকের মধ্যে কয়েক ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হয়। যেমন, কোন অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অথবা উপরাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হইতে পারে না। একমাত্র জন্মসূত্রে নাগরিকরাই ঐ দুই পদ অলংকৃত করিতে পারে। এইভাবে যেখানে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিককে সকল প্রকার অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া হয় না সেখানে অনুমোদন দ্বারা নাগরিকতা অর্জন অপূর্ণাংগ বা আংশিক।

সমষ্টিগত অনুমোদন: বলা হইয়াছে, আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির মাধ্যমে অনুমোদন ছাড়াও বিবাহ, সম্পত্তিক্রয়, সরকারী চাকরি প্রভৃতি দ্বারাও পররাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গৃহীত হওয়া যায়। ইহার উপর ভারত ইংলণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে নিয়ম আছে যে, অন্য কোন দেশ ঐ সকল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলে ঐ দেশের অধিবাসীদের নাগরিকতা প্রদান করা যাইতে পারে। এই পদ্ধতি দ্বারা নাগরিকতা অর্জনকে অনেক সময় 'সমষ্টিগত অনুমোদনকরণ' (group naturalisation) বলা হয়। এই পদ্ধতিতেই গোয়ার ভূতপূর্ব পর্তুগীজ নাগরিকদের ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

নাগরিকতার বিলোপ (Loss or Termination of Citizenship)

নাগরিকতার আবার অবসানও ঘটিতে পারে। এ-বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। যাহা হউক, এখানে কতকগুলি সাধারণ নিয়মের উল্লেখ করা হইতেছে। প্রথমত, কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে পারে। যেমন, যদি কোন ভারতীয় নাগরিক অপর কোন রাষ্ট্রের নাগরিক বা স্বজাতীয় হয় তাহা হইলে সে ঘোষণার দ্বারা ভারতীয় নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভারতের মত কোন কোন দেশে নিয়ম আছে যে কোন নাগরিক স্বেচ্ছায় পররাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ করিলে সে নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত হইবে। তৃতীয়ত, অনেক সময় আবার অপর কোন রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন না করিয়াও কোন ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা হারাইতে পারে। সৈন্যদল হইতে পলায়ন, দীর্ঘকাল ধরিয়া নিজ রাষ্ট্রে অনুপস্থিতি, অসদুপায়ে অনুমোদন দ্বারা নাগরিকতা অর্জন, দেশদ্রোহিতা, বৈদেশিক রাষ্ট্রের উপাধি বা সম্মান গ্রহণ প্রভৃতি কারণেও বিভিন্ন রাষ্ট্রে নাগরিকতার অবসান ঘটিয়া থাকে। এইভাবে নাগরিকতার অবসান ঘটিলে ব্যক্তি নাগরিকতাহীন বা রাষ্ট্রহীন (Stateless) হইয়া পড়ে।

ভারতীয় নাগরিকতা (Indian Citizenship)

'স্বজাতীয় ও প্রজা'র আলোচনা প্রসংগে ইতিমধ্যেই বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় সংবিধান অনুসারে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সকল ভারতীয় ভারতের নাগরিক—কেহই

ভারত-রাষ্ট্রের প্রজা নহে। এখন সংবিধানের নাগরিকতার অন্যান্য ধারা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। এই প্রসংগে প্রথমেই দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

(১) সংবিধানে নাগরিকতা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে পার্লামেণ্ট বা সংসদের হস্তে। মোটামুটিভাবে সংবিধান প্রবর্তনের সময়—অর্থাৎ ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে কোন্ কোন্ ব্যক্তি ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে তাহা সংবিধানে উল্লিখিত হইয়াছে এবং ১৯৫৫ সালে পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইন দ্বারা এ-সম্পর্কে বিস্তৃততর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(২) অনেক যুক্তরাষ্ট্রে 'দ্বৈত নাগরিকতা'র* ব্যবস্থা থাকে; ভারতে কিন্তু ইহা নাই। সকল নাগরিকই ভারতীয় নাগরিক এবং একশ্রেণীভুক্ত। রাজ্যগুলির কোন পৃথক নাগরিকতা নাই।

সংবিধান অনুসারে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি দ্বারা ভারতীয় নাগরিকতা অর্জিত হইয়াছে:

(ক) জন্মস্থান, বসবাস এবং স্থায়ী বসবাসগত পদ্ধতি: যাহারা ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা তাহারা যদি ভারতে জন্মিয়া থাকে অথবা তাহাদের পিতামাতার মধ্যে কেহ যদি ভারতে জন্মিয়া থাকেন তবে তাহারা ভারতের নাগরিক। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর ঠিক আগে যাহারা ভারতে পাঁচ বৎসর ধরিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে তাহারা যদি ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে, তবে তাহারাও ভারতের নাগরিক।

সুতরাং এখানে দেখা যাইতেছে যে স্থায়ী বসবাস (domicile) নাগরিকতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য সর্ত। কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি নিজে বা তাহার পিতা বা মাতা ভারতে জন্মগ্রহণ অথবা সেই ব্যক্তি সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে পাঁচ বৎসরকাল ভারতে বসবাস করিয়া থাকিলেই চলিবে না। নাগরিকতা অর্জনের জন্য এই সর্তগুলির যে-কোন একটির সহিত চাই স্থায়ী বসবাসের অভিপ্রায়।

(খ) পাকিস্তান হইতে আগতদের সম্পর্কিত পদ্ধতি: ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই-এর পূর্বে যাহারা পাকিস্তান হইতে ভারতে চলিয়া আসিয়াছে তাহারা যদি অবিভক্ত ভারতে জন্মিয়া থাকে, অথবা তাহাদের পিতামাতা পিতামহ পিতামহী মাতামহ মাতামহীর মধ্যে কেহ যদি অবিভক্ত ভারতে জন্মিয়া থাকেন এবং তাহারা

---

* 'দ্বৈত নাগরিকতা' বলিতে বুঝায় একই সংগে যুক্তরাষ্ট্র ও রাজ্যের নাগরিকতা—যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা ও নিউইয়র্ক রাজ্যের নাগরিকতা।

যদি ভারতে আসিবার পর হইতে এদেশে সাধারণত বসবাস করিয়া থাকে, তবে তাহারা ভারতের নাগরিকতা অর্জন করিয়াছে।

১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই বা ঐ তারিখের পর উপরি-উক্ত ধরনের যে-সকল ব্যক্তি ভারতে আসিয়াছে তাহারা যদি ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পূর্বে ভারত সরকারের কোন যোগ্য কর্মচারীর নিকট আবেদন করিবার পর উক্ত কর্মচারী কর্তৃক নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, তবে তাহারাও ভারতের নাগরিক। কিন্তু আবেদন করিবার পূর্বে অন্তত ছয় মাস ভারতে বসবাস করিতে হইবে।

(গ) ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে বসবাসকারী মূলত ভারতীয় ব্যক্তিদের নাগরিক-অধিকার : ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে অন্যান্য দেশে যে-সমস্ত ভারতীয় আছে তাহারাও ভারতের নাগরিক হইতে পারে, যদি তাহারা অথবা তাহাদের পিতা বা মাতা অথবা পিতামহ বা পিতামহী অথবা মাতামহ বা মাতামহী অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং যদি তাহারা যে-দেশে বাস করিতেছে সেই দেশস্থ ভারত সরকারের প্রতিনিধি কর্তৃক ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে।

১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইন : নাগরিকতা সম্পর্কে সংবিধানের উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহ এই সংবিধান প্রবর্তনের সময় নাগরিকতা অর্জন করিবার মূল নিয়মাবলী মাত্র ; এগুলি ভারতীয় নাগরিকতার পূর্ণ চিত্র প্রকাশ করে না। এই পূর্ণ চিত্র পাইতে হইলে ১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ, বর্তমানে ভারতীয় নাগরিকতা কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে অর্জন করা যাইতে পারে এবং কি কি কারণে উহার অবসান ঘটে তাহা এই আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান আইনটিতে জন্মগতভাবে, রক্তের সম্পর্কগত সূত্রে, রেজিস্ট্রীকরণের সাহায্যে, দেশীয়করণের মাধ্যমে এবং কোন ভূখণ্ডের ভারতভুক্তির ফলে সংবিধান প্রবর্তনের পর নাগরিকতাপ্রাপ্তির ব্যাপক ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আইনে নাগরিকতার বিলোপ সম্বন্ধেও ব্যবস্থা আছে। পরিশেষে, ইহাতে কমনওয়েলথ্ নাগরিকতাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে ভারত পারস্পরিক ভিত্তিতে কমনওয়েলথ্ দেশগুলির নাগরিকগণকে ভারতীয় নাগরিক যে-সকল অধিকার ভোগ করে তাহা প্রদান করিতে পারে।

৭

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য
(Rights and Duties of Citizens)

অধিকার কাহাকে বলে ? (What are Rights ?)

সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিই সুখী হইতে চায়—তাহার আত্মশক্তিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিয়া ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করিতে চায়। জনসাধারণের এই অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশের ব্যবস্থা করিয়া সুন্দর নাগরিক জীবন সম্ভব করাই সমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় কতকগুলি সুযোগসুবিধার। যেমন সাধারণের মানসিক ও নৈতিক বিকাশের জন্য চাই শিক্ষার সুযোগ। ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য এই সকল প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধিকার বলিয়া অভিহিত হয়।

সংজ্ঞা : প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রের নিকট হইতে এই সকল সুযোগসুবিধা বা অধিকার দাবি করিতে পারে ; আর রাষ্ট্রেরও কর্তব্য হইল ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য অপরিহার্য অধিকারগুলি প্রদান করিয়া নাগরিককে সুন্দর ও পরিপূর্ণ জীবন গঠন করিতে সহায়তা করা। উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা অধিকারের সংজ্ঞা এইভাবে নির্দেশ করিতে পারি : যে-সকল সামাজিক সুযোগসুবিধা ব্যতীত মানুষ তাহার পূর্ণ উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হইতে পারে না তাহাদিগকে অধিকার বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য : এই সংজ্ঞার বিশ্লেষণ করিলে অধিকারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, অধিকারের উদ্দেশ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগপ্রদান।

দ্বিতীয়ত, অধিকার হইল সামাজিক সুযোগসুবিধা—অর্থাৎ সমাজের মধ্যে থাকিয়াই মানুষ অধিকার ভোগ করিতে পারে, সমাজের বাহিরে নয়। সমাজবদ্ধ লোকের পারস্পরিক স্বীকৃত দাবিই অধিকার। যেমন, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকারের জন্য আমি দাবি করি যে অপরে আমার গতিবিধিতে বাধা দিবে না ; অপরেও সেইরূপ দাবি করে যে আমি তাহাদের গতিবিধিতে বাধা দিব না। কিন্তু সমাজ-বহির্ভূত লোক কাহার উপর দাবি করিবে ? এবং কেই বা তাহার দাবি মানিয়া লইবে ? সুতরাং সমাজ-বহির্ভূত অধিকার বলিয়া কিছুই নাই।

তৃতীয়ত, অধিকার চিরন্তন বা শাশ্বত নয়। সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সংগে সংগে ইহারাও পরিবর্তিত হইতেছে। অন্যভাবে বলা যায়, অধিকার স্থান কাল এবং অবস্থার আপেক্ষিক। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি বুঝা যাইবে। আদিম যুগে মানুষ যখন বনেজংগলে ঘুরিয়া বেড়াইত তখন শ্রমিক সংঘ গড়িবার অধিকারের কোন প্রশ্নই উঠে নাই। কিন্তু বর্তমান শিল্প-সভ্যতার যুগে শ্রমিক সংঘ গঠনের অধিকার শ্রমিকদের একটি বিশেষ মূল্যবান অধিকার। আবার এক সময় ছিল

যখন কলকারখানা প্রভৃতি উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা একটি প্রধান অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইত ; এখন কিন্তু সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে ব্যক্তিগত মালিকানার স্থলে সামাজিক মালিকানা প্রবর্তিত হইবার দিকে ঝোঁক দেখা দিয়াছে।

চতুর্থত, অধিকার ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা হইলেও বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এই সুযোগসুবিধা কোন ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার হইতে পারে না। সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকলেই সমানভাবে এই সকল সুযোগসুবিধা ভোগ করিবে। যখন এইরূপ ঘটে তখনই অধিকার হইয়া উঠে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের সহায়ক সার্থক অধিকার। এইরূপ সার্থক অধিকারের প্রতিষ্ঠাই গণতান্ত্রিক আদর্শ।

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Rights)

নানাভাবে অধিকারের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে একটি শ্রেণীবিভাগ হইল নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে। আইনগত অধিকার আবার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক—প্রধানত এই দুই প্রকারের হয়। ইহার উপর সাম্প্রতিক কালে অর্থনৈতিক অধিকারও বিশেষ গুরুত্বলাভ করিয়াছে। নিম্নে অধিকারের এই সকল শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইতেছে।

১। নৈতিক ও আইনগত অধিকার (Moral and Legal Rights) ঃ সমাজের ন্যায়বোধ ও বিবেক দ্বারা সমর্থিত পারস্পরিক দাবিকেই 'নৈতিক অধিকার' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এইরূপ অধিকারের পশ্চাতে রাষ্ট্রশক্তি বা আইনের সমর্থন থাকে না। ফলে নৈতিক অধিকার ভংগ করা হইলে আইনসংগতভাবে প্রতিকারবিধানের কোন উপায় থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সমাজে মাতাপিতার নৈতিক অধিকার রহিয়াছে বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের নিকট হইতে আদরযত্ন পাইবার। এখন কোন সন্তান যদি এই কর্তব্য পালন না করে তবে মাতাপিতা আইনে তাহার প্রতিকার পাইতে পারেন না।

আইনগত অধিকার হইল আইনানুমোদিত পারস্পরিক দাবি। আইন দ্বারা অনুমোদিত বলিয়া রাষ্ট্র ইহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। ইহা ভংগ করা হইলে আইন-আদালতে প্রতিকার পাওয়া যায়। যেমন, প্রত্যেকের জীবনের নিরাপত্তার অধিকার আছে। কেহ অপরের জীবননাশ করিলে তাহাকে শাস্তিভোগ করিতে হয়।

আইনগত অধিকারই নাগরিকের প্রকৃত অধিকার। নৈতিক অধিকারের পশ্চাতে রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন থাকে না বলিয়া নাগরিকের শাস্ত্র পৌরবিজ্ঞানে ইহা লইয়া বড় একটা আলোচনা করা হয় না।

২। **সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার (Civil and Political Rights) :** বলা হইয়াছে যে, আইনগত অধিকারকে সাধারণত সামাজিক ও রাজনৈতিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সামাজিক অধিকার বলিতে বুঝায় সেই অধিকারগুলিকে যাহা ব্যতীত মানুষের পক্ষে সুসভ্য সামাজিক জীবন যাপন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। জীবনের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সম্পত্তি অর্জন ও ভোগের অধিকার, পরিবার-গঠনের অধিকার প্রভৃতি এই সামাজিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। এগুলি না থাকিলে মানুষের জীবন বন্য পশুর জীবনে পরিণত হইয়া পড়িত। রাজনৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ। বর্তমান যুগে নির্বাচন করিবার অধিকার, নির্বাচিত হইবার অধিকার, সরকারী চাকরি পাইবার অধিকার, প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত।

বিভিন্ন সামাজিক অধিকার : দেশ ও কাল ভেদে সামাজিক অধিকারের পার্থক্য ঘটিয়া থাকিলেও কতকগুলি সামাজিক অধিকারকে মৌলিক হিসাবে গণ্য করা হয়। এই অধিকারগুলি না থাকিলে মানুষের পক্ষে সামাজিক জীবন নিরর্থক হইয়া পড়ে। নিম্নে মৌলিক সামাজিক অধিকারগুলির বর্ণনা করা হইল :

(ক) জীবনের অধিকার (Right to Life) : জীবনের অধিকার বলিতে বাঁচিয়া থাকার অধিকার বুঝায়। ইহা মৌলিক সামাজিক অধিকারগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান। এই অধিকার না থাকিলে অন্য সকল অধিকার মূল্যহীন হইয়া পড়ে। আমাকে যদি কেহ যখন ইচ্ছা হত্যা করিতে পারে এবং তাহার যদি কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা না থাকে তবে আমার পক্ষে সমাজে বা রাষ্ট্রে বাস করা অর্থহীন। এই কারণে প্রত্যেক রাষ্ট্রই পুলিসবাহিনী, বিচার-ব্যবস্থা, সৈন্যবাহিনী প্রভৃতির সাহায্যে ব্যক্তির নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করে। হবসের মতে, এইভাবে জীবনরক্ষার অধিকার বা সুযোগ লাভ করিবার জন্যই আদিম মানুষ চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল।* আত্মরক্ষার অধিকার জীবনের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করাও অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয় না।

(খ) স্বাধীনতার অধিকার (Right to Liberty) : "জীবনধারণই যথেষ্ট নয় ধারণোপযোগী জীবনও হওয়া প্রয়োজন।" মানুষ সামাজিক জীব। সে চা পরিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে। এইজন্য তাহার পক্ষে প্রয়োজন স্বাধীনতা অধিকারের। স্বাধীনতার অধিকার বলিতে দুইটি অধিকার বুঝায়—যথা, স্বাধীনভা চলাফেরা করিবার ও স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন করিবার অধিকার বা সুযোগ। এ

* ৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।

অধিকার থাকিলেই মানুষ নিজেকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে। বর্তমানে কেহই যে দাসত্বপ্রথা সমর্থন করে না, তাহার কারণ হইল দাসত্ব মানুষের স্বাধীনতার বিরোধী। স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া ইহা সুন্দর ও সার্থক জীবনেরও পরিপন্থী। স্বাধীনতার অধিকার অব্যাহত অধিকার নয়। যুদ্ধের সময়ে বা আভ্যন্তরীণ শৃংখলার প্রয়োজনে ইহা কিছুটা খর্ব করা যাইতে পারে।

(গ) স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার (Right to Freedom of Opinion): গণতন্ত্র হইল সেই শাসন-ব্যবস্থা যাহা জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। জনমত-গঠনের জন্য প্রয়োজন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দুই প্রকারের— (১) বাক্-স্বাধীনতা এবং (২) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা। মৌখিক ও লিখিতভাবে স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রই তাহাদের অধিবাসীদের দিয়াছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কখনই অবাধ স্বাধীনতা হইতে পারে না। স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার আছে বলিয়া মানহানিকর, দুর্নীতিমূলক, রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক প্রভৃতি কোনকিছু বলিবার বা লিখিয়া প্রকাশ করিবার অধিকার থাকিতে পারে না। যুদ্ধের সময় বা জনস্বার্থের খাতিরে ইহা খর্বও করা যাইতে পারে।

(ঘ) সম্পত্তির অধিকার (Right to Property): জীবনধারণের জন্য কিছু কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি অপরিহার্য এবং ইহা ভোগ ও অর্জনের ইচ্ছা মানুষের প্রকৃতিগত। এ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, "ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজ-বন্ধনের অন্যতম মূল গ্রন্থি।" ইহার অর্থ হইল, যে-সমাজ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন করে, সে-সমাজের বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়িবে। ফলে সমাজ ভাঙনের পথে চলিবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধে রাজনৈতিক ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। বর্তমানে এই বিষয়ে অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তিই একমত যে, স্বোপার্জিত সম্পত্তিভোগের অধিকার প্রত্যেককেই দেওয়া উচিত। তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার অবাধ নয়; সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধনের জন্য রাষ্ট্র এই অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে এবং করিয়া থাকে।

(ঙ) চুক্তির অধিকার (Right to Contract): স্বাধীনতার অধিকার ও সম্পত্তির অধিকারের সংগে চুক্তির অধিকার জড়িত। মানুষের যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থাকে, তবে তাহার পক্ষে চুক্তি করিবার অধিকার থাকাও প্রয়োজনীয়। প্রকৃতপক্ষে সৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ন্যায্য চুক্তির অধিকার আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি। একথাও অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক রাষ্ট্র এমন চুক্তির অধিকারকেই স্বীকার করে যাহা সামাজিক জীবনের অনুকূল। বেআইনী, দুর্নীতিমূলক অথবা সমাজ-কল্যাণের পরিপন্থী কোন চুক্তিকে রাষ্ট্র কখনই চুক্তির মর্যাদা দেয় না।

(চ) পরিবার-গঠনের অধিকার (Right to Family): পারিবারিক জীবন যাপনের অধিকার অন্যতম মৌলিক অধিকার। পরিবারই আদিম সমাজ কি না, সে-বিষয়ে মতবিরোধ থাকিলেও বর্তমানে যে ইহা সমাজজীবনের কেন্দ্র সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকিলে হয়ত সমাজ চলিতে পারে, পারিবারিক জীবন না থাকিলে সমাজ বিনষ্ট হইবেই। সুতরাং এই অধিকার সকল রাষ্ট্রই স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

(ছ) স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার (Right to Freedom of Religion): বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই অধিকারটিকে মানিয়া লইয়াছে। ধর্ম-নিরপেক্ষতা সমাজের প্রগতির লক্ষণ। ভারত অন্যতম ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

(জ) সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার (Right to Association): সমাজে বাস করিবার প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবগত। রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন। রাষ্ট্রের ভিতরে মানুষ তাহার রাজনৈতিক আশা ও আকাংক্ষাকে রূপায়িত করিবার সুযোগ পায়। কিন্তু মানুষের রাজনৈতিক আশা-আকাংক্ষা ছাড়াও অন্যান্য আশা-আকাংক্ষাও আছে। তাই প্রয়োজন হয় অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের। মানুষের জীবন সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া এই অধিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রই মানিয়া লইয়াছে।

(ঝ) আইনের চক্ষে সমানাধিকার (Right to Equality before Law): বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে আইনের চক্ষে সমানাধিকার অন্যতম মৌলিক সামাজিক অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনে ধনী ও নির্ধন, অভিজাত ও অভাজনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

(ঞ) ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অধিকার (Right to preserve Distinct Language and Culture): সংখ্যালঘুদের জন্য এই অধিকারটি অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সাধারণতান্ত্রিক ভারতের সংবিধানে সংখ্যালঘুদের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অধিকার লিখিতভাবে দেওয়া হইয়াছে।

(ট) শিক্ষার অধিকার (Right to Education): শিক্ষা ব্যতীত মানুষ আত্মবিকাশে সমর্থ হয় না বলিয়া অনেক দেশে শিক্ষার অধিকারও অন্যতম মৌলিক সামাজিক অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সমাজের প্রগতির সংগে সংগে সামাজিক মৌলিক অধিকারের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক অধিকার : নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান রাজনৈতিক অধিকার :

(ক) স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার (Right to Residence) : রাষ্ট্রের যে-কোন অংশে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার নাগরিকের আছে। বিদেশীয়ের এই অধিকার নাই।

(খ) প্রবাসী জীবনের নিরাপত্তার অধিকার (Right to Protection while Staying Abroad) : নাগরিকের বিদেশে অবস্থানকালীন রাষ্ট্র তাহার নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। যদি নাগরিক বিদেশে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেই রাষ্ট্রের কাছে যদি কোন প্রতিকার না পায়, তবে নাগরিকের রাষ্ট্র তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবে।

(গ) নির্বাচন করিবার বা ভোটদানের অধিকার (Right to Vote) : নির্বাচন করিবার বা ভোট দিবার অধিকার নাগরিকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার। নাগরিক ভোট দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা আর সম্ভব নয়। ভোটাধিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার বলিয়া ইহার প্রসার বিশেষ কাম্য এবং জাতি-ধর্ম, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার প্রদান করাই রাজনৈতিক আদর্শ। এই আদর্শের উপলব্ধি হইলে তবেই শাসন-ব্যবস্থা প্রকৃত গণতান্ত্রিক রূপ ধারণ করে।

এ-সম্বন্ধে অবশ্য কিছুটা মতবিরোধ আছে এবং এই কারণে ভোটদানের অধিকার সম্বন্ধে পরে আবার আলোচনা করা হইতেছে।

(ঘ) নির্বাচিত হইবার অধিকার (Right to be Elected) : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের নির্বাচিত হইবার অধিকারও থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য বিশেষ পদে নির্বাচিত হইবার জন্য নাগরিকের পক্ষে উপযুক্ত বয়স্ক বা বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন হইবার প্রয়োজন হয়। যেমন, ভারতের রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীকে ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচিত হইবার অধিকার সকল নাগরিকের না থাকিলেও যোগ্যতাসম্পন্ন, উপযুক্ত বয়স্ক প্রত্যেক নাগরিকের থাকে।

(ঙ) সরকারী চাকরিতে অধিকার (Right to hold Public Office) : অধিকাংশ রাষ্ট্রে সকল নাগরিকেরই সরকারী চাকরি পাইবার অধিকার আছে। সরকারী চাকরি করিয়াও নাগরিক শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। অনেক সময় বিদেশীয়কেও সরকারী চাকরিতে লওয়া হয়, কিন্তু বিদেশীয়ের কোন অধিকার নাই।

(চ) আবেদন করিবার অধিকার (Right to Petition): নাগরিকগণ আবেদন দ্বারা অভাব-অভিযোগ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া প্রতিকারের প্রার্থনা করিতে পারে।

অর্থনৈতিক অধিকার : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নাগরিকের আইনগত অধিকার প্রধানত সামাজিক ও রাজনৈতিক—এই দুই প্রকার হইলেও সম্প্রতি অর্থনৈতিক অধিকার (economic rights) বিশেষ গুরুত্বলাভ করিয়াছে। অর্থনৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ ও বেকারত্বের ভয়ভাবনা হইতে মুক্তি। ইহার জন্য নাগরিকের যথাযোগ্য কর্মে নিযুক্ত হইবার অধিকার থাকিবে, তাহার জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকিবে, তাহাকে পর্যাপ্ত মজুরি দিতে হইবে, সে যাহাতে যথেষ্ট অবকাশ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইত্যাদি। আধুনিক সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রে এই সকল অধিকার মানিয়া লওয়া হইতেছে। ইহার উপর কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিককে শিল্প-পরিচালনার অধিকারও দেওয়া হইতেছে।

নাগরিকের কর্তব্য (Duties of a Citizen)

নাগরিকের অধিকারের আলোচনার পর তাহার কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করিতে হয়, কারণ অধিকারের ধারণার মধ্যেই কর্তব্যের ধারণা নিহিত রহিয়াছে। আমি যদি অধিকার ভোগ করিতে চাই তাহা হইলে অপরকে কর্তব্য পালন করিয়া চলিতে হইবে। আবার অপরে যদি অধিকার ভোগ করিতে চায় তাহা হইলে আমাকে কর্তব্য পালন করিতে হইবে। যেমন, আমার যদি জীবনের নিরাপত্তার অধিকার থাকে তাহা হইলে অপরের কর্তব্য রহিয়াছে আমার জীবননাশ না করার। আবার অপরের জীবনের নিরাপত্তার অধিকার থাকিলে আমার কর্তব্য রহিয়াছে অপরের জীবনহানি না করার। সুতরাং কর্তব্যের তাৎপর্য, বিভিন্ন ধরনের কর্তব্য এবং কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

কর্তব্য কাহাকে বলে ? (What are Duties ?) : কোনকিছু করিবার অথবা না-করিবার দায়িত্বকেই কর্তব্য আখ্যা দেওয়া যায়। যেমন, প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব রহিয়াছে রাষ্ট্রকে আনুগত্য প্রদান করিবার অথবা অপরের জীবন-হানি না করিবার। আধুনিক কালে নাগরিকের দায়িত্ব বা কর্তব্যের উপর অধিকারের মতই গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

আইনগত ও নৈতিক কর্তব্য (Legal and Moral Duties) : অধিকারের মত কর্তব্যকেও দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) আইনগত কর্তব্য এবং (২) নৈতিক কর্তব্য। আইনের দ্বারা যে-সকল দায়িত্ব নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং

যাহা ভংগ করিলে রাষ্ট্র কর্তৃক শাস্তিপ্রদানের ব্যবস্থা থাকে তাহাদের আইনগত কর্তব্য বলা হয়। যেমন, আয় অনুযায়ী আয়কর দেওয়া নাগরিকের আইনগত কর্তব্য। কেহ এই কর্তব্য পালন না করিলে তাহাকে রাষ্ট্র আইন অনুযায়ী শাস্তি-প্রদান করিয়া থাকে। অপরদিকে নৈতিক কর্তব্য হইল সেই সকল দায়িত্ব যাহা ব্যক্তি বা সমাজের নৈতিক বোধের উপর নির্ভরশীল। নৈতিক দায়িত্ব পালন না করা হইলে ব্যক্তি সমাজের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু আইনের চক্ষে দণ্ডনীয় হয় না। অর্থাৎ, তাহাকে আইন-আদালতের হস্তে শাস্তিভোগ করিতে হয় না। যেমন, বৃদ্ধ পিতামাতাকে প্রতিপালন করা সন্তানের নৈতিক কর্তব্য। কিন্তু কোন সন্তান এই কর্তব্য অবহেলা করিলে বা পালন না করিলে তাহাকে আইন-নির্দিষ্ট শাস্তিভোগ করিতে হয় না। অবশ্য নৈতিক ও আইনের কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ সকল দেশে এক নহে। এক দেশে যাহা নৈতিক কর্তব্য অপর দেশে তাহা আইনগত কর্তব্যের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে। যেমন, অধিকাংশ রাষ্ট্রেই নাগরিকের নির্বাচনের সময় ভোটপ্রদান করা নৈতিক কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু বেলজিয়াম বা সুইজারল্যাণ্ডে ভোটপ্রদান করা আইনগত অবশ্য করণীয় কর্তব্য।

অনেক সময় নৈতিক কর্তব্য ও আইনগত কর্তব্যের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিতে পারে। যেমন আইন মান্য করা নাগরিকের কর্তব্য, কিন্তু ইতিহাসে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে যে অনেক সময় আইন অধিকাংশ লোকের স্বাধীনতা ও অধিকার হরণ করিয়াছে এবং ফলে কাম্য সমাজজীবনের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় প্রকৃত নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য হইল এই প্রকার বিকৃত রাষ্ট্র ও বিকৃত আইনের বিরোধিতা করা। এই কারণেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক সময় আমরা 'আইন অমান্য আন্দোলন' চালাইয়াছি। তবে শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, সমস্ত দিকের সম্যক বিচারবিবেচনা করিয়া অতি সতর্কতার সহিত আইন ও রাষ্ট্রের বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হইতে হইবে।

নাগরিকের বিভিন্ন প্রকারের কর্তব্য (Different Kinds of Duties of a Citizen) : ব্যাপক দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেক নাগরিকের পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি ও রাষ্ট্রের প্রতি বিভিন্ন ধরনের কর্তব্য রহিয়াছে।

ক। পরিবারের প্রতি কর্তব্য : সামাজিক সংগঠনের মূলভিত্তি ও প্রাথমিক সংস্থা হইল পরিবার। পরিবারের অংগ হইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে, লালিতপালিত হয় এবং আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হয় ; ইহার মধ্য দিয়াই সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতির সহিত তাহার প্রথম পরিচয় ঘটে ; ইহার মধ্যেই স্নেহ মমতা ভালবাসা

সহযোগিতা প্রভৃতি মানবীয় অনুভূতির প্রকাশ ও প্রসার ঘটে। সুতরাং সুস্থ ও সবল পারিবারিক বন্ধন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের অপরিহার্য সর্ত।

পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব বন্ধনের দ্বারাই সুখী ও সুস্থ পরিবার গড়িয়া তোলা সম্ভব। পিতামাতার দায়িত্ব রহিয়াছে সন্তানসন্ততিদের লালনপালন করা ও শিক্ষা দেওয়ার; সন্তানসন্ততিদের কর্তব্য রহিয়াছে পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনকে ভক্তি ও মান্য করার; স্বামীস্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব রহিয়াছে সুখেদুঃখে এক সহযোগে ও একাত্মভাবে সংসারধর্ম পালন করার। ভারতীয় সমাজে পরিবার শুধু স্বামীস্ত্রী সন্তানসন্ততিদের লইয়া গঠিত নয়, অন্যান্য আত্মীয়স্বজনও যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই দিক দিয়া পরিবারভুক্ত প্রত্যেকের অপর সকলের প্রতি কর্তব্য পালন করিতে হয়। যাহা হউক, পারিবারিক দায়িত্বপালনের দ্বারাই নাগরিক কল্যাণকর সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারে। যেখানে পারিবারিক সম্বন্ধ শিথিল সেখানে সামাজিক বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়ে।

সমাজের প্রতি কর্তব্য : পরিবারের গণ্ডির মধ্যেই নাগরিকের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়; পরিবারের বাহিরে বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রেও তাহার দায়িত্ব রহিয়াছে। সমাজকে আশ্রয় করিয়াই মানুষ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে, সমাজবদ্ধ জীব হিসাবেই সে বর্তমানের উন্নত জীবনযাত্রা সম্ভব করিয়াছে। মানুষের মধ্যে পূর্ণবিকাশের যে-আকাংক্ষা রহিয়াছে তাহা কখনও সমাজের বাহিরে সফল হইতে পারে না। ব্যক্তিগত মংগল ও সমষ্টিগত মংগল অংগাংগিভাবে জড়িত। অপরের শক্তির সহিত নিজের শক্তিকে সংযুক্ত করিয়া, অপরের কল্যাণের সহিত নিজের কল্যাণের সামঞ্জস্যসাধন করিয়াই মানুষ সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধির পথ প্রসার করিতে পারে। এইজন্য প্রত্যেক নাগরিককে অপরের প্রতি দরদ ও সহযোগিতার ভাব লইয়া চলিতে হইবে। অপরের অধিকার যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তাহার প্রতি যত্নবান হইতে হইবে। যাহারা অক্ষম, যাহারা সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের কল্যাণসাধন করা তাহার নাগরিক-দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত; সকল প্রকার সমাজসেবামূলক কার্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে নিয়োজিত করিয়া সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন নাগরিকের অন্যতম আদর্শ।

ভারতের উদাহরণ : ভারতের দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিশাল ভারতের অগণিত জনসংখ্যার অধিকাংশই বাস করে পল্লী অঞ্চলে এবং পল্লীই ভারতের প্রাণকেন্দ্র। দুর্ভাগ্যবশত বহুদিনের অবহেলা ও শোষণের ফলে পল্লীজীবন আজ নিষ্প্রাণ। সেখানে না আছে শিক্ষা, না আছে সম্বল, না আছে স্বাস্থ্য। প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের দায়িত্ব রহিয়াছে এই অবহেলিত জনগণকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা, জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা, সমবায় সংগঠন,

শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি পন্থার সাহায্যে পল্লীসমাজকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার যে-প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহার সহিত সক্রিয় সহযোগিতা করা প্রত্যেক ভারতীয়ের কর্তব্য। মোটকথা, সামাজিক ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি আমাদের কর্তব্য রহিয়াছে। এই কর্তব্য পালন করিয়া সামাজিক শান্তি, সামঞ্জস্য ও মংগল প্রতিষ্ঠিত করাই প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

গ। **রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য :** রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য হিসাবে নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতিও কতকগুলি কর্তব্য পালন করিতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনগত পালনীয় হইলেও কতকগুলি সমাজের নৈতিক চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যের মধ্যে প্রধান তিনটি হইল (ক) আনুগত্য প্রদর্শন, (খ) আইন মান্য করা এবং (গ) করপ্রদান করা।

(ক) আনুগত্য : আনুগত্য (allegiance) নাগরিকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। নাগরিক যদি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত না হয়, তবে তাহার নাগরিক-অধিকার কাড়িয়া লওয়া যাইতে পারে। রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত হওয়ার অর্থ রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতিও অনুগত হওয়া। নাগরিক রাষ্ট্রের আদর্শকে মানিয়া লইয়া সর্বদা তাহার উপলব্ধির জন্য চেষ্টা করিবে। যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হইলে নাগরিককে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে হইবে, আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষায় সর্বদা তাহাকে সরকারী কর্মচারীর সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। এইভাবেই আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়।

(খ) আইন মান্য করিয়া চলা : নাগরিক রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতি অনুগত। সুতরাং সে রাষ্ট্রের আইন মান্য করিয়া চলিবে। নিজে আইন মান্য করাই যথেষ্ট নয়, অপর সকলে যাহাতে মান্য করে তাহার দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নাগরিককে আইন মান্য করিয়া রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করিতে হইবে বলিয়া যে সকল আইনই বিনা প্রতিবাদে মান্য করিয়া চলিতে হইবে এইরূপ অভিমত অনেকে সমর্থন করেন না। আইন যদি ব্যক্তির অধিকার হরণ করে, ইহা যদি সুষ্ঠু সমাজজীবনের পরিপন্থী হয় তবে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই নাগরিকের কর্তব্য।

(গ) নিয়মিতভাবে ন্যায্য করপ্রদান : রাষ্ট্র নাগরিকগণের সংগঠন ; নাগরিকগণের কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। কোন সংগঠনের কার্যই অর্থ ব্যতিরেকে চলিতে পারে না। নাগরিকগণের সংগঠন রাষ্ট্র যাহাতে সুপরিচালিত হয় তাহার জন্য নাগরিকের কর্তব্য নিয়মিতভাবে ন্যায্য করপ্রদান করা। যে-ব্যক্তি কর ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে সে নাগরিক-মর্যাদা পাইবার অধিকারী নহে।

(ঘ) অন্যান্য কর্তব্য : উপরি-উক্ত তিনটি মুখ্য কর্তব্য ছাড়া নাগরিকের আরও কয়েকটি কর্তব্য রহিয়াছে। রাষ্ট্র যদি নাগরিকের উপর কোন কর্মভার অর্পণ করে

তবে নাগরিকের পক্ষে তাহা নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করা উচিত। যদি নাগরিককে রাষ্ট্রের অধীনে কর্ম গ্রহণ করিতে বলা হয়, তবে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নাগরিকের পক্ষে সে-কর্ম গ্রহণ করা উচিত। যেমন, কোন বিশিষ্ট আইন-ব্যবসায়ীকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করিতে বলিলে তাঁহার পক্ষে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তাহা গ্রহণ করা উচিত। দলগত স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সৎভাবে ভোট দেওয়াও নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য।

অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Duties)

অধিকার ও কর্তব্যের পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত আছে। বস্তুত, মানুষের সমাজবোধ হইতে অধিকার ও কর্তব্য উভয়েরই জন্ম। সমাজবদ্ধ মানুষের পরস্পরের উপর কতকগুলি দাবি থাকে। এই দাবিগুলি স্বীকারের অর্থ হইল কতকগুলি দায়িত্বপালনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া। এই দায়িত্বগুলিই কর্তব্য। আইনের দ্বারা অনুমোদিত হইলে ইহারা আইনগত কর্তব্যে পরিণত হয়। সুতরাং কর্তব্য ব্যতীত অধিকারের কল্পনা করা যায় না। আমার অধিকারভোগ অপরের কর্তব্যপালনের উপর নির্ভর করে এবং অপরের অধিকারভোগ আমার কর্তব্যপালনের উপর নির্ভর করে। যেমন, ধাক্কা না খাইয়া পথ চলিবার অধিকার যদি আমার থাকে তবে অপরের কর্তব্য হইল আমাকে প্রয়োজনমত পথ ছাড়িয়া দেওয়া।* যাহাতে এই অধিকার অপর সকলেও ভোগ করিতে পারে তাহার জন্য আমারও কর্তব্য অপরের চলার পথ ছাড়িয়া দেওয়া। আবার জীবনের নিরাপত্তার অধিকার ভোগ করিবার জন্য প্রত্যেকের কর্তব্য রহিয়াছে অপরকে অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে আক্রমণ না করিবার।

অধিকার হইল ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা। এই সুযোগ-সুবিধা সমাজ-বহির্ভূত নয়, সমাজের মধ্যেই ইহা নিহিত। সুতরাং এই সকল সামাজিক সুযোগসুবিধাকে এমনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যেন ব্যক্তি ও সমাজ—উভয়েরই সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয়। অসামাজিকভাবে ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য অধিকারের উদ্ভব হয় নাই। এইজন্য প্রত্যেকটি অধিকারের সহিত একই সময় ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণসাধন করিবার পূর্ণ দায়িত্ব সংযুক্ত রহিয়াছে। মোটকথা, সমাজের মধ্যে থাকিয়া অধিকার ভোগ করা হয় বলিয়া ব্যক্তির পক্ষে

* "If I have a right to walk along the street without being pushed off the pavement, your duty is to give me reasonable room." Hobhouse

সমাজকে কিছুটা প্রতিদান দেওয়া প্রয়োজন। এইজন্যই এইরূপ উক্তি প্রচলিত আছে যে, যে-ব্যক্তি কার্য করিবে না সে খাইতেও পারিবে না। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি সমাজের উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণ না করিয়া সমাজের নিকট হইতে ভোগের দাবি করিতে পারে না। আবার, নাগরিকের যদি ভোটদানের অধিকার থাকে, তাহার কর্তব্য হইল ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়া এবং সমস্যাসমূহের সম্যক বিচারবিবেচনা করিয়া নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোটদান করা।

অধিকার সম্পর্কে রাষ্ট্রেরও কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত না হইলে কোন দাবিই আইনের দৃষ্টিতে অধিকার বলিয়া পরিগণিত হয় না এবং ঐ অধিকারকে আইনগতভাবে বলবৎ করিবারও উপায় থাকে না। শুধু ইহাই নয়। স্বীকৃত অধিকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থার দ্বারা সংরক্ষিত না করিলে উহার মূল্য বিশেষ থাকে না—উহা নামমাত্র অধিকার হইয়া পড়ে। আমাদের অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইয়া ইহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিলে তবেই রাষ্ট্র আমাদের নিকট হইতে আনুগত্য, করপ্রদান প্রভৃতি নানাবিধ কর্তব্য দাবি করিতে পারে। সুতরাং একদিকে অধিকারভোগের জন্য রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের যেমন কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে, অপরদিকে তেমনি রাষ্ট্রের কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে নাগরিকের আত্মোপলব্ধির উপযোগী অধিকার-সমূহকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবার। এই কারণেই উন্নত দেশসমূহে মৌলিক অধিকারসমূহকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেশের প্রধান আদালতের উপর উহাদের সংরক্ষণের ভার ন্যস্ত করা হয়। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ইহাই করা হইয়াছে।

রাষ্ট্র যদি তাহার কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হয় তবে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রভৃতি কর্তব্য পালন করিতে বাধ্য কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক ল্যাস্কি, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষিগণ বলেন যে, প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করা নাগরিকের কর্তব্য, কিন্তু সমস্ত দিকের বিচারবিবেচনা করিয়া অতি সতর্কতার সহিত বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা না করিলে আইন ও শৃংখলার পরিবর্তে অরাজকতা ও সমাজবিরোধী শক্তি প্রশ্রয় পাইবে।

৮

আইন ও স্বাধীনতা
(Law and Liberty)

আইন (Law)

সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করিতে হইলে, সংঘবদ্ধভাবে কাজকর্ম করিতে হইলে, সংঘবদ্ধভাবে কোন উদ্দেশ্যসাধন করিতে হইলে কতকগুলি সাধারণ নিয়মকানুন প্রবর্তন করা এবং মানিয়া চলা প্রয়োজন। তাহা না হইলে বিশৃংখলা দেখা দিবে, সামাজিক কাজকর্ম অচল হইয়া পড়িবে। এমনকি সুদূর অতীতেও যখন রাষ্ট্র সরকার জেল পুলিস প্রভৃতি গড়িয়া উঠে নাই, মানুষ তখন প্রথা ও ধর্মের অনুশাসন মানিয়া লইয়া সহজ সরল সামাজিক জীবন যাপন করিত। মোটকথা, নিয়মকানুন ব্যতীত জীবনের কোন ক্ষেত্রেই চলা সম্ভব নয়। সভা বল, সমিতি বল, মানুষের সংগে মানুষের সম্পর্ক বল, সর্বত্রই নিয়মকানুন না থাকিলে অরাজকতা বিরাজ করিবে। সাধারণ ফুটবল খেলার কথা ধরিলে দেখা যায় যে, খেলার নিয়মকানুন না থাকিলে বা না মানিলে খেলাই হইবে না। স্কুলের কথা ধরিলে দেখা যায় যে, স্কুল-পরিচালনার নিয়মকানুন না থাকিলে এবং উহাদের না মানিয়া চলিলে স্কুলের কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যাইবে। কলিকাতা মহানগরীর রাস্তায় গাড়ীঘোড়ার কথা ধরিলে দেখা যায়, যানবাহন চলাচলের নিয়মকানুন না মানিয়া চলিলে দুর্ঘটনা ও বিশৃংখলা দেখা দিবে। মানুষের সংগে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহজেই বুঝা যায় যে, যাহার যাহা ইচ্ছা করিবার অবাধ ক্ষমতা থাকিলে মারামারি কাটাকাটি লাগিয়াই থাকিবে। সুতরাং নিয়মকানুন সমাজজীবনের পক্ষে অপরিহার্য এবং উহারা সমাজজীবনের মধ্যেই নিহিত। কিন্তু সমাজে মানুষ যে-সকল নিয়মকানুন মানিয়া চলে তাহাদের প্রত্যেকটিকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইন আখ্যা দেওয়া হয় না। আইন বলিতে রাষ্ট্রের বিধি বুঝায়। অর্থাৎ, যে-সকল নিয়মকানুনকে রাষ্ট্র সৃষ্টি বা স্বীকার করিয়া লইয়া বলবৎ করে তাহাদিগকেই আইন বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই আইন কেহ ভংগ করিলে রাষ্ট্র শাস্তিপ্রদান করে। পুলিস সৈন্য আদালত ও জেল এই কারণেই রাখা হয়।

আইন ব্যতীত সমাজে অন্যান্য নিয়মকানুনও আছে—যথা, সামাজিক নিয়মকানুন, নৈতিক নিয়মকানুন, বিভিন্ন সমিতির নিয়মকানুন ইত্যাদি। প্রচলিত রীতিনীতি, প্রথা, ফ্যাশন প্রভৃতি হইল সামাজিক নিয়মকানুন; আর সত্যকথন, সত্যভংগ ও প্রবঞ্চনা না করা, অপরের অনিষ্টসাধন না করা, ইত্যাদি নৈতিক নিয়মকানুনের অন্তর্ভুক্ত। এগুলির সংগে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রধান পার্থক্য হইল যে আইন ভংগ

করা হইলে রাষ্ট্রশক্তি শাস্তিপ্রদান করে, কিন্তু অন্যান্য নিয়মকানুন মান্য না করা হইলে রাষ্ট্রের নিকট কোন ব্যক্তিকে দণ্ডনীয় হইতে হয় না। তবে রাষ্ট্রের হাতে শাস্তিভোগ না করিতে হইলেও তাহাকে সমাজের নিন্দা অথবা বিবেকের দংশন সহ্য করিতে হয় অথবা সভাসমিতি হইতে বিতাড়িত হইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক নিয়ম অনুসারে বয়ঃকনিষ্ঠ বয়ঃজ্যেষ্ঠদের সম্মান করিয়া চলিবে। কেহ যদি এই নিয়ম ভংগ করে তবে অপর দশজনে তাহার নিন্দা করিবে, কিন্তু আইন-আদালতে তাহাকে শাস্তিভোগ করিতে হইবে না। নৈতিক নিয়ম অনুসারে অপরের অনিষ্ট চিন্তা করা অন্যায়; কিন্তু এই নিয়ম ভংগ করা হইলে রাষ্ট্র-প্রদত্ত শাস্তিভোগ করিতে হয় না। তবে ব্যক্তি নিজের অন্যায় বুঝিতে পারিলে তাহার অনুশোচনা হয়।

তবে একথা মনে করা ভুল হইবে যে, সামাজিক প্রথা বা রীতিনীতি এবং ন্যায়-অন্যায়ের নীতির সহিত রাষ্ট্রীয় আইনের কোন সম্পর্ক নাই। প্রকৃতপক্ষে, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যে-সকল রীতিনীতি ও ন্যায়-অন্যায়ের নীতি গড়িয়া উঠে তাহার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের আইনকানুন প্রণীত হয়। এক সময় আমাদের দেশে সহমরণ প্রথা বা সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু আজ উহা আইনত দণ্ডনীয়।

আইনের সংজ্ঞা: উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে আমরা আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট উইলসনের (Woodrow Wilson) ভাষায় "আইন হইল মানুষের প্রচলিত আচারব্যবহার ও চিন্তার সেই অংশ যাহা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিধিতে পরিণত হইয়াছে এবং যাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট সমর্থন আছে।"* অধ্যাপক হল্যাণ্ড (Holland) বলেন, "আইন হইল মানুষের বাহিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সার্বভৌম রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্ব দ্বারা প্রযুক্ত সাধারণ নিয়মকানুন।"**

আইনের বৈশিষ্ট্য: এই দুইটি সংজ্ঞার মধ্যে আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্টই ধরা পড়ে। প্রথমত, আইন মাত্র মানুষের বাহিক আচরণকেই নিয়ন্ত্রিত করে, মানুষের মনের চিন্তা বা ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। যেমন, চুরি করা আইনত দণ্ডনীয়; কেহ চুরি করিলে তাহাকে শাস্তিপ্রদান করা হয়। কিন্তু কোন

---

* "Law is that portion of the established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of government."

** "A law is a general rule of external action enforced by the sovereign political authority."

ব্যক্তি চুরির চিন্তা বা বাসনা করিলে তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে ধরা এবং তাহাকে বাধাপ্রদান করা সম্ভব হয় না। সুতরাং মানুষের বাহিরের ব্যবহার বা আচরণ লইয়াই আইনের কাজ-কারবার। দ্বিতীয়ত, আইনের পিছনে থাকে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের শক্তি। অর্থাৎ, রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুলিস আদালত জেল প্রভৃতির মাধ্যমে বলপ্রয়োগ করিয়া আইন মান্য করিতে বাধ্য করায়। তৃতীয়ত, যে-পর্যন্ত না রাষ্ট্র প্রচলিত রীতিনীতিকে স্বীকার করিয়া লইয়া উহা বলবৎকরণের ব্যবস্থা করে সে-পর্যন্ত উহা আইন বলিয়া গণ্য হয় না।

আইনের উৎস (Sources of Law)

আইনের উৎস প্রধানত ছয়টি—যথা, প্রথা, ধর্ম, বিচারের রায়, ন্যায়বিচার, পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা এবং আইন প্রণয়ন।

১। **প্রথা (Custom):** আইনের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হইল প্রথা। প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র আইনসভা জেল পুলিস সৈন্য প্রভৃতি ছিল না। তবুও সমাজজীবন বিশৃংখল ছিল না। মানুষ তখন প্রথার সাহায্যেই বিবাদবিসংবাদের মীমাংসা করিয়া লইত। পরিবার, গোষ্ঠী এবং উপজাতির আচারব্যবহারের ভিত্তিতেই বিভিন্ন প্রথা গড়িয়া উঠে। ধর্মের ভয়েই হউক অথবা অপরের অনুসরণে বা প্রয়োজনের তাগিদেই হউক মানুষ আচারব্যবহার বা প্রথাকে মানিয়া চলিত। সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে অনেক দিন ধরিয়া সমাজের নেতৃবৃন্দ এই সকল প্রথার ভিত্তিতেই দ্বন্দ্ব-মীমাংসার ব্যবস্থা করিতেন। বর্তমানেও রাষ্ট্রের আইনকানুনের উপর প্রথার অসামান্য প্রভাব রহিয়াছে। আমাদের বহু আইনই প্রথাগত আইন।

২। **ধর্ম (Religion):** প্রাচীন কালে প্রথাগত অনুশাসন ও ধর্ম এমনভাবে মিশিয়াছিল যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যাইত না। প্রথাই ছিল আইন, আর আইনই ছিল ধর্ম। ধর্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আইনের ক্রমবিকাশে সহায়তা করিয়াছিল। পরোক্ষভাবে ইহা প্রথাকে সমর্থন করিয়া উহার স্থায়িত্ব প্রদান করিয়াছিল এবং প্রত্যক্ষভাবে দলপতি রাজা বা পুরোহিতকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া প্রচার করিয়া তাঁহার নির্দেশকেই ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মান্য করিতে শিখাইয়াছিল। বর্তমানেও আইনের উপর ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমানদের বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি সংক্রান্ত আইন বিশেষভাবে ধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত। ইহাদের ভিত্তিতে মনু ও কোরাণের বিধান বর্তমান রহিয়াছে।

৩। **বিচারের রায় (Judicial Decisions):** বিচারের রায় আইনের আর একটি উৎস। অতি প্রাচীন কালে প্রথা ও ধর্মীয় নিয়মকানুনের সাহায্যে সহজেই বিবাদবিসংবাদের মীমাংসা করা যাইত। কিন্তু পরে যখন সমাজ জটিল রূপ ধারণ

করিল তখন আর প্রথা ও ধর্মের মধ্যে সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ফলে বিচারকের আসনে আসীন দলপতি বা রাজা ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুসারে বিচার করিতে লাগিলেন। এই প্রকার বিচারের রায় ভবিষ্যতে বিচারকার্যে আইন হিসাবে গণ্য হইতে লাগিল।

শুধু প্রাচীন কালেই নয়, বর্তমানেও বিচারের রায় হইতে অনেক আইনের সৃষ্টি হয়। মূল আইনে অনেক ফাঁক থাকিতে পারে, আইনের অর্থও সুস্পষ্ট না হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণ বিচারের রায় দ্বারা আইনের ফাঁক পূরণ করেন, আইনের অর্থও সুস্পষ্ট করিয়া তুলেন। এই কার্য প্রকৃতপক্ষে আইন প্রণয়নকার্য তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বিচারপতি হোম্‌স (Holmes) বলিয়াছেন, "বিচারপতিগণ অবশ্যই আইন প্রণয়ন করেন এবং চিরকালই করিয়া যাইবেন।"

৪। **ন্যায়বিচার (Equity)**: ন্যায়বিচার আইনের আর একটি উৎপত্তিস্থল। এই সূত্রটির প্রকৃতি বিচারের রায়ের মতই। বিচারপতির কার্য ন্যায়বিচার করা। কিন্তু প্রচলিত আইনের সাহায্যে সকল সময় ন্যায়বিচার করা যায় না। বর্তমান সমাজ বিশেষভাবে গতিশীল বলিয়া কোন আইন কিছুদিন ধরিয়া প্রবর্তিত থাকিলে পর উহা সমাজের ন্যায়বোধের সহিত সম্পর্কবিহীন হইয়া পড়িতে পারে। ধরা যাউক, দেশের আইন অস্পৃশ্যতাকে সমর্থন করে, কিন্তু সমাজে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে জনমত বিশেষ জাগরিত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণকে নিজস্ব ন্যায়বোধ অনুসারে বিচারকার্য সম্পাদন করিতে হয়। ফলে আইনের রূপ পরিবর্তিত হইতে পারে, নূতন আইনেরও সৃষ্টি হইতে পারে। আমাদের উদাহরণে অস্পৃশ্যতা-সমর্থনকারী যে-আইন বর্তমান আছে তাহার স্থলে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আইন প্রবর্তিত হইতে পারে।

৫। **পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা (Scientific Commentaries)**: আইন সম্বন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা হইতেও আইনের উদ্ভব হয়। প্রত্যেক সভ্য দেশেই আইন সম্বন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতামত আইনজীবী ও বিচারপতিগণ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আইন অনেক সময় প্রথার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। পরবর্তী যুগে প্রথার পরিবর্তন ঘটিলেও আইনটি প্রচলিত থাকে। ফলে ঐ আইন সমাজের ধ্যানধারণার সহিত সামঞ্জস্যবিহীন হইয়া পড়ে। আবার অনেক সময় আইন যে-উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় লোকে তাহা ভুলিয়া যায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা আইনের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে, প্রকৃত উদ্দেশ্য স্মরণ করাইয়া দেয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা ও স্বরূপ বর্ণনা করেন। ইহা হইতে আইনের সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করা যায়। এইভাবে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আইনের উপর

টীকা ও রচনা বিভিন্ন দেশের আইনের অনেক সংস্কারসাধন করিয়াছে। কিছুদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে মন্থর টীকাই ছিল হিন্দু আইনের মূলভিত্তি। বর্তমানে অবশ্য হিন্দু সংহিতা (the Hindu Code) পাস হওয়ায় হিন্দু আইন মন্থর ব্যাখ্যা হইতে অনেকটা বিচ্যুত হইয়াছে।

৬। **আইন প্রণয়ন (Legislation):** আইন প্রণয়ন বলিতে বুঝায় আনুষ্ঠানিকভাবে আইনসভা কর্তৃক আইন রচনা। আধুনিক যুগে এই আইন প্রণয়নই আইনের সর্বপ্রধান উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতকে আইনের একমাত্র উৎস বলিয়া বর্ণনা করা হয়। আইনসভা জনমতকে আনুষ্ঠানিকভাবে আইনের রূপদান করে। প্রথা, ধর্মীয় নীতি, ন্যায়বোধ প্রভৃতি প্রায় সকলই আইনসভা দ্বারা বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত হইতেছে। ফলে সমাজে অন্যান্য সূত্র হইতে উদ্ভূত আইন ক্রমশ অপ্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। উদাহরণস্বরূপ, আবার হিন্দু সংহিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতীয় পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত হিন্দু সংহিতা প্রথা, ধর্ম, পণ্ডিত ব্যক্তিদের টীকা প্রভৃতির ভিত্তিতে উদ্ভূত পুরাতন হিন্দু আইনকে অপ্রচলিত করিয়াছে।

উপসংহার: উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এ-ধারণা সহজেই করা যাইবে যে আইনের উৎসসমূহ সকল সময়ে একই প্রকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। প্রাচীনতম যুগে প্রথার ভূমিকা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তারপর ক্রমে ঐ স্থান অধিকার করে ধর্ম, বিচারের রায় ও ন্যায়বিচার। পরে সভ্যতা আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে আইন প্রণয়ন ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা উভয়ে আইনের সর্বপ্রধান উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়। বর্তমানে আবার একমাত্র আইন প্রণয়নই আইনের প্রধান উৎপত্তিস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আইন ও নীতি (Law and Morality)

প্রাচীন কালে আইন ও নৈতিক বিধির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হইত না, কারণ তখন রাষ্ট্রীয় জীবন একমাত্র নৈতিক আদর্শ দ্বারাই পরিচালিত হইত। এই দিক দিয়াই এ্যারিস্টটল বলিয়াছেন যে মংগলময় জীবন সম্ভব করিবার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব—অর্থাৎ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য মংগলময় জীবন গঠন করা এবং একমাত্র এই নৈতিক আদর্শ দ্বারাই রাষ্ট্র পরিচালিত হইবে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও এইরূপ রাষ্ট্রনীতি ও সমাজের নৈতিক বিশ্বাসের সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। ভবভূতি লিখিয়াছেন, "নাগরিকগণ সকল অসত্যের কবল হইতে মুক্ত হইয়া সুখী হউক, রাষ্ট্রপাল নীতিপরায়ণ হইয়া দেশ রক্ষা করুন, মেঘ নাগরিকগণের সুকৃতির ফলে সর্বঋতুতে বারিবর্ষণ করুক এবং সকলে বন্ধুস্বজন সহবাসে আনন্দ উপভোগ করুক।" আইন ও নৈতিক বিধি

প্রাচীন কালে এইভাবে অভিন্ন থাকিলেও বর্তমানে উহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যাইতে পারে।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য : প্রথমত, নীতিশাস্ত্রের পরিধি আইন অপেক্ষা ব্যাপকতর। নৈতিক সূত্রগুলি মানুষের বাহিরের আচরণ ও মনের চিন্তা উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করে। নীতিশাস্ত্র অনুসারে শুধু যে লোকের অনিষ্ট করা অন্যায় তাহাই নহে, অনিষ্টের চিন্তা করাও অনুচিত। অপরদিকে আইনের উদ্দেশ্য হইল লোকের বাহিরের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, যদিও বা অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক আচরণের পশ্চাতে উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, স্বভাববশে চুরি করিলে যে-শাস্তি হয়, কয়েকদিন অনাহারে থাকিয়া চুরি করিলে তদপেক্ষা লঘু দণ্ডই হয়। উপরন্তু, আইন মানুষের সকল প্রকার বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে না, কিন্তু নীতিশাস্ত্র কোন বাহ্যিক আচরণকেই বাদ দেয় না। ফলে দেখা যায় যে, এরূপ অনেক কার্য দুর্নীতিমূলক বলিয়া ঘোষিত হয় যাহা আইনের দৃষ্টিতে অন্যায় নহে। মিথ্যা বলাকে নীতিশাস্ত্র কখনই সমর্থন করে না, কিন্তু মিথ্যা কথা দ্বারা যতক্ষণ কাহারও ক্ষতি না হয় ততক্ষণ ইহা আইনের গণ্ডির মধ্যে আসে না।

দ্বিতীয়ত, সমাজের কল্যাণসাধন আইনের উদ্দেশ্য। এই কারণে সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়াও আইন প্রণীত হয়, কিন্তু নৈতিক সূত্র রচিত হয় একমাত্র ন্যায়-অন্যায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। ফলে যাহা বেআইনী তাহা দুর্নীতিমূলক নাও হইতে পারে। প্রেক্ষাগৃহে বা ট্রামে-বাসে ধূমপান করা বেআইনী, কিন্তু দুর্নীতিমূলক নহে।

তৃতীয়ত, প্রয়োগের দিক হইতেই আইন ও নীতির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। আইন প্রযুক্ত হয় রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনভংগকারীকে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তিভোগ করিতে হয়। কিন্তু নীতি প্রযুক্ত হয় মানুষের নিজের বিবেক ও সমাজের অনুশাসন দ্বারা। ফলে নৈতিক বিধিভংগের শাস্তি হইল সম্পূর্ণ মানসিক—নিজের বিবেকের দংশন এবং লোকের 'ছি ছি' সহ্য করা।

পরিশেষে, আইন নির্দিষ্ট কিন্তু নৈতিক সূত্র অনির্দিষ্ট। আইন কি তাহা নির্দিষ্ট-ভাবে বলা যায় ; কিন্তু কোন্‌টি সুনীতি এবং কোন্‌টি দুর্নীতি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। নৈতিক বিশ্বাস অনেকাংশে ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং একজনের নিকট যাহা দুর্নীতিমূলক, অপর একজনের নিকট তাহা দুর্নীতিমূলক নাও হইতে পারে। অস্পৃশ্যতাকে অনেকে দুর্নীতিমূলক বলিয়া মনে করেন, অনেকে করেন না।

উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক : এইভাবে আইন ও নীতির মধ্যে পার্থক্য দেখান হইলেও উভয়ের মধ্যে আজও গভীর সম্পর্ক বর্তমান আছে এবং চিরকালই থাকিবে। আইন ও নৈতিক সূত্র উভয়েই সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে।

সুতরাং উভয়ে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে বাধ্য। সমাজের ন্যায়বোধ—অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা আইনে রূপান্তরিত হইয়া মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে। আইনও আবার কুনীতি দূর করিয়া সুনীতিকে আহ্বান করে। পূর্বে যে-আইন দ্বারা সতীদাহ প্রথার বিলোপের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা এই সুনীতি আহ্বানেরও অন্যতম উদাহরণ (৭৪ পৃষ্ঠা)। কিন্তু আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র যদি জোর করিয়া সহসা কোন নৈতিক ধারণা সমাজের উপর চাপাইয়া দিতে চায়, তবে সেই আইনকে বলবৎ করা কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, যতক্ষণ পর্যন্ত অধিকাংশ লোক মদ্যপানকে নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আইন করিয়া মদ্যপান বন্ধ করা অসম্ভব। এই কারণে অনেক দেশে মদ্যপানের বিরুদ্ধে আইন বিশেষ কার্যকর হয় নাই। সুতরাং আইনের কার্যকারিতা সমাজের নৈতিক বিশ্বাসের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এইজন্য আইন প্রণীত হয় নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। অবশ্য প্রচলিত নীতি যদি বর্তমান অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিহীন হইয়া পড়ে তবে আইনের মাধ্যমে উহার পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা না করিলে রাষ্ট্র কখনই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধনে সমর্থ হইবে না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সামগ্রিক কল্যাণসাধনই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

স্বাধীনতা (Liberty)

আইনের পরই স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। আইন ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে; অপরদিকে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় নিয়ন্ত্রণবিহীনতা। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আইন স্বাধীনতার বিরোধী। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, আইন স্বাধীনতার পরিপন্থী নহে, বরং আইনই স্বাধীনতার ভিত্তি। এই কারণে স্বাধীনতার স্বরূপ এবং আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক আলোচনা করিয়া দেখিতে হয়।

স্বাধীনতার স্বরূপ (Nature of Liberty): স্বাধীনতা অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ (political ideal)। এই আদর্শ যুগে যুগে মানুষকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তবে স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায় সে-সম্বন্ধে মানুষ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করিয়াছে।

প্রাচীন ধারণা : স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণা উদ্ভূত হয় প্রাচীন গ্রীসে। গ্রীকদের অনুসরণে প্রাচীন কালে স্বাধীনতা বলিতে বুঝাইত ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অনুসরণের জন্য বাহ্যিক আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা। অর্থাৎ, ব্যক্তি যদি বাধাবিহীনভাবে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধানে নিয়োজিত থাকিতে পারে তবেই সে স্বাধীন। স্বাধীনতার এই অর্থ গ্রহণ করা হইলে আইনকে স্বাধীনতার পরিপন্থী হিসাবে গণ্য করিতে হইবে,

কারণ আইন ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের উপর বাধানিষেধ আরোপ করিয়া তাহার আচরণের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া দেয়।

বর্তমান ধারণা : কিন্তু বর্তমানে স্বাধীনতা বলিতে ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা না বুঝাইয়া এমন একটি পরিবেশকে (atmosphere) বুঝায় যেখানে মানুষ নিজেকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে সমর্থ হয়। বিখ্যাত ইংরাজ লেখক ল্যাস্কি (Laski) বলেন, "স্বাধীনতা বলিতে আমি সেইরূপ পরিবেশ রক্ষার কথা বলিতেছি যেখানে মানুষ নিজেকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে" (By liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves)।

অতএব, বর্তমানে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় ব্যক্তির আত্মবিকাশের উপযোগী পরিবেশ। এই পরিবেশের সৃষ্টি হয় অধিকারের দ্বারা। সুতরাং স্বাধীনতা অধিকারেরই ফল।

বিষয়টিকে আরও একটু পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। স্বাধীনতা হইল আত্মবিকাশের উপযোগী পরিবেশ। আত্মবিকাশের বিশেষ বিশেষ সুযোগসুবিধা বা অধিকারের অস্তিত্ব থাকিলে তবেই এই পরিবেশ সৃষ্ট হয়। সুতরাং স্বাধীনতা নির্ভর করে অধিকারভোগের উপর। আমার যদি স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার থাকে, তবেই আমার গতিবিধির স্বাধীনতা থাকিতে পারে। এইভাবে বিভিন্ন অধিকার যখন পরিপূর্ণভাবে ব্যক্তির আত্মবিকাশের সহায়ক হয়, তখনই স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে।

দেখা গেল, স্বাধীনতা বলিতে বাধানিষেধ রহিত অবস্থা বা নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বুঝায় না, বুঝায় অধিকারের অস্তিত্ব। একদিক দিয়া কিন্তু স্বাধীনতাকে 'নিয়ন্ত্রণবিহীনতা' বলিয়াই বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণবিহীনতা দ্বারা ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝায় না, বুঝায় আত্মবিকাশের সুযোগসুবিধা বা অধিকারের উপর বাধানিষেধ সম্পূর্ণভাবে অপসারিত থাকা। অর্থাৎ, যে যে অধিকার স্বাধীনতার পরিবেশের সৃষ্টি করে তাহারা কোনরূপে নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ হইবে না ; হইলে স্বাধীনতা সংকুচিত হইয়া পড়িবে। স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার সীমাবদ্ধ অধিকার হইলে গতিবিধির স্বাধীনতাও পূর্ণ স্বাধীনতাও হইতে পারে না।

ব্যক্তির জন্য স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু স্বাধীনতা থাকিলেই যে ব্যক্তি তাহার পূর্ণ আত্মবিকাশে সমর্থ হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। মানুষ স্বাধীনতা বা আত্মবিকাশের সুযোগসুবিধার যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে সমর্থ নাও হইতে পারে। বাক্-স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি সরকারের সমালোচনায় বিমুখ

থাকিয়া সরকারকে স্বৈরাচারী হইবার সুযোগ প্রদান করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা হইয়া উঠে নিরর্থক। এইজন্যই ইংরাজ লেখক ম্যাথু আরনল্ড্ (Mathew Arnold) বলিয়াছেন, "যদি আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত ব্যবহার না করিতে পারি তবে স্বাধীনতা পাই বা না-পাই তাহাতে কিছু যায় আসে না।" সুতরাং স্বাধীনতা প্রদান করা যেরূপ রাষ্ট্রের কর্তব্য, ইহার যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা ইহাকে সার্থক করিয়া তোলাও তেমনি ব্যক্তির কর্তব্য। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ব্যক্তির যদি স্বাধীনতা প্রাপ্তির অধিকার থাকে তবে ইহাকে সার্থক করিয়া তুলিবার দায়িত্ব বা কর্তব্যও তাহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

আইন ও স্বাধীনতা (Law and Liberty)

রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির আত্মবিকাশের উপযোগী অধিকারসমূহকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে তবেই স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্ট হইতে পারে। আইনের দ্বারাই রাষ্ট্র এই অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। সুতরাং স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে আইনের উপর এবং পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভরশীল। এইভাবে স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট এবং আইনের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ইহাকে আইনসংগত স্বাধীনতা (Legal Liberty) বলা হয়। আইনসংগত বলিয়া এরূপ স্বাধীনতা অব্যাহত বা নিয়ন্ত্রণবিহীন হইতে পারে না, কারণ আইনের অর্থই নিয়ন্ত্রণ—সকলের জন্য ব্যক্তির যথেচ্ছাচারিতা নিয়ন্ত্রণ। সকলকে স্বাধীনতা প্রদানের উদ্দেশ্যেই আইন দ্বারা ব্যক্তির স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইংরাজ লেখক বার্কারের ভাষায় বলা যায়, "প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সকলের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা দ্বারা সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত।" কারখানার মালিকের পক্ষে যেমন শ্রমিকের কার্যের সর্ত নির্ধারণ করিবার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন, তেমনি শ্রমিকের পক্ষেও সে যে-কার্যে নিযুক্ত হইবে তাহার সর্তাবলী—যথা, মজুরি, কয় ঘণ্টা করিয়া কাজ করিতে হইবে, ইত্যাদি—নির্ধারণ করিবার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। শ্রমিকের এই স্বাধীনতা না থাকিলে শ্রমিক একরূপ ক্রীতদাসে পরিণত হইবে, সে তাহার আত্মশক্তিকে বিকশিত করিবার সুযোগ পাইবে না। সুতরাং মালিকের স্বাধীনতা ও শ্রমিকের স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইবে, শ্রমিকের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পেই মালিকের স্বাধীনতাকে খর্ব করিতে হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আত্মবিকাশের জন্য স্বাধীনতা যখন প্রত্যেকের পক্ষেই প্রয়োজনীয় তখন ইহা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া পারে না। বস্তুত, নিয়ন্ত্রিত না হইলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব বজায় থাকে না। আইনই এই নিয়ন্ত্রণকার্য সম্পাদন করে বলিয়া আইন স্বাধীনতার ভিত্তি।

যাঁহারা আইনকে স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া মনে করিয়াছেন তাঁহারা স্বাধীনতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্বাধীনতাকে তাঁহারা যথেচ্ছাচারিতা বলিয়া মনে করিয়াছেন। যথেচ্ছাচারিতার ফলে কয়েকজনের সুবিধা হয় সত্য, কিন্তু অধিকাংশেরই আত্মবিকাশ হয় ব্যাহত। শিল্পপতির যথেচ্ছাচারিতার ক্ষমতা থাকিলে শ্রমিকের কোন স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রমিককে শিল্পপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট কার্যের সর্ত মানিয়া লইতে হইবে, তাহাকে যে-কোন মজুরিতে কার্য করিতে হইবে। আবার যদি ধর্মাচরণের স্বাধীনতা অব্যাহত হয় তবে এক ধর্মসম্প্রদায়ের উগ্র আচরণের ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ঐ স্বাধীনতা বিপন্ন হইতে পারে। এইভাবে অব্যাহত বা অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার ফলে দুর্বল সবলের দ্বারা অত্যাচারিত হয়, ব্যক্তির লোভে সমষ্টির স্বার্থহানি ঘটে।

তাই প্রয়োজন হইল আইনের। আইন সকলের অধিকার ও আচরণের সীমা নির্দেশ করিয়া সবলের লোভের কবল হইতে দুর্বলকে রক্ষা করে। ইহার ফলে সকলের পক্ষেই আত্মোপলব্ধি সম্ভব হয়। প্রকৃত স্বাধীনতার উদ্দেশ্যই হইল সকলের আত্মবিকাশে সহায়তা করা—মাত্র কয়েকজনের নহে। সুতরাং আইনই স্বাধীনতার স্বরূপ বজায় রাখে। আইনই প্রকৃত স্বাধীনতার প্রাণ। তবে আইনের পক্ষে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ উহা সকলের স্বাধীনতা সংরক্ষণে সমর্থ হইবে না। উদাহরণস্বরূপ, ক্রীতদাস প্রথার যুগে আইনের ফলে ক্রীতদাস-মালিকদেরই সুবিধা হইত, ক্রীতদাসের স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইত না।

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (Forms of Liberty)

এতক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীনতার যে-রূপ লইয়া আলোচনা করা হইল তাহাকে ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা বা 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' বলা হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার তিনটি দিক আছে—সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। উপরন্তু, ব্যক্তির ন্যায় জাতির পক্ষেও স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপরিহার্য। এই শেষোক্ত স্বাধীনতাকে 'জাতীয় স্বাধীনতা' বলা হয়। নিম্নে স্বাধীনতার এই সকল রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

১। **সামাজিক স্বাধীনতা (Social Liberty):** সমাজজীবনে ব্যক্তির পক্ষে যে-স্বাধীনতা প্রয়োজনীয় তাহাকে সামাজিক স্বাধীনতা বলা হয়। সামাজিক অধিকারগুলি (Civil Rights) ভোগের দ্বারাই এই স্বাধীনতা উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং সামাজিক স্বাধীনতা বলিতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, গতিবিধির স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা, অপরের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা প্রভৃতি বুঝায়।

২। **রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty)**ঃ রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা। নাগরিক-জীবনে এই স্বাধীনতা সামাজিক স্বাধীনতার মতই গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন করিবার অধিকার, নির্বাচিত হইবার অধিকার, রাজনৈতিক দল-গঠনের অধিকার, সরকারী কার্যের সমালোচনা করিবার অধিকার প্রভৃতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপাদান।

৩। **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty)**ঃ সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রের ন্যায় অন্নসংস্থান ব্যাপারেও ব্যক্তির পক্ষে স্বাধীনতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার এই তৃতীয় রূপ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নামে অভিহিত। ইহার দ্বারা বুঝায় নাগরিকের পক্ষে অভাব-অনটনের ভাবনা ও সর্বদা বেকারত্বের ভয় হইতে মুক্তি এবং পর্যাপ্ত অবসর। সুতরাং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্ভব করিতে হইলে প্রত্যেককে উপযুক্ত মজুরি ও পর্যাপ্ত অবসর প্রদান করিতে হইবে, বেকারত্বের ভাবনা হইতে মুক্তি করিতে হইবে, জীবিকা নির্বাচনের স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে হইবে। অন্নচিন্তাতেই যদি মানুষের দিন কাটিয়া যায়, উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও যদি সে পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করিতে পারে, বেকার হইবার ভয়ে তাহাকে যদি সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হয় তবে তাহার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, নির্বাচনাধিকার প্রভৃতির কোনই মূল্য থাকে না। এই কারণে সমভোগবাদীরা (Communists) অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

৪। **জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty)**ঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও জাতীয় স্বাধীনতা অন্য সকল প্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি। জাতীয় স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণপাশ হইতে দেশ বা জাতির সর্বপ্রকার মুক্তি। দেশ পরাধীন থাকিলে ব্যক্তির পক্ষে আত্মবিকাশের সহায়ক অধিকারসমূহ ভোগ করা সম্ভব হয় না। মাত্র স্বাধীন দেশের লোকই পূর্ণ অধিকার ভোগ করিতে পারে। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইল জাতীয় স্বাধীনতার—অর্থাৎ বৈদেশিক অধীনতা হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত অবস্থার।

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (Safeguards of Liberty)

আমরা দেখিয়াছি যে, রাষ্ট্রশক্তি আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি পরিচালিত হয় সরকারের দ্বারা; সরকার আমাদের মতই সাধারণ লোক লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইহা আদর্শভ্রষ্ট হইতে পারে। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ক্ষমতার আসনে বসিয়া অনেক সময় জনসাধারণের স্বাধীনতা সংরক্ষণের পরিবর্তে ইহার বিনাশের ব্যবস্থা করিতে পারেন। এইজন্য প্রয়োজন হয়

স্বাধীনতা-রক্ষার বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার। ইহাদিগকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (safeguards) বলা হয়।

১। **সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকার**: স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ হইল শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলি (Fundamental Rights) লিখিতভাবে গৃহীত হওয়া। মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্রে লিখিতভাবে গৃহীত হইলে উহাদের একটি বিশেষ মর্যাদা থাকে। জনসাধারণ জানিতে পারে যে তাহাদের অধিকার কি কি। নির্দিষ্ট অধিকার ভংগ করা হইলে আদালতে প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকে। ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া আদালতের মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২। **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ**: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকেও স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচরূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু পূর্ণ অর্থে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব বা কাম্য—কোনটাই নহে। সুতরাং ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষাকবচ নহে। তবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের এক অংশ স্বাধীনতার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা হইল বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য। বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের প্রভাব হইতে মুক্ত না হইলে স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইতে পারে না। এ-সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা করা হইবে।

৩। **আইনের অনুশাসন**: 'আইনের অনুশাসন'ও (Rule of Law) স্বাধীনতার একটি প্রধান রক্ষাকবচরূপে পরিগণিত হয়। 'আইনের অনুশাসন' বলিতে মোটামুটি দুইটি জিনিস বুঝায়—(১) আইন অনুসারে শাসন এবং (২) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য। অর্থাৎ, সরকার যে-সকল ক্ষমতা ব্যবহার করে তাহা আইন-প্রদত্ত হইবে এবং সকলের জন্যই একই প্রকার আইন থাকিবে। সুতরাং বেআইনীভাবে কাহারও স্বাধীনতা খর্ব করা যাইবে না, এবং একই প্রকার অপরাধ করিলে সকলকে একই শাস্তিভোগ করিতে হইবে। ইংলণ্ডে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত না হইলেও এইভাবে আইনের অনুশাসনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংরক্ষিত করা হয়।

তবুও বলা যায়, আইনের অনুশাসন স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষাকবচ নহে। কারণ, আইন-প্রদত্ত ক্ষমতারও অপব্যবহার হইয়া থাকে এবং বর্তমান দিনের ধনবৈষম্যমূলক সমাজে আইন পক্ষপাতহীন হইতে পারে না। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যে-সমাজে ধনী-দরিদ্র উভয়ই আছে সে-সমাজের আইনে ধনীদেরই সুবিধা হয়, দরিদ্রদের নহে।

৪। **দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা**: অনেকের মতে, দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা স্বাধীনতার আর একটি রক্ষাকবচ। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ

জনপ্রতিনিধিগণ লইয়া গঠিত আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে এবং আইনসভায় বিরোধী দল সমালোচনা দ্বারা সরকারের দোষত্রুটি জনসমক্ষে তুলিয়া ধরে। এই দুই কারণে সরকার জন-স্বাধীনতা হরণ করিতে সাহসী হয় না।

৫। **গণভোট, গণ-উদ্যোগ ইত্যাদি :** প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখিবার জন্য বর্তমানে গণভোট, গণ-উদ্যোগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি যে-সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহাদিগকেও স্বাধীনতার রক্ষাকবচরূপে গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু বর্তমানে বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রসমূহে এই সকল পদ্ধতি বিশেষ অনুসৃত হইতে পারে না বলিয়া ইহাদের ব্যবহারিক মূল্য বিশেষ নাই।

৬। **স্বাধীনতাকামী নাগরিক সম্প্রদায় :** স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হইল স্বাধীনতাকামী নাগরিক সম্প্রদায়। এইরূপ নাগরিক সম্প্রদায়ের স্বাধীনতার জন্য উগ্র আকাংক্ষা এবং ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য তীব্র আবেগ থাকিবে। বিনামূল্যে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না—ইহার সংরক্ষণের জন্য মূল্য দিতে হয়। নাগরিকগণের চিরন্তন সতর্কতাই এই মূল্য। স্বাধীনতাকামী নাগরিক সর্বদা সজাগ থাকে এবং কোনরূপে স্বাধীনতা ব্যাহত হইলে অবিলম্বে বিঘ্নকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। প্রয়োজন হইলে সেই সংগ্রামে সর্বস্ব বিসর্জনও দেয়। এইজন্য গ্রীক দার্শনিক পেরিক্লিস (Pericles) বলিয়াছেন, "চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য" (Eternal vigilance is the price of liberty) এবং "সাহসিকতাই স্বাধীনতার মূলমন্ত্র" (Secret of liberty is courage)।

ল্যাস্কি বলেন, সাহসিকতা স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হইলেও ইহার প্রকাশের জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রভৃতি হইল এই সকল ব্যবস্থা। সুতরাং এগুলিও থাকা প্রয়োজন।

৯

সরকারের বিভিন্ন রূপ
(Forms of Government)

এ্যারিস্টটল প্রভৃতি প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়া ইহার বিভিন্ন রূপের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সকল রাষ্ট্রেরই প্রকৃতি এক বলিয়া—সকল রাষ্ট্র জনসমষ্টি, ভূখণ্ড প্রভৃতি একই উপাদানে গঠিত বলিয়া—এই শ্রেণীবিভাগ সন্তোষজনক হয় নাই। এই কারণে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রের পরিবর্তে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিয়া সরকারেরই বিভিন্ন রূপের আলোচনা করিয়া থাকেন।

সরকার বা শাসন-ব্যবস্থার* শ্রেণীবিভাগে প্রথমেই দেখা হয় যে শাসনক্ষমতা একজন না বহুজনের হস্তে ন্যস্ত। ক্ষমতা একজনের হস্তে ন্যস্ত থাকিলে সরকারকে নায়কতন্ত্র (Dictatorship) এবং বহুজনের হস্তে ন্যস্ত থাকিলে উহাকে গণতন্ত্র (Democracy) বা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Democratic Government) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই গণতন্ত্র ও নায়কতন্ত্রই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

গণতন্ত্র (Democracy):

'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলিতে এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা বুঝায় যাহা পূর্ণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ সমাজ জন্মগত ও ধনগত বৈষম্যকে কোনরূপ মর্যাদা দেয় না, বলপ্রয়োগ বা শোষণকে কোনরূপ সমর্থন করে না। এইরূপ সমাজে সকলেরই দায়িত্ব রহিয়াছে সমাজজীবনকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার এবং সমাজের উন্নতিকল্পে সকলের প্রচেষ্টাকেই সমান মূল্যবান বলিয়া গণ্য করা হয়। এইভাবে একমাত্র সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজ গণতান্ত্রিক রূপ ধারণ করে। সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় 'গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা'। ইহা শুধু রাজনৈতিক সাম্য বা সকলের সমান রাজনৈতিক অধিকার ও মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সাম্যের সন্ধান নাও মিলিতে পারে।

সাধারণত এই সংকীর্ণ অর্থেই 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়—অর্থাৎ গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বা গণতান্ত্রিক সরকার। এই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Democratic Government)

শব্দগত অর্থে গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় জনগণের শাসন (rule of the people)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি এ্যাব্রাহাম লিংকনের মতে, ইহার উপর গণতন্ত্র হইল জনগণের দ্বারা (by the people) এবং জনগণের (কল্যাণার্থে) জন্য (for

* সরকারের বাংলা শাসন-ব্যবস্থাও করা হয়।

le) শাসন। এই তিনটিকে মিলাইয়া রাষ্ট্রপতি লিংকন গণতান্ত্রিক র যে-সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই সুপ্রচলিত হইয়াছে। লিংকনের ভাষায়, াসন-ব্যবস্থা হইল "জনগণের (কল্যাণার্থে) জন্য, জনগণের শাসন (সরকার)" nment of the people, by the people, for the people)।

ন্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃতি: এখন প্রশ্ন উঠে যে জনগণ বলিতে জনগণ বলিতে কখনই দেশের সকল লোককে বুঝায় না, অধিকাংশকেই। এমন শাসন-ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই যাহাতে দেশের ারণ অংশগ্রহণ করিয়াছে। নাবালক উন্মাদ সমাজদ্রোহী প্রভৃতিকে নকার্যে অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হয় না। এই কারণে অধ্যাপক ডাইসি (Prof. A. V. Dicey) গণতন্ত্রের যে-সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই গ্রহণীয় বিবেচিত হয়। ডাইসির মতে, জনসাধারণের অধিকাংশই যদি শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে তবে তাহাই গণতন্ত্র। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) বলেন, এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা জনগণ বা সম্প্রদায়ের সকলের হস্তে ন্যস্ত থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে পরিণত হয়। কারণ, সম্প্রদায়ের ইচ্ছা প্রকাশিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে এবং সম্প্রদায়ের সকলে একমতাবলম্বী নহে বলিয়া নির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই শাসনভার প্রাপ্ত হয়।

বিষয়টিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ভারতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তিত বলিয়া শাসনক্ষমতা নাগরিক সম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু সকল নাগরিক একমতাবলম্বী নয়। এই কারণে নির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দলই কেন্দ্রে শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছে।*

সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'জনগণ' বলিতে বুঝায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এবং স্বাভাবিকভাবেই গণতান্ত্রিক শাসন হইল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, সর্বসাধারণের নহে।

এইভাবে শাসনকার্যের পরিচালনার ভার সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর ন্যস্ত থাকিলেও শাসনকার্য কিন্তু পরিচালিত হয় সকলেরই কল্যাণার্থে, মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্বার্থেই নহে। গণতান্ত্রিক সরকার কোন অবস্থাতেই সংখ্যালঘিষ্ঠের মংগলকে উপেক্ষা করিতে পারে না। ফলে এই শাসন-ব্যবস্থা সকলেরই প্রিয়; এই কারণে ইহাকে 'জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা'ও (Popular Form of Government) বলা হয়।

গণতন্ত্র রাজনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সকলের শাসনক্ষমতায় আস্থাবান। 'রাজনৈতিক সাম্য' বলিতে বুঝায় সকলেরই শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিবার সমান সুযোগসুবিধা। এই সুযোগসুবিধা প্রদান করাই গণতান্ত্রিক আদর্শ। কোন ব্যক্তি বা কোন

* অনেকগুলি রাজ্যে কিন্তু কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য দল শাসনভার পাইয়াছে।

শ্রেণী একচেটিয়াভাবে শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া থাকিবে, এইরূপ ধারণা গণতান্ত্রিক আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব শাসিতের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত, পাশবিক বলের উপর নয়। এই কারণে শাসনকার্য সর্বদাই জনমতের অনুকূলে পরিচালিত হয়। সুতরাং গণতন্ত্রকে 'জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা' (Government based on Public Opinion) বলিয়াও বর্ণনা করা যাইতে পারে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Direct and Indirect or Representative Democracy): বর্তমানে যে-গণতান্ত্রিক সরকারের সাক্ষাৎ আমরা পাই—যে-গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে তাহা হইল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Indirect or Representative Democracy)। ইহা ছাড়া গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধও (Direct or Pure) হইতে পারে।

প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় সেই শাসন-ব্যবস্থাকে যাহাতে নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে। প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রসমূহে এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে সমগ্র নাগরিক কোন বিশেষ স্থানে সমবেত হইয়া আইন প্রণয়ন, রাজস্ব ও ব্যয় নির্ধারণ, সরকারী কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিত। সময় সময় তাহারা আবার বিচারের ব্যবস্থাও করিত। এইভাবে শাসনকার্য নাগরিক সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হইত। নির্বাচন বা প্রতিনিধি প্রেরণের কোন ব্যবস্থাই ছিল না।

প্রাচীন গ্রীসের মত প্রাচীন ভারতেও নগর-রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহাভারতে এইরূপ নগর-রাষ্ট্রের উল্লেখ আছে। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন তিনি সিন্ধু নদের দুই তীরে বহুসংখ্যক নগর-রাষ্ট্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সেখানে তখন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রবর্তিত ছিল।

প্রাচীন গ্রীস ও ভারতের নগর-রাষ্ট্রে এইরূপ শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। রাষ্ট্রের আয়তন ক্ষুদ্র এবং জনসংখ্যা স্বল্প হইলে এখনও এইরূপ ব্যবস্থা চলিতে পারে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের আয়তন ক্ষুদ্র নহে, জনসংখ্যাও স্বল্প নহে। সুতরাং বর্তমান যুগে এই শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল। ফলে মাত্র সুইজারল্যাণ্ডের 'কয়েকটি ক্যাণ্টন' ও 'অর্ধ-ক্যাণ্টনে'* এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অংগরাজ্যে (States) এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে।

* সুইজারল্যাণ্ডে প্রদেশগুলি 'ক্যাণ্টন' (Cantons) এবং ক্ষুদ্রাকার প্রদেশগুলি 'অর্ধ-ক্যাণ্টন' (Half-Cantons) নামে অভিহিত। ক্যাণ্টন ও অর্ধ-ক্যাণ্টনের সংখ্যা হইল যথাক্রমে ১৯ ও ৬।

আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে না—পরোক্ষভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে করে। জন স্টুয়ার্ট মিলের ভাষায়, এই প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র হইল সেইরূপ শাসন-ব্যবস্থা যেখানে 'জনসাধারণের অধিকাংশ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনক্ষমতার ব্যবহার করে।' নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আইনসভায় জনমতের অনুকূলে আইন পাস করেন এবং শাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের অপ্রতিহত নিয়ন্ত্রণ করেন।

শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণও হয় নাগরিকগণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন, না-হয় আইনসভার প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন। সুতরাং তাঁহারাও জনমতের অনুকূলে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। প্রতিনিধি যদি জনমতের বিরুদ্ধে কার্য করেন, তবে পরবর্তী নির্বাচনে তাঁহার নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং তিনি জনমতের সপক্ষে কার্য করিতে সচেষ্ট থাকেন।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের গুণাগুণের মধ্যে তুলনা (Relative Merits and Demerits of Direct and Indirect Democracy): পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অপেক্ষা অনেক দিক দিয়া সুবিধাজনক। প্রথমত, পরোক্ষ গণতন্ত্র বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর কার্যকর হইতে পারে। সুতরাং ইহাই আজিকার দিনের বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রের উপযোগী ; প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বর্তমানে চলিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রয়োজনমত সরকারী কর্মবণ্টন (division of governmental functions) এবং ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ (separation of powers) করা সম্ভব। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে নাগরিকগণকে আইন প্রণয়ন, শাসনকার্য পরিচালনা, বিচারের ব্যবস্থা—সকলই করিতে হয়। সুতরাং কর্মবিভাগের সুবিধা লাভ করা যায় না ; স্বাধীনতার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থাও কোনরূপ করা যায় না। তৃতীয়ত, আজিকার দিনের কর্মমুখর রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় ; ইহার জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষজ্ঞের (experts)। সুতরাং পরোক্ষ গণতন্ত্রই কাম্য—বর্তমান দিনে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে সুশাসন (good government) সম্ভব নহে।

আদর্শের দিক দিয়া অবশ্য প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রই সমর্থনীয়, কারণ ইহাই গণতন্ত্র বা জনগণের শাসনের বিশুদ্ধ রূপ। পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনগণের হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাহাদের প্রতিনিধিবর্গ। এইরূপ গণতন্ত্রকে রুশো গণতন্ত্র বলিয়াই অভিহিত করিতে চাহেন নাই। তাঁহার মতে, গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ না হইলে উহা স্বৈরাচারের নামান্তর মাত্র।

দ্বিতীয়ত, পরোক্ষ গণতন্ত্রে ধরিয়া লওয়া হয় যে প্রতিনিধি জনমতের অনুকূলেই কার্য করিতে সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু প্রতিনিধি যে সকল সময় জনমতের অনুকূলেই কার্য করিবেন, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। নির্বাচিত হইয়া তিনি জনমতের বিরুদ্ধেও কার্য করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করিবার জন্য নির্বাচকগণকে পুনর্নির্বাচন অবধি অপেক্ষা করিতে হয়। এই কারণে অনেক সময় এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় যাহাতে প্রতিনিধির উপর নির্বাচকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ সর্বদা বজায় থাকে।

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (Direct Democratic Checks): প্রতিনিধির উপর নির্বাচকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার পন্থা প্রধানত তিনটি—গণভোট (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative) এবং পদচ্যুতি (Recall)। ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (Direct Democratic Checks) বলা হয়।

ক। গণভোট: গণভোট পদ্ধতির দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহকে নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটের দ্বারা পাস করান বাধ্যতামূলক করা যাইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশ ইহা অনুমোদন করিলে তবে ইহা আইনে পরিণত হইবে। এককথায় বলা যায়, গণভোটের ব্যবস্থা থাকিলে আইন প্রণয়নের চরম ক্ষমতা নির্বাচকমণ্ডলীর হস্তেই থাকে, প্রতিনিধিগণের নিকট হস্তান্তরিত হয় না।*

খ। গণ-উদ্যোগ: গণ-উদ্যোগ বলা হয় সেই ব্যবস্থাকে যেখানে নির্বাচকগণ উদ্যোগী হইয়া আইন প্রণয়ন করিতে পারে। শাসনতন্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিতে পারে যে নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচক যদি আবেদন করে তবে আইনসভা সেই আইন পাস করিতে বাধ্য হইবে।

গ। পদচ্যুতি: পদচ্যুতির ব্যবস্থা থাকিলে নির্বাচকগণ নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বেই প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করিতে পারে। এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচক যদি আবেদন করে যে প্রতিনিধি তাহাদের মতের বিরুদ্ধে কার্য করিতেছেন, তবে প্রতিনিধিকে পদত্যাগ করিয়া পুনর্নির্বাচনে অবতীর্ণ হইতে হয়। এইভাবে পদ্ধতিগুলি দ্বারা আজিকার দিনের বৃহৎ রাষ্ট্রে বিশুদ্ধ বা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখার প্রচেষ্টাই করা হয়।

---

* ইহা ছাড়া, Plebiscite নামে আর এক প্রকারের গণভোটের ব্যবস্থা থাকিতে পারে। Plebisciteএর উদ্দেশ্য হইল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জনগণের মতামত গ্রহণ এবং স্থায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণ (Merits of Democratic Government) : সর্বসাধারণের কল্যাণসাধন রাষ্ট্রের আদর্শ বলিয়া মানিয়া লইলে গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। কারণ, একমাত্র গণতন্ত্রেই শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না বলিয়া শাসনযন্ত্র সকলের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত হইতে পারে। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায়, গণতন্ত্রে শাসনক্ষমতা জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। সুতরাং জনসাধারণের পক্ষে যাহা মংগলজনক সেইরূপ কার্যই গণতন্ত্রে সম্পাদিত হয় ; জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর আইনই গণতন্ত্রে প্রণীত হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনস্বার্থকে উপেক্ষা করিতে পারেন না ; করিলে তাঁহাদের পক্ষে পুনরায় নির্বাচিত হইবার আশা থাকে না।

এ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, একমাত্র গণতন্ত্রেই ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ন্যায় ও সত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ধারণা থাকিতে পারে। এই কারণে প্রকৃত ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হইল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও ভাব-বিনিময়। একমাত্র গণতন্ত্রেই ইহা সম্ভব। নায়কতন্ত্রে আলাপ-আলোচনার কোন সুযোগ নাই ভাব-বিনিময়ের কোন ক্ষেত্র নাই। সেখানে নায়কের মতকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

গণতন্ত্র স্বাধীনতার ভিত্তিতে গঠিত। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সকলেরই অধিকার রহিয়াছে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করিবার, অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করিয়া আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হইবার। এইজন্য একমাত্র গণতন্ত্রেই সুন্দর ও সার্থক জীবন সম্ভবপর হয়।

গণতন্ত্র সাম্যের নীতিকেও সমর্থন করে। গণতন্ত্রে ধনী ও দরিদ্রে, অভিজাত ও অভাজনে, উচ্চবর্ণ ও নীচবর্ণে কোন ভেদ নাই। এখানে সকলেই সমান অধিকার ও সমান ক্ষমতাসম্পন্ন। ধনীরও একটি ভোট, দরিদ্রেরও একটি ভোট ; ধনীর নির্বাচিত হইবার অধিকার আছে, পথচারী দরিদ্রেরও নির্বাচিত হইবার অধিকার আছে।

গণতন্ত্র সকলকে সমান মর্যাদা দিয়া সাধারণ মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করে। সকলে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে বলিয়া তাহারা রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, তাহাদের দেশপ্রীতি গভীর হয় এবং তাহাদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। কেহ যখন কাহারও অপেক্ষা কম নহে তখন দেশরক্ষা সকলেরই দায়িত্ব, রাষ্ট্রের উন্নয়ন সকলেরই কর্তব্য—এইরূপ ধারণা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়া জাতীয় জীবনকে মংগলের পথে লইয়া যায়। জনসাধারণও শাসনকার্যে অংশগ্রহণের ফলে উত্তরোত্তর রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠে। মিলের মতে, সুশাসনই সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে,

জনসাধারণকে রাজনৈতিক শিক্ষাপ্রদান করাও অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। গণতন্ত্র এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও সাধন করে।

পরিশেষে, গণতন্ত্রে গণ-অভ্যুত্থান বা বিপ্লবের আশংকা বিশেষ থাকে না। গণতন্ত্রের অধীনে জনসাধারণ ইহা বুঝে যে রাষ্ট্র তাহাদেরই রাষ্ট্র, সরকার তাহাদেরই সরকার। বর্তমানে যাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছেন তাঁহারা তাহাদের প্রতিনিধি; সুতরাং আজ্ঞাবাহী। সৈন্যসামন্ত, পুলিস, চৌকিদার, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি তাহাদেরই ভৃত্য। এই কারণে জনসাধারণ আইনকানুন স্বেচ্ছায় পালন করে। আর যদি তাহারা দেখে সরকার অন্যায় করিতেছে, অযৌক্তিক আইনকানুন পাস করিতেছে তবে পরবর্তী নির্বাচনে তাহারা সরকার-গঠনকারী ঐ দলকে সরাইয়া দিয়া অন্য দলের হস্তে শাসনভার অর্পণ করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জনসাধারণ যদি কেন্দ্রে কংগ্রেস দলের শাসন পছন্দ না করে, তবে পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসকে সরাইয়া অন্য এক দলকে গদিতে বসাইতে পারে। সহজে শাসক-পরিবর্তন সম্ভব বলিয়া গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটে না।

ত্রুটি (Defects): উপরি-উক্ত গুণাবলী সত্ত্বেও গণতন্ত্র বিরুদ্ধ সমালোচনার হাত এড়াইতে পারে নাই। এক শ্রেণীর সমালোচকের মতে, গণতন্ত্র অক্ষম ও অশিক্ষিত জনসাধারণের শাসন। ইঁহারা বলেন, শাসন-ব্যবস্থার সফলতা নির্ভর করে শাসকবর্গের শিক্ষা, কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিবিবেচনার উপর। কিন্তু গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠত্বের উপযুক্ত মর্যাদা দেয় না। ইহা সকলকেই সমান জ্ঞান করে বলিয়া অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকেই সাধারণত শাসনকার্য পরিচালনা করিতে দেখা যায়। সমালোচকের ভাষায় বলিতে গেলে, গণতন্ত্র "সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, সর্বাপেক্ষা অজ্ঞ এবং সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্যের শাসন, কারণ এই শ্রেণীর লোকই সংখ্যায় অধিক।"

ইহাও বলা হইয়াছে যে অজ্ঞ ও অকর্মণ্যের শাসন বলিয়া গণতন্ত্র বিশেষভাবে রক্ষণশীল। নূতন নূতন আবিষ্কার, নূতন নূতন ধ্যানধারণা অশিক্ষিত শাসকবর্গ এবং জনসাধারণের মনে বিশেষ সাড়া জাগাইতে পারে না। ফলে শাসনযন্ত্র পুরাতন পদ্ধতিতেই চলে।

গণতন্ত্রে যে স্বাধীনতার কল্পনা করা হয় তাহাও সমালোচকগণের মতে ভুল। বলা হয় যে জনসাধারণের প্রকৃত স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকিতে পারে না। প্রকৃত স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণার জন্য যে চিন্তাশক্তি ও উপলব্ধির ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, তাহার কোনটাই সাধারণ লোকের থাকে না। সুতরাং তাহারা গতানুগতিক পথে চলে এবং নির্দিষ্ট গণ্ডির বাহিরে সকল প্রকার কার্য ও মতামত প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত

করিতে চেষ্টা করে। এইভাবে গণতন্ত্রে দেখা দেয় নিয়ন্ত্রণের আধিক্য। এই নিয়ন্ত্রণাধিক্যের জন্য জনসাধারণের স্বাধীনতা অলীক প্রতিপন্ন হয়।

দলপ্রথা গণতন্ত্রের অংগ। এই কারণে গণতন্ত্রে অপচয় দলগত স্বার্থপরতা প্রভৃতি কুফল দৃষ্ট হয়। প্রথমত, নির্বাচন ইত্যাদির জন্য বিরাট ব্যয় হয়। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় মিতব্যয়িতার প্রতি কাহারও দৃষ্টি থাকে না। শাসকবর্গ জনসাধারণের অর্থ অপব্যয় করিয়াও জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করেন। অপরদিকে আবার শাসকবর্গ এবং সাধারণ লোক সকলেই রাষ্ট্রের মংগল অপেক্ষা নিজ দলের স্বার্থের দিকে অধিক লক্ষ্য রাখে। এই সকলের ফলে জাতীয় কল্যাণ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। গণতন্ত্রে পরস্পরবিরোধী মত প্রচলিত থাকায় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের পক্ষে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার বিশেষ সুবিধা হয়। এই কারণে গণতান্ত্রিক সরকারের ঘন ঘন উত্থানপতন দেখিতে পাওয়া যায়।

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হইল যে এই শাসন-ব্যবস্থা চারুকলা বিজ্ঞান সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতি মানসিক সম্পদের উন্নতির পরিপন্থী। যে-জনসাধারণ গণতন্ত্রে ক্ষমতার অধিকারী তাহাদের নিকট এই সকল বিষয়ে প্রগতির কোন মূল্যই নাই। তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা নিম্নস্তরের বলিয়া তাহারা নিম্নস্তরের সাহিত্য, নিম্নস্তরের শিল্পকলারই পৃষ্ঠপোষকতা করে। ফলে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির সৃজনীশক্তি প্রকাশিত হইতে পারে না এবং গণতান্ত্রিক সভ্যতা 'বন্ধ্য, সাধারণ ও স্থূল' (banal, mediocre and dull) হইয়া দাঁড়ায়।

আরও বলা হয় যে বিপৎকালীন ব্যবস্থা অবলম্বনে গণতন্ত্র বিশেষ কার্যকর নহে। গণতন্ত্রে শাসক সংখ্যায় বহু বলিয়া প্রতি পদে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হয়। ইহাতে শাসনযন্ত্র মন্থরগতি হইয়া পড়ে এবং বিপদের সময় জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না।

পরিশেষে, গণতন্ত্র পুঁজিবাদের (Capitalism) প্রশ্রয় দেয় বলিয়াও অভিযোগ করা হইয়াছে। সংজ্ঞা অনুসারে এবং তত্ত্বের দিক দিয়া গণতন্ত্র সর্বসাধারণের সরকার, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহা ধনী ও মূলধন-মালিকদের স্বার্থেই পরিচালিত হয়। তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক সাম্য থাকিলেও অর্থনৈতিক সাম্য থাকে না। ইহার ফলে রাজনৈতিক সাম্য মূল্যহীন হইয়া পড়ে।

গণতন্ত্র কিভাবে সফল হইতে পারে (Conditions of Success of Democracy) : গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ যে বেশ

কিছুটা অতিরঞ্জিত তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে গণতন্ত্র যে ত্রুটিবিহীন শাসন-ব্যবস্থা সেকথাও বলা চলে না। আদর্শের দিক দিয়া গণতন্ত্রের স্থান অতি উচ্চে। কিন্তু এই সকল আদর্শকে উপলব্ধি করিয়া গণতন্ত্রকে সফল করিয়া তোলা বিশেষ কঠিন।

গণতন্ত্রের সাফল্য কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, গণতন্ত্রের সফলতার জন্য প্রয়োজন হইল 'গণতান্ত্রিক জনগণে'র (democratic men)। 'গণতান্ত্রিক জনগণ' বলিতে মিল এরূপ জনসাধারণকে বুঝিয়াছিলেন (১) যাহাদের গণতন্ত্রকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা আছে, (২) যাহারা কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ নহে এবং (৩) যাহারা গণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে সর্বদা প্রস্তুত। সুতরাং গণতন্ত্র প্রবর্তন করিলেই উহা সাফল্যলাভ করে না। জনসাধারণ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উপযোগী হইলে তবেই উহা সফল হইয়া উঠিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র নাগরিকগণের নিকট হইতে বুঝাপড়াও দাবি করে। কার্যক্ষেত্রে গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মানিয়া লইতে হইবে। অপরদিকে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষেও সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামত ও স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হইবে। এইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে সহযোগিতা থাকিলে তবেই গণতন্ত্র সফল হইতে পারে।

তৃতীয়ত, গণতন্ত্রে জনমতই প্রকৃত শাসক বলিয়া জনমত প্রকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ইহা না থাকিলে জনগণের পক্ষে শাসকবর্গকে কোনরূপে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না বলিয়া 'জনগণের শাসন' মিথ্যায় পরিণত হইতে পারে।

পরিশেষে, গণতন্ত্রের সফলতার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় বিষয় হইল জনগণের অর্থ নৈতিক অধিকারের। অর্থ নৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় যথাযোগ্য কর্মে নিযুক্ত হইবার অধিকার, উপযুক্ত মজুরি পাইবার অধিকার, বেকারত্ব হইতে মুক্তির অধিকার, পর্যাপ্ত বিশ্রামের অধিকার, ইত্যাদি। এইগুলি না থাকিলে লোকে ভোটাধিকার লইয়া কি করিবে? নাগরিক যদি দৈনন্দিন অভাব মিটাইতেই সকল সময় ব্যস্ত থাকে তবে সে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার লইয়া কখন চিন্তা করিবে?

কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া নাগরিককে অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করা যায় না। শ্রমিককে যথাযোগ্য মজুরি প্রদান করিতে হইলে নিয়োগকর্তার স্বাধীনতা খর্ব করিতে হয়। গণতন্ত্রের প্রয়োজনে ইহাই করিতে হইবে; বহুর কল্যাণের জন্য কতিপয় ব্যক্তির অর্থ নৈতিক স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করিতে হইবে। এরূপ করিলে তবেই সাধারণ নাগরিক গণতন্ত্রে আগ্রহান্বিত হইয়া ইহাকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইবে এবং তখনই গণতন্ত্র হইয়া উঠিবে প্রকৃত জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা (Popular Form of Government)।

নায়কতন্ত্র (Dictatorship)

নায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা। গণতন্ত্রে শাসনক্ষমতা বহুজনের হস্তে ন্যস্ত থাকে, নায়কতন্ত্রে ন্যস্ত থাকে মাত্র একজনের হস্তে। নায়কতন্ত্রে নায়কই (Dictator) একমাত্র শাসক ; অন্যান্য যে-সকল ব্যক্তি শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাঁহারা নায়কের অধীনস্থ আজ্ঞাবাহী বা কর্মচারী মাত্র।

প্রাচীন কালে রাজার হস্তেই শাসনের চরম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিত। এরূপ রাজতন্ত্রকে চরম রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) বলা হয়। তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে এই চরম রাজতন্ত্রও নায়কতন্ত্র। কিন্তু বর্তমানে 'নায়কতন্ত্র' শব্দটি একটু ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে নায়কতন্ত্র বলিতে সেই শাসন-ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে চরম ক্ষমতার অধিকারী হইলেন কোন রাজনৈতিক দলের নায়ক—উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনপ্রাপ্ত রাজা নহেন। এইরূপ রাজনৈতিক দলের নায়ক প্রথমে বিপ্লবের সাহায্যে বা নির্বাচনের ফলে ক্ষমতা অধিকার করেন। তারপর সকল বিরোধী দলের বিলোপসাধন করিয়া নিজ দলের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দলের মধ্যেও তিনি আর কোন নেতাকে মাথা তুলিতে দেন না। এইভাবে ক্রমে তিনি হইয়া দাঁড়ান দল ও দেশের একমাত্র নায়ক বা একনায়ক। নায়কগণের প্রত্যেকের নিজস্ব রাজনৈতিক দল থাকে বলিয়া গণতান্ত্রিকতার কিছুটা আভাস নায়কতন্ত্রে পাওয়া যায়।

বৈশিষ্ট্য : তবুও বলা যায়, নায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা। গণতন্ত্রে জনগণ শাসকবর্গকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু নায়কতন্ত্রে শাসকই জনগণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। মানুষে মানুষে সাম্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, জনমতের প্রাধান্য প্রভৃতি গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান নায়কতন্ত্রে পাওয়া যায় না। ইহাদের পরিবর্তে দেখা যায় একদলীয় শাসন, দলের উপর নায়কের একাধিপত্য, মূল্যহীন ভোটাধিকার, জনমত নিয়ন্ত্রণ এবং 'রক্ত ও তরবারির নীতি' অনুসরণ।

নায়কতন্ত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকার ও অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয় এবং অনেক সময় তাহাদিগকে দমনও করা হয়। অপরদিকে আবার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া নায়কতন্ত্রের বিরোধিতার সম্ভাবনা লুপ্ত করা হয়। সংখ্যা-লঘিষ্ঠের দমনের জন্য, জনমত নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হইলে গুলিগোলা জেল নির্বাসন প্রভৃতি সবকিছু ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়।

গুণ (Merits) : নায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া গণতন্ত্রের যাহা ত্রুটি নায়কতন্ত্রের তাহা গুণ এবং গণতন্ত্রের যাহা গুণ নায়কতন্ত্রের

তাহা দোষ। প্রথমে গুণ লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, নায়কতন্ত্রে বহুজনের কুশাসনের পরিবর্তে একজনের সুশাসনের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে। নানা মুনির নানা মতের ফলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় যে-বিশৃংখলার সম্ভাবনা থাকে, নায়ক সুদক্ষ অভিজ্ঞ এবং কর্মক্ষম হইলে সে-আশংকা দূর হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, নায়কতন্ত্রে দলীয় বিরোধ না থাকায় অপব্যয়, দলীয় স্বার্থসাধন প্রভৃতি রহিত হইয়া দেশের সর্বাংগীণ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। তৃতীয়ত, বিপদের সময় এবং জরুরী অবস্থায় নায়ক দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন, বহুজন-শাসিত গণতন্ত্রে যাহা সম্ভব হয় না। পরিশেষে, জনমতের জোয়ারভাঁটায় ফলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মত নায়কতন্ত্রে সরকারের ঘন ঘন উত্থানপতন ঘটে না। সরকারের এই স্থায়িত্বের ফলে নায়কতন্ত্রে দীর্ঘদিন ধরিয়া বিশেষ নীতি অনুসৃত হইতে পারে।

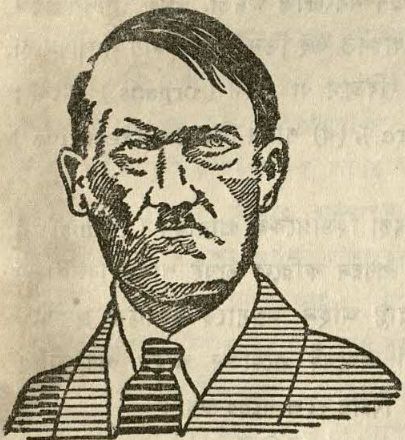
ত্রুটি (Defects): অপরদিকে কিন্তু নায়কতন্ত্রের অধীনে জনসাধারণ রাজনৈতিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয়। শাসন-ব্যবস্থায় কোথায় গলদ তাহা তাহারা জানিতে পারে না; জানিতে পারিলেও সে-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে পারে না। নায়কতন্ত্রে শুধু এই মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাই নহে, অন্যান্য স্বাধীনতা ও মানুষে মানুষে সাম্যও অস্বীকৃত হয়। সকলেরই যে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের ক্ষমতা ও অধিকার আছে তাহা মোটেই মানিয়া লওয়া হয় না। ফলে নাগরিকের আত্মবিকাশ ব্যাহত হয়, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি তাহার আকর্ষণ গভীর হইতে পারে না। নায়কতান্ত্রিক সরকারকে সে বৈদেশিক সরকারের ন্যায় জ্ঞান করিতে শিখে। এই সরকারের পরিবর্তন নির্বাচনের মাধ্যমে সম্ভব নয় বলিয়া পরিবর্তন প্রয়োজনীয় মনে করিলে লোকে বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হয়। ফলে নায়ককে সর্বদা সচেতন হইয়া থাকিতে হয়, বিপ্লবের কানাঘুষা চলিতেছে কি না তাহা জানিবার জন্য বহু গুপ্তচর পোষণ করিতে হয়। এই বাবদ অর্থের অপচয় ছাড়াও গুপ্তচরদের কার্যকলাপের ফলে সাধারণ লোকের জীবন ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে।

উপসংহার হিসাবে বলা যায় যে ত্রুটি সত্ত্বেও নায়কতন্ত্রে মোটামুটি সুশাসনের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উহাই যথেষ্ট নহে, কারণ লোকে মাত্র সুশাসনই চায় না, নিজস্ব শাসন বা স্বায়ত্তশাসনও চায়।

নায়কতন্ত্রের দুইটি সাম্প্রতিক রূপ (Two Modern Forms of Dictatorship): সাম্প্রতিক নায়কতন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালীর ফ্যাসীবাদী নায়কতন্ত্র (Fascist Dictatorship) এবং জার্মেনীর নাৎসীবাদী নায়কতন্ত্র (Nazi Dictatorship) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ফ্যাসীবাদ প্রচারের সাহায্যে মুসোলিনী এবং নাৎসীবাদের সাহায্যে হিটলার যথাক্রমে ইতালী ও জার্মেনীর সর্বময় কর্তা হইয়া দাঁড়ান।

মুসোলিনী গণতন্ত্রকে সরাসরি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনই যে সুশাসন হইবে এমন কোন কথা নাই। সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকিতে পারেন যিনি শাসন-পরিচালনার কার্যে যোগ্যতম। সুতরাং এইরূপ ব্যক্তির সন্ধান করিয়া তাঁহার হস্তেই শাসনকার্য পরিচালনার ভার দিতে হইবে। নির্বাচনের প্রয়োজন নাই, আইনসভার বিতর্কও নিরর্থক; শাসনকার্য পরিচালনার ভার যোগ্য ব্যক্তির হস্তে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিয়া এইরূপ যোগ্য ব্যক্তিকে পূজা করাই জনসাধারণের কর্তব্য।



হিটলার



মুসোলিনী

হিটলারও গণতন্ত্রের ধ্বংস করিয়া নেতৃপূজার ব্যবস্থা প্রচলন করেন। হিটলারই সমগ্র জার্মান জাতির নেতা হইয়া দাঁড়ান এবং তাঁহার অধীনে নাৎসী দল (Nazi Party) জার্মেনীকে পরিচালিত করিতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইতালী ও জার্মেনী উভয় দেশেই নায়কতন্ত্র ধ্বংস হইয়া গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে নায়কতন্ত্র পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হয় নাই; অন্তত ফ্রাংকোর অধীনে স্পেনে ইহা আবার মাথা তুলিয়াছে।

১০

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি

(Organs of Government and Separation of Powers)

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (Organs of Government)

সরকারই রাষ্ট্রের হইয়া কার্য পরিচালনা করে। সুতরাং রাষ্ট্রের কার্যাবলী বলিতে বুঝায় সরকারেরই কার্যাবলী। সরকারের কার্যাবলী প্রধানত তিন শ্রেণীর—যথা, আইন প্রণয়ন করা, আইন বলবৎ বা শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং বিচারের ব্যবস্থা করা। এই তিন প্রকার কার্য পরিচালনার জন্য সরকারী ক্ষমতাকেও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (ক) আইন প্রণয়নসংক্রান্ত ক্ষমতা, (খ) শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা এবং (গ) বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা। সাধারণত এই তিন প্রকার কার্য সম্পাদন বা ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য সরকারের তিনটি বিভাগ বা অংগ (organs) থাকে: (ক) আইন বা ব্যবস্থা বিভাগ (Legislature), (খ) শাসন বিভাগ (Executive) এবং (গ) বিচার বিভাগ (Judiciary)।

সরকারের এই তিনটি বিভাগের মধ্যে ব্যবস্থা বিভাগকেই প্রাথমিক (primary) বলিয়া ধরা হয়। ব্যবস্থা বিভাগ আইন প্রণয়ন করিলে তবেই শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের কার্যের সুযোগ ঘটে। রাষ্ট্র আইন অনুসারে সংগঠিত জনসমষ্টি (a people organised for law) বলিয়া প্রথমেই প্রয়োজন আইন প্রণয়নের। সেই আইন অনুসারে শাসন ও আইনভংগের বিচার হইল পরের কথা।

দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে ব্যবস্থা বিভাগ জনপ্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত হয় বলিয়াও ব্যবস্থা বিভাগের গুরুত্ব অপর দুই বিভাগ হইতে অধিক। এই দুই কারণে সাধারণত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের আলোচনা সুরু করা হয় ব্যবস্থা বিভাগ হইতে।

ব্যবস্থা বিভাগ (The Legislature)

ব্যবস্থা বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা হইল ইহার কার্যাবলী ও সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা।

কার্যাবলী (Functions): ব্যবস্থা বিভাগের কার্য আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু বর্তমান যুগে ইহা অন্যান্য কার্যও সম্পাদন করে। ব্যবস্থা বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান:

(ক) আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য: ইহাই ব্যবস্থা বিভাগের প্রধান কার্য। পূর্বে অধিকাংশ আইন ছিল প্রথাগত (customary laws)। কিন্তু বর্তমানে ব্যবস্থাপক

সভা-প্রণীত আইনই প্রধান স্থানাধিকার করিয়াছে। আজিকার দিনে ব্যবস্থাপক সভা প্রথাগত আইনের (customary laws) সংশোধন করে এবং প্রয়োজন হইলে ইহার বিলোপসাধন করিয়া নূতন আইন প্রণয়ন করে।

(খ) অর্থসংক্রান্ত কার্য: গণতন্ত্রের অন্যতম মৌলিক নীতি হইল যে জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের সম্মতি লইয়াই করধার্য বা ব্যয়বরাদ্দ করিতে হইবে। ইহার ফলে সকল গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রীয় অর্থের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকের ব্যবস্থা বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধে রাষ্ট্রীয় অর্থব্যয়ের প্রশ্ন রহিয়াছে বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক সভার সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণাও করা যায় না।

(গ) শাসনসংক্রান্ত কার্য: ব্যবস্থা বিভাগকে কর্মচারী নিয়োগ, যুদ্ধ ঘোষণা, সন্ধি অনুমোদন প্রভৃতি শাসনসংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করিতে দেখা যায়। শাসন বিভাগকে বা মন্ত্রি-পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করাও এই শাসনসংক্রান্ত কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) বিচারসংক্রান্ত কার্য: ব্যবস্থা বিভাগের বিচারসংক্রান্ত কার্যও রহিয়াছে। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার করে ব্যবস্থাপক সভা। ইহা ছাড়া ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের আচরণের বিচার হয় ঐ ব্যবস্থাপক সভাতেই। ইংলণ্ডে আবার ব্যবস্থাপক সভার উচ্চতর পরিষদ লর্ড সভা (House of Lords) ঐ দেশের আপিল বিচারের চূড়ান্ত আদালত।

(ঙ) শাসনতন্ত্রসংক্রান্ত কার্য: শাসনতন্ত্র বা সংবিধান সংক্রান্ত কার্য বলিতে সংবিধানের পরিবর্তন ও ব্যাখ্যার কার্য বুঝায়। ভারতের ন্যায় অনেক রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভা সমগ্র বা আংশিকভাবে সংবিধানের পরিবর্তন করিতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডে সংবিধানের ব্যাখ্যার চূড়ান্ত ভার ঐ দেশের ব্যবস্থাপক সভার হস্তে ন্যস্ত।

গঠন—একপরিষদসম্পন্ন ও দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভা (Organisation—Unicameral and Bicameral Legislatures)

ব্যবস্থাপক সভা একটি অথবা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইতে পারে। একটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইলে উহাকে একপরিষদসম্পন্ন আইনসভা (Unicameral Legislature) এবং দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইলে উহাকে দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভা* (Bicameral Legislature) বলা হয়।

দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভার সপক্ষে যুক্তি: দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভার পরিষদ দুইটিকে যথাক্রমে প্রথম বা নিম্নতর (lower) এবং দ্বিতীয় বা উচ্চতর

* 'Legislature'-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'ব্যবস্থাপক সভা' ও 'আইনসভা' দুইই করা হয়।

(upper) পরিষদ বা কক্ষ (chamber) বলিয়া অভিহিত করা হয়। নিম্নতর পরিষদ সকল ক্ষেত্রেই জনগণের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইহা জনপ্রিয় পরিষদ (popular chamber) নামেও পরিচিত।

আইনসভা দ্বিপরিষদসম্পন্ন অথবা একপরিষদসম্পন্ন হইবে ইহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার সমর্থকেরা নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেন :

(ক) দুইটি পরিষদ না থাকিলে সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভব হয় না। একটি-মাত্র পরিষদে প্রত্যেকটি বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইতে পারে না। ফলে ইহাতে সর্বদাই অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণয়নের আশংকা রহিয়াছে। একপরিষদসম্পন্ন আইনসভা মুহূর্তের আবেগে এরূপ আকস্মিক আইনও পাস করিতে পারে, যাহাতে দেশের ক্ষতি হয়। কিন্তু দুইটি পরিষদ থাকিলে এরূপ ঘটা দুষ্কর। প্রথম পরিষদ কোন বিল পাস করিলে দ্বিতীয় পরিষদ ধীরভাবে উহার বিচার করে। ইহাতে বিলটির দোষত্রুটি ধরা পড়ে এবং অবিবেচনামূলক আইনও প্রণীত হইতে পারে না। এইভাবে দ্বিতীয় পরিষদ অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে।

(খ) লর্ড ব্রাইসের মতে, দ্বিতীয় পরিষদ নাগরিকগণকে একটিমাত্র পরিষদের স্বৈরাচার হইতে রক্ষা করে। তিনি বলেন, সকল আইনসভারই স্বৈরাচারী হইবার একটি অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি আছে। একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে এই প্রবৃত্তি বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। তাই আইনসভাকে সমক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি পরিষদে বিভক্ত করা উচিত যাহাতে একটি অপরটির স্বৈরাচারিতা রোধ করিতে পারে।

বর্তমান যুগে ব্রাইসের এই যুক্তি মানিয়া লওয়া হয় না। দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভার সমর্থকরাও উভয় পরিষদকে সমান ক্ষমতা প্রদানের পক্ষপাতী নহেন।

(গ) উচ্চতর বা দ্বিতীয় পরিষদে মনোনয়ন ও পরোক্ষ নির্বাচনের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যগুলির আইনসভার দ্বিতীয় পরিষদে শিল্পকলা বিজ্ঞান সাহিত্য সমাজসেবা প্রভৃতিতে খ্যাতিসম্পন্ন বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মনোনয়নের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) অধিকাংশ সময় উচ্চতর পরিষদে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সংখ্যায় অধিক থাকেন বলিয়া ঐ পরিষদ নিম্নতর পরিষদের উৎসাহী অথচ অনভিজ্ঞ সভ্যগণকে সংযত রাখিতে পারে। প্রথম পরিষদেও উচ্চতর পরিষদের রক্ষণশীলতা কতকাংশে দূর করিতে পারে।

(ঙ) বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বিপুলভাবে বাড়িয়া যাওয়ায় একটি পরিষদের পক্ষে আইনসভার সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয় বলিয়াই অনেকে মনে করেন। সুতরাং প্রয়োজন হইল দুইটি পরিষদের।

(চ) দ্বিতীয় পরিষদেও প্রত্যেক বিল সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা হইতে জনসাধারণ রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষালাভ করে। একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে হয়ত বিতর্ক ও আলোচনার ত্রুটি থাকিয়া যাইত; ফলে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষাও ত্রুটিপূর্ণ হইত।

(ছ) অনেকের মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভায় দুইটি পরিষদ সম্পূর্ণ অপরিহার্য। যুক্তরাষ্ট্রে দুই প্রকার স্বার্থের সমন্বয়সাধন করা হয়—যথা, জাতীয় স্বার্থ ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বার্থ। এই দুই পৃথক স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের জন্য দুইটি পরিষদের প্রয়োজন। যেমন, ভারতবাসী হিসাবে আমাদিগকে সমগ্র ভারতের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে, আবার পশ্চিমবংগবাসীদের পশ্চিমবংগের স্বার্থের দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। সুতরাং আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার একটি পরিষদে থাকিবেন সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধিবর্গ, আর অপরটিতে থাকিবেন পশ্চিমবংগ বিহার উড়িষ্যা আসাম প্রভৃতি সকল রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ।

বিপক্ষে যুক্তি : দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভার বিরোধিতা করিয়া ফরাসী লেখক আবে সিয়ে (Abbes Sieyes) বলিয়াছেন, উচ্চতর পরিষদ যদি নিম্নতর পরিষদের সহিত একমত হয় তবে উহা অনাবশ্যক, আর যদি একমত না হয় তবে উহা অনিষ্টকর। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারা যায়, উচ্চতর পরিষদ যদি নিম্নতর পরিষদকে সমর্থন করিতেই থাকে তবে দুইটি পরিষদ বজায় রাখিয়া অনর্থক জটিলতা সৃষ্টি ও সময় নষ্ট করিবার কোন হেতু নাই। এক্ষেত্রে উচ্চতর পরিষদের বিলোপসাধনই করা উচিত। অপরদিকে যদি উচ্চতর পরিষদ নিম্নতর পরিষদের কার্যে বাধার সৃষ্টিই করিতে থাকে তবে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় বলিয়া এই ব্যবস্থা অনিষ্টকর। সুতরাং আইনসভা একটিমাত্র পরিষদ লইয়াই গঠিত হইবে। বস্তুত, উচ্চতর পরিষদ সকল সময় বিবেচনার সহিত কার্য করে না। ইহা একরূপ ধরিয়া লয় যে নিম্নতর পরিষদের বিরোধিতা করাই ইহার কর্তব্য। অর্থাৎ, উহার পক্ষে বিরোধিতা করা একপ্রকার স্বভাবে পরিণত হয়। ফলে অনেক সময় ইহা কাম্য আইন প্রণয়নেও বাধাপ্রদান করিয়া দেশের অনিষ্টসাধন করে।

উপরন্তু, দুইটি পরিষদ থাকিলে অতিরিক্ত অর্থব্যয় হয়। উচ্চতর পরিষদ যদি অনাবশ্যক এবং অকাম্যই হয় তবে এই অর্থব্যয়কে অপচয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

উচ্চপদ পরিষদ সাধারণত ধনী, রক্ষণশীল ও মনোনীত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়। এইরূপ গঠন অগণতান্ত্রিক বলিয়াও দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভার বিরোধিতা করা হয়। বলা হয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভা মাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গকে লইয়াই গঠিত

হইবে, ইহাতে মনোনয়ন বা ইংলণ্ডের লর্ড সভার মত উত্তরাধিকার সূত্রে সভ্যপদপ্রাপ্তির কোন ব্যবস্থাই থাকিবে না।

আর একটি কারণে দ্বিতীয় পরিষদকে অগণতান্ত্রিক মনে করা হয়। গণতন্ত্র হইল জনমত পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা। ব্যবস্থা বিভাগ জনমতের অনুকূলে আইন পাস করিবে এবং শাসন বিভাগ তাহা বলবৎ করিবে—ইহাই এই শাসন-ব্যবস্থার মূলকথা। কিন্তু দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভায় কোন্‌টি ঠিক জনমত তাহা নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ, দেখা যায় দুইটি পরিষদ পরস্পরের বিরোধী মত প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং বলা হয়, আইনসভা জনমতের প্রতিফলন ক্ষেত্র বলিয়া ইহা ঐক্যবদ্ধই হইবে, দুইটি পরস্পরবিরোধী পরিষদে বিভক্ত হইবে না।

আরও বলা হয়, আইনসভা দ্বিপরিষদসম্পন্ন হইলে ব্যবস্থা বিভাগের দায়িত্ব বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং দুইটি পরিষদের প্রত্যেকটি পরস্পরের উপর দোষ চাপাইয়া অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিবে।

অন্যতম আধুনিক লেখক ল্যাস্কি বলেন, একপরিষদসম্পন্ন আইনসভাই বর্তমান যুগের পক্ষে প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা। বর্তমানে বিশেষ বিচারবিবেচনা না করিয়া কোন আইন পাস করা হয় না। প্রথম পরিষদের পর দ্বিতীয় পরিষদ এই আলোচনারই পুনরাবৃত্তি করে মাত্র। ফলে অনর্থক সময় নষ্ট হয় এবং প্রয়োজনীয় আইন পাসে অযথা বিলম্ব ঘটে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভায় দ্বিতীয় পরিষদের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করা হয়। ল্যাস্কির মতে ইহাও ভুল। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেই ঐ স্বার্থসংরক্ষণের যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করা হয়: (ক) শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন, (খ) লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র এবং (গ) ক্ষমতা বণ্টন লইয়া বিবাদবিসংবাদ মীমাংসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। আঞ্চলিক স্বার্থসংরক্ষণের জন্য এইগুলিই যথেষ্ট। ইহার উপর দ্বিতীয় পরিষদ সম্পূর্ণ অহেতুক।

উপসংহার: উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্য দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভার প্রতি আকর্ষণ অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে। তবুও অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইহার বিলোপসাধন অপেক্ষা সংস্কারেরই পক্ষপাতী। ইঁহারা মনে করেন, প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধিত হইলেই দ্বিতীয় পরিষদের ত্রুটিগুলি দূর হইবে এবং তখন ইহা সংশোধনকারী পরিষদ (revising chamber) হিসাবে জনকল্যাণে নিয়োজিত থাকিতে পারিবে।

শাসন বিভাগ (The Executive)

সরকারের যে-অংশ আইন বলবৎকরণের কার্যে নিযুক্ত তাহাকে শাসন বিভাগ বলা হয়। ব্যাপক অর্থে প্রধান কর্মকর্তা (Chief Executive) হইতে আরম্ভ করিয়া

সাধারণ পুলিস কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সংকীর্ণ অর্থে মাত্র প্রধান কর্মকর্তা ও কর্মসচিবকে লইয়া শাসন বিভাগ গঠিত এইরূপ মনে করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাধারণত এই সংকীর্ণ অর্থেই 'শাসন বিভাগ' কথাটি ব্যবহৃত হয়।

প্রধান কর্মকর্তা ইংলণ্ডের মত উত্তরাধিকার সূত্রে পদলাভ করিতে পারেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যসমূহের রাজ্যপালগণের ন্যায় জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইতে পারেন, ভারতের রাষ্ট্রপতির ন্যায় আইনসভার সভ্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইতে পারেন অথবা কানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের গভর্নর-জেনারেলের ন্যায় মনোনীত হইতে পারেন।

শাসন বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Executive): রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধির সংগে সংগে শাসন বিভাগের কার্যও বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমান জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ যে-সকল কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:

(ক) আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা: আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা বলিতে দেশের অভ্যন্তরে শান্তিশৃংখলা রক্ষা, নিম্নতন কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ, সরকারী কর্মচারীদের জন্য নিয়মকানুন প্রণয়ন, জরুরী অবস্থায় অস্থায়ী আইন (ordinance) পাস প্রভৃতি কার্যকে বুঝায়। শাসন বিভাগের যে-দপ্তরের উপর আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনার ভার থাকে তাহাকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর (Home Department) বলা হয়।

(খ) পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কার্য: পররাষ্ট্রসংক্রান্ত ব্যাপার বলিতে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন, এই সকল রাষ্ট্রে দূত প্রেরণ, ইহাদের প্রেরিত রাষ্ট্রদূত গ্রহণ, রাষ্ট্রনৈতিক ও বাণিজ্যিক সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি বুঝায়। বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি এবং অর্থনৈতিক পরস্পর নির্ভরশীলতার জন্য বর্তমান জগতে শাসন বিভাগের এই পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কার্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(গ) যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা: অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থা বিভাগের সম্মতি লইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলেও যুদ্ধ পরিচালনা প্রধানত শাসন বিভাগই করিয়া থাকে। শাসন বিভাগের যিনি প্রধান তিনিই সাধারণত সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (Supreme Commander of the Armed Forces) হইয়া থাকেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। শাসন বিভাগের যে-দপ্তরের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনী ও যুদ্ধবিষয়ক ব্যাপার পরিচালনা করা হয় তাহাকে প্রতিরক্ষা দপ্তর (Defence Department) বলে।

(ঘ) অর্থসংক্রান্ত কার্য: সরকারী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য করধার্যের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করা হয়। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত করধার্য ও অর্থব্যয় করা যায় না

সত্য, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় করিয়া থাকে শাসন বিভাগ। যে-দপ্তরের মাধ্যমে এই কার্য করা হইয়া থাকে তাহাকে অর্থদপ্তর (Finance Department) বা রাজস্ব দপ্তর (Treasury) বলে। কর সংগ্রহ বা ব্যয় করা ছাড়াও এই দপ্তর হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা করে।

(ঙ) আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য: শাসন বিভাগের আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্যও কিছু কিছু রহিয়াছে। শাসন বিভাগই আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করে এবং উহার অধিবেশন স্থগিত রাখে। আবার প্রধান কর্মকর্তার সম্মতি না পাইলে কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। আইনসভা অধিবেশনে না থাকিলে শাসন বিভাগ প্রয়োজনবোধে জরুরী অস্থায়ী আইনও পাস করিতে পারে। বর্তমানে আইনসভা-প্রণীত মূল আইনের ফাঁকগুলি পূরণ করিবার জন্য শাসন বিভাগ নিয়মিতভাবে উপ-আইন (by-law) প্রণয়ন করিয়া থাকে। রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধির ফলে আইনসভা আইন প্রণয়নের ভার শাসন বিভাগের উপর উত্তরোত্তর ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে।

(চ) বিচারসংক্রান্ত কার্য: দণ্ডিত অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন প্রভৃতি দ্বারা শাসন বিভাগ বিচারসংক্রান্ত কার্যও সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহা ছাড়াও শাসন বিভাগ কোন কোন ক্ষেত্রে করধার্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আপত্তির বিচার করে, কেহ অন্যায়ভাবে পদচ্যুত হইলে তাহার আবেদনের বিচার করে, ইত্যাদি।

(ছ) অন্যান্য কার্য: বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় শাসন বিভাগকে অন্যান্য কর্তব্যও সম্পাদন করিতে হয়। আজিকার দিনে রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা, আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা, ডাক বিভাগ পরিচালনা, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ প্রভৃতি মামুলী কর্তব্যপালন ছাড়াও নানাবিধ সেবামূলক কার্য সম্পাদন করে। ফলে শাসন বিভাগকেও এই সকল কার্য লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে হয়। আজিকার দিনের সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ উত্তরোত্তর জনকল্যাণের সহিত জড়িত হইয়া পড়িতেছে।

বিচার বিভাগ (The Judiciary)

সরকারের তৃতীয় অংগ বিচার বিভাগ। ইহার প্রধান কার্য ন্যায়বিচার করা। সমাজ-কল্যাণ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রভৃতি রাজনৈতিক আদর্শ বিশেষভাবে নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। লর্ড ব্রাইস যথার্থই বলিয়াছেন যে বিচার বিভাগের কর্মকুশলতা অপেক্ষা সরকারের যোগ্যতা বিচারের অধিকতর উপযোগী মাপকাঠি আর নাই।

প্রাচীন কালে শাসনকার্য ও বিচারকার্যের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। উভয় কার্যই সম্পাদন করিতেন স্বয়ং রাজা বা রাজকর্মচারী। এই ব্যবস্থাকে 'স্বৈরাচারের নামান্তর' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাই বর্তমান সময়ে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্পূর্ণ গৃহীত না হইলেও বিচার বিভাগের যে স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন সে-সম্বন্ধে সকলেরই একমত। ফলে অধিকাংশ দেশে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র করা হইয়াছে বা করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

বিচার বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Judiciary) : বিচার বিভাগের প্রধান কার্য প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা করা এবং দণ্ডবিধান করা। কিন্তু প্রচলিত আইনের সাহায্যে সকল সময় বিবাদবিসংবাদের মীমাংসা করা যায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে বিচারকগণ ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়বোধ অনুসারে বিচার করিয়া থাকেন। এইরূপ বিচারের রায় ভবিষ্যৎ বিচারকার্যে আইন (case law) হিসাবে গণ্য হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিচারকগণও শুধু আইনের ব্যাখ্যা ও দণ্ড-বিধানই করেন না, আইনের সৃষ্টিও করেন।

বিচার বিভাগ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের অভিভাবক। সংবিধানের ব্যাখ্যা দ্বারা কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানের স্বরূপ বজায় রাখে। আমাদের দেশের সুপ্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণের উপর এই ভার ন্যস্ত।

বিচার বিভাগ শাসন বিভাগকে পরামর্শদানও করে। আমাদের সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে পরামর্শদানের ব্যবস্থা আছে।

বিচার বিভাগের আরও কতকগুলি কার্য আছে যাহা ঠিক বিচারকার্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ, নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ, মৃত ব্যক্তির বিচাবাধীন সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা, লাইসেন্স প্রদান প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক সময় আবার ইহা দুষ্কর্ম বা অন্যান্য রহিত করিবার জন্য আদেশ নির্দেশ বা লেখ (writs) জারি করে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Independence of the Judiciary) : পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচার এবং ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিম্নলিখিত বিষয় কয়টির উপর নির্ভর করে :

(ক) বিচারকগণের নিয়োগ-পদ্ধতি : বর্তমানে শাসন বিভাগই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণকে নিয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত যে, সাধারণভাবে উর্ধ্বতন বিচারপতিগণের সহিত পরামর্শ করিয়াই নিয়োগ করিতে

হইবে। নচেৎ, বিচারকগণ শাসন বিভাগের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িবেন। ভারতে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণের নিয়োগের ভার রাষ্ট্রপতির হস্তে থাকিলেও নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে এইরূপ পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়।

(খ) বিচারকগণের কার্যকাল ও পদচ্যুতি: বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য বিচারকগণের কার্যকাল তাঁহাদের নিয়োগ-পদ্ধতির ন্যায়ই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রে বিচারকগণকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয় এবং অক্ষমতা বা দুষ্কর্ম প্রমাণিত না হইলে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা যায় না।

(গ) বিচারকগণের বেতন ও ভাতা: বিচারকগণকে উপযুক্ত বেতন ও ভাতা না দিলে তাঁহারা তাঁহাদের পদের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন না। দেখা গিয়াছে, স্বল্প বেতনভোগী বিচারপতিগণ উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি দুষ্কর্মের জন্য উন্মুখ থাকেন।

(ঘ) বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ: পরিশেষে, বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র না করিলে স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থার সৃষ্টি করা যায় না।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (Principle of Separation of Powers)

বলা হইয়াছে যে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র না করিলে বিচার বিভাগ স্বাধীন হইতে পারে না। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র করা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণেরই (Separation of Powers) একটি দিক। এখন দেখা যাউক, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ বলিতে কি বুঝায়।

দেখা গিয়াছে যে সরকারের কার্যাবলী তিন শ্রেণীর—যথা, আইন প্রণয়ন, শাসন-কার্য পরিচালনা এবং বিচার সম্পাদন। এই তিন প্রকার কার্যের জন্য সরকারের তিনটি বিভাগ বা অংগও থাকে—যথা, ব্যবস্থা বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। সংক্ষেপে, সরকারের তিনটি শ্রেণীর কার্য বা ক্ষমতা এই তিন বিভাগ দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদিত বা ব্যবহৃত হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইলে তাহাকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, আইন প্রণয়ন ব্যাপারে আইন বা ব্যবস্থা বিভাগ, আইন বলবৎকরণের ব্যাপারে শাসন বিভাগ এবং বিচার সম্পর্কিত ব্যাপারে বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য প্রদানের নীতিই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি। বিপরীত দিক দিয়া দেখিলে ইহা হইল কোন বিভাগের পক্ষে নিজস্ব গণ্ডি ছাড়াইয়া অপর বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি।

এই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির তিন প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে: (১) সরকারের এক বিভাগ অন্য কোন বিভাগের কার্য পরিচালনা করিবে না, (২) একই

ব্যক্তি সরকারের একাধিক বিভাগের সহিত জড়িত থাকিবে না এবং (৩) সরকারের কোন বিভাগ অপর কোন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ বা উহার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিবে না। এখন দেখা যাউক, এই তিন অর্থের কোন্‌টিতে কতদূর পর্যন্ত ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং উহা কতদূর প্রযুক্ত হওয়া কাম্য। তাহার পূর্বে অবশ্য আলোচনা করা প্রয়োজন ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের উদ্দেশ্য কি?

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের উদ্দেশ্য: বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ কর্তৃক আলোচিত ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মোটামুটি তিনটি উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়: ১। শাসনকার্যের ক্ষেত্রে কর্মবিভাগের সুবিধা (advantages of division of labour) লাভ করা, ২। সরকারের তিনটি বিভাগের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা সুশাসন সম্ভব করা এবং ৩। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা।

এইরূপ এ্যারিস্টটলই প্রথমে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সরকারী কার্যাবলী তিন শ্রেণীর—যথা, নীতি-নির্ধারণ করা, ঐ নীতি অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং বিচারকার্য সম্পাদন করা। সরকারী কার্যাবলী এইভাবে বিভক্ত হইলে শাসনকার্য পরিচালনায় কর্মবিভাগ বা শ্রমবিভাগের সুবিধা লাভ করা যায় বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

পরবর্তীকালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সরকারের তিনটি বিভাগের স্বাতন্ত্র্যের দিক দিয়া ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপযোগিতা নির্দেশ করেন। ইঁহাদের মতে, সরকারের তিনটি বিভাগ যদি পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র থাকে—অর্থাৎ পরস্পরের কার্যে হস্তক্ষেপ না করে তবেই সুশাসন সম্ভব হয়।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ও মন্টেস্কু: ইহার পর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ আলোচনা করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মন্টেস্কু (Montesquieu)। মন্টেস্কুর হস্তে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণ। বলা যায়, মন্টেস্কুই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ধারণাকে (concept) মতবাদে (theory) পরিণত করিয়া উহার পূর্ণ রূপদান করেন।

মন্টেস্কু চরম স্বৈরাচারী ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর সমসাময়িক ছিলেন। লুই-এর স্বৈরাচারের ফলে ফ্রান্সে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছিল বলা চলে। একবার ইংলণ্ড ভ্রমণে আসিয়া মন্টেস্কু ঐ দেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ব্যাপক রূপ দেখিয়া একরূপ অভিভূত হইয়া পড়েন। স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে এইরূপ পার্থক্যের কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণই ইংলণ্ডের ব্যক্তি-স্বাধীনতার অস্তিত্বের হেতু। এই সিদ্ধান্ত

হইতে পরে তিনি স্বাধীনতার সর্বপ্রধান রক্ষাকবচ (safeguard) হিসাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ মতবাদের সৃষ্টি করেন।

মণ্টেস্কুর বক্তব্য হইল, একই ব্যক্তির হস্তে একাধিক ক্ষমতা ন্যস্ত রাখিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইতে পারে না। রাজা যদি আইন প্রণয়ন, আইন বলবৎকরণ, বিচারকার্য সকলই সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, তবে তিনি ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন করিয়া অযৌক্তিকভাবে উহাকে বলবৎ করিতে এবং অন্যায়ভাবে আইনভংগকারীর শাস্তিপ্রদান করিতে পারেন। এইরূপ ঘটিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অতএব, এই তিন প্রকার কার্য পৃথক তিন শ্রেণীর ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

মণ্টেস্কু ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভুল কল্পনা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা কোন কালেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের পদ্ধতিতে সংগঠিত হয় নাই। তবুও মণ্টেস্কুর মতবাদ চিন্তাজগতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং বহু লোকের নিকট ইহা স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। ১৭৮৯ সালে ফরাসীরা ঘোষণা করে, যে-দেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত হয় নাই সে-দেশে শাসনতন্ত্রই নাই। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর আমেরিকার ভূতপূর্ব ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি মিলিয়া গঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে এই নীতি সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে প্রণীত ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলির শাসনতন্ত্রেও এই নীতি গৃহীত হয়। ইউরোপে কিন্তু ফ্রান্স ছাড়া অন্য কোন দেশ এই মতবাদের প্রভাবে পড়ে নাই।

সমালোচনা ঃ বর্তমানে নানাদিক দিয়া ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সমালোচনা করা হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর সমালোচকের মতে, সরকারের কার্যাবলী ঠিক তিন শ্রেণীর নয়; সুতরাং সরকারের বিভাগও সংখ্যায় তিনটি নয়। ইঁহাদের কয়েকজন বিচারকার্যকে শাসনকার্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বলেন যে সরকারী বিভাগ সংখ্যায় মাত্র দুইটি ঃ (১) শাসন বিভাগ এবং (২) ব্যবস্থা বিভাগ। সমালোচক দলের অপর অংশ সরকারী কার্যাবলীকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করার পক্ষপাতী—যথা, (১) নির্বাচন, (২) আইন প্রণয়ন, (৩) শাসননীতি নির্ধারণ ও শাসনকার্য পরিচালনা, (৪) আইন ও নীতিকে কার্যকর করা এবং (৫) বিচারকার্য। ফলে ইঁহাদের মতে, সরকারী বিভাগও সংখ্যায় পাঁচটি—যথা, (১) নির্বাচকমণ্ডলী, (২) ব্যবস্থা বিভাগ, (৩) শাসন বিভাগের কর্মকর্তাগণের বিভাগ, (৪) শাসন বিভাগের সাধারণ কর্মচারিগণের বিভাগ এবং (৫) বিচার বিভাগ।

প্রয়োগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন রাষ্ট্রেই সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া কার্য সম্পাদন করিতে পারে না। সরকারকে একটি

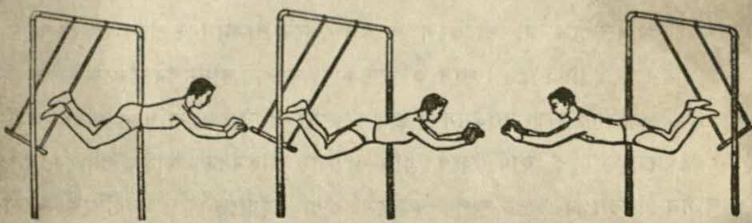
জীবদেহের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। জীবদেহের বিভিন্ন অংশ—যথা, হস্ত পদ মস্তিষ্ক প্রভৃতি যেরূপ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, সরকারের বিভিন্ন বিভাগও সেইরূপ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই বিভাগগুলিকে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত করা একেবারে অসম্ভব। ফলে প্রত্যেকটি বিভাগ এমন সমস্ত কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে যাহা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সূক্ষ্ম নীতি অনুসারে অপর বিভাগের কর্তব্য। উদাহরণস্বরূপ, আইন প্রণয়নের উল্লেখ করিতে পারা যায়। আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা বিভাগের কার্য। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন প্রণীত হয় শাসন বিভাগের নির্দেশে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—যেখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ প্রধান নীতি হিসাবে গৃহীত সেখানেও আইনসভা অল্পবিস্তর শাসন বিভাগের নির্দেশানুযায়ী আইন প্রণয়ন করে। উপরন্তু, আইনসভা অধিবেশনে না থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে শাসন বিভাগকে জরুরী অবস্থায় অস্থায়ী আইন (ordinance) পাস করিতে হয়। আবার শাসন বিভাগকে উপ-আইন (by-law) প্রণয়নের দ্বারা আইনসভা-প্রণীত আইনের ফাঁকগুলি পূরণ করিয়া লইতে হয়। বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়ায় আইনসভা আইন প্রণয়নের কিছু ভার শাসন বিভাগের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অপরদিকে আবার আইন প্রণয়ন করা বিচার বিভাগেরও কার্য। বর্তমানে বিচারকগণ-প্রণীত আইন (judgemade law) বিচার-ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করিয়া আছে। প্রচলিত আইন যখন অ-পর্যাপ্ত বা অযৌক্তিক বিবেচিত হয় তখন বিচারসভা এইরূপ আইন প্রণয়ন করে।

এইভাবে এক বিভাগ অপর বিভাগের কার্য সম্পাদন করে বলিয়া একই ব্যক্তিকে একাধিক বিভাগের সহিত জড়িত থাকিতে হয়। ইংলণ্ড ভারত প্রভৃতি দেশে পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থাতে প্রকৃত শাসকবর্গ বা মন্ত্রিগণ ব্যবস্থা বিভাগেরই অংশ।

আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে এক বিভাগ অপর বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। তত্ত্বের দিক দিয়া সরকারের তিনটি বিভাগ সমক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও কার্যক্ষেত্রে শাসন বিভাগের উপর ব্যবস্থা বিভাগের প্রাধান্য প্রায় সকল দেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। পার্লামেন্টীয় সরকারে শাসন বিভাগের কর্মকর্তা বা মন্ত্রিগণ সরাসরি ব্যবস্থা বিভাগের নিকট দায়িত্বশীল থাকেন ; আইনসভার আস্থা হারাইলে তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হয়। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে শাসন বিভাগের কতিপয় কার্য আইনসভার অনুমোদন-সাপেক্ষ বলিয়া ঐ শাসন-ব্যবস্থাতেও আইনসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। অপরদিকে আবার আইনের বৈধতা-অবৈধতা ঘোষণার দ্বারা বিচার বিভাগ ব্যবস্থা বিভাগকে অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের তিন অর্থের কোনটিতেই এই নীতির পূর্ণ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

শুধু যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ অসম্ভব তাহাই নহে, ইহার পূর্ণ প্রয়োগ কাম্যও নহে। বিভিন্ন বিভাগ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া কার্য সম্পাদন করিলে শাসনকার্যে দক্ষতার অভাব দেখা দিবে। ইহা উপলব্ধি করিয়া জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছিলেন যে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ প্রবর্তিত থাকিলে প্রত্যেক বিভাগ নিজস্ব ক্ষমতা সংরক্ষণেই ব্যস্ত থাকিবে এবং কখনই অপর বিভাগগুলিকে সাহায্য করিবে না। ইহার ফলে শাসনকার্যে দক্ষতার যে-অভাব ঘটিবে তাহা এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের সুফল কখনই পূরণ করিতে পারিবে না।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ



এই দিক দিয়া একজন আধুনিক লেখক ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থাকে এক ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই ব্যায়াম-কৌশলে খেলোয়াড়দের মধ্যে সহযোগিতার একটু অভাবের ফলে সমস্ত খেলাটাই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

উপরন্তু, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণকে স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হিসাবে দেখা ভুল। ইতিহাসের দিক দিয়া মন্টেস্কু ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছেন। ইংলণ্ডে শাসনক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ কোন দিনই ছিল না। তবুও ইংরাজরা কোনকালেই অন্য দেশের লোক অপেক্ষা কম ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করে নাই। ব্যক্তি-স্বাধীনতা নির্ভর করে দেশের জনসাধারণের উপর। জনসাধারণ যদি স্বাধীনতাকাংক্ষী হয় তবে রাষ্ট্র উহা প্রদান না করিয়া পারে না। আবার জনসাধারণকেই স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বাধীনতা ব্যাহত হইতেছে কি না, তাহা জনগণকে চিরকালই সতর্ক দৃষ্টি লইয়া লক্ষ্য করিয়া যাইতে হইবে। ব্যাহত হইলে তৎক্ষণাৎ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সুতরাং স্বাধীনতা নির্ভর করে দেশের জনগণের স্বাধীনতাকাংক্ষী ও নির্ভীকতার উপর, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের উপর নহে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের উপরি-উক্ত ত্রুটির জন্য বর্তমানে এই নীতির মাত্র আংশিক প্রয়োগ সমর্থন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই আংশিক প্রয়োগ বলিতে মাত্র বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্যই বুঝায়।

১১ নির্বাচকমণ্ডলী ও ভোটাধিকার
(Electorate and Suffrage)

নির্বাচকমণ্ডলী সংক্রান্ত সমস্যা (Problems of the Electorate)

বর্তমান দিনের গণতন্ত্র পরোক্ষ গণতন্ত্র। ইহাতে নাগরিকগণ ভোটাধিকারের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পরোক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থা সংগঠনের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। তন্মধ্যে দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হইল ভোটাধিকারের ভিত্তি ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্ব লইয়া।

এই দুইটি সমস্যাকেই 'নির্বাচকমণ্ডলী সংক্রান্ত সমস্যা' (problems of the electorate) বলিয়া অভিহিত করা যায়। নির্বাচকমণ্ডলী (electorate) বলিতে ভোটাধিকারী নাগরিকগণের সমষ্টিকে বুঝায়। এখন প্রশ্ন, নাগরিকগণের মধ্যে কাহাদের এবং কি ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদান করা হইবে? অর্থাৎ, নির্বাচকমণ্ডলী কি পরিমাণ ব্যাপক হইবে?

নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যাপকতা ও সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (Extent of Electorate and Universal Adult Suffrage)

ভোটাধিকারের ভিত্তি কি হইবে তাহা লইয়া মোটামুটি দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রথম মতবাদ অনুসারে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককেই ভোটাধিকার প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থাকে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার (Universal Adult Suffrage) বলে।

সপক্ষে যুক্তি: সার্বিক ভোটাধিকারের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হয়:

গণতন্ত্র যখন জনগণেরই শাসন (rule of the people) তখন সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত। নতুবা গণতন্ত্র মুষ্টিমেয়ের শাসনে পরিণত হইয়া মিথ্যায় পর্যবসিত হইবে। বলা যায়, গণতন্ত্রে ভোটাধিকার নাগরিকের জন্মগত অধিকার।

দ্বিতীয়ত, শাসননীতির ফলাফল যখন সকলকেই ভোগ করিতে হয় তখন ঐ নীতি নির্ধারণের ভার সকলের উপরই থাকা উচিত। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, যাহাদের ভোটাধিকার নাই তাহাদের অভিযোগে কেহই কর্ণপাত করে না—তাহাদের দাবি উপেক্ষিতই হইতে থাকে। সুতরাং সর্বসাধারণের মংগলসাধন যদি গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হয় তবে উহাকে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের নীতি গ্রহণ করিতেই হইবে।

তৃতীয়ত, গণতন্ত্র সাম্যকে সমর্থন করে বলিয়াও সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া লইবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। একমাত্র বয়স ছাড়া অন্য কোন কারণ বা অজুহাতে নাগরিকগণকে ভোটাধিকার প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে বৈষম্যকে সমর্থন করা হয়। ফলে গণতন্ত্রও অলীক প্রতিপন্ন হয়।

বিপক্ষে যুক্তিঃ দ্বিতীয় মতবাদে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের বিরোধিতা করিয়া বলা হয় যে যোগ্যতা না থাকিলে এই অধিকার কাহাকেও দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। মিলের মতে, শিক্ষাই যোগ্যতার মাপকাঠি বলিয়া সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পূর্বে সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষেই ভোটদানের অধিকারী হইবার জন্য কিছুটা পড়িবার, কিছুটা লিখিবার ও কিছুটা অংক কষিবার জ্ঞান অর্জন করা চাই। একথা স্বীকার্য যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এবং উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা নাগরিককে উন্নত স্তরে লইয়া যাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ লোক যদি সুযোগসুবিধার অভাবে অশিক্ষিত থাকিয়া যায় তাহার জন্য দায়ী হইল সমাজ-ব্যবস্থা এবং অশিক্ষার অজুহাতে যদি জনসাধারণকে ভোটাধিকার বা নির্বাচিত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে রাষ্ট্র কোন সময়ই শিক্ষাবিস্তার ও জনকল্যাণসাধনে আগ্রহান্বিত হইবে না। ইহা ছাড়া নির্বাচনের সমস্যা বুঝিবার জন্য স্কুলকলেজে শিক্ষার্জনের প্রয়োজন হয় না। রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই কাম্যভাবে ভোটাধিকারের ব্যবহার করিতে পারে। এমনও দেখা যায় যে উচ্চশিক্ষিত লোক—যেমন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বা প্রখ্যাত বিজ্ঞানী—রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন এবং নীতি ও বুদ্ধিমত্তার পথে ইহার সমাধান করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত নন। সুতরাং শিক্ষাকে ভোটদানের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা চলে না।

আবার অনেকের মতে, শিক্ষা নহে সম্পত্তির মালিকানাই ভোটাধিকার অর্জনের মাপকাঠি হওয়া উচিত। কারণ, যাহাদের সম্পত্তি নাই দেশের প্রতি তাহাদের দরদ থাকে না এবং তাহাদের বিশেষ কর প্রদান করিতে হয় না বলিয়া তাহাদিগকে সরকারী অর্থের অপব্যয়ের প্রশ্রয় দিতে দেখা যায়। সম্পত্তিকে ভোটদানের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার নীতি অন্যতম সামন্ততান্ত্রিক (feudal) নীতি। সামন্ততান্ত্রিক যুগে মাত্র সম্পত্তির অধিকারিগণকেই ভোটাধিকার প্রদান করা হইত। বর্তমানে এই নীতিকে কেহই সমর্থন করেন না, কারণ সম্পত্তির মালিকানার সহিত নাগরিকতার গুণের কোন সম্পর্ক নাই। সম্পত্তিকে ভোটাধিকারের ভিত্তি করিলে ধনীরাই নিজেদের স্বার্থে শাসনকার্য চালাইবে।

উপসংহারে বলা যায়, জাতি-ধর্ম ধনী-নির্ধন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার প্রদান করাই যুক্তিযুক্ত। প্রাপ্তবয়স্ক বলিলাম এইজন্য যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের রাষ্ট্রীয় সমস্যা বুঝিবার বা জানিবার মত যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে না। আমাদের দেশে কোন নাগরিকের একুশ বৎসর বয়স না হইলে সে ভোটাধিকার পায় না। এইভাবে সর্বত্রই ভোটদানের বয়স নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে। ইহা ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যাহারা বিকৃত মস্তিষ্ক, দেউলিয়া গ্রহণকারী বা রাষ্ট্রদ্রোহী তাহাদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, কারণ ইহারা দেশের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভোটাধিকারের ব্যবহার করিতে অপারগ।

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব (Minority Representation)

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বসংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব হয় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃতি হইতেই। শব্দগত অর্থে গণতন্ত্র বলিতে জনগণ বা সর্বসাধারণের শাসন বুঝায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠেরই সরকার হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সরকার গঠন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে। অনেকের মতে, এইরূপ ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকে না এবং ইহাকে অন্যায় (injustice) বলিয়াও গণ্য করা যাইতে পারে। বস্তুত, সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না থাকিলে সংখ্যালঘিষ্ঠগণ জানিবে যে তাহাদের মতামতের কোন মূল্য নাই। তাহারা নির্বাচকমণ্ডলীর শতকরা ৪৯ ভাগ হইলেও প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে না। সুতরাং তাহাদের পক্ষে ভোটদানকার্য একরূপ অর্থহীন। এরূপ মনোভাব সংখ্যালঘিষ্ঠদের কাম্য রাজনৈতিক জীবন গঠনের সহায়ক নহে।

দ্বিতীয়ত, সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না থাকিলে তাহাদের দাবিও উপেক্ষিত হইতে পারে। কারণ, দেখা গিয়াছে যে আইনসভায় যাহাদের প্রতিনিধি নাই তাহাদের কথা লোকে বড় একটা চিন্তা করে না।

তৃতীয়ত, আইনসভায় প্রতিনিধি না থাকিলে সংখ্যালঘিষ্ঠরা বলিতে পারে যে আইন তাহাদের সম্মতিক্রমে পাস হয় নাই; সুতরাং তাহারা ঐ আইন অমান্য করিবে। ইহার ফলে দেশে নানারূপ গোলযোগ এমনকি গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত দেখা দিতে পারে।

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতাও করা হয়। বলা হয় যে এরূপ ব্যবস্থা নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে অযথা বিভেদের সৃষ্টি করে। ইহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ উভয় দলই নিজেদের স্বার্থের দিক হইতে সকল বিষয়ের বিচারবিবেচনা করে বলিয়া

জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয় এবং আইনসভা বিরোধী দলসমূহের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। উপরন্তু, সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা জটিল বলিয়াও ইহাকে পরিহার করিবার সুপারিশ করা হয়।

কিন্তু যুক্তি যাহা হউক না কেন, বর্তমানে বিভিন্ন দেশ সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে উহার ব্যবস্থা করিয়াছে।

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতি (Different Methods of Minority Representation): সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের জন্য অবলম্বিত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :

(ক) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation): এই পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের মধ্যে যে-অনুপাত হয় সেই অনুপাতেই তাহাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, কোন নির্বাচন-এলাকার যখন ভোটদাতাগণের দুই-তৃতীয়াংশ একদলের পক্ষে এবং এক-তৃতীয়াংশ অপর দলের পক্ষে ভোটপ্রদান করে তখন ঐ নির্বাচন-এলাকা হইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দুই-তৃতীয়াংশ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দল এক-তৃতীয়াংশ সদস্য আইনসভায় প্রেরণ করে। ইহার জন্য অবশ্য নির্বাচন-এলাকা বহুসদস্য-সমন্বিত (multi-member constituency) হওয়া প্রয়োজন। উপরি-উক্ত উদাহরণে নির্বাচন-এলাকা হইতে অন্তত ৩ জন সদস্য প্রেরণের ব্যবস্থা না থাকিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দুই-তৃতীয়াংশ বা ২ জন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দল এক-তৃতীয়াংশ বা ১ জন সদস্য প্রেরণ করিতে পারিবে না।

(খ) পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও আসন সংরক্ষণ (Separate Electorate and Reservation of Seats): সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াও উহাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের দেশে হিন্দু ও শিখ তপশীলী বর্ণসমূহের জন্য আইনসভাসমূহে আসন সংরক্ষিত আছে। পূর্বে ব্রিটিশ আমলে হিন্দু মুসলমান শিখ প্রভৃতি সকলের জন্যই স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হইত। ফলে সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকই আইনসভায় তাহাদের সদস্য প্রেরণ করিতে পারিত।

(গ) সীমাবদ্ধ ভোট-পদ্ধতি (Limited Vote Plan): এই পদ্ধতিতেও প্রত্যেক নির্বাচন-কেন্দ্র বহু আসন-সমন্বিত করা হয়। নির্বাচন-কেন্দ্রে মোট যতগুলি আসন থাকে নির্বাচক তাহা অপেক্ষা একটি কম ভোটদান করিতে পারে। ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল প্রত্যেক নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে অন্তত একজন করিয়া সদস্য প্রেরণ করিতে সমর্থ হয়।

(ঘ) পুঞ্জীকৃত ভোট-পদ্ধতি (Cumulative Vote Plan): এই পদ্ধতিতে নির্বাচন-এলাকায় যতগুলি আসন থাকে প্রত্যেক নির্বাচকের ততগুলি করিয়াই ভোট থাকে। নির্বাচক ভোটগুলি প্রার্থীদের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে পারে বা একজন প্রার্থীকেই পুঞ্জীকৃতভাবে দান করিতে পারে। এইভাবে পুঞ্জীকৃত ভোটদানের ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল কিছু আসন সংগ্রহ করিতে পারে।

ভারতে নির্বাচক ও নির্বাচন-এলাকা (Voters and Constituencies in India)

এখন দেখা যাউক, ভারতে নির্বাচক বা ভোটাধিকারী কাহারা এবং নির্বাচন-এলাকাই বা কিভাবে নির্ধারিত হয়।

নির্বাচক (Voters): গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের সংবিধান সকল প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় নাগরিককেই ভোটাধিকার দিয়াছে। বস্তুত, সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বর্তমান শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সংবিধান অনুসারে, "লোকসভা এবং প্রতি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হইবে।" পরে আরও পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে যে, 'সংবিধানের দ্বারা বা আইন অনুসারে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত নয় এবং ২১ বৎসরের কম বয়স্ক নয়' এইরূপ প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকই নির্বাচক বা ভোটার বলিয়া গণ্য হইবে। শাসনতন্ত্রের বিধান বা আইন অনুসারে একজন ভারতীয় নাগরিক নির্বাচন-এলাকায় বসবাস না করার জন্য, মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য এবং নির্বাচনের সময় বেআইনী বা অসাধু আচরণের জন্য নির্বাচক হইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, প্রত্যেক ভারতীয়ই লোকসভা এবং রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচক যদি সে—(১) ভারতীয় নাগরিক হয়, (২) অন্তত ২১ বৎসর বয়স্ক হয়, (৩) কোন নির্বাচন-এলাকায় সাধারণত বসবাস করে, (৪) সুস্থ মস্তিষ্ক হয়, (৫) ভারতীয় দণ্ডবিধির বিশেষ ধারা অনুসারে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হয় এবং (৬) কোন নির্বাচনের সময় অসাধু কার্যের সহিত জড়িত না থাকে।

শাসনতন্ত্রের এই বিধানের ফলে ভারতবাসীর প্রায় অর্ধেক সংখ্যক ভোটাধিকার পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে প্রায় ৫১ কোটি ভারতীয়ের মধ্যে ২৫ কোটির অধিক নির্বাচক-তালিকাভুক্ত হয়।

ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের নির্বাচকগণ শেষ পর্যন্ত মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১৪ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর বর্তমানে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হইল নির্বাচক। ইহার কারণ হইল পূর্বে সম্পত্তি আর শিক্ষা উপাধি প্রভৃতির ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদান করা হইত, কিন্তু বর্তমানে আইনের চক্ষে অযোগ্য নয় বলিয়া

বিবেচিত সকলকেই নির্বাচকশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। সাধারণতান্ত্রিক ভারতে স্ত্রী-পুরুষ ধনী-নির্ধন শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল ভারতীয় নাগরিকই নির্বাচক। ২১ বৎসরকে ভোটাধিকারপ্রাপ্তির বয়স হিসাবে ধরা হইয়াছে। সংবিধানের এই ব্যবস্থাকে সংবিধান-প্রণেতৃবর্গের একজন 'গণতন্ত্রের উৎস' (fountain of democracy) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

স্বাধীন ভারতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি না (Whether the Provision for Adult Suffrage in Free India has been justified): রাজনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা মৌলিক গণতান্ত্রিক নীতি। ইহা ব্যতিরেকে জনগণের শাসন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু স্বাধীন ভারতের সংবিধানে যখন সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হয় তখন অনেকেই ইহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহারা বলিয়াছিলেন, শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থা আগে না করিয়া সকল প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়কে ভোটাধিকার প্রদান করায় বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহাতে ভারতে গণতন্ত্র উচ্ছৃংখল জনতার শাসনে পরিণত হইতে পারে। উপরন্তু, ১৬-১৭ কোটির মত নির্বাচক লইয়া নির্বাচন-কার্য পরিচালনা করাও একপ্রকার অসম্ভব বিবেচিত হইয়াছিল।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নির্বাচনকার্য পরিচালনা করা যে দুঃসাধ্য নহে, তাহা প্রমাণিত হইল। অপরদিকে ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপও বজায় রহিল; উহা উচ্ছৃংখল জনতার শাসনে পরিণত হইল না। বস্তুত, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র বা জনগণের শাসনের প্রধানতম সর্ত। অশিক্ষার অজুহাতে ইহা হইতে দূরে থাকিলে গণতন্ত্র অলীকই প্রতিপন্ন হয়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে শিক্ষা সম্পত্তি প্রভৃতির যুক্তিকে বর্তমানে আর মানা চলিতে পারে না। সুতরাং সকল দিক দিয়াই ভারতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে, এই অভিমত স্বচ্ছন্দেই প্রকাশ করা চলে।

লোকসভা ও রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন-এলাকা: লোকসভার নির্বাচনের জন্য রাজ্যগুলিকে আঞ্চলিক নির্বাচন-এলাকায় বিভক্ত করা হয়। সংবিধান অনুসারে লোকসভার জন্য নির্বাচন-এলাকা এরূপভাবে নির্ধারিত করিতে হইবে যাহাতে যতসংখ্যক অধিবাসীপিছু একজন করিয়া সদস্য নির্বাচিত করা হইবে, তাহা যেন ভারতের সর্বত্র একই হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি ঠিক হয় যে ৫ লক্ষ লোক প্রতি ১ জন করিয়া সদস্য নির্বাচিত করা হইবে তবে ঐ নীতি যেন ভারতের সর্বত্রই অনুসৃত হয়।

প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে পূর্ববর্তী আদমসুমারির ভিত্তিতে প্রথমে রাজ্যগুলির জনসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়; পরে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে লোকসভার নির্বাচন-এলাকা নির্ধারিত হয়।

লোকসভার মত রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন-এলাকা সম্বন্ধেও সংবিধানে বলা হইয়াছে যে জনসংখ্যা ও সদস্যের মধ্যে অনুপাত সকল এলাকায় যেন যথাসম্ভব একই হয়।

রাজ্যের বিধানসভার বেলাতেও সাধারণ নির্বাচনের পূর্বেও পূর্ববর্তী আদমসুমারিকে ভিত্তি করিয়া জনসংখ্যা এবং রাষ্ট্রপতির আদেশে ঐ নির্বাচন-এলাকা নির্ধারিত হয়।

লোকসভা ও রাজ্যের বিধানসভা উভয় ক্ষেত্রেই তপশীলী বর্ণ ও তপশীলী উপজাতিদের (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা ১৯৭০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

বিধান পরিষদের নির্বাচন-এলাকা: রাজ্যের বিধান পরিষদ বিধানসভা দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, গ্রাজুয়েটগণ ও শিক্ষকগণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত সদস্য লইয়া গঠিত হয়। রাজ্যের বিধান পরিষদে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি, গ্রাজুয়েট ও শিক্ষকগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য বিশেষ বিশেষ নির্বাচন-এলাকা নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষকদের মধ্যে অন্তত যাঁহারা তিন বৎসর কোন মাধ্যমিক বা উচ্চ বিদ্যালয়ে বা উচ্চতর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন তাঁহারাই ভোটাধিকারী হন। গ্রাজুয়েটদের বেলাতেও অন্তত তিন বৎসর পূর্বে পাস করা চাই। স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির বেলাতে সময়ের কোন বাধা নাই। সকল সভ্যই ভোটাধিকারী হন। ভোটাধিকারী হইবার জন্য সকল ক্ষেত্রেই আবেদন করিতে হয়।

নির্বাচন-পদ্ধতি (Methods of Election)

লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। অর্থাৎ, ভোটাধিকারী প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকই এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারে। রাজ্যসভার নির্বাচিত সদস্যগণ পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানসভার সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত হন। রাজ্য বিধান পরিষদের সদস্যগণের নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। যথা, শিক্ষক ও গ্রাজুয়েটদের প্রতিনিধিগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং রাজ্য বিধানসভা ও স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা নির্বাচিত সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। নির্বাচন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গোপন ব্যালট (secret ballot) দ্বারা হয়।

ভারতের শাসন-ব্যবস্থা

১ | ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য
(Features of the Constitution of India)

ভূমিকা

ব্রিটিশ আমলে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত শাসনতন্ত্র অনুসারে পরিচালিত হইত। যখন ভারতীয়গণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন ঠিক হয় যে স্বাধীন ভারতে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি গণপরিষদ (Constituent Assembly) গঠিত হইবে। ১৯৪৬ সালে এই গণপরিষদ গঠন করা হয় এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে 'ভারতের গণপরিষদ' এবং 'পাকিস্তানের গণপরিষদ'—এই দুই অংশে বিভক্ত হইয়া যায়।

ভারতের গণপরিষদ ভারতীয় জনগণের পক্ষে নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিতে থাকে। রচনাকার্য সমাপ্ত হইলে ইহা ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখে ভারতীয় জনগণের পক্ষেই গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে ঠিক দুই মাস পরে—অর্থাৎ ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে এই শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন করা হয়। ইহা 'ভারতীয় সংবিধান' (The Constitution of India) নামে অভিহিত এবং এই শাসনতন্ত্র অনুসারেই বর্তমান সাধারণতান্ত্রিক ভারতের (Republican India) শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

ভারতীয় সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য (Main Features of the Constitution of India)

ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হিসাবে নিম্নলিখিতগুলির উল্লেখ করিতে পারা যায় :

(১) ভারতীয় সংবিধান লিখিত শাসনতন্ত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিরাট, বিষয়-বহুল ও জটিল। ইহা যখন প্রবর্তিত হয় তখন ইহাতে ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ (Articles) এবং ৮টি তপশীল (Schedules) ছিল। তখন হইতে আজ পর্যন্ত এই সংবিধানের মোট ২১ বার সংশোধন করা হইয়াছে। ইহার ফলে সংবিধানের বেশ কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। প্রথমত, তপশীলের সংখ্যা ৮ হইতে ৯-এ দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে অনুচ্ছেদের ক্রমিক সংখ্যা ঐ ৩৯৫ থাকিলেও বিভিন্ন সংশোধনের ফলে সংবিধানের মধ্য হইতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ পুরাপুরি ও কয়েকটি অনুচ্ছেদের কিছু অংশ বাদ গিয়াছে এবং কয়েকটি অনুচ্ছেদের সংগে কিছু কিছু অংশ সংযুক্তও হইয়াছে। তৃতীয়ত, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের গঠনসংক্রান্ত প্রথম তপশীল, রাজ্যসভায় বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্বসংক্রান্ত চতুর্থ তপশীল প্রভৃতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

মোটকথা, নানা হ্রাসবৃদ্ধি সত্ত্বেও ভারতীয় সংবিধান পৃথিবীর লিখিত শাসনতন্ত্রগুলির মধ্যে বৃহত্তম রহিয়া গিয়াছে।

ভারতীয় সংবিধান বিপুলায়তন ও জটিল হইবার মূলে রহিয়াছে নিম্নলিখিত কারণগুলি: (ক) সংবিধানে মাত্র কেন্দ্রের শাসন-ব্যবস্থাই সন্নিবিষ্ট হয় নাই; জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থাও সম্পূর্ণভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। (খ) কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্কও বিশেষ জটিল। (গ) সংবিধানে বিশেষ বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে। যথা, সরকারী চাকরি, ইংগ-ভারতীয় সম্প্রদায়, তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতি (Scheduled Castes and Scheduled Tribes), সরকারী ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে সংবিধানে অনেকগুলি ধারা আছে। (ঘ) সংবিধানে কেবলমাত্র মৌলিক অধিকারই বর্ণিত হয় নাই, কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতিও উল্লিখিত হইয়াছে। (ঙ) সংবিধান বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রকে বহুলাংশে অনুকরণ করিয়াছে।

(২) সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' (Sovereign Democratic Republic) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, (ক) ভারত আভ্যন্তরীণ ও বহির্ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন, (খ) সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়ায় শাসন-ব্যবস্থাও গণতান্ত্রিক, (গ) আবার ভারত সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অর্থাৎ, ভারতে রাজার স্থান নাই—শাসনক্ষমতা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের হস্তে ন্যস্ত। ভারতের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইলেন সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি।

(৩) সংবিধানে ভারতকে 'রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন' বা 'রাজ্যসংঘ' (Union of States) বলিয়া বর্ণনা করা হইলেও ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ, বলা যায় যে স্বাধীন ভারতের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে নাই। কিন্তু ভারতকে সম্পূর্ণভাবে 'যুক্তরাষ্ট্র' বলিয়া অভিহিত করার বিপক্ষেও যুক্তি রহিয়াছে। ভারতীয় 'যুক্তরাষ্ট্রে' কেন্দ্রের হস্তে এত বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহা অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরন্তু, জরুরী ও শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণার দ্বারা রাষ্ট্রপতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করিতে পারেন। এইজন্য বলা হয় যে, সাধারণতান্ত্রিক ভারতের শাসন-ব্যবস্থা একাধারে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক। জনৈক আধুনিক শাসনতন্ত্রবিদের মতে, ভারত 'অপূর্ণাংগ যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের রাষ্ট্র' (Quasi-federal State)।

(৪) ভারতীয় সংবিধান একাধারে দুষ্পরিবর্তনীয় ও সুপরিবর্তনীয়। ইহার কতক অংশের সংশোধনে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু বাকী অংশের

পরিবর্তন সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে সহজেই করা চলে। এই বৈশিষ্ট্যটির জন্যও ভারতকে 'অপূর্ণাংগ যুক্তরাষ্ট্র' বলিয়া গণ্য করা হয়। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের সমগ্রটাই সাধারণত দুষ্পরিবর্তনীয় হয়।

(৫) সংবিধানে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করিয়া এ-দেশের শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করা হইয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলি অবশ্য অবাধ নহে; নানাভাবে উহাদিগকে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

(৬) মৌলিক অধিকার ছাড়াও সংবিধানে শাসনকার্য পরিচালনার কয়েকটি নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles of State Policy) ঘোষণা করা হইয়াছে। শাসনকর্তাগণ শাসনকার্য পরিচালনা করিবার সময় এগুলি সর্বদা স্মরণ রাখিবেন। এই নীতিগুলি সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের (Social Welfare State) দ্যোতক।

(৭) ধর্ম-নিরপেক্ষতা বা অসাম্প্রদায়িকতা (secularism or non-communalism) ভারত-রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট দিক বলিয়া ধরা হয়। ভারতে কোনপ্রকার রাষ্ট্রীয় ধর্ম (State Religion) নাই। জাতি ধর্ম বর্ণ চিন্তাবিশ্বাস এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ভারতীয়দের জন্য এক এবং অভিন্ন নাগরিক-অধিকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারত-রাষ্ট্র ধর্মের ভিত্তিতে কোন নাগরিকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিতে পারে না। এইজন্য ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণাণের ভাষায় ভারত হইল অন্যতম অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র (a non-communal State)।

(৮) সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে পূর্ণ পার্লামেন্টীয় বা দায়িত্বশীল সরকারের প্রবর্তন। ব্রিটিশ আমলে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও উহা নানাভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন পূর্ণ দায়িত্বশীলতার প্রবর্তন করা হইয়াছে। ধীরে ধীরে এই দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতেও সম্প্রসারিত করা হইতেছে।

২ | ইউনিয়ন সরকারের শাসন বিভাগ
(The Union Executive)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে যে স্বাধীন ভারতের সংবিধান কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় ব্যবস্থা বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের দায়িত্বশীলতা। এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থা 'পার্লামেন্টীয়' (Parliamentary) বা মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকার (Cabinet Government) নামেও অভিহিত। ভারতের এই দায়িত্বশীল বা পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রি-পরিষদ লইয়া গঠিত। শাসন বিভাগের আলোচনা রাষ্ট্রপতি হইতে শুরু করিতে হয়।

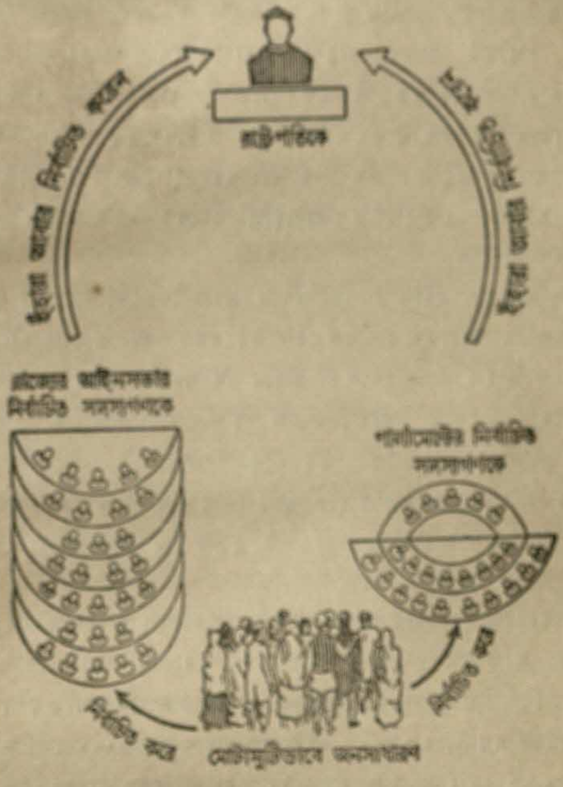
রাষ্ট্রপতি (The President)

রাষ্ট্রপতিকে ভারতের নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা বলিয়া অভিহিত করা চলে। ডক্টর আম্বেদকারের ভাষায়, "আমাদের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের পতি, কিন্তু শাসন বিভাগের কর্তা নহেন। তিনি জাতির প্রতীক, কিন্তু জাতিকে শাসন করেন না।" শাসন বিভাগের কর্তা হইলেন প্রধান মন্ত্রী। ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর পদের সহিত আমাদের রাষ্ট্রপতির পদের কতকটা তুলনা করা চলে। আইনত উভয়েই প্রধান শাসক হইলেও, কার্যত দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার বিধান অনুসারে উভয়েই মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। উভয়েরই পদের মর্যাদা আছে, কিন্তু কাহারও কর্তৃত্ব নাই; সুতরাং দায়িত্বও নাই।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন (Election of the President): রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হন না। তিনি এক বিশেষ নির্বাচক-মণ্ডলী (an electoral college) দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। এই নির্বাচক-মণ্ডলী (ক) কেন্দ্রীয় আইনসভা বা পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ এবং (খ) রাজ্যের বিধানসভাসমূহের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ লইয়া গঠিত হয়।

ভোটের ব্যাপারে দুইটি নীতি অনুসরণ করা হইয়া থাকে—(ক) দেখা হয় যে পার্লামেন্টের সদস্যগণের মোট যতগুলি ভোট থাকে, যেন মোট ততগুলি ভোট থাকে রাজ্যের বিধানসভার সদস্যগণের এবং (খ) যেন বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ভোটের ব্যাপারে সমতা থাকে। এই দুইটি নীতিকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পার্লামেন্ট এবং রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যের ভোটসংখ্যা নির্ধারিত হয়।

প্রথমে রাজ্যের জনসংখ্যাকে ঐ রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণের সংখ্যা দ্বারা ভাগ দেওয়া হয়। ভাগফলকে আবার ১০০০ দ্বারা ভাগ করা হয়। এইবার যে-ভাগফল পাওয়া যাইবে তাহাই হইল ঐ রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত প্রত্যেক সদস্যের ভোটদানের সংখ্যা। তবে এই দ্বিতীয়বার ভাগের সময় ভাগশেষ ৫০০ বা



তাহার অধিক হইলে প্রত্যেক সদস্যের ভোটসংখ্যা আর একটি করিয়া বাড়িয়া যাইবে। এই সংখ্যাকে ঐ রাজ্যের নির্বাচিত সদস্যগণের সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে ঐ রাজ্যের মোট ভোটসংখ্যা পাওয়া যাইবে। সকল রাজ্যের মোট ভোটসংখ্যাগুলি যোগ করিলে যে-সংখ্যা হইবে তাহাই পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্যগণের মোট ভোটসংখ্যা। (পূর্বেই বলা হইয়াছে রাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণের মোট যতগুলি ভোট থাকে ততগুলিই ভোট থাকে পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্যগণের।) পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্যগণের মোট ভোটসংখ্যা পাওয়া গেলে

তাহাকে নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে যে-ভাগফল পাওয়া যাইবে তাহাই পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যগণের প্রত্যেকের ভোটদানের সংখ্যা।*

যে-পদ্ধতি দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন তাহা একটি জটিল পদ্ধতি। সংবিধানে ইহাকে একহস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation by means of the Single Transferable Vote) বলা হইয়াছে। পদ্ধতিটি এইরূপ : রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে যতজন নির্বাচনপ্রার্থী থাকিবেন প্রত্যেক ভোটাধিকারীর ততগুলি পছন্দ (preferences) থাকিবে। ভোটাধিকারী ব্যালট কাগজে নির্বাচনপ্রার্থীদের নামের পাশে তাঁহার পছন্দ অনুসারে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা বসাইবেন। ২য়, ৩য় এবং পরবর্তী পছন্দ তিনি নাও জানাইতে পারেন, কিন্তু প্রথম পছন্দ তাঁহাকে জানাইতেই হইবে। না জানাইলে তাঁহার ভোট বাতিল হইয়া যাইবে।

ভোটদান সমাপ্ত হইলে ব্যালট কাগজে প্রদত্ত বৈধ ভোটের মোট সংখ্যাকে দুই দ্বারা ভাগ করিয়া তাহার সহিত এক যোগ করা হয়। ইহাতে যে-সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাকে 'কোটা' (Quota) বলে। প্রথমে ১ম পছন্দের ভোটগুলি গণনা করিয়া দেখা হয় যে, কেহ কোটা পাইয়াছেন কি না। কোটা পাইলেই তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়; কেহ কোটা না পাইলে সর্বনিম্নসংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীকে বাদ দিয়া তাঁহার প্রাপ্ত ভোটগুলিকে দ্বিতীয় পছন্দ অনুযায়ী প্রার্থীদের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়। ইহাতেও যদি কেহ কোটা না পান তবে

---

* বিষয়টিকে বুঝাইবার জন্য একটি উদাহরণের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, পশ্চিমবংগের জনসংখ্যা মোট ৩,৪৯,২৬,২৭৯ এবং পশ্চিমবংগের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণের সংখ্যা ২৮০। এই জনসংখ্যাকে সদস্যসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল হয় ১,২৪,৭৩৬। এই ভাগফলকে আবার ১০০০ দ্বারা ভাগ করিলে (১,২৪,৭৩৬ ÷ ১০০০) ভাগফল হয় ১২৪ এবং ভাগশেষ থাকে ৭৩৬। সুতরাং রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে পশ্চিমবংগের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের (১২৪ + ১) ১২৫ ভোট থাকিবে। নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা ২৮০ হওয়ায় সদস্যদের মোট ভোটসংখ্যা হইবে ৩৪,৯০০। এইভাবে আসাম বিহার উড়িষ্যা প্রভৃতি সকল রাজ্যের সদস্যদের মোট ভোটসংখ্যা বাহির করা যাইতে পারে। তারপর এই সকল মোট ভোটসংখ্যাকে যোগ দিলে যে-সংখ্যা পাওয়া যাইবে তাহাই হইল পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যের মোট ভোটসংখ্যা। উহাকে পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে প্রত্যেক সদস্যের ভোটসংখ্যা পাওয়া যাইবে।

তৃতীয়বার এইরূপ করা হয়। এইভাবে যতক্ষণ-পর্যন্ত না একজন প্রার্থী কোটা প্রাপ্ত হন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রার্থীবাদ ও ভোট-হস্তান্তরকার্য চলিতে থাকে।

এইরূপ নির্বাচন-পদ্ধতি অবলম্বনের কারণ: রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে এইরূপ জটিল পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি অবলম্বনের তিনটি কারণ আছে।

(ক) ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে বিপুল নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন বিশেষ অসুবিধাজনক ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

(খ) নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তাকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত না করাই যুক্তিযুক্ত; করিলে তিনি প্রকৃত শাসনক্ষমতা দাবি করিতে পারেন। তাঁহাকে প্রকৃত শাসনক্ষমতা দিলে মন্ত্রি-পরিষদের হস্তে প্রকৃত শাসনক্ষমতা থাকে না এবং ফলে নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার (Parliamentary Government) স্বরূপও বজায় রাখা যায় না।

(গ) রাষ্ট্রপতি যাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে—অর্থাৎ মোট ভোটসংখ্যার অর্ধেকের বেশী পাইয়া, নির্বাচিত হন সেই উদ্দেশ্যে 'সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বে'র ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যদি সাধারণ নির্বাচন-পদ্ধতি অনুসরণ করা হইত তবে রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচন-প্রার্থীর সংখ্যা বেশী থাকিলে রাষ্ট্রপতি সংখ্যালঘিষ্ঠের ভোটেও নির্বাচিত হইতে পারিতেন। এইরূপ ঘটনা গণতন্ত্রের দিক হইতে অবাঞ্ছনীয় বলিয়াই একহস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ও পদচ্যুতি (Tenure and Removal of the President): রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। কার্যকাল উত্তীর্ণ হইলে তিনি পুনরায় নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পারেন। কার্যকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তিনি পদত্যাগও করিতে পারেন। শাসনকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই আবার পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ তাঁহার বিচার করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে। এই বিচার করিতে পারে সংবিধানভংগের অভিযোগে। যে-কোন পরিষদ সংবিধানভংগের অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে। অভিযোগ প্রস্তাবাকারে আনিতে হয়। এইরূপ প্রস্তাব আনয়ন করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার অন্যূন এক-চতুর্থাংশের দ্বারা স্বাক্ষরিত অন্তত চৌদ্দ দিনের এক লিখিত নোটিস দিয়া প্রস্তাব উত্থাপনের অভিপ্রায় জানাইতে হইবে। ইহার পর প্রস্তাবটি ঐ পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে পাস হওয়া প্রয়োজন। এইভাবে পার্লামেন্টের এক পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অপর পরিষদ অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবে বা অনুসন্ধান করিবার ব্যবস্থা করিবে। অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধানকারী পরিষদ যদি উহার মোট সদস্যসংখ্যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে

অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে—এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে রাষ্ট্রপতি পদ হইতে অপসারিত হইবেন।

রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীর যোগ্যতা: রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচনপ্রার্থীকে অন্যূন ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে, ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে এবং লোকসভার সদস্য হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে। লাভজনক কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্ট বা কোন রাজ্যের আইনসভার সদস্য হইতে পারেন না। এরূপ কোন ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তবে যেদিন তিনি রাষ্ট্রপতি-পদে অধিষ্ঠিত হইবেন সেই দিন হইতে তাঁহার পার্লামেণ্টের বা রাজ্যের আইনসভার পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

শাসনভার গ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান অনুযায়ী শপথ বা স্বীকৃতি গ্রহণ করিতে হয় যে তিনি বিশ্বস্ততার সহিত রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনা করিবেন, সাধ্য অনুসারে সংবিধানের স্বরূপ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবেন এবং নিজেকে ভারতীয় জনগণের সেবা ও কল্যাণে নিয়োজিত করিবেন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা (Powers of the President)

ইউনিয়ন সরকারের শাসনসংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতাই রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। অবশ্য তিনি দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার মূলনীতি অনুযায়ী মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুসারেই এই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অন্যভাবে বলিতে গেলে, আইনত সকল ক্ষমতাই রাষ্ট্রপতির, তাঁহার নামেই শাসনকার্য পরিচালিত এবং সরকারী আদেশসমূহ প্রচারিত হয়—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা হইল মন্ত্রি-পরিষদের। ভারতের নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা রাষ্ট্রপতিকে ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর ন্যায় মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে হয়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার আলোচনায় দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার এই মৌলিক নীতিটি স্মরণ রাখিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ: রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে প্রধানত চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়—শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা, আইনবিষয়ক ক্ষমতা, অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা এবং জরুরী অবস্থাসংক্রান্ত ক্ষমতা।

ক। **শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা:** রাজ্যপালগণ, প্রধান ধর্মাধিকরণ ও মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণ, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা-পরীক্ষক (Comptroller and Auditor-General), নির্বাচন কমিশনার, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যগণ, এ্যাটর্নী-জেনারেল প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

রাষ্ট্রপতি স্থল, নৌ ও বিমান—এই তিন রক্ষিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ মিনিকয় ও আমীনদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ এবং দাদরা ও নগরহাভেলি—এই তিনটি কেন্দ্রশাসিত বা ইউনিয়ন অঞ্চলের (Union Territories) সুশাসনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি নিয়মকানুন প্রবর্তন করিতে পারেন। বাকী কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে মন্ত্রি-পরিষদ ও আইনসভা গঠন করা হইলেও উহারা কিছুটা রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণাধীন আছে।

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনা বিষয়ে সমতা ও সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রপতি এক আন্তঃরাজ্য পরিষদ (Inter-State Council) নিযুক্ত করিতে পারেন। জরুরী অবস্থায় তিনি রাজ্যপালের শাসনকার্য পরিচালনা সম্পর্কে যে-কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

কয়েক ক্ষেত্রে দণ্ডিত ব্যক্তিকে মার্জনা করিবার অথবা তাহার দণ্ডাদেশ হ্রাস করিবার অথবা দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে।

খ। আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা: পার্লামেন্টীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা বিভাগ বা পার্লামেন্টের একটি অংগ। তাঁহার সম্মতি ব্যতীত কোন বিল (Bill) আইনে পরিণত হইতে পারে না। পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে পাস হইবার পর প্রত্যেক বিলকে সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে হয়। তিনি সম্মতি দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন, অথবা বিলটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে ফেরত পাঠাইতে পারেন।*

কেন্দ্রের আইন ছাড়াও রাজ্যের আইন প্রণয়ন ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হইতে পারে। রাজ্যের আইনসভা কোন বিল পাস করিলে তাহা রাজ্যপালের সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হয়। রাজ্যপাল নিজে সম্মতি বা অসম্মতি কোনকিছুই জ্ঞাপন না করিয়া বিলটি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সরাসরি তাঁহার নিকট পাঠাইতে পারেন। এক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতির সম্মতি না দেওয়ার ক্ষমতা আছে।

রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উচ্চতর পরিষদ বা রাজ্যসভায় ১২ জন সদস্য মনোনীত করেন। নিম্নতর পরিষদ বা লোকসভাতেও তাঁহার অনধিক দুইজন ইংগ-ভারতীয় সদস্য মনোনীত করিবার ক্ষমতা আছে।

রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন। সাধারণত পার্লামেন্টের উদ্বোধনী সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় সরকারী কার্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এবং যে যে কারণে অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে জ্ঞাত

* অর্থসংক্রান্ত কোন বিলকে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠান যায় না।

করান হয়। পার্লামেন্টের যে-কোন পরিষদে তিনি অন্য যে-কোন সময় বক্তৃতা করিতে বা নির্দেশ পাঠাইতে পারেন।

পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী রাখা এবং নিম্নতর পরিষদ লোকসভাকে ভাঙিয়া দিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির আছে।

পার্লামেণ্ট অধিবেশনে না থাকিলে রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স বা অস্থায়ী জরুরী আইন জারি করিতে পারেন। এইরূপ আইন বা অর্ডিন্যান্স পার্লামেণ্ট অধিবেশনে বসার পরও ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত কার্যকর থাকিতে পারে।

গ। **অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা :** পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকারী ব্যয়বরাদ্দ করিবার এবং খরচের অনুমতি দিবার পূর্ণ ক্ষমতা থাকে আইনসভার হস্তে। কিন্তু শাসন বিভাগের পক্ষ হইতে বরাদ্দের দাবি করা না হইলে এবং খরচের অনুমতি চাওয়া না হইলে আইনসভা ব্যয়বরাদ্দ করিতে বা খরচের অনুমতি দিতে পারে না। আবার নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তার সুপারিশ ব্যতিরেকে শাসন বিভাগের পক্ষ হইতে বরাদ্দের দাবি করা যায় না। ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতিরেকে ব্যয়বরাদ্দের কোন দাবি করা যায় না। তাঁহার সুপারিশ ব্যতীত অর্থসম্বন্ধীয় কোন বিলই লোকসভায় আনয়ন করা যায় না।

রাষ্ট্রপতি প্রতি 'আর্থিক বৎসরে'র (Financial Year)* প্রারম্ভে সেই বৎসরের জন্য ইউনিয়ন সরকারের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাব লইয়া একটি বিবৃতি মন্ত্রী মারফত পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে পেশ করান। এই বিবৃতিকেই কেন্দ্রীয় সরকারের 'বাজেট' (Budget) বলা হয়।

অনিশ্চিত ব্যয়ের জন্য রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্বাধীনে একটি তহবিল (Contingency Fund) আছে। হঠাৎ কোন অনিশ্চিত অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইলে পার্লামেন্টের অনুমোদন পাইবার পূর্বেই তিনি এই তহবিল হইতে ব্যয়ের অনুমতি দিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতিকে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর বা তাহার পূর্বেই একটি অর্থ কমিশন (Finance Commission) নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তিনি এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা করেন।

ঘ। **জরুরী অবস্থাসংক্রান্ত ক্ষমতা :** ভারতের বর্তমান সংবিধান তিন ধরনের জরুরী অবস্থার কল্পনা করিয়া রাষ্ট্রপতিকে তিন প্রকার জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা দিয়াছে। প্রথমত, রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে যুদ্ধ অথবা বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা ভারতের বা ভারতের কোন অংশের

* আর্থিক বৎসর এপ্রিল মাস হইতে পরবর্তী বৎসরের মার্চ মাস পর্যন্ত।

নিরাপত্তা বিপন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে তবে তিনি 'আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা' (Proclamation of Emergency) করিতে পারেন। কেন্দ্রীয় আইনসভা—অর্থাৎ পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ অনুমোদন করিলে এই ঘোষণা দুই মাসেরও অধিক (কতদিন পর্যন্ত তাহার কিছু ঠিক নাই) বলবৎ থাকিতে পারে। ঘোষণা বলবৎ থাকাকালীন ইউনিয়ন সরকার রাজ্য সরকারের এলাকাধীন আইনবিষয়ক ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে। ইহা ছাড়া এইরূপ জরুরী অবস্থা বর্তমান থাকাকালীন রাষ্ট্রপতিও কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হন।

ভারতে এ-পর্যন্ত একবার এইরূপ আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা করা হইয়াছে। এই ঘোষণা করা হয় ১৯৬২ সালের ২৬শে অক্টোবর চীনের সহিত সীমান্ত সংঘর্ষের ফলে ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন হইলে এবং উহা প্রত্যাহার করা হয় ১৯৬৮ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি যদি কোন রাজ্যপালের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া অথবা অন্য কোন কারণে মনে করেন যে শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ঐ রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালিত হওয়া সম্ভব নহে, তবে তিনি ঘোষণার দ্বারা ঐ রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতাই নিজ হস্তে তুলিয়া লইতে পারেন এবং আইনবিষয়ক সকল ক্ষমতা পার্লামেণ্টকে প্রদান করিতে পারেন। রাজ্যের মহাধর্মাধিকরণের কোন ক্ষমতা অবশ্য তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না বা কাহাকেও প্রদান করিতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির এইরূপ ঘোষণাকে 'শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা'র (Failure of Constitutional Machinery) ঘোষণা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের অনুমোদন পাইলে এইরূপ শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সর্বাধিক তিন বৎসর পর্যন্ত বর্তমান থাকিতে পারে।

আপৎকালীন অবস্থা মাত্র একবার ঘোষণা করা হইলেও এ-পর্যন্ত শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে বেশ কয়েকবার। যে-সকল রাজ্যে ইহা ঘোষিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেরল উড়িষ্যা বিহার উত্তরপ্রদেশ পাঞ্জাব হরিয়ানা পশ্চিমবংগ প্রভৃতি অনেক রাজ্যই আছে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে সমগ্র দেশের বা দেশের কোন অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম ক্ষুণ্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি এক 'আর্থিক সংকটাবস্থা' (Financial Emergency) ঘোষণা করিয়া ইহার প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। এইরূপ সংকটাবস্থায় সকল সরকারী কর্মচারীর বেতন ও ভাতা হ্রাস করা যাইতে পারে। এ-পর্যন্ত এই আর্থিক সংকটাবস্থা একবারও ঘোষিত হয় নাই।

উপরাষ্ট্রপতি (The Vice-President)

ভারতের একজন উপরাষ্ট্রপতিও আছেন। তিনি পদাধিকারবলে পার্লামেন্টের উচ্চতর পরিষদ বা রাজ্যসভার সভাপতি এবং পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যগণ লইয়াই গঠিত এক নির্বাচনী সংস্থা দ্বারা নির্বাচিত হন। নির্বাচন-পদ্ধতিকে এক্ষেত্রেও 'একহস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' বলা হইয়াছে। আবার রাষ্ট্রপতির ন্যায় উপরাষ্ট্রপতিকেও কার্যকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই পদচ্যুত করা যায়। তবে রাষ্ট্রপতির ন্যায় এই পদচ্যুতির ক্ষেত্রে ঠিক ইমপিচ্‌মেণ্ট-পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন হয় না। রাষ্ট্রপতির ন্যায় উপরাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদও পাঁচ বৎসর। রাজ্যসভায় মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশের দ্বারা পদচ্যুতির প্রস্তাব গৃহীত হইলে এবং ঐ প্রস্তাবে লোকসভা সম্মতি প্রদান করিলেই উপরাষ্ট্রপতি তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হন।

ভারতীয় নাগরিক না হইলে, ৩৫ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে এবং রাজ্যসভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা না থাকিলে কোন ব্যক্তি উপরাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইতে পারেন না।

ভারতীয় সংবিধান শাসনসংক্রান্ত কোন ক্ষমতাই উপরাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত করে নাই। তবে রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হইলে অথবা রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিলে অথবা তিনি অসুস্থ বা পদচ্যুত হইলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনা করেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মৃত্যু পদচ্যুতি বা পদত্যাগ দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে উপ-রাষ্ট্রপতি অবশ্য রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হন না—রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনা করেন মাত্র। রাষ্ট্রপতির শূন্য পদ পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতিতে নির্বাচন দ্বারাই পূরণ করা হয়।

মন্ত্রি-পরিষদ (Council of Ministers)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা থাকে মন্ত্রি-পরিষদের হস্তে এবং নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ অনুসারেই শাসনকার্য পরিচালনা করেন। নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তার স্বেচ্ছাধীন কোন ক্ষমতা থাকে না।

ভারতের নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিবার জন্য এবং তাঁহাকে শাসনকার্যে সহায়তা করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে একটি মন্ত্রি-পরিষদ আছে। প্রধান মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি। প্রধান মন্ত্রী হইলেন পার্লামেন্টের নিম্নতর পরিষদ বা লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়াই রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন। সুতরাং মন্ত্রি-পরিষদ গঠনের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর হইল যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান মন্ত্রীর নিয়োগ এবং প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করা।

সকল মন্ত্রীই অবশ্য মন্ত্রি-পরিষদের সভ্য নহেন। যাঁহারা মন্ত্রি-পরিষদের সভ্য তাঁহাদের 'পরিষদভুক্ত মন্ত্রী' (Cabinet Ministers) বলা হয়। তাঁহাদের সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন রাষ্ট্রমন্ত্রী (Ministers of State) এবং উপমন্ত্রী (Deputy Ministers) আছেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীরা পদমর্যাদায় পরিষদভুক্ত মন্ত্রিগণ অপেক্ষা নিম্ন। প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি ঠিক করেন যে বিভিন্ন মন্ত্রীর মধ্যে পরিষদভুক্ত মন্ত্রী কে কে হইবেন।

প্রত্যেক মন্ত্রীকে পার্লামেন্টের দুইটি পরিষদের যে-কোন একটির সদস্য হইতে হয়। যদি এইরূপ কোন ব্যক্তি মন্ত্রী নিযুক্ত হন যিনি পার্লামেন্টের কোন পরিষদেরই সভ্য নহেন, তবে ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে পার্লামেন্টের সদস্য হইতে হইবে। না হইতে পারিলে তাঁহার মন্ত্রিত্ব বজায় থাকিবে না। মন্ত্রিগণ যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল।

সংবিধান অনুসারে মন্ত্রিগণের পদে অধিষ্ঠিত থাকা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলেও, মন্ত্রিগণ যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী বলিয়া যতদিন লোকসভার আস্থাভাজন থাকেন, ততদিনই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। লোকসভার আস্থাভাজন কোন মন্ত্রী বা মন্ত্রিমণ্ডলীকে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত করেন না। পদচ্যুত করিলে তাঁহাকে আর একটি মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পদচ্যুত মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতি যদি লোকসভার আস্থা থাকে তবে নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করা অর্থহীন, কারণ নবগঠিত মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া লোকসভা উহাকে পদচ্যুত করিবে। তবে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে মন্ত্রিমণ্ডলী সংবিধান ভংগ করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া এবং সংগে সংগে লোকসভা ভাঙিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থায় এইরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করা উচিত। এইজন্যই রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী (The Prime Minister)

ইতিমধ্যেই বলা হইয়াছে যে, দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার বিধি অনুযায়ী প্রধান মন্ত্রীই প্রকৃতপক্ষে প্রধান শাসনকর্তা। ভারতীয় সংবিধান বা ভারতের বর্তমান শাসন-তন্ত্র সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছে যে প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে। প্রধান মন্ত্রী শুধু মন্ত্রিসভার নেতা নহেন, তিনি পার্লামেন্টের বা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণেরও নেতা। এইজন্য তাঁহাকে লোকসভার নেতা (Leader of the House of the People)—এই আখ্যাও দেওয়া হয়।

প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রি-পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁহারই পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরিষদভুক্ত মন্ত্রী কে কে হইবেন, কোন্ কোন্ মন্ত্রীর উপর

কোন্ কোন্ দপ্তরের ভার থাকিবে—এই সকল বিষয় প্রকৃতপক্ষে নির্ধারণ করেন তিনিই। তিনি যে-কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারেন। তিনি নিজে পদত্যাগ করিলে মন্ত্রিসভাও ভাঙিয়া যায়। তিনিই রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্টের অধিবেশন প্রভৃতি সম্পর্কে পরামর্শ দেন। পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার বিধান অনুসারে তিনি রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ভাঙিয়া দেওয়ার জন্যও পরামর্শ দিতে পারেন। যতদিন লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার পদ অধিকার করিয়া থাকেন, ততদিনই তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। মন্ত্রি-পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনিই প্রধানত রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন এবং মন্ত্রি-পরিষদের আলাপ-আলোচনা ও প্রস্তাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে জ্ঞাত করান। রাষ্ট্রপতি যে-বিষয়ে জ্ঞাত হইতে চাহিবেন সে-বিষয়ে তাঁহাকে জ্ঞাত করান প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্য। প্রধান মন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রি-পরিষদের মধ্যে যোগসূত্র বলিয়া অভিহিত করা যায়। উপমা দিয়া বলিতে গেলে বলা যায়, সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র যেমন সূর্য, মন্ত্রি-পরিষদের কেন্দ্র তেমনি প্রধান মন্ত্রী।

পদমর্যাদার দিক দিয়া প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা নিম্ন হইলেও প্রধান মন্ত্রীকেই প্রকৃত প্রধান জননায়ক বলিয়া অভিহিত করা যায়।

একজন আধুনিক লেখক ক্রিকেট খেলার অধিনায়কের সহিত পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় প্রধান মন্ত্রীর তুলনা করিয়াছেন। ক্রিকেট খেলায় যেমন দল বিশেষভাবে পরিচালিত হয় অধিনায়ক দ্বারা, তেমনি পার্লামেণ্টীয় সরকারও পরিচালিত হয় প্রধান মন্ত্রী দ্বারা। আবার ক্রিকেট খেলায় যেমন জয়পরাজয় অনেকাংশে নির্ভর করে অধিনায়কের উপর, তেমনি পার্লামেণ্টীয় সরকারের সাফল্যও নির্ভর করে প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতার উপর।

৩

ইউনিয়ন সরকারের ব্যবস্থা বিভাগ

(The Union Legislature)

পার্লামেন্ট বা সংসদ (Parliament)

ইউনিয়ন সরকারের ব্যবস্থা বিভাগ বা আইন বিভাগকে পার্লামেন্ট বলা হয়। পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতি এবং দুইটি পরিষদ বা কক্ষ লইয়া গঠিত। উচ্চতর পরিষদের নাম রাজ্যসভা (*Rajya Sabha* or Council of States) এবং নিম্নতর পরিষদের নাম লোকসভা (*Lok Sabha* or House of the People)।*

রাজ্যসভা : রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা ২৫০ জনের অধিক হইতে পারিবে না। সদস্যগণের মধ্যে চারুকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজসেবা—এই চারিটি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ১২ জন সদস্য সকল সময়েই থাকিবেন। বাকী অনধিক ২৩৮ জন হইবেন রাজ্য ও ইউনিয়ন অঞ্চলসমূহের (Union Territories) প্রতিনিধি (representatives)। সংবিধান অনুসারে প্রতিনিধি-সংখ্যা ২৩৮ অবধি হইতে পারিলেও বর্তমানে এই সংখ্যা হইল মাত্র ২২৮ জন। এই ২২৮ জন প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্রপতি-মনোনীত ১২ জন সদস্য লইয়া বর্তমানে রাজ্যসভার মোট সদস্যসংখ্যা হইল ২৪০ জন।

রাজ্যের প্রতিনিধিগণ ঐ রাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণ দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।** ইউনিয়ন অঞ্চলসমূহের প্রতিনিধিবর্গ বিশেষভাবে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হন। দিল্লীর নির্বাচকমণ্ডলী দিল্লীর মেট্রোপলিটন পরিষদের (Metropolitan Council) নির্বাচিত সদস্যদের লইয়া এবং মণিপুর, ত্রিপুরা, পণ্ডিচেরি ও হিমাচলপ্রদেশের নির্বাচকমণ্ডলী ঐ অঞ্চলগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত। বর্তমানে রাজ্যসভায় রাজ্যসমূহের ২১৯ জন এবং ইউনিয়ন অঞ্চলসমূহের ৯ জন প্রতিনিধি আছেন। পশ্চিমবংগের প্রতিনিধি-সংখ্যা হইল ১৬ জন।

---

* সংবিধানে এই দুইটি পরিষদ এখনও Council of States এবং House of the People বলিয়া অভিহিত। তবে সরকারীভাবে ভারতীয় নাম গ্রহণ করিয়া সকল ক্ষেত্রেই উহাদিগকে যথাক্রমে রাজ্যসভা (*Rajya Sabha*) এবং লোকসভা (*Lok Sabha*) বলা হইতেছে। ফলে সংবিধান-বর্ণিত নাম দুইটি একপ্রকার অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

** রাজ্যের বিধানসভায় মনোনীত ইংগ-ভারতীয় সদস্য থাকিতে পারেন। মনোনীত সদস্যদের ভোট দেওয়ার অধিকার নাই।

রাজ্যসভা চিরস্থায়ী পরিষদ—ইহাকে কখনও ভাঙিয়া দেওয়া হয় না। দুই বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন এবং পুনরায় মনোনয়ন ও পুনর্নির্বাচন দ্বারা তাঁহাদের শূন্য আসন পূর্ণ করা হয়।

রাজ্যসভার সদস্য হইবার জন্য প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক এবং অন্যূন ৩০ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পদাধিকারবলে ভারতের উপরাষ্ট্রপতিই হইলেন রাজ্যসভার সভাপতি (Chairman)। সভার একজন সহ-সভাপতিও (Deputy Chairman) আছেন। তিনি সদস্যগণের মধ্য হইতে সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত হন।

লোকসভা ঃ লোকসভা অংগরাজ্যসমূহ হইতে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত অনধিক ৫০০ জন এবং ইউনিয়ন অঞ্চলসমূহ হইতে অনধিক ২৫ জন—সর্বাধিক এই ৫২৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। ইউনিয়ন অঞ্চলসমূহের সদস্যগণ কিভাবে লোকসভায় আসন গ্রহণ করিবেন তাহা পার্লামেণ্ট আইন করিয়া স্থির করিয়া দেয়। বর্তমান আইন অনুসারে ইউনিয়ন অঞ্চলগুলির সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া আসেন ; একমাত্র আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকার (North-East Frontier Area or NEFA) ১ জন প্রতিনিধি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন।

নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে তপশীলী বর্ণ ও কয়েকটি তপশীলী উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এই সংরক্ষণ-ব্যবস্থা সংবিধান প্রবর্তনের পর ২০ বৎসর—অর্থাৎ ১৯৭০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

ইহা ছাড়া শাসনতন্ত্রে এই বিধানও আছে যে, যদি রাষ্ট্রপতি ইংগ-ভারতীয় সম্প্রদায় লোকসভায় উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে নাই বলিয়া মনে করেন, তবে তিনি এই সম্প্রদায় হইতে সংবিধান প্রবর্তনের ঐ ২০ বৎসর পর্যন্ত অনধিক দুইজন সদস্য এই পরিষদে মনোনীত করিতে পারিবেন। এই মনোনয়নের ফলে লোকসভার সদস্যসংখ্যা সর্বাধিক ৫২৫-কে ছাড়াইয়া ৫২৭-এ পৌছিতে পারে।

বর্তমানে লোকসভার সদস্যসংখ্যা উক্ত সর্বাধিক ৫২৫-এর পরিবর্তে হইল ৫২১ জন (এবং মনোনীত ইংগ-ভারতীয় ২ জন ধরিয়া ৫২৩ জন)। ইহার মধ্যে আছেন রাজ্যগুলি হইতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত ৪৯৬ জন সদস্য, ইউনিয়ন অঞ্চলগুলি হইতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত ২৪ জন সদস্য এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকার ১ জন মনোনীত সদস্য। বর্তমানে পশ্চিমবংগ এবং আসাম হইতে যথাক্রমে ৪০ ও ১৪ জন সদস্য লোকসভায় আছেন।

লোকসভার জীবনকাল সাধারণত পাঁচ বৎসর। ইহার মধ্যে রাষ্ট্রপতি এই পরিষদকে যে-কোন সময়ে ভাঙিয়া দিতে পারেন। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি ইহার

ভারতীয় রাজ্যসংঘের বর্তমান গঠন

ক। অংগরাজ্যসমূহ

১। অন্ধ্রপ্রদেশ
২। আসাম
৩। উড়িষ্যা
৪। উত্তরপ্রদেশ
৫। কেরল
৬। গুজরাট
৭। জম্মু ও কাশ্মীর
৮। নাগাভূমি
৯। পশ্চিমবংগ
১০। পাঞ্জাব (পাঞ্জাবী সুবা)
১১। বিহার
১২। মধ্যপ্রদেশ
১৩। মহারাষ্ট্র
১৪। মহীশূর
১৫। মাদ্রাজ*
১৬। রাজস্থান
১৭। হরিয়ানা

খ। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ

১। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
২। গোয়া, দমন ও দিউ
৩। চণ্ডীগড়
৪। ত্রিপুরা
৫। দাদরা ও নগর হাভেলি
৬। দিল্লী
৭। পণ্ডিচেরি
৮। মণিপুর
৯। লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমীনদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ
১০। হিমাচলপ্রদেশ

গ। এলাকা

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকা

* বর্তমানে তামিলনাডু নামে অভিহিত।

রাজ্যসভায় আসন বণ্টন

ক। রাজ্য সরকার (States)	আসনসংখ্যা
১। অন্ধ্রপ্রদেশ	১৮
২। আসাম	৭
৩। বিহার	২২
৪। মহারাষ্ট্র	১৯
৫। গুজরাট	১১
৬। হরিয়ানা	৫
৭। কেরল	৯
৮। মধ্যপ্রদেশ	১৬
৯। মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু)	১৮
১০। মহীশূর	১২
১১। উড়িষ্যা	১০
১২। পাঞ্জাব	৭
১৩। রাজস্থান	১০
১৪। উত্তরপ্রদেশ	৩৪
১৫। পশ্চিমবংগ	১৬
১৬। জম্মু ও কাশ্মীর	৪
১৭। নাগাভূমি	১
খ। ইউনিয়ন অঞ্চল (Union Territories)	
১। দিল্লী	৩
২। হিমাচলপ্রদেশ	৩
৩। মণিপুর	১
৪। ত্রিপুরা	১
৫। পণ্ডিচেরি	১
	মোট ২২৮*

লোকসভায় আসন বণ্টন

ক। রাজ্য সরকার (States)	আসনসংখ্যা
১। অন্ধ্রপ্রদেশ	৪১
২। আসাম	১৪
৩। বিহার	৫৩
৪। গুজরাট	২৪
৫। হরিয়ানা	৯
৬। জম্মু ও কাশ্মীর	৬
৭। কেরল	১৯
৮। মধ্যপ্রদেশ	৩৭
৯। মাদ্রাজ	৩৯
১০। মহারাষ্ট্র	৪৫
১১। মহীশূর	২৭
১২। নাগাভূমি	১
১৩। উড়িষ্যা	২০
১৪। পাঞ্জাব	১৩
১৫। রাজস্থান	২৩
১৬। উত্তরপ্রদেশ	৮৫
১৭। পশ্চিমবংগ	৪০
খ। ইউনিয়ন অঞ্চল (Union Territories)	
১। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	১
২। চণ্ডীগড়	১
৩। দাদরা ও নগর হাভেলি	১
৪। দিল্লী	৭
৫। গোয়া, দমন ও দিউ	২
৬। হিমাচলপ্রদেশ	৬
৭। লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমীনদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ	১
৮। মণিপুর	২
৯। পণ্ডিচেরি	১
১০। ত্রিপুরা	২
গ। এলাকা (Area বা Tract)	
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকা	১
	মোট ৫২১**

* ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রপতি ১২ জন সদস্য মনোনীত করেন।

** ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রপতি ইংগ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের ২ জন প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারেন।

কার্যকাল ১ বৎসরের জন্ম বৃদ্ধিও করিতে পারেন। পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত একজন পরিষদপাল (Speaker) এবং একজন উপপরিষদপাল (Deputy Speaker) থাকেন।

সংবিধান অনুসারে পার্লামেন্টের দুই অধিবেশনের মধ্যে ছয় মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হয় না।

পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও কার্য (Powers and Functions of Parliament): পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও কার্যকে কয়েকভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যায়—যথা, (ক) আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা, (খ) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা, (গ) শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, এবং (ঘ) অন্যান্য ক্ষমতা।

ক। **আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা:** ইউনিয়ন এবং উভয় এলাকাধীন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার পূর্ণ ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে। যদি উভয় এলাকাধীন তালিকার অন্তর্গত কোন বিষয়ে পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের সহিত কোন রাজ্যের আইনসভা-প্রণীত আইনের সংঘর্ষ বাধে, তবে রাজ্যের আইনের অসংগতিপূর্ণ অংশটুকু বাতিল হইয়া যাইবে এবং কেন্দ্রের আইনই বলবৎ থাকিবে। সাধারণ অবস্থায় রাজ্যগুলির অন্তর্গত অঞ্চলের জন্য রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা পার্লামেন্টের নাই। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যদি জরুরী অবস্থাসংক্রান্ত ঘোষণা করেন, তবে পার্লামেন্টকে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে-কোন বিষয়ে সমগ্র ভারত বা ভারতের যে-কোন অঞ্চলের জন্য আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করিয়াও রাষ্ট্রপতি ঐ রাজ্য সম্পর্কে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা পার্লামেন্টকে অর্পণ করিতে পারেন। ইহা ছাড়া আরও তিনটি ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে—যথা, (১) যদি রাজ্যসভা দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে স্থির করে যে জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই পার্লামেন্টের পক্ষে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা উচিত। (২) যদি দুই বা ততোধিক রাজ্য পার্লামেন্টকে এইরূপ আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করে এবং সম্মতি দেয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট-প্রণীত আইন মাত্র অনুরোধকারী রাজ্যগুলিতেই প্রযুক্ত হইবে, অপর রাজ্যগুলিতে নহে। (৩) আন্তর্জাতিক সন্ধি ইত্যাদির শর্তাদি রক্ষার জন্য পার্লামেন্ট সমগ্র ভারত বা ভারত-রাষ্ট্রের যে-কোন অঞ্চলের জন্য যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

খ। **অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা:** আমরা দেখিয়াছি যে প্রতি বৎসর রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী মারফত একটি 'বাৎসরিক আর্থিক বিবৃতি' বা বাজেট পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে পেশ

করান (১১ পৃষ্ঠা)। এই বিবৃতিতে 'কেন্দ্রীয় তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়' (Charged on the Consolidated Fund of India) এবং কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে অন্যান্য ব্যয় করিবার প্রস্তাবগুলি স্বতন্ত্রভাবে দেখান হয়। যে-ব্যয়গুলি কেন্দ্রীয় তহবিলের উপর ধার্য তাহা লোকসভার অনুমোদন-সাপেক্ষ নহে। এই ধরনের ব্যয়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা, রাজ্যসভার সভাপতি ও সহ-সভাপতির বেতন ও ভাতা, লোকসভার পরিষদপাল ও উপপরিষদপালের বেতন ও ভাতা, প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণের এবং নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা-পরীক্ষকের বেতন ভাতা ও পেনসন্, সরকারী ঋণজনিত ব্যয় প্রভৃতিই প্রধান। এই ব্যয়গুলি ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যয় লোকসভার অনুমোদন-সাপেক্ষ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, লোকসভার ব্যয়সংক্রান্ত পূর্ণ ক্ষমতা নাই। কিন্তু কর-নির্ধারণ ও সরকারী ঋণসংক্রান্ত পূর্ণ ক্ষমতা লোকসভার আছে। লোকসভার অনুমোদন ব্যতীত করধার্য বা ঋণসংগ্রহ করা যায় না। করনীতি ও সরকারী ঋণপদ্ধতিতে যে-কোন পরিবর্তনসাধন করিতে হইলে লোকসভার অনুমোদন প্রয়োজনীয়।

রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত ব্যয়বরাদ্দের কোন অর্থ পার্লামেণ্টের নিকট দাবি করা যায় না বা কোন 'অর্থ বিল' লোকসভায় আনয়ন করা যায় না।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এ-ধারণা সহজেই হইবে যে পার্লামেণ্টের অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা বলিতে প্রধানত লোকসভার ক্ষমতাই বুঝায়। উচ্চতর পরিষদ বা রাজ্যসভার আইনবিষয়ক ক্ষমতা নিম্নতর পরিষদ বা লোকসভার সমতুল্য হইলেও, অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা লোকসভার একচেটিয়া বলা যায়। অর্থসংক্রান্ত কোন বিল রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না। এইরূপ বিল লোকসভায় পাস হইলে রাজ্যসভায় প্রেরিত হয় বটে, কিন্তু উহাকে বাতিল করিবার ক্ষমতা রাজ্যসভার নাই। এই পরিষদ এই প্রকার বিলের সংশোধনের জন্য সুপারিশ করিতে পারে মাত্র। লোকসভা এইরূপ সুপারিশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিলেও বিল দুই পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়।

গ। শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ঃ পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার নীতি অনুসারে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা পার্লামেণ্টের অন্যতম প্রধান কার্য। এই উদ্দেশ্যে সংবিধান মন্ত্রি-পরিষদকে যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল করিয়াছে। লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাস হইলে অথবা মন্ত্রি-পরিষদের কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে মন্ত্রি-পরিষদকে পদত্যাগ করিতে হয়। এইভাবে অনাস্থা প্রস্তাব পাস অথবা মন্ত্রি-পরিষদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা ছাড়াও পার্লামেণ্ট অন্যভাবে মন্ত্রি-পরিষদকে সংযত রাখিতে সমর্থ হয়। শাসন বিভাগের উপর পার্লামেণ্টের এই নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটু পরেই পৃথকভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

অন্যান্য ক্ষমতাঃ পার্লামেন্টের অন্যান্য ক্ষমতার মধ্যে সংবিধান সংশোধন করিবার ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এককভাবে সংবিধান পরিবর্তনের আংশিক ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে। কিন্তু সংবিধানের এমন কতকগুলি ধারা আছে যাহাদের পরিবর্তন পার্লামেন্ট রাজ্যগুলির আইনসভার অর্ধেকের সম্মতি পাইলে তবেই করিতে পারে।

সংবিধানভংগের জন্য সংবিধান-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিচার করিয়া পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে (৮-৯ এবং ১৩ পৃষ্ঠা)। প্রধান ধর্মাধিকরণ ও মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতাও পার্লামেন্টের আছে।

পার্লামেন্ট কর্তৃক শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ (Control of the Executive by Parliament)

পার্লামেন্ট কিভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে সে-সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে। প্রথমত, লোকসভা সাধারণভাবে সরকারী আয়ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। লোকসভার অনুমোদন ব্যতীত কোন ভোট-সাপেক্ষ ব্যয় নির্বাহ করা যায় না, করধার্য বা ঋণসংগ্রহও করা যায় না। ইহা ছাড়া সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা ঠিকমত পরিচালিত হইতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্য লোকসভার দুইটি কমিটি আছে।* মন্ত্রিগণ এই কমিটিদ্বয়ের সদস্য হইতে পারেন না। পার্লামেন্টের নির্দেশ উপেক্ষা করা হইলে, অর্থ অপচয় করা হইলে, বেআইনীভাবে অর্থব্যয় করা হইলে ও ব্যয়সংক্ষেপের প্রচেষ্টা না করা হইলে কমিটিদ্বয় মন্ত্রি-পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কিভাবে আয়ব্যয়সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা করিতে হইবে সে-সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়। শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে পার্লামেন্ট অন্যান্য যে-সকল পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে তাহার মধ্যে খবরাখবরের জন্য মন্ত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী বক্তৃতার উপর বিতর্ক, মুলতবী প্রস্তাব, নিন্দাসূচক প্রস্তাব, বাজেটের সমালোচনা প্রভৃতিই প্রধান।

পার্লামেন্টের সদস্যগণ খবরাখবরের জন্য মন্ত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এই সকল প্রশ্নের উত্তর দানের পর প্রত্যহ আধঘণ্টা ধরিয়া আলোচনা হয়। কোন জরুরী ব্যাপার আলোচনা করিবার জন্য যে-কোন সদস্য লোকসভায় বা রাজ্যসভায়

* Committee on Public Accounts and Committee on Estimates

মূলতবী প্রস্তাব (Adjournment Motion) আনয়ন করিতে পারেন—অর্থাৎ প্রস্তাব করিতে পারেন যে সভার সাধারণ কর্মসূচী বন্ধ রাখিয়া এখন ঐ বিষয়ে আলোচনা করা হউক। বিষয়টি বিশেষ জরুরী না হইলে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য সভার দৃষ্টি আকর্ষণ (Calling Attention) করা যাইতে পারে। ১৫ দিনের নোটিস দিয়া জনসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কিত যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রস্তাব আনয়ন করিবার অধিকার পার্লামেন্টের প্রত্যেক সদস্যের আছে। এইরূপ প্রস্তাব পাস হইলে উহাকে কার্যকর করিবার জন্য পরিষদপাল (Speaker) উহা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন। রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী বক্তৃতার উপর ভিত্তি করিয়া সদস্যগণ সরকারী নীতি এবং কর্মপদ্ধতির সমালোচনা ও অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। বাজেট পেশ কালেও এই সুযোগ মিলে।

ইহা ছাড়া সরকারী প্রতিশ্রুতি ঠিকমত প্রতিপালিত হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার জন্যও কিছুদিন পূর্বে লোকসভা একটি কমিটি গঠন করিয়াছে।* মন্ত্রিগণ-প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভংগ করা হইলে অথবা ঠিকমত প্রতিপালিত না হইলে কমিটি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরকারকে নিয়ন্ত্রণের আর একটি কমিটি হইল অধস্তন বা অর্পিত আইনসংক্রান্ত কমিটি।** বর্তমান সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্য দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে। এই কারণে পার্লামেণ্ট শাসন বিভাগের হস্তে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু শাসন বিভাগ যাহাতে এই অর্পিত ক্ষমতার অপপ্রয়োগ না করে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার উদ্দেশ্যে অধস্তন আইনসংক্রান্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়।

চরম ক্ষেত্রে লোকসভা অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করিয়া অথবা সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া যে মন্ত্রি-পরিষদের পতন ঘটাইতে পারে তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে (২২ পৃষ্ঠা)।

পার্লামেন্টের উপরি-উক্ত প্রকার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার জন্য মন্ত্রি-পরিষদকে সর্বদা সতর্ক ও সংযত হইয়া চলিতে হয়। কারণ প্রথমত, লোকসভায় পরাজয় ঘটিলে মন্ত্রি-পরিষদকে সরাসরি পদত্যাগ করিতে হইতে পারে এবং দ্বিতীয়ত, নির্বাচকদের নিকট জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইলে পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভের আশা থাকে না।

পার্লামেন্টের শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের এই ক্ষমতা সম্পর্কে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা প্রধানত লোকসভারই ক্ষমতা। রাজ্যসভায় পরাজয় মন্ত্রি-পরিষদকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে না।

---

* Committee on Government Assurances

** Committee on Subordinate Legislation

পার্লামেন্টের দুই পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the two Houses of Parliament)

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই পার্লামেন্টের পরিষদদ্বয়ের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইবে। প্রথমত, আমরা দেখিয়াছি যে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্যসভার ক্ষমতা অতি সামান্যই ; এ-বিষয়ে লোকসভাই একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করে।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ আইন পাসের ব্যাপারে কিন্তু উভয় পরিষদ সমক্ষমতাসম্পন্ন। এইরূপ আইনের জন্য বিল উভয় পরিষদে পাস হওয়া প্রয়োজন। এই ব্যাপারে দুই পরিষদের মধ্যে যদি মতবিরোধ ঘটে তবে রাষ্ট্রপতি পরিষদদ্বয়ের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। এই যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দ্বারা বিলটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ, সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা বিলটিকে গ্রহণ করিলে উহা পাস হয়, প্রত্যাখ্যান করিলে উহা বাতিল হইয়া যায়।

তৃতীয়ত, সরকার নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে আবার লোকসভা রাজ্যসভা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। সংবিধান অনুসারে মন্ত্রি-পরিষদ লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল এবং রাজ্যসভার পরাজয় মন্ত্রি-পরিষদকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে না বলিলেও চলে।

পার্লামেণ্টে আইন পাসের পদ্ধতি (Legislative Procedure in Parliament)

পার্লামেণ্টে আইন পাসের পদ্ধতি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। নিম্নে ইহাদের বর্ণনা করা হইতেছে :

১। **বিল উত্থাপন ও বিলের প্রথম পাঠ (Introduction and First Reading) :** অর্থ বিল ভিন্ন অন্যান্য বিল পার্লামেণ্টের দুই পরিষদের যে-কোন পরিষদে উত্থাপন করা যায়। যে-সকল বিল মন্ত্রীরা উত্থাপন করেন তাহাদিগকে সরকারী বিল (Government Bills) বলা হয়, আর যে-সকল বিল পার্লামেণ্টের সাধারণ সদস্যরা উত্থাপন করেন তাহাদিগকে বেসরকারী বিল (Private Members' Bills) বলা হয়। উভয় ধরনের বিল পাসের পদ্ধতি মোটামুটিভাবে একপ্রকার। তবে কতকগুলি বিষয়ে বেসরকারী বিলের ক্ষেত্রে পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন, বেসরকারী বিল উত্থাপনের জন্য সাধারণত এক মাসের নোটিস দিতে হয় এবং বিলের গুরুত্ব ও প্রকৃতি পরীক্ষার জন্য লোকসভায় বেসরকারী বিল ও প্রস্তাব সংক্রান্ত একটি কমিটি (a Committee on Private Members' Bills and Resolutions) আছে। যাহা হউক, কোন বিল উত্থাপনের জন্য প্রথমে পরিষদের অনুমতি চাহিয়া প্রস্তাব করিতে হয়। অনুমতি পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সদস্য বিলকে উত্থাপন করেন

উত্থাপনের পর বিলকে অবিলম্বে জনসাধারণের অবগতির জন্য সরকারী গেজেটে প্রকাশিত করা হয়। বিল উত্থাপনের পূর্বেও বিলটি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইতে পারে।

২। **বিলের দ্বিতীয় পাঠ (Second Reading of a Bill):** বিল উত্থাপনের পর ভারপ্রাপ্ত সদস্য প্রস্তাব করিতে পারেন যে, (ক) পরিষদ বিলটির বিচারবিবেচনা করুক, অথবা (খ) বিলটিকে সিলেক্ট কমিটির (a Select Committee) নিকট প্রেরণ করা হউক, অথবা (গ) বিলটি সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত জানিবার জন্য উহাকে প্রচার করা হউক, অথবা (ঘ) বিলকে দুই পরিষদের যুক্ত কমিটির (a Joint Committee of the two Houses) নিকট প্রেরণ করা হউক। ইহার পর বিলটির নীতি ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লইয়া বিতর্ক চলে। যখন 'বিলটি বিচারবিবেচনা করা হউক' এই প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন বিলের সংশোধন এবং বিভিন্ন ধারার বিচারবিবেচনা চলে।

৩। **কমিটি পর্যায় (Committee Stage):** পরিষদে সরাসরি বিচারবিবেচনার পরিবর্তে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইলে, কমিটিতে প্রথমে বিলটির সাধারণ ধারার আলোচনা হয় এবং পরে বিলের প্রত্যেকটি ধারার পুংখানুপুংখভাবে বিচারবিবেচনা চলে।

৪। **রিপোর্ট পর্যায় (Report Stage):** বিচারবিবেচনার পর কমিটি উহার রিপোর্ট রচনা করে এবং কমিটির চেয়ারম্যান ঐ রিপোর্টকে সংশ্লিষ্ট পরিষদের নিকট উপস্থিত করেন।

৫। **বিচারবিবেচনা পর্যায় এবং বিলের ধারার আলোচনা (Consideration Stage and Clause by Clause Discussion):** কমিটি কর্তৃক প্রেরিত কোন বিল সম্পর্কে বিচারবিবেচনার প্রস্তাব ভোটে গৃহীত হওয়ার পর বিলের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে পরিষদে আলোচনা চলে এবং ভোট গ্রহণ করা হয়। এই পর্যায়ে সংশোধন প্রস্তাবও করা যায়।

৬। **বিলের তৃতীয় পাঠ (Third Reading):** যখন বিলের সকল ধারা সম্পর্কে বিচারবিবেচনা এবং ভোট গ্রহণ করা সমাপ্ত হয় তখন বিলের তৃতীয় পাঠ হয়। প্রস্তাব করা হয় যে বিলটিকে পাস করা হউক। এই পর্যায়ে বিলকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের প্রশ্ন লইয়া বিতর্ক চলে।

বিলটি এইভাবে এক পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর অপর পরিষদের নিকট প্রেরিত হয়। বিলটি অপর পরিষদ কর্তৃক অনুরূপ পদ্ধতিতে গৃহীত হইলে উহাকে রাষ্ট্রপতির নিকট সম্মতির জন্য উপস্থিত করা হয়। রাষ্ট্রপতি সম্মতি প্রদান করিলে

বিলটি আইনে পরিণত হয়। কিন্তু দুই পরিষদই যে সকল সময় বিলকে গ্রহণ করিবে এমন কোন কথা নাই। এক পরিষদে পাস হওয়ার পর অপর পরিষদ কোন বিলকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে অথবা ছয় মাস ধরিয়া কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া বিলকে ফেলিয়া রাখিতে পারে, অথবা এমনভাবে বিলের সংশোধন করিতে পারে যে উহাতে উত্থাপনকারী পরিষদের সম্মতি থাকে না। এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতি দুই পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন এবং এই যুক্ত অধিবেশনে সদস্যদের ভোটে বিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

অর্থ বিল (Money Bills)

অর্থ বিল সম্পর্কে সংবিধানের ব্যবস্থা হইল যে উহা রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না, লোকসভাতেই উত্থাপন করিতে হয়। লোকসভায় অর্থ বিল পাস হওয়ার পর উহাকে রাজ্যসভার নিকট সুপারিশের (recommendations) জন্য প্রেরণ করা হয়। বিল পাইবার ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভাকে সুপারিশসহ উহাকে লোকসভার নিকট ফেরত পাঠাইতে হয়। লোকসভা ঐ সুপারিশসমূহ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। আর যদি রাজ্যসভা ১৪ দিনের ভিতর বিলকে ফেরত না পাঠায় তাহা হইলেও ধরিয়া লওয়া হয় যে বিলটি উভয় পরিষদেই পাস হইয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতিপ্রাপ্তির পর বিল আইনে পরিণত হয়।

৪ রাজ্যসমূহের শাসন-ব্যবস্থা
(Administration of States)

রাজ্যসমূহের শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থারই অনুরূপ। এখানেও দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত।

রাজ্যপাল (Governor)

প্রত্যেক রাজ্যের শীর্ষে আছেন একজন করিয়া রাজ্যপাল। রাজ্যপালকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। সাধারণত তাঁহার কার্যকাল হইল ৫ বৎসর। তবে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে যে-কোন সময় তাঁহাকে অপসারিত করিতে পারেন। রাজ্যপালকে অন্যূন ৩৫ বৎসর বয়স্ক এবং ভারতীয় নাগরিক হইতে হয়।

কিছুদিন পূর্বেও জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজ্যপ্রধান, 'সদর-ই-রিয়াসৎ' (Sadar-I-Riyasat) বলিয়া পরিচিত ছিলেন। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সংবিধান অনুসারে তিনি ঐ রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। ভারত সরকারের সহিত চুক্তি অনুসারে যিনিই সদর-ই-রিয়াসৎ পদে নির্বাচিত হইতেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকেই জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজ্যপ্রধান হিসাবে স্বীকার করিয়া লইতেন। বর্তমানে অবশ্য সদর-ই-রিয়াসৎ-কে রাজ্যপাল আখ্যাই দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য রাজ্যপালের ন্যায় জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপালও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

রাজ্যপালের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা (Position and Powers of the Governor): কেন্দ্রের ন্যায় রাজ্যসমূহেও দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত বলিয়া রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালও নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা মাত্র। তবে রাষ্ট্রপতির কোন স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (discretionary powers) নাই, কিন্তু অন্তত দুইটি বিষয়ে রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা রহিয়াছে—যথা, (ক) রাজ্যমধ্যে কোন জনজাতি অঞ্চল (Scheduled Areas) থাকিলে তাহার শাসন ব্যাপারে এবং (খ) রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে জানান ব্যাপারে। অর্থাৎ, এই দুইটি ক্ষমতার ব্যবহারে রাজ্যপাল মন্ত্রি-পরিষদের সহিত পরামর্শ করিতেই বাধ্য নহেন—মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা ত দূরের কথা। সুতরাং রাজ্যপাল সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা নহেন। এই দিক দিয়া পদমর্যাদায় রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির ঊর্ধ্বে, কিন্তু অন্য এক দিক দিয়া নিম্নে। কারণ, রাজ্যপালের পক্ষে পদে অধিষ্ঠিত থাকা নির্ভর করে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর, কিন্তু সংবিধানভংগের অভিযোগে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ছাড়া রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায় না।

রাজ্যপালের ক্ষমতার আলোচনার প্রথমেই আসিয়া পড়ে মন্ত্রি-পরিষদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক। রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালেরও মন্ত্রি-পরিষদ সম্পর্কে কতকগুলি ক্ষমতা রহিয়াছে—যেমন, মন্ত্রিবর্গকে নিযুক্ত করা, মন্ত্রি-পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করা, ইত্যাদি। রাজ্যপাল প্রথমে মুখ্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার পরামর্শক্রমে পরে অন্যান্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন। আইনত তিনিই মন্ত্রিগণের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করিয়া দেন। মন্ত্রিবর্গ ছাড়া রাজ্যপাল রাজ্যের এ্যাডভোকেট-জেনারেল এবং রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যগণকে নিযুক্ত করেন। রাজ্যের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন। কয়েক ক্ষেত্রে দণ্ডিত অপরাধীকে ক্ষমা করিবার বা তাহার দণ্ডাদেশ লাঘব করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে।

রাজ্যপাল রাজ্যের ব্যবস্থা বিভাগের একটি অংগ। এক্ষেত্রেও তাঁহার পদের সহিত রাষ্ট্রপতির পদের মিল আছে। রাজ্যপাল রাজ্যের আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন। তিনি পরিষদ বা পরিষদদ্বয়ের অধিবেশন স্থগিত রাখিতে এবং নিম্নতর পরিষদ বা বিধানসভাকে ভাঙিয়া দিতে পারেন। তাঁহার সম্মতি ব্যতীত কোন বিলকে আইনে পরিণত করা যায় না। রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক পাস হইবার পর প্রত্যেক বিলকে তাঁহার সম্মতির জন্য বিলকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে হয়। তাঁহার সম্মতির জন্য বিলকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইলে, তাঁহাকে সম্মতি যে দিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। তিনি সম্মতি নাও দিতে পারেন, অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটিকে আইনসভায় ফেরত পাঠাইতে পারেন,* অথবা নিজে কিছু না করিয়া বিলটিকে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন।

রাজ্যপাল আইনসভার এক বা উভয় পরিষদকে আহ্বান করিয়া বক্তৃতা করিতে পারেন। আইনসভার যে-কোন পরিষদে বাণী প্রেরণ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে। আইনসভার প্রত্যেক অধিবেশনে তিনি সাধারণত উদ্বোধনী বক্তৃতা করিয়া থাকেন।

আইনসভা অধিবেশনে না থাকিলে রাজ্যপাল অর্ডিন্যান্স বা অস্থায়ী জরুরী আইন জারি করিতে পারেন। আইনসভা অধিবেশনে বসার ছয় সপ্তাহ পরে এইরূপ আইন আর কার্যকর থাকে না।

রাজ্যপালের সুপারিশ ব্যতিরেকে খরচের জন্য একটি টাকাও বিধানসভার নিকট দাবি করা যায় না। মন্ত্রী মারফত তিনিই আইনসভার নিকট 'বাৎসরিক আর্থিক বিবৃতি' বা বাজেট পেশ করান।

---

* অর্থসংক্রান্ত বিলকে অবশ্য ফেরত পাঠান যায় না।

যে-রাজ্যের আইনসভার দুইটি কক্ষ বা পরিষদ আছে, সেখানে রাজ্যপাল উচ্চতর কক্ষ বা বিধান পরিষদে চারুকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসেবা ও সমবায় আন্দোলনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে মনোনীত করেন।

পরিশেষে, রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালের জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবার ক্ষমতা নাই সত্য, কিন্তু রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে করিলে তিনি রাষ্ট্রপতিকে সংবাদ প্রেরণ করিতে পারেন এবং রাষ্ট্রপতি তখন ঐ সংবাদের ভিত্তিতে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। এ-পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষিত হইয়াছে রাজ্যপাল কর্তৃক সংবাদ প্রেরণের ফলে। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সম্পর্কে রাজ্যপালের অন্তত পরোক্ষ ক্ষমতা আছে।

মন্ত্রি-পরিষদ (Council of Ministers)

রাজ্যপালের কার্যসম্পাদনে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া মন্ত্রি-পরিষদ থাকে। কেন্দ্রের মত এখানেও মন্ত্রি-পরিষদ মুখ্য মন্ত্রীর (Chief Minister) নেতৃত্বাধীনে কার্য করে। মুখ্য মন্ত্রী হইলেন রাজ্যের বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, অথবা যেক্ষেত্রে একাধিক দল মিলিত হইয়া সরকার গঠন করে সেক্ষেত্রে সম্মিলিত দল সমর্থিত নেতা। কেন্দ্রের মত রাজ্যসমূহেও মুখ্য মন্ত্রী রাজ্যপাল ও মন্ত্রি-পরিষদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করেন। রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার পটভূমিকায় মুখ্য মন্ত্রীকে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর প্রতিচ্ছবি বলা যায়।

ভারতীয় সংবিধান রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রীর উপর বিশেষ কয়েকটি দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে। তাঁহাকে মন্ত্রি-পরিষদের আইনসংক্রান্ত ও শাসনসংক্রান্ত সকল প্রস্তাব রাজ্যপালকে জানাইতে হয়। রাজ্যপাল যে যে বিষয়ে জ্ঞাত হইতে চাহেন, সেই সেই বিষয়ে জ্ঞাত করানও মুখ্য মন্ত্রীর কর্তব্য। রাজ্যপাল আদেশ করিলে মুখ্য মন্ত্রীকে যে-বিষয় মন্ত্রি-পরিষদ কর্তৃক বিবেচিত হয় নাই, তাহা বিবেচনার জন্য মন্ত্রি-পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করিতে হয়। রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রীর এই সকল দায়িত্বের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-পরিষদের উপর রাষ্ট্রপতির যে নিয়ন্ত্রণক্ষমতা রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক নিয়ন্ত্রণক্ষমতা রহিয়াছে রাজ্যের মন্ত্রি-পরিষদের উপর রাজ্যপালের।

মন্ত্রিগণ যৌথভাবে বিধানসভার নিকট দায়িত্বশীল। তাঁহাদিগকে আইনসভার কোন একটি পরিষদের সভ্য হইতে হয়। যদি এমন কোন ব্যক্তি মন্ত্রী নিযুক্ত হন, যিনি আইনসভার সভ্য নহেন, তবে তাঁহাকে হয় ছয় মাসের মধ্যে আইনসভা বা বিধানমণ্ডলের* সভ্য হইতে হয়, না-হয় পদত্যাগ করিতে হয়। আইনত রাজ্যপাল

* রাজ্যের আইনসভাকে বর্তমানে বাংলায় বিধানমণ্ডল বলা হইতেছে।

যে-কোন মন্ত্রীকে যে-কোন সময় পদচ্যুত করিতে সমর্থ হইলেও, মন্ত্রিগণ যতদিন বিধানসভার আস্থাভাজন থাকেন ততদিন মন্ত্রীর পদেও আসীন থাকেন। তবে কেন্দ্রের ন্যায় সংবিধান ভংগ করার জন্য রাজ্যপাল মন্ত্রি-পরিষদ ও বিধানসভা ভাঙিয়া পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। আর যদি রাজ্যপাল মনে করেন যে শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে রাজ্যের শাসনকার্য চলিতেছে না, তবে তিনি রাষ্ট্রপতিকে জানাইতে পারেন। রাষ্ট্রপতি তখন ইচ্ছা করিলে 'শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা' ঘোষণা করিয়া রাজ্যের শাসনভার কেন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিতে পারেন।

ব্যবস্থা বিভাগ (Legislature)

প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া আইনসভা বা বিধানমণ্ডল আছে। এই আইনসভা রাজ্যপাল এবং একটি বা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হয়। ভারতীয় ইউনিয়নের ১৭টি অংগরাজ্যের মধ্যে ৯টিতে—যথা, অন্ধ্রপ্রদেশ বিহার মহারাষ্ট্র মাদ্রাজ উত্তরপ্রদেশ পাঞ্জাব মহীশূর পশ্চিমবংগ এবং জম্মু ও কাশ্মীরে দুইটি করিয়া এবং বাকী ৮টি রাজ্যে একটি করিয়া পরিষদের ব্যবস্থা রহিয়াছে। দুইটি পরিষদ থাকিলে উচ্চতর পরিষদকে বিধান পরিষদ (Legislative Council) এবং নিম্নতর পরিষদকে বিধানসভা (Legislative Assembly) বলা হয়। একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে তাহাকে বিধানসভাই বলা হয়।

যদি কোন রাজ্যের বিধানসভা মোট সদস্যগণের অধিকাংশের এবং উপস্থিত ভোটপ্রদানকারী সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সেই রাজ্যে বিধান পরিষদ লুপ্ত করিবার জন্য বা সেই রাজ্যে বিধান পরিষদ গঠন করিবার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে, তবে পার্লামেন্ট সেই রাজ্যে বিধান পরিষদ লোপ বা গঠনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।*

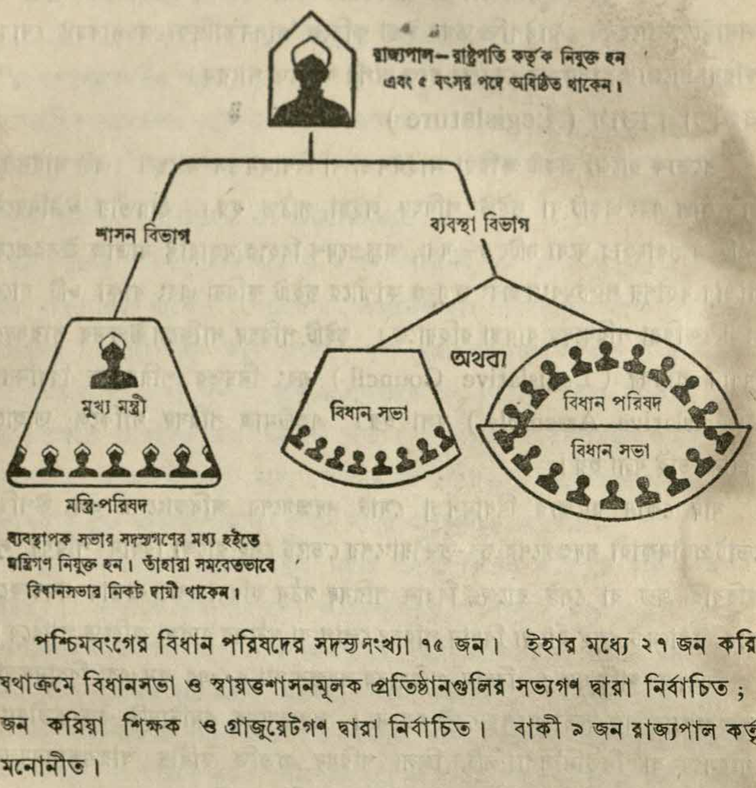
বিধান পরিষদ : বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৪০-এর কম এবং বিধানসভার সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হয় না। সদস্যগণের মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ পৌরসংঘ বা মিউনিসিপ্যালিটি, জিলা পরিষদ প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্যগণ দ্বারা, মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ বিধানসভার সদস্যগণ দ্বারা, এক-দ্বাদশাংশের কাছাকাছি গ্রাজুয়েটগণ দ্বারা এবং এক-দ্বাদশাংশের কাছাকাছি শিক্ষকগণ দ্বারা নির্বাচিত হন। বিধানসভার কোন সদস্যকে অবশ্য বিধানসভা নির্বাচিত করিতে পারে না। বাকী সদস্যগণ রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হন। রাজ্যপাল চারুকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা এবং সমবায় আন্দোলনে অভিজ্ঞ

* পশ্চিমবংগে বিধান পরিষদ লোপ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব বিধানসভায় গ্রহণ করা হইয়াছে। পাঞ্জাবেও উহা করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

ব্যক্তিদের মধ্য হইতে বিধান পরিষদের সদস্য মনোনীত করেন। বিধান পরিষদের সদস্য হইবার জন্য অন্যূন ৩০ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়।

বিধান পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন সভাপতি (Chairman) ও একজন সহ-সভাপতি (Deputy Chairman) থাকেন।

রাজ্য সরকার



পশ্চিমবংগের বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৭৫ জন। ইহার মধ্যে ২৭ জন করিয়া যথাক্রমে বিধানসভা ও স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্যগণ দ্বারা নির্বাচিত; ৬ জন করিয়া শিক্ষক ও গ্রাজুয়েটগণ দ্বারা নির্বাচিত। বাকী ৯ জন রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত।

বিধান পরিষদ চিরস্থায়ী পরিষদ—ইহাকে কখনও ভাঙিয়া দেওয়া হয় না। প্রতি দুই বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন।

বিধানসভা ঃ বিধানসভার সদস্যসংখ্যা ৬০-এর কম বা ৫০০-এর বেশী হইতে পারে না।* সদস্যবর্গ প্রধানত প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সভায় তপশীলী বর্ণ এবং কয়েকটি তপশীলী উপজাতির জন্য আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এই সংরক্ষণ-ব্যবস্থা ১৯৬০ সালের

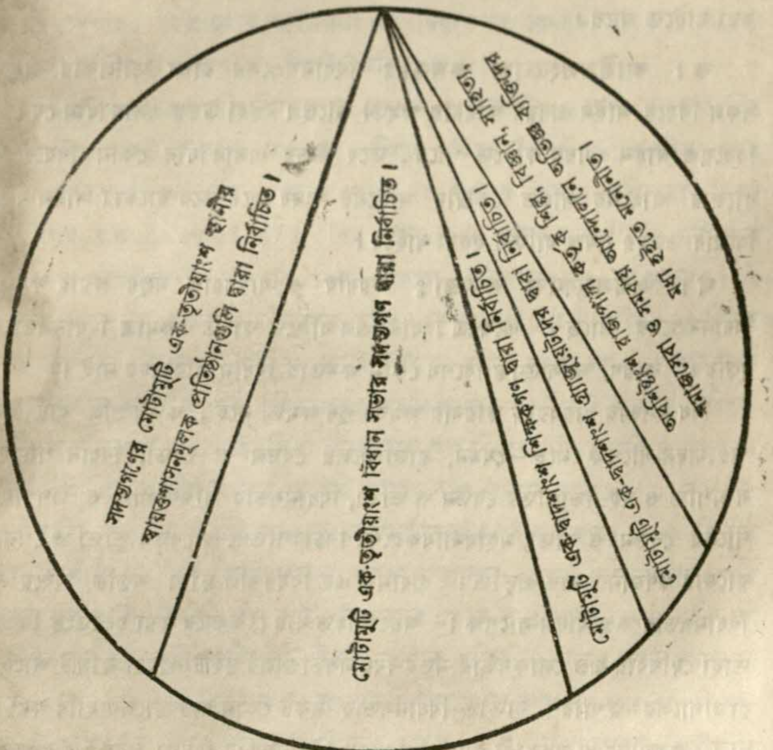
* নাগাভূমির ক্ষেত্রে অবশ্য বিধানসভার সদস্যসংখ্যা হইল ৪৬ জন।

২৬শে জানুয়ারী তুলিয়া দেওয়ার কথা ছিল ; সংবিধানের অষ্টম সংশোধন দ্বারা উহার মেয়াদ আরও দশ বৎসর বা ১৯৭০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বর্ধিত করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালকেও সংবিধান প্রবর্তনের পর ১০ বৎসর পর্যন্ত—অর্থাৎ ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাস অবধি নিম্নতর পরিষদ বা বিধানসভায় ইংগ-ভারতীয় সদস্য মনোনয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমানে উহার মেয়াদ আরও

রাজ্যের বিধান পরিষদের গঠন পদ্ধতি

বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা বিধান সভার সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী এবং ৪০-এর কম হয় না।



১০ বৎসর—অর্থাৎ ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পশ্চিম-বংগের বিধানসভায় ৪ জন মনোনীত ইংগ-ভারতীয় সদস্য আছেন। বিধানসভার সদস্য হইতে হইলে অন্যূন ২৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়।

বিধানসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন পরিষদপাল (Speaker) ও একজন উপপরিষদপাল (Deputy Speaker) থাকেন।

সভার জীবনকাল ৫ বৎসর। তবে রাজ্যপাল ইহাকে ইহার কার্যকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই ভাঙিয়া দিতে পারেন। অপরদিকে আবার জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে পার্লামেন্ট ইহার কার্যকাল ১ বৎসর পর্যন্ত বাড়াইয়া দিতে পারে।

পশ্চিমবংগের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা ২৮০ জন। ইহা ছাড়া মনোনীত ইংগ-ভারতীয় সদস্য থাকিতে পারেন।

বিধানমণ্ডলের ক্ষমতা (Powers of the State Legislature): পার্লামেন্টের ন্যায় বিধানমণ্ডলের ক্ষমতার আলোচনা আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা হইতে সুরু করা যাইতে পারে।

ক। আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা: বিধানমণ্ডলের রাজ্য তালিকার অন্তর্গত সকল বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা আছে। ইহা উভয় এলাকাধীন যে-কোন বিষয়েও আইন প্রণয়ন করিতে পারে; তবে উভয় এলাকাধীন কোন বিষয়ে যদি রাজ্যের আইনের সহিত কেন্দ্রীয় আইনের সংঘর্ষ বাধে তবে রাজ্যের আইন যতদূর বিরোধ ততদূর পর্যন্ত বাতিল হইয়া যাইবে।

খ। অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা: করধার্য ও ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করার ক্ষমতাও বিধানমণ্ডলের আছে। এক্ষেত্রে বিধানমণ্ডল বলিতে কার্যত একমাত্র বিধানসভাকেই বুঝায়। কারণ, অর্থসংক্রান্ত বিশেষ কোন ক্ষমতাই বিধান পরিষদের নাই।

বিধানসভার ব্যয়বরাদ্দ করিবার ক্ষমতা পূর্ণ ক্ষমতা নহে; কতকগুলি ব্যয় ইহার অনুমোদন-সাপেক্ষ নহে—যেমন, রাজ্যপালের বেতন ও ভাতা, বিধান পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতির বেতন ও ভাতা, বিধানসভার পরিষদপাল ও উপপরিষদ-পালের বেতন ও ভাতা, মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণের বেতন ভাতা ও পেনসন, রাজ্যের ঋণজনিত ব্যয় প্রভৃতি। প্রধানত এই বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় বিধানসভার অনুমোদন-সাপেক্ষ। অনুমোদিত ব্যয় ঠিকভাবে করা হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য লোকসভার মতই বিধানসভাগুলির দুইটি করিয়া কমিটি আছে।* রাজ্যপালের সুপারিশ ব্যতীত বিধানসভার নিকট কোন ব্যয়বরাদ্দের দাবি করা যায় না। করনীতি ও সরকারী ঋণপদ্ধতি সম্বন্ধে বিধানসভার ক্ষমতা অবশ্য পূর্ণ ক্ষমতা।

গ। শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা: মন্ত্রিগণ যৌথভাবে বিধানসভার নিকট দায়িত্বশীল। বিধানসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত করিতে পারে। ইহা ছাড়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সমালোচনা, বিতর্ক, মুলতবী প্রস্তাব

---

* ২৩ পৃষ্ঠা দেখ।

ইত্যাদি দ্বারা বিধানমণ্ডলের উভয় কক্ষই মন্ত্রি-পরিষদকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। তবে এই বিষয়ে বিধানসভা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উচ্চতর পরিষদে পরাজয় মন্ত্রি-পরিষদকে ততটা স্পর্শ করে না।

রাজ্য আইনসভায় আইন পাসের পদ্ধতি (Legislative Procedure in the State Legislature)

রাজ্যের আইনসভায় আইন পাসের পদ্ধতি মোটামুটিভাবে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে আইন পাসের পদ্ধতির অনুরূপ।* তবে কয়েকটি বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। পশ্চিমবংগের মত কোন কোন রাজ্যের আইনসভা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত আবার আসামের মত কোন কোন রাজ্যের আইনসভা একপরিষদসম্পন্ন। যে-রাজ্যের আইনসভা একপরিষদসম্পন্ন সেখানে বিল মাত্র বিধান-সভাতেই পাস হইয়া রাজ্যপালের নিকট প্রেরিত হয়।

যে-রাজ্যে আইনসভা দ্বিপরিষদসম্পন্ন সেখানে পার্লামেণ্টের ব্যবস্থার মত অর্থ বিল মাত্র বিধানসভাতেই উত্থাপন করা যায়; বিধান পরিষদে উহা উত্থাপিত হইতে পারে না। বিধানসভায় অর্থ বিল পাস হওয়ার পর উহাকে বিধান পরিষদের নিকট সুপারিশের জন্য প্রেরণ করা হয়। বিল পাইবার ১৪ দিনের মধ্যে বিধান পরিষদকে সুপারিশসহ বিলটিকে বিধানসভার নিকট ফেরত পাঠাইতে হয়। বিধানসভা ঐ সুপারিশ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। আর যদি বিধান পরিষদ ১৪ দিনের ভিতর বিলকে ফেরত না পাঠায় তাহা হইলেও ধরিয়া লওয়া হয় যে বিলটি উভয় পরিষদেই পাস পাইয়াছে এবং রাজ্যপালের সম্মতিপ্রাপ্তির পর বিলটি আইনে পরিণত হয়। অবশ্য রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য বিলকে ধরিয়া রাখিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ঐ বিলে সম্মতি দিতেও পারেন, আবার নাও দিতে পারেন।

অর্থ বিল ভিন্ন অন্যান্য বিল পাস সম্পর্কে পার্লামেণ্টের দুই পরিষদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে যেমন যুক্ত অধিবেশনের ব্যবস্থা করা যায়, রাজ্যের আইনসভার ক্ষেত্রে সেইরূপ যুক্ত অধিবেশনের ব্যবস্থা নাই। রাজ্যের ক্ষেত্রে সংবিধানের ব্যবস্থা হইল যে বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত বিলকে বিধান পরিষদ যদি তিন মাসের মধ্যে ফেরত না পাঠায়, অথবা যদি প্রত্যাখ্যান করে, অথবা যদি এরূপভাবে সংশোধন করে যে, বিধান-সভা ঐ পরিবর্তন গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক থাকে—তবে বিধানসভা দ্বিতীয়বার বিলটিকে পাস করিয়া বিধান পরিষদে প্রেরণ করিলে এক মাস পরে উহা উভয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। বিধান পরিষদ উহাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিলেও কোন ফল হইবে না।

* ২৫-২৭ পৃষ্ঠা দেখ।

রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক এইভাবে পাস হইবার পর বিলকে রাজ্যপালের নিকট সম্মতির জন্য উপস্থিত করা হয়। রাজ্যপাল বিলে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারেন, আবার নাও করিতে পারেন অথবা নিজে কিছু না করিয়া বিলটিকে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত অর্থ বিল ভিন্ন অন্য বিলকে রাজ্যপাল পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভার নিকট ফেরত পাঠাইতে পারেন। দ্বিতীয়বার ঐ বিল আইনসভা কর্তৃক গৃহীত হইলে রাজ্যপাল উহাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন। যে-বিল রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করা হয় তাহাতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। যখন আইনসভা কর্তৃক গৃহীত বিলকে রাজ্যপালের সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয় এবং রাজ্যপালের সম্মতি অথবা যেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য বিলটি প্রেরিত হয় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাইলে তখন ঐ বিল বিধিবদ্ধ আইনে (Act) পরিণত হয়।

নাগাভূমির শাসন-ব্যবস্থা (Administration of Nagaland)

ভারতের অন্যতম রাজ্য নাগাভূমির শাসন-ব্যবস্থা অন্যান্য অংগরাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা হইতে অনেকটা পৃথক। নাগাভূমি অন্যতম পূর্ণ অংগরাজ্য হইলেও ঐ রাজ্যের রাজ্যপালের হস্তে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আইন ও জনশৃংখলা রক্ষার বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত রাখা হইয়াছে। এই ব্যাপারে রাজ্যপাল মন্ত্রি-পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি (individual judgement) অনুসারে কার্য করিবেন। অর্থাৎ তাঁহাকে যে মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুসারে কার্য করিতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। মন্ত্রি-পরিষদের সহিত আলোচনা তাঁহাকে অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু আলোচনার পর তিনি মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শকে উপেক্ষাও করিতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, নাগভূমির তুয়েনসাং জিলার শাসনকার্য প্রথম ১০ বৎসরের জন্য রাজ্যপালের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হইবে। এই সময়ের মধ্যে এই জিলার অধিবাসীরা দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

নাগাভূমির জন্য একপরিষদসম্পন্ন বিধানমণ্ডল গঠন করা হইয়াছে। এই বিধানমণ্ডল বা বিধানসভা প্রথম ১০ বৎসরের জন্য ৪৬ জন এবং পরে ৬০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। এই ৪৬ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন সদস্য উক্ত ১০ বৎসরের জন্য তুয়েনসাং জিলা হইতে আঞ্চলিক পরিষদ (Regional Council) দ্বারা মনোনীত হইয়া আসিবেন ; বাকী ৪০ জন সদস্য নাগাভূমির অন্যান্য অঞ্চল হইতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন।

তুয়েনসাং জিলার উল্লিখিত আঞ্চলিক পরিষদ ঐ জিলার বিভিন্ন উপজাতির (tribes) নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইবে। এই আঞ্চলিক পরিষদ বিভিন্ন গ্রাম-পরিষদ, এলাকা-পরিষদ প্রভৃতির কার্যের তত্ত্বাবধান করিবে এবং আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ ব্যতিরেকে নাগাভূমি বিধানমণ্ডলের (Nagaland Legislature) কোন আইন তুয়েনসাং জিলায় কার্যকর হইবে না।

৫

ভারতের বিচার-ব্যবস্থা

(System of Judicial Administration)

ভারতে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। সুতরাং সকল নাগরিকের জন্য একই বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তিত। তবে বিশেষ বিশেষ ধরনের বিচারের জন্য কয়েক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ আদালত আছে। যেমন, শিল্পক্ষেত্রে বিবাদ-মীমাংসার জন্য স্বতন্ত্র শিল্প-আদালত (Industrial Courts and Tribunals) আছে। তবুও বলা যায়, ভারতের বিচার-ব্যবস্থা এক এবং অখণ্ড। নিম্নে এই বিচার-ব্যবস্থার বর্ণনা করা হইল।

প্রধান ধর্মাধিকরণ (The Supreme Court)

ভারতের বিচার-ব্যবস্থাকে একটি পিরামিডের সহিত তুলনা করা চলে। এই পিরামিডের শীর্ষে আছে সুপ্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণ। প্রধান ধর্মাধিকরণ একাধারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত এবং প্রধান আপিল আদালত। সংবিধান অনুসারে এই আদালত একজন প্রধান বিচারপতি এবং অনধিক ৭ জন সাধারণ বিচারপতি লইয়া গঠিত হইবে। সংবিধানে ইহাও বলা হইয়াছে যে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া বিচারপতির সংখ্যা বাড়াইতে পারে। শাসনতন্ত্রের এই বিধান বলে ১৯৫৬ সালে প্রণীত এক আইন দ্বারা পার্লামেণ্ট প্রধান বিচারপতি সমেত মোট বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া অনধিক ১১তে লইয়া যায়। পরে এই সংখ্যাও বিবেচিত না হওয়ায় ১৯৬০ সালে আবার একটি সংশোধনী আইন দ্বারা সাধারণ বিচারপতির (other Judges) সংখ্যা অনধিক ১৩-তে এবং ফলে মোট বিচারপতির সংখ্যা অনধিক ১৪-তে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।* ইহা ছাড়া প্রয়োজনবোধে অস্থায়ী বিচারপতিগণের (*ad hoc* judges) নিয়োগের ব্যবস্থাও আছে।

প্রধান ধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতিকে ভারতের প্রধান বিচারপতিও বলা হয়। তিনি এবং অন্যান্য বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। হাইকোর্টের বিচারপতি, অভিজ্ঞ আইন-ব্যবসায়ী ও প্রখ্যাত আইনাভিজ্ঞগণের (eminent jurists) মধ্য হইতে এই আদালতের বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করা হয়।

প্রত্যেক বিচারপতি ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইতিমধ্যে তিনি অবশ্য পদত্যাগ করিতে পারেন, অথবা প্রমাণিত অক্ষমতা বা অসদাচরণের জন্য

---

* প্রথম আইনটি Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 এবং সংশোধনী আইনটি Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960 নামে অভিহিত।

পার্লামেন্টের আবেদনক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পদচ্যুতও হইতে পারেন। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল যে, রাষ্ট্রপতি মাত্র পার্লামেন্টের আবেদনক্রমেই পদচ্যুতির আদেশ দিতে পারেন— নিজ হইতে ইহা করিতে পারেন না। অতএব, অক্ষমতা বা অসদাচরণ প্রমাণিত হইয়াছে কি না, তাহা নির্ধারণের ভার পার্লামেন্টের উপর ন্যস্ত—রাষ্ট্রপতির উপর নহে। একবার নিযুক্ত হইলে বিচারপতিগণের বেতন, ভাতা, অধিকার ইত্যাদির পরিবর্তন করা যায় না। বিচারকদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এলাকা: প্রধান ধর্মাধিকরণের চারি প্রকার এলাকা আছে—যথা, মূল এলাকা, আপিল এলাকা, পরামর্শদান এলাকা এবং নির্দেশ বা আদেশ বা লেখ জারি করিবার এলাকা।

(ক) মূল এলাকা (Original Jurisdiction): ইউনিয়ন সরকার এবং কোন রাজ্য সরকারের মধ্যে অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে আইনগত অধিকার লইয়া বিবাদ বাধিলে তাহার বিচার একমাত্র প্রধান ধর্মাধিকরণেই হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দুই সরকারের মধ্যে বিবাদ সাধারণত সংবিধানের ব্যাখ্যা লইয়াই বাধে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের উপরই সংবিধানের ব্যাখ্যার ভার থাকে। সংবিধানের ব্যাখ্যা করিয়া আদালত বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেয়। ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বলিয়া ইহা 'ভারতীয় সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও রক্ষক' (Interpreter and Guardian of the Constitution of India) বলিয়া অভিহিত। প্রধান ধর্মাধিকরণের মূল এলাকায় অবশ্য পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত সন্ধি বা চুক্তি সংক্রান্ত কোন মামলা করা যায় না।

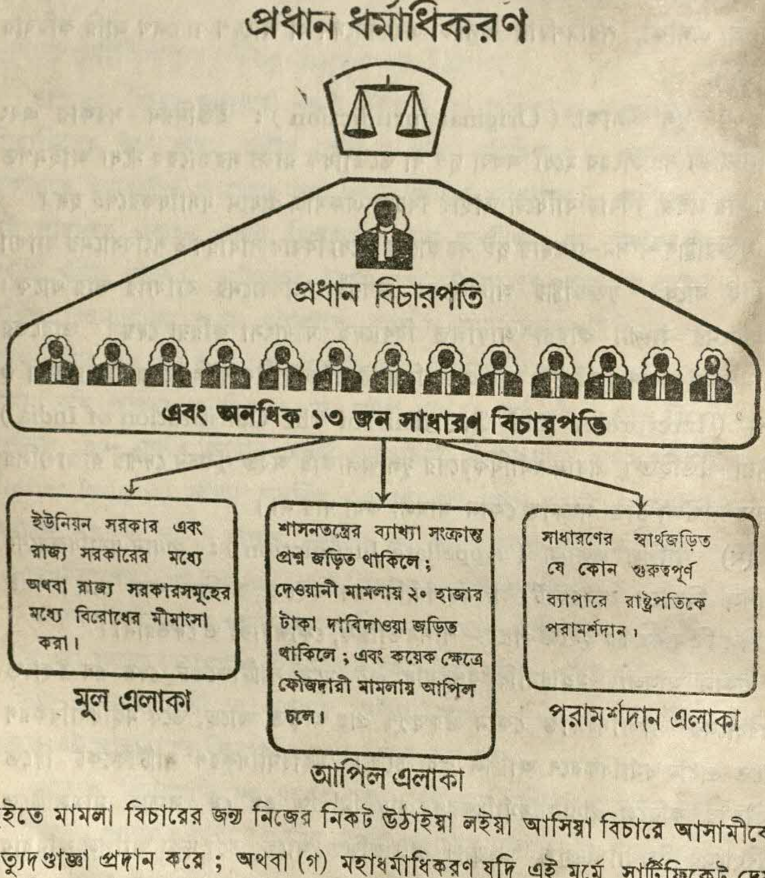
(খ) আপিল এলাকা (Appellate Jurisdiction): প্রধান ধর্মাধিকরণের আপিল বিভাগে হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণ হইতে আপিল করা চলে। এই আপিল তিন শ্রেণীর হইতে পারে—শাসনতান্ত্রিক, ফৌজদারী ও দেওয়ানী।

কোন মামলায় মহাধর্মাধিকরণ যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে ইহাতে সংবিধানের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে, তবে মহাধর্মাধিকরণ হইতে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপিল করা চলে। মহাধর্মাধিকরণ সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করিলে প্রধান ধর্মাধিকরণ যদি নিশ্চিত হয় যে সত্যই মামলাটিতে সংবিধানের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে, তবে উহা আপিল করিবার বিশেষ অনুমতি (special leave) দিতে পারে।

কোন দেওয়ানী মামলায় অন্যূন বিশ হাজার টাকার দাবিদাওয়া জড়িত আছে বলিয়া মহাধর্মাধিকরণ সার্টিফিকেট দিলে মহাধর্মাধিকরণ হইতে প্রধান ধর্মাধিকরণে

আপিল করা চলে। ইহা ব্যতীত মহাধর্মাধিকরণ যদি সার্টিফিকেট দেয় যে, মামলাটি প্রধান ধর্মাধিকরণের নিকট আপিলযোগ্য তাহা হইলে প্রধান ধর্মাধিকরণের নিকট আপিল করা চলে।

ফৌজদারী মামলাতেও কয়েক ক্ষেত্রে মহাধর্মাধিকরণ হইতে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপিল করা চলে। যথা, (ক) অধস্তন আদালত হইতে মহাধর্মাধিকরণে আপিল হইবার পর মহাধর্মাধিকরণ যদি আসামীর খালাসের আদেশ বাতিল করিয়া তাহাকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করে; অথবা (খ) মহাধর্মাধিকরণ যদি অধস্তন কোন আদালত



হইতে মামলা বিচারের জন্য নিজের নিকট উঠাইয়া লইয়া আসিয়া বিচারে আসামীকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করে; অথবা (গ) মহাধর্মাধিকরণ যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে এই মামলার আপিল-বিচার প্রধান ধর্মাধিকরণে হওয়া উচিত।

পার্লামেণ্ট আইন পাস করিয়া প্রধান ধর্মাধিকরণের আপিল এলাকা বাড়াইয়া দিতে পারে।

(গ) পরামর্শদান এলাকা (Advisory Jurisdiction): রাষ্ট্রপতি আইন বা ঘটনা সংক্রান্ত যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রধান ধর্মাধিকরণের অভিমত জানিতে পারেন। পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত ভারত সরকারের চুক্তি বা সন্ধি সংক্রান্ত কোন মামলা প্রধান ধর্মাধিকরণের মূল বিভাগে আনয়ন করা না গেলেও পরামর্শদান বিভাগে আনয়ন করা চলে। অর্থাৎ, এই সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধান ধর্মাধিকরণের মতামত জানিতে পারেন; কিন্তু এই সকল বিষয় লইয়া প্রধান ধর্মাধিকরণে মামলা রুজু করা যায় না।

(ঘ) নির্দেশ বা আদেশ বা লেখ জারি করিবার এলাকা (Jurisdiction to Issue Directions or Orders or Writs): মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) রক্ষা করার ভারও প্রধান ধর্মাধিকরণের উপর অর্পিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ইহা নির্দেশ বা আদেশ বা লেখ (writs) জারি করিতে পারে।

উপরি-উক্ত চারিটি এলাকা ছাড়া সকল বিচারালয়ের রায়ের সংশোধন করার ক্ষমতাও প্রধান ধর্মাধিকরণের আছে। কিন্তু কোন সামরিক আদালতের রায় সংশোধন করিবার ক্ষমতা ইহার নাই।

প্রধান ধর্মাধিকরণ যাহাতে নিরপেক্ষতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে তাহার জন্য ইহাকে ইহার কর্মচারী নিযুক্ত করিবার এবং তাহাদের চাকরিসংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই আবার ইহার ব্যয় লোকসভার ভোট-নিরপেক্ষ করা হইয়াছে।

মহাধর্মাধিকরণসমূহ (High Courts)

প্রজাতান্ত্রিক ভারতের সংবিধান অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যেই একটি করিয়া হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণ থাকিবে। তবে পার্লামেন্ট আইন দ্বারা একাধিক রাজ্য অথবা একাধিক রাজ্যের জন্য একই মহাধর্মাধিকরণের ব্যবস্থা করিতে পারে। যেমন, নাগাভূমি ও আসামের জন্য একটিমাত্র এবং পাঞ্জাব ও হরিয়ানার জন্যও একটিমাত্র মহাধর্মাধিকরণ রহিয়াছে। বর্তমানে ভারতের ১৭টি অংগরাজ্যের জন্য মোট ১৫টি মহাধর্মাধিকরণ আছে। আবার কোন কোন রাজ্যের মহাধর্মাধিকরণগুলির এলাকা পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও সম্প্রসারিত। যেমন, মাদ্রাজ হাইকোর্টের এলাকা মাদ্রাজ রাজ্য ও ইউনিয়ন অঞ্চল পণ্ডিচেরি এবং পাঞ্জাব হাইকোর্টের এলাকা পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্য এবং ইউনিয়ন অঞ্চল দিল্লী ও চণ্ডীগড় লইয়া। কলিকাতা হাইকোর্টের এলাকা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সম্প্রসারিত।

সকল মহাধর্মাধিকরণে বিচারপতির সংখ্যা এক নহে। কোন্ মহাধর্মাধিকরণে কত জন বিচারপতি থাকিবেন তাহা রাষ্ট্রপতি স্থির করেন। প্রধান বিচারপতি ও

সাধারণ বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধান বিচারপতি ও রাজ্যপালের সহিত পরামর্শ করিয়াই মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণকে নিয়োগ করেন। সাধারণ বিচারপতিগণকে নিয়োগ করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে ঐ মহাধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতির সহিতও পরামর্শ করিতে হয়। বিচারপতিগণ ৬২ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তবে এই সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগকে অকর্মণ্যতা অথবা অসদাচরণের জন্য প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণের মত অপসারিত করা চলে।

অন্তত ১০ বৎসর ভারতের বিচার বিভাগের কোন পদে অধিষ্ঠিত আছেন অথবা অন্তত ১০ বৎসর ধরিয়া কোন মহাধর্মাধিকরণে এ্যাডভোকেট হিসাবে কার্য করিতেছেন—এরূপ যে-কোন ভারতীয় নাগরিককেই মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতি-পদে নিযুক্ত করা যায়।

রাজ্যের মধ্যে মহাধর্মাধিকরণই উর্ধ্বতন আপিল আদালত। অধস্তন আদালতগুলি হইতে মহাধর্মাধিকরণে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় প্রকার মামলারই আপিল করা চলে। কয়েকটি রাজ্যে মহাধর্মাধিকরণের মূল এলাকাও আছে। এই মূল এলাকায় বড় বড় দেওয়ানী মামলার বিচার হয়। গুরুতর ফৌজদারী মামলায় আসামী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দায়রা সোপরদ্দ হইলে মহাধর্মাধিকরণে এই দায়রা বিচার হয়।

উপরি-উক্ত ক্ষমতা ছাড়াও মহাধর্মাধিকরণের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা আছে। মহাধর্মাধিকরণ রাজ্যের সকল অধস্তন আদালতের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। অধস্তন কোন আদালতের কোন মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িত থাকিলে, তাহা উঠাইয়া মহাধর্মাধিকরণ তাহার বিচার করিতে পারে।

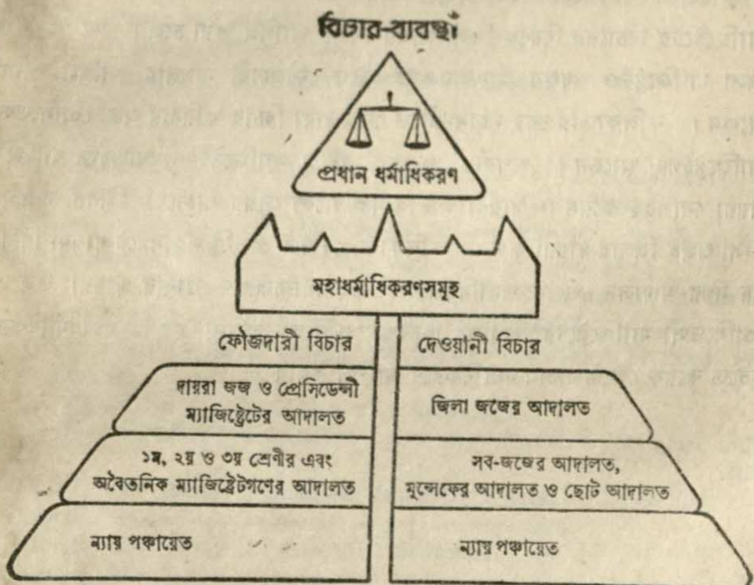
মহাধর্মাধিকরণের উপরও মৌলিক অধিকার রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে মহাধর্মাধিকরণ শাসন বিভাগের উপর নির্দেশ বা আদেশ বা লেখ জারি করিতে পারে।

প্রধান ধর্মাধিকরণের মত মহাধর্মাধিকরণের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ও কর্মচারী নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা আছে। মহাধর্মাধিকরণ সংক্রান্ত সকল ব্যয়ও রাজ্যের বিধানসভার ভোট-নিরপেক্ষ করা হইয়াছে।

অধস্তন আদালতসমূহ (Subordinate Courts)

মহাধর্মাধিকরণের পর ভারতের বিচার-ব্যবস্থাকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী—এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া অধস্তন আদালত হইতে আলোচনা সুরু করিলে বিচার-ব্যবস্থা সহজবোধ্য হয়।

দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থা : পূর্বে দেওয়ানী বিচারের অধস্তন আদালত ছিল ইউনিয়ন কোর্ট। বর্তমানে ইউনিয়ন বোর্ডের স্থলে পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় এই কোর্টের স্থানাধিকার করিতেছে 'ন্যায়-পঞ্চায়েত' বা পঞ্চায়েত আদালত। প্রত্যেক গ্রাম বা কয়েকটি গ্রামের জন্য এইরূপ একটি আদালত থাকে। এই আদালতের কার্য হইল ছোট ছোট মামলার মীমাংসা করা। সাধারণত এইরূপ আদালতের রায়কে চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে আপিল করিবার ব্যবস্থাও আছে। গ্রামীণ আদালতের সুবিধা হইল যে গ্রামবাসীদের ছোটখাট বিবাদবিসংবাদের মীমাংসার জন্য নিজেদের কাজকর্ম বন্ধ করিয়া অন্যত্র যাইতে হয় না।



বড় বড় সহরে এইরূপ ছোট ছোট মামলার বিচার করিবার জন্য ছোট আদালত আছে। মফস্বল অঞ্চলে যে-সকল মামলা ন্যায়-পঞ্চায়েতের এলাকায় পড়ে না, তাহাদের বিচার হয় মুন্সেফের আদালতে। মহকুমা ও জিলা সহরে এবং কয়েক ক্ষেত্রে অন্যান্য সহরেও মুন্সেফের আদালত থাকে। মুন্সেফের বিচারের বিরুদ্ধে সব-জজের আদালতে আপিল করা চলে। মামলার দাবিদাওয়া বেশী হইলে মামলা রুজু করিতে হয় সব-জজের আদালতে। সব-জজের এবং কয়েক ক্ষেত্রে মুন্সেফের বিচারের বিরুদ্ধে জিলা জজের আদালতে আপিল করা চলে। জিলা জজের এবং কয়েক ক্ষেত্রে সব-জজের বিচারের বিরুদ্ধে মহাধর্মাধিকরণে আপিল করা চলে।

জিলা জজ জিলার দেওয়ানী আদালতসমূহের তত্ত্বাবধান করেন। কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি মহানগরে মাঝারি ধরনের দেওয়ানী মামলার বিচার হয় নগর-আদালতে (City Courts)।

ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থা ঃ দেওয়ানী বিচারের মতই গ্রামাঞ্চলে ছোটখাট ফৌজদারী মামলার বিচার হইত ইউনিয়ন বেঞ্চে।* বর্তমানে দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে ন্যায়-পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত আদালতের হস্তে এই ভার অর্পণ করা হইয়াছে। সহরাঞ্চলে এই ধরনের মামলার বিচার করেন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটগণ। অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধের বিচার হয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। বেতনভোগী ও অবৈতনিক উভয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটগণই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—এই তিন শ্রেণীর হন। ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারের বিরুদ্ধে জিলা জজের নিকট আপিল করা চলে। অনেক সময় জিলা ম্যাজিস্ট্রেটও অধস্তন আদালতসমূহ হইতে ফৌজদারী মামলার আপিল শুনিয়া থাকেন। কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে ফৌজদারী বিচার করিবার জন্য প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটগণ আছেন। অপরাধ গুরুতর হইলে ম্যাজিস্ট্রেটগণ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দায়রা সোপরদ্দ করেন। দায়রা জজ অনেক রাজ্যে জুরির সাহায্যে বিচার করেন। জিলা জজই জিলার দায়রা জজ। কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি মহানগরে দায়রা বিচার হয় নগর-আদালত ও মহাধর্মাধিকরণে। মহাধর্মাধিকরণে আবার দায়রা জজ ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানী হয়। মহাধর্মাধিকরণ হইতে কয়েক ক্ষেত্রে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপিল করা চলে।

* ইউনিয়ন বোর্ডের দেওয়ানী বিচারের শাখাকে বলা হইত 'ইউনিয়ন কোর্ট' এবং ফৌজদারী বিচারের শাখাকে বলা হইত 'ইউনিয়ন বেঞ্চ'।

উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার (বাণিজ্য-ধারা) প্রশ্নাবলী

(HIGHER SECONDARY [COMMERCE STREAM] QUESTIONS)

নূতন সিলেবাসের বিষয় অনুসারে সাজান

ক। অর্থবিদ্যা

১। মৌলিক ধারণা (Fundamental Concepts)

1. Explain the meaning of the following and their relations with each other:
   (a) Production and Consumption.
   (b) Value and Price. (1960)

[নিম্নলিখিত ধারণাগুলির অর্থ ও উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর :
(ক) উৎপাদন ও ভোগ।
(খ) মূল্য ও দাম।]

2. Define 'Wealth'. Are the following wealth ?—(a) B. A. diploma, (b) the skill of a surgeon. Give reasons for your answer. (Comp. 1961)

[সম্পদের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। নিম্নলিখিতগুলি কি সম্পদ বলিয়া গণ্য ? (ক)—বি. এ. পরীক্ষা পাসের ডিপ্লোমা, (খ) অস্ত্র-চিকিৎসকের দক্ষতা ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।]

3. Define Wealth. What are the characteristics of wealth ? Is the sand in the desert wealth ? Give reasons for your answer. (1968)

[সম্পদের সংজ্ঞা নির্দেশ কর ? সম্পদের বৈশিষ্ট্য কি কি ? মরুভূমির বালুকা কি সম্পদ ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।]

4. Explain the meaning of each of the following:
   (i) (a) Free goods and Economic goods, (b) Market, (c) Marginal utility. (1964)
   (ii) (a) Wealth, (b) Capital, (c) Increasing Returns. (Comp. 1964)
   (iii) (a) Utility, (b) Value, (c) Barter. (Comp. 1965)
   (iv) (a) Wealth, (b) Demand, (c) Production. (1966)
   (v) (a) Wealth, (b) Demand, (e) Consumption. (Comp. 1967)

[নিম্নলিখিত প্রত্যেকটি ধারণার অর্থ ব্যাখ্যা কর :
১। (ক) অবাধলভ্য পণ্য এবং অর্থনৈতিক পণ্য, (খ) বাজার, (গ) প্রান্তিক উপযোগ।
২। (ক) সম্পদ, (খ) মূলধন, (গ) ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন।
৩। (ক) উপযোগ, (খ) মূল্য, (গ) সরাসরি দ্রব্য-বিনিময়।
৪। (ক) সম্পদ, (খ) চাহিদা, (গ) উৎপাদন।
৫। (ক) সম্পদ, (খ) চাহিদা, (গ) ভোগ।]

5. Distinguish between the terms :
   (a) Capital and Money, (b) Price and Value, (c) National Income and *Per Capita* Income. (1966)

[নিম্নলিখিত ধারণাগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর :
(ক) মূলধন ও টাকাকড়ি, (খ) দাম ও মূল্য, (গ) জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়।]

২। ভোগ ও চাহিদা (Consumption and Demand)

1. State and explain the Law of Diminishing Utility. Name at least two cases of exceptions to the Law. (1965, Comp. 1960)

[ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। বিধিটির অন্তত দুইটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ কর।]

2. What do you understand by the Law of Diminishing Utility ? Illustrate your answer. (1963)

[ক্রমহ্রাসমান উপযোগবিধি বলিতে কি বুঝ ? উদাহরণসহ উত্তর দাও।]

3. Distinguish between total utility and marginal utility with the help of an example. Explain how they are related to price. (1962)

[উদাহরণের সাহায্যে মোট ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। উহারা কিভাবে দামের সংগে সম্পর্কিত তাহা দেখাও।]

4. Explain Elasticity of Demand. (Comp. 1964)

[চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ব্যাখ্যা কর।]

5. What do you understand by Elasticity of Demand ? Describe the factors which determine the elasticity of demand for a commodity. (1966)

[চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিতে কি বুঝ ? যে যে বিষয় দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণ করিয়া থাকে তাহাদের বর্ণনা কর।]

6. What do you mean by 'Elasticity of Demand' ? Is the demand for the following commodities elastic or not ? Give reasons for your answer.

(*a*) Salt, (*b*) Radio, (*c*) Tea. (1961)

[চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিতে কি বুঝ ? নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির চাহিদা স্থিতিস্থাপক না অস্থিতিস্থাপক ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।]

(ক) লবণ, (খ) রেডিও, (গ) চা।

7. State and explain the Law of Demand. (Comp. 1961)

[চাহিদার সূত্র বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।]

৩। উৎপাদন ও উৎপাদনের উপাদান (Production and Factors of Production)

1. State and explain the Law of *Diminishing Returns*. Is it applicable to manufacturing industries ? (1961)

[ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। ইহা কি যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে কার্যকর ?]

2. Explain the Law of Diminishing Returns with its limitations. Illustrate your answer. (Comp. 1966)

[সীমাবদ্ধতাসহ ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ব্যাখ্যা কর। উত্তরের সপক্ষে উদাহরণ দাও।]

3. State and explain the Law of Increasing Returns in production. (1962)

[ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।]

4. Explain the characteristics of land as a factor of production. (Comp. 1962)

[উৎপাদনের উপাদান হিসাবে জমির বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর।]

5. Enumerate the factors of production and explain briefly the function of each. (Comp. 1965)

[উৎপাদনের উপাদান সংখ্যায় কয়টি তাহা দেখাইয়া সংক্ষেপে প্রত্যেকটির কার্য ব্যাখ্যা কর।]

6. What are the different factors of production ? Give a clear definition of each of them. (Comp. 1967)

[উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান কি কি ? তাহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান কর।]

৪। ক্ষুদ্র ও বৃহদায়তন শিল্প (Small-scale and Large-scale Industries)

1. What is meant by internal and external economies of large-scale production? Illustrate your answer by giving two concrete examples of each. (1960)

[বৃহদায়তন উৎপাদনের আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপ বলিতে কি বুঝায়? প্রত্যেকের অন্তত দুইটি করিয়া উদাহরণসহ প্রশ্নের উত্তর দাও।]

2. Explain large-scale production and point out its advantages. (Comp. 1963)

[বৃহদায়তনে উৎপাদন বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর এবং ইহার সুবিধাগুলি নির্দেশ কর।]

3. Describe the advantages and disadvantages of large-scale production. (1968)

[বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধা-অসুবিধাগুলি বর্ণনা কর।]

4. What do you mean by Large-scale Production? What are its advantages? (1964)

[বৃহদায়তনে উৎপাদন বলিতে কি বুঝ? ইহার সুবিধা কি কি?]

5. What do you mean by Division of Labour? Enumerate the advantages of Division of Labour. (Comp. 1963)

[শ্রমবিভাগ বলিতে কি বুঝ? শ্রমবিভাগের সুবিধাগুলির উল্লেখ কর।]

6. What are the causes of localisation of industries? What are its advantages and disadvantages? (Comp. 1960, '64)

[শিল্পের একদেশতার কারণ কি কি? ইহার সুবিধা-অসুবিধাগুলি কি কি?]

7. What do you mean by efficiency of labour? What are the conditions on which the efficiency of labour depends? (1963, Comp. 1960)

[শ্রমিকের দক্ষতা বলিতে কি বুঝ? শ্রমিকের দক্ষতা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে?]

8. Point out the advantages of Large-scale Production. Why do small industries still survive? (1966)

[বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধাগুলি নির্দেশ কর। ক্ষুদ্র শিল্পগুলি এখনও বাঁচিয়া আছে কি করিয়া?]

৫। বাজার ও দাম-নির্ধারণ (Market and Price-Determination)

1. What is a Market? Point out the conditions determining the size of a Market. (1967)

[বাজার কাহাকে বলে? কোন্ কোন্ বিষয় বাজারের আয়তন নির্ধারণ করিয়া থাকে?]

2. Define a Market. What are the conditions of a wide market? (Comp. 1962)

[বাজারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। ব্যাপক বাজারের সর্তাবলী কি কি?]

3. What is meant by a perfectly competitive market? Explain how the value of a commodity is determined in such a market. (1960)

[পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলিতে কি বুঝায়? এইরূপ বাজারে দ্রব্যের দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর।]

. What is the distinction between market value and normal value in economic theory? Explain how normal value of a thing is determined in a competitive market. (1962)

[অর্থনৈতিক তত্ত্বে বাজার-দাম ও স্বাভাবিক দামের মধ্যে পার্থক্য কি? প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন জিনিসের স্বাভাবিক দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর।]

5. Write short notes on Market Price and Normal Price. (1963)

[বাজার-দাম ও স্বাভাবিক দামের উপর টীকা রচনা কর।]

৬। টাকাকড়ি, ঋণ ও ব্যাংক-ব্যবস্থা (Money, Credit and Banking)

1. Define 'Money'. What are its functions ? (Comp. 1961)
[টাকাকড়ির সংজ্ঞা নির্দেশ কর। টাকাকড়ির কার্যাবলী কি কি ?]

2. State the functions of Money. (Comp. 1963, '67)
[টাকাকড়ির কার্যাবলীর বিবরণ দাও।]

3. Explain with reference to an example, the meaning of barter. Describe the disadvantages of barter. (1968)
[সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় বলিতে কি বুঝায় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। এইরূপ বিনিময়ের অসুবিধাগুলি বর্ণনা কর।]

4. Summarise the functions of Money. What are the different kinds of money in India today ? (1964)
[টাকাকড়ির কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ভারতে বর্তমানে যে বিভিন্ন প্রকারের টাকাকড়ি আছে তাহাদের বিবরণ দাও।]

5. Explain the Quantity Theory of Money. (1965, Comp. 1960)
[টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।]

6. What is Paper Money ? What are the advantages and disadvantages of paper money ? (Comp. 1962)
[কাগজী মুদ্রা কাহাকে বলে ? এই মুদ্রার সুবিধা-অসুবিধা কি কি ?]

7. Describe the functions of Banks. (1967, Comp. 1966)
[ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা কর।]

8. State and explain the functions of Central Bank in a modern banking organisation. (Comp. 1960)
[আধুনিক যুগের ব্যাংক-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।]

9. Explain the functions of Central Banks. (Comp. 1963)
[কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর।]

10. State the functions of Commercial Banks in India. (1960)
[ভারতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির কার্যাবলী বিবৃত কর।]

11. Point out the functions of Commercial Banks. (Comp. 1964)
[বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী কি কি দেখাও।]

12. What is Inflation and what are its evils ? (1961)
[মুদ্রাস্ফীতি কাহাকে বলে এবং ইহার কুফল কি কি ?]

13. What do you understand by Inflation ? Point out its economic effects on (*a*) persons with fixed incomes, and (*b*) business men.
[মুদ্রাস্ফীতি বলিতে কি বুঝ ? (ক) ধরাবাঁধা আয়ের লোক, এবং (খ) ব্যবসায়ীদের উপর মুদ্রাস্ফীতির অর্থনৈতিক ফলাফল বর্ণনা কর।]

14. Explain the term 'Credit'. Mention some important credit instruments and discuss their utilities ? (1961)
['ঋণ' শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা কর। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঋণপত্রের উল্লেখ কর এবং ঋণপত্রসমূহের উপযোগিতার পর্যালোচনা কর।]

৭। বণ্টন (Distribution)

1. Explain the nature of 'economic rent'. Does rent enter into the price of a commodity ? (1961)

['অর্থনৈতিক খাজনা'র প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। খাজনা কি দ্রব্যের দামের অন্তর্ভুক্ত হয় ?]

2. Explain how the rent of land is determined. (1967)

[কিভাবে জমির খাজনা নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর।]

3. Define Wages. Distinguish between Money Wages and Real Wages. What factors determine real wages ? (Comp. 1966)

[মজুরির সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। কোন্ কোন্ বিষয় প্রকৃত মজুরি নির্ধারণ করিয়া থাকে ?]

4. What are the factors that determine Wages ? (1965)

[কেনে কোন্ বিষয় মজুরির হার নির্ধারণ করিয়া থাকে ?]

5. Distinguish between Gross and Net Interest. Account for the differences in the rate of interest in a country. (1962)

[মোট ও নীট সুদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। কোন দেশের সুদের হারে পার্থক্যের বিবরণ দাও।]

6. Distinguish between Gross Interest and Net Interest. (1964)

[মোট সুদ ও নীট সুদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।]

7. What are the factors that determine Interest ? (1966, Comp. 1965)

[কোন্ কোন্ বিষয় সুদের হার নির্ধারণ করিয়া থাকে ?]

8. Define Interest. How is Interest determined ? (Comp. 1967)

[সুদের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয় ?]

9. Discuss the reasons for the differences in the rates of interest on different types of loans. (1968)

[বিভিন্ন প্রকার ঋণের উপর সুদের হারের পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা কর।]

৮। জাতীয় আয় (National Income)

1. Explain clearly what is meant by National Income. (Comp. 1963)

[জাতীয় আয় বলিতে কি বুঝায় সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা কর।]

খ। পৌরবিজ্ঞান

১। বিষয়বস্তু ও আলোচনাক্ষেত্র (Subject Matter and Scope)

1. Describe the scope and value of studying Civics. (Comp. 1961)
[পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র বর্ণনা করিয়া পৌরবিজ্ঞানের পর্যালোচনার সার্থকতা ব্যাখ্যা কর।
2. Define Civics and point out its scope. (1964)
[পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রদান করিয়া উহার আলোচনাক্ষেত্র কি তাহা দেখাও।]
3. Explain fully the meaning and scope of Civics. (1966)
[পৌরবিজ্ঞানের অর্থ ও আলোচনাক্ষেত্র বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর।]

২। রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ (State and Other Associations)

1. Define the term 'State' and distinguish it from other associations. (1962)
['রাষ্ট্রে'র সংজ্ঞা প্রদান কর এবং অন্যান্য সংঘ হইতে রাষ্ট্রের পার্থক্য নির্দেশ কর।]
2. Define Society and State and distinguish between the two. (1967)
[সমাজ ও রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া উহাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তাহা দেখাও।]

৩। রাষ্ট্রের কার্যাবলী (Functions of the State)

1. State the functions of a modern State. Would you regard India as a modern State according to this concept? (1960)
[আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী বর্ণনা কর। এই কার্যাবলীর ধারণার ভিত্তিতে ভারতকে তুমি কি অন্যতম আধুনিক রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করিবে?]
2. Explain what you understand by the term 'modern State'. What are its functions? (Comp. 1962)
['আধুনিক রাষ্ট্র' বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর। এইরূপ রাষ্ট্রের কার্যাবলী কি কি?]
3. Summarise the functions of the Modern State. (1965)
[আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।]
4. Write a note on the functions of the modern State. (1967)
[আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলীর উপর একটি টীকা রচনা কর।]
5. Describe briefly the functions of the modern State. (1963)
[আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

৪। নাগরিকতা (Citizenship)

1. Define Citizenship. Distinguish between a *citizen* and an *alien.* (1968)
[নাগরিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। নাগরিক ও বিদেশীয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।]
2. Distinguish between *citizens* and *aliens.* How can citizenship be acquired and how is it lost? (1960)
[নাগরিক ও বিদেশীয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। কিভাবে নাগরিকতা অর্জিত হয় এবং উহা বিলুপ্তই বা হয় কিভাবে?]
3. Distinguish between *citizens* and *aliens.* How can citizenship be acquired? (1962)
[নাগরিক ও বিদেশীয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। কিভাবে নাগরিকতা অর্জন করা যাইতে পারে?]
4. How is citizenship (*a*) acquired, and (*b*) how does it terminate?
[কিভাবে নাগরিকতা (ক) অর্জিত হয়, এবং (খ) কিভাবে ইহার অবসান ঘটিতে পারে?]

৫। অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Duties)

1. Explain briefly the rights and duties of a citizen. (1963)

[নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।]

2. Define the term citizen and explain the rights and duties of a citizen. (Comp. 1967)

[নাগরিকের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যসমূহের ব্যাখ্যা কর।]

3. What is meant by adult suffrage? How do you justify it? Should there be any limitation to adult suffrage? (1960)

[প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বলিতে কি বুঝায়? তুমি কি ইহা সমর্থন কর? প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের কি কোন সীমা থাকা উচিত?]

4. Explain Adult Franchise and state the arguments in favour of the system. (1966, Comp. 1963, '67)

[প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর এবং উহার সপক্ষে যুক্তিগুলির উল্লেখ কর।]

5. What is meant by adult suffrage? Explain the arguments for and against it. (1966)

[প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বলিতে কি বুঝায়? ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলির ব্যাখ্যা কর।]

৬। আইন ও স্বাধীনতা (Law and Liberty)

1. 'Law is a condition of Liberty'.—Explain. (Comp. 1960)

['আইন স্বাধীনতার অন্যতম সর্ত'। —ব্যাখ্যা কর।]

2. Explain what you mean by liberty of a citizen. How is it related to Law? (1962)

[নাগরিকের স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝ? আইনের সংগে ইহা কিভাবে সম্পর্কিত?]

3. Define Law and point out its usefulness. (Comp. 1964)

[আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং আইনের উপযোগিতা কি তাহা দেখাও।]

4. Explain the meanings of 'law' and 'right'. Indicate their relationship. (1968)

['আইন' ও 'অধিকার' শব্দ দুইটির অর্থ ব্যাখ্যা কর এবং উহাদের মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা দেখাও।]

৭। সরকারের বিভিন্ন রূপ (Forms of Government)

1. Distinguish between Democracy and Dictatorship. Which do you prefer and why? (1961)

[গণতন্ত্র ও নায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। ইহাদের মধ্যে তুমি কোন্‌টিকে পছন্দ কর এবং কেন কর?]

2. What are the conditions essential for the success of a Democracy? Do they exist in India? (Comp. 1960, '62)

[গণতন্ত্রের সাফল্যের অপরিহার্য সর্ত কি কি? ভারতে কি উহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়?]

3. Discuss the merits and demerits of democracy as a form of Government. (1962)

[সরকারের অন্যতম রূপ হিসাবে গণতন্ত্রের গুণাগুণের পর্যালোচনা কর।]

4. State and explain the merits of Democracy. (Comp. 1963)

[গণতন্ত্রের গুণগুলির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা কর।]

5. Explain the meaning of Democracy and point out its advantages. (1964)
[গণতন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া উহার সুবিধাগুলি বিবৃত কর ।]

6. Define Democracy and summarise briefly the arguments in favour of democracy. (1966)

[গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং উহার সপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তাহাদের সংক্ষিপ্তসার প্রদান কর ।]

7. Define Democracy and point out its defects. (Comp. 1967)
[গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং উহার ত্রুটিগুলির উল্লেখ কর ।]

8. Define Democracy. What are the factors upon which the success of Democracy depends ? (1968)

[গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। গণতন্ত্রের সফলতা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?]

9. What do you mean by Dictatorship ? Point out its advantages and disadvantages. (Comp. 1966)

[নায়কতন্ত্র বলিতে কি বুঝ ? ইহার গুণাগুণের উল্লেখ কর ।]

10. What do you mean by Dictatorship ? Summarise the disadvantages of dictatorship. (1967)

নায়কতন্ত্র বলিতে কি বুঝ ? ইহার ত্রুটিগুলির সংক্ষিপ্তসার প্রদান কর।]

৮। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ও সরকারের বিভিন্ন অংশ (Theory of Separation of Powers and Organs of Government)

1. Describe the advantages of separation of powers between the different organs of a Government. What are its limits ? (1961)

[সরকারের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সুবিধাগুলি বর্ণনা কর। এই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ কতদূর সম্ভব ?]

2. Explain briefly the theory of Separation of Powers. (Comp. 1965)
[সংক্ষেপে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ মতবাদটি ব্যাখ্যা কর ।]

3. What are the functions of the legislature in a Cabinet type of Government ? (1962)

[মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকারে আইনসভার কার্যাবলী কি কি ?]

4. What are the advantages and disadvantages of a bi-cameral form of legislature ? (1960)

[দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভার সুবিধা-অসুবিধা কি কি ?]

৯। নির্বাচকমণ্ডলী ও সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব (Electorate and Minority Representation)

1. What do you understand by Minority Representation ? Why is it advocated ? (1965)

[সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব বলিতে কি বুঝায় ? ইহার সমর্থন করা হয় কেন ?]

গ। ভারতের শাসন-ব্যবস্থা

১। কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগ (Union Executive and Union Legislature)

1. Describe the position and powers of the President in the Indian Constitution. (Comp. 1961)

[ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতা বর্ণনা কর।]

2. What are the powers given to the President under the Indian Constitution ? (1968)

[ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে কি কি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে ?]

3. Write a short note on the Union Executive in India. (1963, Comp. 1966)

[ভারতে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর।]

4. Write a short note on the functions and organisation of the Union Executive under the Constitution of India. (Comp. 1966)

[ভারতীয় সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের কার্যাবলী ও গঠনের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর।]

5. Describe briefly the composition of the Legislature of the Indian Union. (Comp. 1965, '67)

[ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভার গঠন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

6. Describe the relations between the Union Executive and the Union Legislature in the present Constitution of India. (1961)

[ভারতের বর্তমান সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা কর।]

২। রাজ্যের শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগ (State Executive and State Legislature)

1. Describe the relations between the Governor and the Council of Ministers in a State under the present Indian Constitution. How is the Council of Ministers formed ? (Comp. 1961)

[ভারতের বর্তমান সংবিধান অনুসারে রাজ্যপাল ও রাজ্যের মন্ত্রি-পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা কর। মন্ত্রি-পরিষদ কিভাবে গঠিত হয় ?]

৩। বিচার-ব্যবস্থা (Judicial System)

1. Give a brief description of the Judiciary in India. (Comp. 1967)

[ভারতে বিচার-ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।]

2. State the composition and functions of the Supreme Court in India. (1962, '63)

[ভারতে প্রধান ধর্মাধিকরণের গঠন ও কার্যাবলী বিবৃত কর।]

অধ্যক্ষ অরুণকুমার সেন প্রণীত

১। অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞান পরিচয় ৬'০০
[সাহিত্য-কলা ধারার জন্য]

২। অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞান ৬'৫০
[বাণিজ্য-ধারার জন্য]

৩। স্কুল ফাইন্যাল অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞান ৪'০০

অধ্যক্ষ অরুণকুমার সেন, অধ্যাপক সুশীলকুমার সেন ও ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত

১। অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞান পরিচয় ৭'৫০
[সাহিত্য-কলা ধারার জন্য
—অতিরিক্ত পাঠ্য ও বৃহত্তর সংস্করণ]

২। অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞান ৭'০০
[বাণিজ্য-ধারার জন্য
—অতিরিক্ত পাঠ্য ও বৃহত্তর সংস্করণ]

৩। স্কুল ফাইন্যাল অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞান ৬'০০
[অতিরিক্ত পাঠ্য ও বৃহত্তর সংস্করণ]

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ ॥ কুইক প্রিন্টিং সার্ভিস ॥ কলিকাতা ৯